শিক্ষাশ্রয়ী
মনোবিজ্ঞান

6005

(প্রথম খণ্ড)

মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ (Nature of Psychology)

মনোবিজ্ঞান কথাটির সঙ্গে সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত থাকলেও মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি এবং কর্ম্মক্ষেত্র সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও ত্রুটিপূর্ণ। এই কারণে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত ও হাস্যকর মন্তব্য প্রায়ই শোনা যায়। সাধারণ লোকের কথা ছেড়ে দিলেও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও মনোবিজ্ঞানের কর্ম্মক্ষমতা সম্বন্ধে বেশ একটা সন্দিগ্ধ মনোভাব পোষণ করেন এবং প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তা প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এ ধরনের মনোভাবের মূলে আছে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে সত্যকার জ্ঞানের অভাব বা বড় জোর মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে অতি প্রাচীন বা কোন সখের লেখকের লেখা থেকে আহরিত অসম্পূর্ণ বিদ্যা। তবে সান্ত্বনার কথা, এ ধরনের অবাঞ্ছিত মনোভাব দ্রুত বিলুপ্তির পথে।

সত্য কথা বলতে কি, বর্ত্তমানে মনোবিজ্ঞান ক্রমোন্নতির এমন একটা স্তরে এসে পৌঁছেছে যে বিশেষজ্ঞের শ্রদ্ধা-লব্ধ জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া একে এখন ভাল করে বোঝা শক্ত। গভীরতা এবং বিস্তৃতি উভয় দিক থেকেই এর কর্ম্মক্ষেত্র এত সুবিপুল হয়ে পড়েছে এবং এর পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু দুইই এত জটিল হয়ে উঠেছে যে অগভীর ভাসা ভাসা জ্ঞানে এর স্বরূপ চেনা সত্যই দুষ্কর।

মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিবর্ত্তন

প্রচলিত অনেক শব্দের মতই মনোবিজ্ঞান পদটিও তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। তবে মনোবিজ্ঞানের স্বরূপের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের একটা কাহিনী পাওয়া যাবে এই বুৎপত্তিগত অর্থের ক্রম-পরিবর্ত্তনে। ইংরাজী Psychology কথাটির উৎপত্তি হল Psyche এবং logy এই দুটি পদের সমন্বয়ে। Psyche কথাটির অর্থ হল soul বা আত্মা। আর logyর অর্থ হলো বিজ্ঞান বা শাস্ত্র। অর্থাৎ Psychologyর ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ হল আত্মার শাস্ত্র বা বিজ্ঞান। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে মনোবিজ্ঞানের জন্ম দর্শনশাস্ত্রের সূতিকাগারে। দার্শনিকদের বিশ্বরহস্য সমাধানের প্রচেষ্টায় সহায়ক হিসাবে মনোবিজ্ঞানের জন্ম হয়।

দর্শনের প্রধান সমস্যা হল দৃশ্যমান জগতের মূলতত্ত্ব নির্ণয় করা। তার জন্য তাকে সব কিছুরই বাহ্যিক অস্তিত্ব ভেদ করে পৌছতে হয় তার মূলগত স্বরূপে। দার্শনিকদের মতে প্রাণীর, বিশেষ করে মানুষের, মৌলিক সত্তাটি হল আত্মা। অতএব দৃশ্যমান জগতের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে মানুষ, তাকে জানতে হলে জানতে হবে আত্মার স্বরূপকে। দ্বিতীয়ত সকল সমস্যার মূলে হচ্ছে আমাদের লব্ধ জ্ঞান, অর্থাৎ বাহিরের জগৎকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জানা। এই "জানা" বস্তুটার স্বরূপ কি, কতটুকু তার যাথার্থ্য এবং কোথায়ই বা তার সীমা—এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দর্শনের সমস্যা সমাধানের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ফলে দার্শনিকেরা অনুভব করলেন যে, আত্মার জন্য একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের প্রয়োজন এবং তার ফলে সৃষ্ট হল Psychology বা আত্মার বিজ্ঞান।

এই দর্শন-ঘেঁসা মনোবিজ্ঞানের প্রথম সৃষ্টি বহু প্রাচীনকালে। ভারতীয় দর্শনে আত্মা ও মন সম্বন্ধে বহু আলোচনা ও তত্ত্ব পাওয়া যায়। সাংখ্য দর্শনে, গীতায়, ন্যায়-বৈশেষিকে মন, জ্ঞান, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি নিয়ে বিশদ গবেষণা করা হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে প্লেটো, অ্যারিষ্টটল, অগাষ্টাইন, আকুইনাস্, ডেকার্ট, হব্‌স্, লক্, বার্ক্‌লে, হিউম্ প্রভৃতি বিখ্যাত দার্শনিকেরা মনোবিজ্ঞানের বহু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে গেছেন। কিন্তু বিজ্ঞান কখনও অবাস্তব কোন কিছুর উপরে গড়ে উঠতে পারে না। আত্মাকে কল্পনা করা হয়েছে অগ্নিশিখার মত—চেতনারূপী সর্ব্বশক্তির আধার অথচ ইন্দ্রিয়াতীত। এ বস্তু নিয়ে যথেচ্ছ জল্পনা কল্পনা চলতে পারে কিন্তু সত্যকারের বিজ্ঞান গড়ে তোলা যায় না। বিজ্ঞানের প্রধান কাজ প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে সর্ব্বজনীন সূত্র বা আইন খুঁজে বার করা, পদ্ধতি হল সুপরিকল্পিত নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ। আত্মা সর্ব্বপ্রকার নিরীক্ষণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, পরীক্ষণের কথা দূরে থাকুক। অতএব 'আত্মার বিজ্ঞান' কথাটাই আত্মবিরোধী।

পরবর্ত্তী সুধীরা সাইকোলজীর এই সঙ্কট উপলব্ধি করলেন, এবং আত্মার পরিবর্ত্তে তাঁরা সাইকোলজীর বিষয়বস্তু করে তুললেন "মন"কে। আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকতে পারে, কিন্তু মন যে আছে সে সম্পর্কে কেউ দ্বিমত নন। তাছাড়া মনকে আমরা চিনি, জানি, তার কার্য্যাবলীর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে আমরা পরিচিত। অতএব মনকেই সাইকোলজীর প্রকৃত বিষয়বস্তু করা উচিত।

কোন কোন মনোবিজ্ঞানী আবার মনের পরিবর্ত্তে "চেতনা" কথাটির ব্যবহার করলেন। তাঁদের মতে মনের চেয়ে চেতনার অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের

জ্ঞান অনেক বেশী ও সুনির্দ্দিষ্ট। অতএব এই সব চিন্তাবিদেরা আত্মাকে সাইকোলজীর রাজ্য থেকে নির্ব্বাসিত করে দিয়ে উঠে পড়ে লেগে গেলেন "মন" বা "চেতনার" উপরই এই নতুন বিজ্ঞানকে খাড়া করতে। সাইকোলজী হল মন বা চেতনার বিজ্ঞান।

সাইকোলজী যখন আত্মার বিজ্ঞান ছিল তখন গবেষণার পদ্ধতি ছিল নিছক জল্পনা-কল্পনা, কেবলমাত্র অনুমান। কিন্তু এখন এই নতুন বিজ্ঞানের নতুন পদ্ধতি হল introspection বা অন্তর্নিরীক্ষণ। নিজের মনের প্রক্রিয়াগুলিকে গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে নিজেই নিরীক্ষণ করে পরে তা লিপিবদ্ধ করার নামই অন্তর্নিরীক্ষণ।*

মূলত এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে দীর্ঘকাল ধরে বহু মনোবিজ্ঞানী মনের প্রকৃতি, কার্য্যাবলী প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা চালালেন। বহু চিত্তাকর্ষক তথ্যে ভরা গ্রন্থের পর গ্রন্থ রচিত হল। নব-নব তত্ত্ব ও সূত্র স্তূপীকৃত হল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে একদল মনোবিজ্ঞানী দেখা দিলেন। তাঁরা পূর্ব্ববর্ত্তী সকল মনোবিজ্ঞানীর আবিষ্কারগুলিকে অপ্রমাণিত ও অনুমান-প্রসূত কল্পনা বলে উড়িয়ে দিলেন। তাঁদের প্রতিবাদের মূল বিষয় হল যে মন বা চেতনা আত্মার মত নিরীক্ষণের আওতার বাইরে, তবে তাকে নিয়ে সত্যকারের বিজ্ঞান কেমন করে গড়ে তোলা যায়? মনের মধ্যে যে সব প্রক্রিয়া ঘটে তার কোনটাই ত বাইরে থেকে নিরীক্ষণ করা যায় না। তার সম্বন্ধে সব কিছু তথ্যই অনুমান করে নিতে হয়। তাঁদের মতে অন্তর্নিরীক্ষণ পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণযোগ্যই নয় এবং তা থেকে লব্ধ তথ্যাদির উপর নির্ভর করে কোনরূপেই বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গঠন করা যায় না।

অন্তর্নিরীক্ষণকে নিরীক্ষণ বলা হলেও আসলে এটা নিরীক্ষণ নয়। কেননা যে সময়ে কোন মানসিক প্রক্রিয়া ঘটে ঠিক সেই সময়ে তাকে নিরীক্ষণ করা সম্ভব হয় না। অন্তর্নিরীক্ষণ সম্ভব হয় ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পরে। অতএব অন্তর্নিরীক্ষণের মধ্যে কল্পনার প্রভাব, পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন, অনুমান প্রভৃতি থাকতে বাধ্য। এ ধরনের একটা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে ত কোন বিজ্ঞান গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

এই নতুন মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানের এক নতুন সংজ্ঞা দিলেন। মনোবিজ্ঞান

---

* পৃঃ ৩৬ দ্রষ্টব্য

হল প্রাণীর আচরণের বিজ্ঞান। আচরণ, সে স্থূলই হোক আর সূক্ষ্মই হোক, আমাদের নিরীক্ষণের আওতার অধীন। অতএব মনোবিজ্ঞানকে যদি সত্য সত্যই বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হতে হয়, তবে আত্মা, মন, চেতনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুকে ছেড়ে দিয়ে প্রাণীর আচরণকে করতে হবে তার নিরীক্ষণের বিষয়বস্তু।

ধরা যাক একজনের খুব রাগ হয়েছে। আমাকে যদি নিছক মানসিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, তবে ঐ ব্যক্তির অন্তর্নিরীক্ষণের সাহায্য নেওয়া ছাড়া আমার কোন উপায় নাই। কেননা তার মনের ভিতর কি পরিবর্ত্তন ঘটছে সেটা আমি কোন উপায়েই জানতে পারি না। কিন্তু যদি আমি আচরণকে আমার গবেষণার বিষয়বস্তু বলে মেনে নিই, তবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আমার তথ্য সংগ্রহের সুযোগ প্রচুর। লোকটির রক্তচক্ষু, চীৎকার, আস্ফালন, মুষ্টি-উত্তোলন প্রভৃতি নিরীক্ষণ করে "রেগে যাওয়ার" স্বরূপ সম্বন্ধে একটা নির্ভরযোগ্য জ্ঞান লাভ করতে পারি। আর এই নিরীক্ষণ প্রক্রিয়াটি যদি আরও উন্নত করে তুলতে পারি তবে "রেগে যাওয়া" সম্বন্ধে প্রচুর সূক্ষ্মতর তথ্য আমার হাতে এসে পৌছবে। ঐ ব্যক্তির নানা দৈহিক আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন—যেগুলিও এক ধরনের আচরণ—যেমন, মাংসপেশীর সংকোচন, গ্রন্থির রস নিঃসরণ, শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তচলাচল, হৃৎস্পন্দন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে রেগে যাওয়া সম্বন্ধে অতি মূল্যবান সিদ্ধান্তে পৌছান আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে।

একদল চরমবাদী তো স্বয়ং মনকেই মনোবিজ্ঞান থেকে নির্ব্বাসিত করে দিলেন। এঁদের নাম আচরণবাদী বা Behaviourist। তাঁরা বলেন, মন চেতনা প্রভৃতি বস্তুগুলির আসলে কোন অস্তিত্বই নেই। ওগুলি হল আমাদের দেহের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সমবেত কাজ থেকে উদ্ভূত জটিল অবস্থার বিশেষ বিশেষ নাম, ব্যবহারিক সুবিধার জন্য দেওয়া। সত্যকারের থাকবার মধ্যে আছে প্রাণীর দেহ, তার মস্তিষ্ক ও জটিল স্নায়ুমণ্ডলী, ইন্দ্রিয়াদি, শিরা-উপশিরা, পেশী, গ্রন্থি ইত্যাদি। প্রাণীর সমস্ত কাজই এই দেহযন্ত্রের আচরণের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। "মন" বা "চেতনা"কে তার মধ্যে আনা নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য আমরা এই চরমবাদীদের মত এখানে গ্রহণ করছি না, যদিও আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অগ্রগতিতে এঁদের গবেষণার দান অগ্রাহ্যের নয়। তবে বর্ত্তমানে অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীই প্রাণীর আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করাকেই মনোবিজ্ঞানের প্রধান কাজ বলে মেনে নিয়েছন।

অতএব দেখা যাচ্ছে ক্রমবিবর্ত্তনের বিভিন্ন স্তরে Psychologyর স্বরূপ বার

বার বদলে গেছে। সাইকোলজী প্রথমে ছিল আত্মার বিজ্ঞান, পরে হল মন বা চেতনার বিজ্ঞান এবং আধুনিককালে হয়ে দাঁড়িয়েছে **আচরণের বিজ্ঞান**। সাইকোলজীর এই বারবার রূপপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে উড্ওয়ার্থের একটা চমৎকার উক্তি আছে—First, Psychology lost its soul, and then it lost its mind ; then it lost consciousness. It still has behaviour of a kind. ক

আচরণ কথাটি নিতান্ত ছোট হলেও, অর্থের দিক থেকেই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই কথাটির যথার্থ স্বরূপ বুঝতে না পারলে, মনোবিজ্ঞানের কাজের গুরুত্ব এবং বিশালতা উপলব্ধি করা যাবেনা। অতএব আমাদের পরবর্ত্তী সোপান হল প্রাণীর আচরণ বলতে আমরা কি বুঝি তা দেখা।

প্রাণীর আচরণের স্বরূপ (Nature of Behaviour)

প্রাণীর আচরণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমরা বলতে পারি, যে আচরণ হল সেই সব প্রচেষ্টা যা প্রাণী নিজেকে তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান (adjustment) বা খাপ খাইয়ে নেবার তাগিদে সম্পাদন করে।

প্রাণীমাত্রেই কোন না কোন পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে। বিনা পরিবেশে অস্তিত্বই সম্ভবপর নয়। মানুষের ক্ষেত্রে এই পরিবেশ আবার অতি জটিল এবং বহুবিধ। আলো, হাওয়া, উত্তাপ, ঋতুর প্রভাব, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য থেকে সুরু করে সামাজিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য, বংশ মর্য্যাদা, আধ্যাত্মিক চিন্তা, আত্ম-প্রতিষ্ঠার তাগিদ, স্নেহ ভালবাসার দান প্রভৃতি অগণিত বিষয় আছে যা আধুনিক মানুষের পরিবেশের অঙ্গীভূত হয়ে আছে এবং এই প্রত্যেকটি শক্তির সঙ্গে তাকে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলতে হবে, নইলে কোন না কোন প্রকারের বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। এই ত গেল পরিবেশের কথা। আবার খাপ খাইয়ে নেবে যে প্রাণী সেও একটি জটিলতার প্রতিমূর্ত্তি। এক প্রাণীর দেহেই ত আছে কত বিচিত্র যন্ত্রপাতি এবং প্রত্যেকটির কাজ এত বিভিন্ন প্রকৃতির ও এত জটিল যে আজও বিজ্ঞানীরা সেগুলিকে ভাল করে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি—যেমন মস্তিষ্ক,

ক Woodworth—Contemporary Schools of Psychology

হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, মেরুদণ্ড, পেশী, গ্রন্থি, চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয়াদি, রক্তশিরা, মূত্রাশয় ইত্যাদি। প্রাণীর পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের কাজে এর প্রত্যেকটিরই নিজের নিজের অংশ আছে এবং ফলে সঙ্গতিবিধানের কাজটিও হয়ে ওঠে অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়া। ঘরের ভিতরের গরম হাওয়া থেকে হঠাৎ বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় এসে পড়ার মত সামান্য একটা কাজে আমাদের দেহকে নূতন পরিবেশে সঙ্গতিবিধানের জন্য এতগুলো বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় যা আমরা সহজে কল্পনা করতে পারবো না। বিমান আক্রমণ, ভূমিকম্প, দুর্ঘটনা প্রভৃতি জটিল পরিস্থিতিতে সঙ্গতিবিধানের প্রতিক্রিয়াগুলি যে আরও জটিল হবে সে বিষয়ে সন্দেহই নেই।

প্রাণীর এই সঙ্গতিবিধানের প্রয়াস, যাকে আমরা সাধারণ ভাষায় আচরণ বলি, তা হল একটা জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। জন্মের মুহূর্ত্ত থেকে, এমন কি ভূমিষ্ঠ হবার আগে থেকেই এই প্রয়াস স্বরু হয় এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই প্রয়াস অব্যাহত থাকে। বলতে গেলে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে দেহ-যন্ত্রের চরম অক্ষমতার নামই মৃত্যু। অতএব দেখা যাচ্ছে যে মনোবিজ্ঞানের কাজ হল প্রাণীর এই সঙ্গতিবিধান প্রচেষ্টার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া। সুসংবদ্ধ নিরীক্ষণের সাহায্যে প্রাণীর বহুবিধ আচরণের স্বরূপ নির্ণয় করা এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের দ্বারা তাদের অন্তর্নিহিত সূত্র আবিষ্কার করা—এই হল সংক্ষেপে মনোবিজ্ঞানের কর্ম্মসূচী।

শিক্ষার স্বরূপ (Nature of Education)

মনোবিজ্ঞান বলতে কি বুঝি এবং তার কাজই বা কি তা আমরা মোটামুটি জেনেছি। এখন শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক জানতে হলে শিক্ষারও স্বরূপ জানা দরকার। সাধারণ মানুষ শিক্ষার যে অর্থের সঙ্গে পরিচিত সেটা হল শিক্ষার একটা অতি সঙ্কীর্ণ অর্থ। স্কুল, কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থ-লব্ধ বিদ্যাকেই আমরা সাধারণত শিক্ষা বলে থাকি। শিক্ষিত অশিক্ষিতের ভেদ আমরা করি গ্রন্থগত জ্ঞানের তারতম্যের উপর। যে লোক লিখতে পড়তে জানে না তাকে আমরা অশিক্ষিত বলি। কিন্তু এইভাবে কেবলমাত্র বিশেষ এক শ্রেণীর জ্ঞানলাভকে শিক্ষা বলা মানেই শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা।

এই অর্থে শিক্ষা হয়ে দাঁড়ায় বিশেষ কোন সামাজিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যের জন্য ব্যক্তির প্রস্তুতিকরণ। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার গণ্ডী আরও অনেক বড়—সারা জীবনব্যাপী। এই অর্থে শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি যে কোনও নতুন অভিজ্ঞতা যেটা প্রাণীর ভবিষ্যৎ আচরণকে কোন না কোনও ভাবে প্রভাবিত করে এবং তার মধ্যে কিছু না কিছু পরিবর্ত্তনের সৃষ্টি করে। কাঁটা-চামচের সাহায্যে ভোজনে অনভ্যস্ত কোন ভদ্রলোকের আচরণ তাঁর এক বিলাতফেরৎ বন্ধুর ডিনার টেব্‌লে প্রথম দিন সমবেত অতিথিগণের হাস্যোদ্দীপক হয়ে উঠল! কিন্তু দ্বিতীয় দিন দেখা গেল যে কাঁটা-চামচগুলি তিনি বেশ আয়ত্তে এনে ফেলেছেন এবং তাঁর আচরণ আর কারও হাস্যোদ্রেক করল না। এই যে দ্বিতীয় দিন ভদ্রলোকের আচরণের মধ্যে পরিবর্ত্তন দেখা দিল এটা হল শিক্ষা-প্রসূত এবং পূর্ব্বদিনের ডিনার-টেব্‌লের অভিজ্ঞতাই হল ভদ্রলোকের পক্ষে শিক্ষা। এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা ঘটনাবিশেষে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিটি প্রাণীর জীবনে এই শিক্ষা চলেছে নিরন্তর ছেদহীন ধারায়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত সে প্রতিনিয়তই শিক্ষাগ্রহণ করে চলেছে—প্রকৃতির সর্ব্বজনীন পাঠশালায়। প্রাণীর জীবন-বিকাশের সঙ্গে এ শিক্ষা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সমার্থক। অতএব দেখা যাচ্ছে যে কেউ নিরক্ষর থাকতে পারে কিন্তু সত্যকারের অ-শিক্ষিত কেউই থাকতে পারে না।

মানুষমাত্রেই কোন না কোন সমাজে বাস করে। তার প্রত্যেকটি আচরণ তার নিজের সমাজের কাঠামোর সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রত্যেক সমাজের সংরক্ষণের জন্য সেই সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই বিশেষ কতকগুলি আচরণ সম্পাদন করতে শেখা অবশ্য প্রয়োজন। যেমন বাঙালী সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজন যে সেই সমাজের অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তি বাংলা ভাষায় কথা বলতে শিখবে, বাঙালীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি থাকবে, বাঙালীর হাবভাব, চালচলন, প্রথা, রীতিনীতি প্রভৃতি মেনে চলবে ইত্যাদি। যদি বাঙালীসমাজের আগামী বংশধরগণ এগুলি কোন কারণে শিখতে না পারে তবে সেই মুহূর্ত্তেই বাঙালী সমাজের মৃত্যু ঘটবে। অতএব দেখা যাচ্ছে, বিশেষ কোন সমাজের বেঁচে থাকা নির্ভর করছে সমাজের অপরিণত নাগরিকদের বিশেষ কতকগুলি আচরণ শেখার উপর। সমাজের সংরক্ষণ ছাড়াও সমাজের উন্নয়নের জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন। পূর্ব্বপুরুষদের অনুসৃত আচরণগুলি ছাড়াও প্রতি যুগে কিছু কিছু নূতন আচরণের প্রবর্ত্তন হচ্ছে এবং কিছু কিছু পুরাতন আচরণ

অকেজো বলে বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এই নতুন আচরণগুলির প্রবর্ত্তন করেন সংস্কারকেরা, নতুন আদর্শ এবং চিন্তাধারার জনকেরা। অতএব সমাজের অস্তিত্ব এবং অগ্রগতি এই দুইয়ের প্রয়োজনে কতকগুলি সুনির্ব্বাচিত, সুনির্দ্দিষ্ট এবং সমাজ-স্বীকৃত আচরণ প্রত্যেক সমাজের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের শেখান হয় এবং তারই নাম "শিক্ষা"। এর জন্য প্রত্যেক সমাজেরই আছে কতকগুলি অনুমোদিত সংস্থা, যেমন পরিবার, স্কুল-কলেজ, ধর্ম্মায়তন এবং বহু ছোটখাট সামাজিক সংগঠন। এগুলিরই মাধ্যমে অপরিণত নাগরিককে শেখান হয় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামাজিক আচরণগুলি।

সমাজ-অনুমোদিত নয় এমন কোন সংস্থার মাধ্যমে যদি কোন আচরণ শেখান হয় তবে সেগুলিকে সেই বিশেষ সমাজে "শিক্ষা"র পর্য্যায়ে ফেলা হয় না এবং সেগুলি শেখা ও শেখানো—এ দুইই সেই সমাজে অসামাজিক বলে গণ্য করা হয়। এই শ্রেণীর সংস্থাগুলি সাধারণত গুপ্তপ্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করে এবং সমাজে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক বিধানগ্রহণের আইনগত ব্যবস্থা থাকে। শোনা যায়, কেমন করে চুরি করতে হয় বা পকেট মারতে হয় তা শেখানোর নাকি রীতিমত গুপ্ত স্কুল আছে। এই শেখাকে কোন সমাজই শিক্ষার পর্য্যায়ে ফেলবে না, যদিও চুরি করতে বা পকেট মারতে শেখাটাও ছবি আঁকতে বা অঙ্ক কষতে শেখার মতো এক ধরনের শেখা। যদি কখনও কোন সমাজে পকেট মারা বা চুরি করাকে অসামাজিক বলে গণ্য না করা হয়, তবে তখন পকেটমারা বা চুরি করাকেও সে সমাজে শিক্ষার পর্য্যায়ে ফেলা হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে "শিক্ষা" বলতে আমরা সেই সব আচরণগুলি আয়ত্ত করা বুঝি যেগুলি সমাজ-অনুমোদিত কতকগুলি সংস্থার মাধ্যমে সমাজের অপরিণত নাগরিকদিগকে শেখান হয়।

মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক (Relation between Psychology and Education)

মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাতত্ত্বের সম্পর্কটা বোঝা এখন সহজসাধ্য হবে। মনোবিজ্ঞান হল আচরণের বিজ্ঞান অর্থাৎ যার সাহায্যে আমরা প্রাণীর আচরণকে ব্যাখ্যা করতে পারি। কেমন করে বিশেষ বিশেষ আচরণ সংঘটিত

হয়, কোন্ বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন্ বিশেষ আচরণ সৃষ্ট হয় এবং বিভিন্ন আচরণগুলির পেছনে কোন সর্ব্বজনীন সূত্র পাওয়া যায় কিনা—এই সব নির্ণয় করাই মনোবিজ্ঞানের কাজ। আর শিক্ষাতত্ত্বের বিষয়বস্তু হল সেই আচরণের প্রয়োগমূলক দিকটি। কতকগুলি বিশেষ আচরণ শিশু-নাগরিকদের শেখানোই হলো শিক্ষাতত্ত্বের কাজ। সেদিক দিয়ে শিক্ষাতত্ত্বকে "আচরণের প্রয়োগ শাস্ত্র" বলা চলে।

অতএব মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাতত্ত্বের সম্পর্কটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এমন কি অবিচ্ছেদ্য। কোন বিশেষ আচরণ শেখাতে হলে সেই আচরণটির স্বরূপ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা যে শেখানোর পক্ষে কেবল সহায়ক তাই নয়, অপরিহার্য্যও, সে বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। সেই বিশেষ আচরণটি প্রাণী কিভাবে শিখতে পারে এবং কোন্ কোন্ পরিস্থিতি এই শেখার পক্ষে অনুকূল, কিসে স্বল্পতম প্রচেষ্টায় সর্ব্বাধিক ফল পাওয়া যাবে ইত্যাদি মূল্যবান তথ্যাদি জানা থাকলে শেখার কাজটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের পক্ষে নিঃসন্দেহে সহজ হয়ে উঠবে। আর এই প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে শেখাবার প্রচেষ্টা যে সর্ব্বদাই কষ্টকর এবং প্রায়ই ক্ষতিকর তার প্রমাণ সব দেশের শিক্ষার ইতিহাসের পাতায় পাতায়।

মনে করা যাক কোন শিক্ষক তার ছাত্রকে রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা মুখস্থ করাতে চান বা বীজগণিতের সমীকরণ শেখাতে চান। এখন কবিতা মুখস্থ করতে হলে বা সমীকরণ শিখতে হলে কি ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয় এবং কোন্ কোন্ বাহ্যিক এবং মানসিক পরিস্থিতি এই সব প্রক্রিয়ার অনুকূল বা প্রতিকূল এই তথ্যগুলি জানা থাকলে তবেই শিক্ষকের প্রচেষ্টা সার্থক হতে পারে, নইলে নয়।

প্রাচীন শিক্ষাদানের সব চেয়ে বড় ত্রুটি ছিল যে তার পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানসম্মত ছিল না। প্রায় ক্ষেত্রেই শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হত কতকগুলি বিশ্বাস এবং কল্পিত ধারণার দ্বারা এবং ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে পড়ত। সত্য বলতে কি, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফল শিক্ষার ক্ষেত্রে যতটা পরিবর্ত্তন এনেছে এতটা অন্য কোন ক্ষেত্রে আনতে পারে নি। শিখন-প্রক্রিয়া, মুখস্থ করার উপকারিতা, শাস্তিদানের সার্থকতা, শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা প্রভৃতি শিক্ষাঘটিত বহুসমস্যা সম্বন্ধে প্রাচীন শিক্ষাবিদ্‌গণ যে সব ধারণা পোষণ করতেন আজ মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে তা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে, সেইজন্য

মনোবিজ্ঞানসম্মত নতুন তথ্যের উপর বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সর্ব্বজনীনরূপে দেখা দিয়েছে।

অবশ্য শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে তাকে যে মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এ সত্য শিক্ষাবিদ্‌রা অতি প্রাচীনকাল থেকেই উপলব্ধি করে এসেছেন এবং অনেকে মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা যে সার্থক ও কার্য্যকরী কোন শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তুলতে পারেন নি তার মূলে তাঁদের প্রতিভার অভাব বা অবিচক্ষণতা ছিল না, ছিল নির্ভরযোগ্য পরীক্ষণ-ভিত্তিক সত্যকারের এক মনোবিজ্ঞানের অভাব।

শিক্ষার মোটামুটি তিনটি দিক আছে—লক্ষ্য, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি। শিক্ষার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত এই সমস্যার সমাধান করবে দর্শন। আমরা দেখেছি শিক্ষা জীবনবিকাশের সঙ্গে সমার্থক। অতএব মানুষের বেঁচে থাকার লক্ষ্যের সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। আবার ব্যক্তিমাত্রের বেঁচে থাকার লক্ষ্য নির্ভর করে সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে তার জীবন-দর্শন কি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে তার উপর। সেইরকম শিক্ষার বিষয়বস্তু মোটামুটি নির্ভর করে শিক্ষার লক্ষ্যের উপর অর্থাৎ শেষ পর্য্যন্ত সেই দর্শনশাস্ত্রের অনুশাসনের উপর। কিন্তু শিক্ষার পদ্ধতি পুরোপুরি নির্ভর করে মনোবিজ্ঞানের উপর। "শিক্ষার" অর্থ কোন বিশেষ আচরণ শেখা, অতএব শিখন-প্রক্রিয়া রয়েছে সব শিক্ষার মূলে। ফলে শিক্ষার সার্থকতা বহুলাংশে নির্ভর করছে শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার কার্য্যকারিতার উপর এবং সেইজন্য মনোবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া শিক্ষাদানের কোন কার্য্যকরী পদ্ধাত গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব।

তেমনি যদি কোনও শিক্ষাবিদ্ বলেন যে মানুষের প্রকৃতিদত্ত বাসনাগুলির সম্পূর্ণ নিরোধ বা বাইরের জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়নিচয়কে সম্পূর্ণ সরিয়ে এনে সেগুলিকে অন্তর্মুখী করা ইত্যাদি হল শিক্ষার লক্ষ্য তাহলে মনোবিজ্ঞান আপত্তি জানিয়ে বলবে যে এ ধরনের লক্ষ্য, অন্তত সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে, একান্ত অবাস্তব এবং কখনই এগুলিকে কার্য্যে পরিণত করা যাবে না। শিক্ষার লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু যদিও শিক্ষার দর্শনশাস্ত্রের স্বরূপের উপর নির্ভর করে, তবুও এগুলি মনোবিজ্ঞানের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন (Educational Philosophy) শিক্ষার লক্ষ্য স্থিরীকৃত করে দিলেও দেখতে হবে যে সেই লক্ষ্য শিক্ষার্থীর শিখন-ক্ষমতার আওতার মধ্যে কিনা এবং সে দেখার ভার শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের উপর। ।শক্ষার

লক্ষ্য যতই কাম্য ও দর্শনশাস্ত্র-গ্রাহ্য হোক না কেন যদি সেটা শিক্ষার্থীর নাগালের বাইরে হয় তবে সে শিক্ষা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে এ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে না।

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে মনোবিজ্ঞানের হাত যতটা না থাক, সে লক্ষ্যের কতটুকু কার্য্যে পরিণত হল এই প্রয়োজনীয় তথ্যটুকুও জানাতে পারে একমাত্র মনোবিজ্ঞানই। শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর মানসিক সংগঠনে অভীপ্সিত পরিবর্ত্তন ঘটল কিনা, ঘটলে কতটুকু ঘটল এবং সেই পরিবর্ত্তন স্থায়ী কিনা ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে একমাত্র মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে। শিক্ষার ফল অবশ্য অনেকাংশে উপলব্ধি করা যায় আচরণের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে, কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের সত্যকারের নির্ভর-যোগ্য ও নিখুঁত পরিমাপ পেতে হলে মনোবিজ্ঞান-সম্মত পরীক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব আরও বেশী। শিক্ষার বিষয়বস্তু যে কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর শিখন ক্ষমতার আয়ত্তাধীন হবে তাই নয়, শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী তা সুবিভক্ত হবে; কোন্ বয়সের পক্ষে কোন্ শ্রেণীর বিষয়বস্তু উপযুক্ত হবে এবং শিক্ষার্থীর ক্রমবিকাশমান দেহমনের বৃদ্ধির সঙ্গে কি করে বিষয়বস্তুকে সুসংহত করা যাবে এই অতি প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে একমাত্র মনোবিজ্ঞানই। এছাড়া আরও কতকগুলি শিক্ষা-ঘটিত সাধারণ সমস্যার সমাধানেও মনোবিজ্ঞান শিক্ষাতত্ত্বকে প্রচুর সাহায্য করেছে। কোন্ কোন্ দিক দিয়ে বর্ত্তমান শিক্ষাতত্ত্ব মনোবিজ্ঞানের গবেষণার উপর নির্ভরশীল তার একটা মোটামুটি তালিকা দেওয়া হল।

১। **ব্যক্তিগত বৈষম্য**—সব মানুষ সমান নয়। দৈহিক, মানসিক ও অন্যান্য অনেক দিক দিয়ে মানুষে মানুষে প্রচুর প্রভেদ, ফলে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতাও অসমান। গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় এই বৈজ্ঞানিক তথ্যের কোন স্থান নেই। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির প্রথম লক্ষ্য হল এই প্রকৃতিগত বৈষম্য অনুযায়ী শিক্ষার পদ্ধতিকে পরিবর্ত্তনশীল ও বৈচিত্রময় করা।

২। **শিখনপ্রক্রিয়ার নিয়মাবলী**—মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক গবেষণার ফলে শিখন-প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। জানা গেছে যে সাধারণত আমরা সব বস্তু একই প্রক্রিয়ায় শিখি না এবং বিভিন্ন শিক্ষণীয় বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী সেগুলি বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিখি। যেমন জ্যামিতির উপপাদ্য শেখা ও টাইপ করতে শেখা, দুইই শিখন কার্য্য হলেও শিখনের পদ্ধতি

উভয়ক্ষেত্রে বিভিন্ন। এখন শিক্ষক যদি এই শিখন পদ্ধতির বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে পরিচিত থাকেন তবেই তাঁর শিক্ষণ সফল হতে পারে। নতুবা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের শ্রমের মিথ্যা অপচয় হতে বাধ্য।

৩। **ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকের ক্রমবিকাশের নিয়মাবলী**—শিক্ষা ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সমার্থক। নবজাতকের দেহ, মন, বুদ্ধি, অনুভূতি, সামাজিক চেতনা প্রভৃতি থাকে নিতান্ত অপরিণত অবস্থায়, কিন্তু সময়ের অতিক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে এর প্রত্যেকটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং যথাসময়ে পূর্ণতালাভ করে। মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে ব্যক্তিসত্তার এই প্রত্যেকটি দিকের বৃদ্ধির ধারা ও গতি এক ত নয়ই বরং এদের প্রত্যেকটির একটা নিজস্ব ভঙ্গী এবং পথ আছে। শিশুর শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে এই বিভিন্ন বিকাশভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

৪। **বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ**—শিক্ষা গ্রহণের ক্ষিপ্রতা এবং সার্থকতা দুইই বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির উপর। দেখা গেছে সব কিছু শেখা বিশেষ করে চিন্তামূলক কোন কিছু শেখা নির্ভর করে বুদ্ধির পরিমাণের উপর। মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় এই বুদ্ধির প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য জানা গেছে এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে বর্তমানে এই বুদ্ধির পরিমাপ করার পন্থাও আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে শিক্ষাদানের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান এখন সম্ভব হয়েছে।

৫। **মনোযোগ দেওয়া (Attending), মনে রাখা (Remembering), ভুলে যাওয়া (Forgetting)** প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে বহু মূল্যবান গবেষণা হয়েছে এবং ফলে নানা প্রয়োজনীয় তথ্যাদিও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই তথ্যগুলি বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

৬। **সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct) ও প্রক্ষোভের (Emotion)** সঙ্গে শিক্ষার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। শিক্ষার্থীর বহু আচরণের উপর তার বিভিন্ন প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণক্ষমতা উল্লেখযোগ্য এবং এই প্রবৃত্তিগুলির স্বরূপ ও কার্য্যপন্থা সম্বন্ধে শিক্ষকের প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকলে শিক্ষণ-কার্য্য অপচয়বহুল হতে বাধ্য। শিক্ষার সুষ্ঠু সম্পাদন আবার শিক্ষার্থীর অনুকূল প্রক্ষোভের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। সুতরাং প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্যাদি শিক্ষকের জানা নিতান্ত আবশ্যক।

৭। **গণ-মনোবিজ্ঞানের (Group Psychology)** নানা সূত্রাবলী আজকাল শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে। আধুনিক শিক্ষাদান প্রথা দল-মূলক, ব্যক্তি-মূলক নয়। ফলে দলগত মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য।

৮। **আচরণ-গত সমস্যাদির (Bahaviour Problems)** সমাধান করা সুষ্ঠু শিক্ষণ-কার্য্যের প্রথম সোপান। আচরণগত সমস্যার প্রধান কারণ হল পরিবেশের সঙ্গে কোন কারণে খাপ খাওয়াতে না পারা। আর পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে নি এমন ছাত্রকে কিছু শেখানই চলে না। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে শৈশব ও কৈশোরের আচরণমূলক সমস্যাদি সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে।

৯। **মনোবিজ্ঞান-সম্মত পরিমাপ-পদ্ধতি (Psychological Testing).** শিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান হল মানসিক প্রক্রিয়ার পরিমাপক যন্ত্রের আবিষ্কার। আজকাল বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিক্ষার্থীর অধীত-জ্ঞানের পরীক্ষা (Educational Testing) সম্ভবপর হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলি (Personality Traits), তার আগ্রহ (Interest), মনোভাব (Attitude) প্রভৃতি পরিমাপ করার যন্ত্রও আজকাল আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির যথাযথ ব্যবহার যে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে যথেষ্ট উন্নত করে তুলেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ (Nature of Educational Psychology)

শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। শিক্ষা হল নতুন জ্ঞান ও আচরণের আয়ত্তীকরণ। মনোবিজ্ঞান হল আচরণের প্রকৃতি, গতি ও সংঘটনের বিশ্লেষণ ও সংব্যাখ্যান। শিক্ষার বিষয়বস্তু হল কেমন করে নতুন আচরণ সম্পাদন করা যায় তা দেখা, আর মনোবিজ্ঞানের কাজ হল সেই আচরণটির প্রকৃতি কি ও কিভাবে তা ঘটে তা দেখা। অতএব সার্থক শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য অপরিহার্য্যই।

তাছাড়া শিক্ষা নির্ভর করছে শিখন প্রক্রিয়ার উপর। কোন কিছু শিখন (learning) ছাড়া শিক্ষা হয় না। আর সে শিখন হতে পারে দুরকম বস্তুর, জ্ঞান (knowledge) এবং দক্ষতার (skill)। এ দুরকম শিখনই নির্ভর করে মানসিক শক্তির উপর। প্রাণী যে শিখতে পারে অথচ জড়বস্তু পারে না, তার কারণ হল প্রাণীর শিখনক্ষমতা আছে, জড়বস্তুর নেই। শিখনের মাত্রা, উৎকর্ষ ও কার্য্যকারিতা সবই নির্ভর করে এই মানসিক শক্তির প্রকৃতি ও সংগঠনের উপর। এই মানসিক শক্তির স্বরূপ ও কর্ম্মদক্ষতা জানতে হলে আমাদের মনোবিজ্ঞানের সাহায্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। শিখন নির্ভর করে প্রত্যক্ষণ (Perception), সংবোধন (Comprehension), চিন্তন (Thinking), বিচারকরণ(Reasoning) মনে রাখা (Remembering) ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উপর। এগুলি কি ভাবে সংঘটিত হয় এবং এগুলির বৈশিষ্ট্য কি তা জানা সার্থক শিখনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া শিক্ষার্থীর কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেও শিখন নিবিড়ভাবে জড়িত। যেমন প্রবৃত্তি (Instinct), প্রক্ষোভ (Emotion), আগ্রহ (Interest), মনোভাব (attitude) ইত্যাদি মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলিও শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। অতএব এগুলি সম্পর্কেও শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ জ্ঞান থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ এক কথায় শিক্ষার্থীকে তার শক্তি, চাহিদা, পছন্দ, অভিরুচি এসমস্ত নিয়ে সমগ্রভাবে জানা দরকার এবং তার জন্য প্রয়োজন মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ। এইজন্যই বলা হয়েছে যে শিক্ষার পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।

এইসব কারণে বিংশশতাব্দীর সুরু থেকেই মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার মধ্যে বিভেদের দূরত্বটা ক্রমশ কমতে সুরু হল। শিক্ষাবিদেরা শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং শিক্ষার উৎকর্ষ, কার্য্যকারিতা ইত্যাদি সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি প্রয়োগ করতে সুরু করলেন। এই থেকে জন্ম নিল মনোবিজ্ঞানের নতুন একটি শাখা। এরই নাম হল শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology) অর্থাৎ শিক্ষাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে যে মনোবিজ্ঞান।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এই পরিবর্ত্তন কেবলমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রেই দেখা দিল না। এই সময় মানব অস্তিত্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতেও মনোবিজ্ঞানের এই অনুপ্রবেশ ঘটল। সর্ব্বত্রই গবেষকেরা মনোবিজ্ঞানমূলক বিশ্লেষণ ও সংব্যাখ্যানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে লাগলেন এবং ব্যাপকভাবে মনো-বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও সূত্রগুলির প্রয়োগ করতে সুরু করলেন। দেখতে দেখতে মনোবিজ্ঞানের নানা নতুন নতুন শাখা গড়ে উঠতে লাগল, যেমন শিশু মনোবিজ্ঞান, ব্যক্তিগত মনোবিজ্ঞান, সামাজিক মনোবিজ্ঞান, শিল্পাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান, মনোবিকার-মূলক মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি। এক কথায় মানব আচরণের সমস্ত অলিগলিতেই মনোবিজ্ঞানের সন্ধানী আলোর সম্প্রপাত ঘটল। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান এইভাবেই গড়ে উঠল।

এই নতুন শাখাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি মূলত প্রয়োগমূলক। সাধারণ মনোবিজ্ঞান হল প্রধানত তত্ত্বমূলক, অর্থাৎ মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি আবিষ্কার ও সপ্রমাণ করাই তার কাজ। কিন্তু সেগুলিকে নিজের নিজের বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কোন সমস্যার সমাধান করা বা কোন নতুন ব্যবহারিক মূল্য-সম্পন্ন তথ্য আবিষ্কার করাই হল এই নতুন নতুন শাখাগুলির লক্ষ্য। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানও এই ধরনের প্রয়োগমূলক ও ব্যবহারিক মূল্যসম্পন্ন মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের বিকাশ

শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক যখন এতই ঘনিষ্ঠ, তখন শিক্ষার সমস্যাগুলির সমাধানে প্রাচীন কাল থেকেই মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগের যে প্রচেষ্টা হবে তাতে

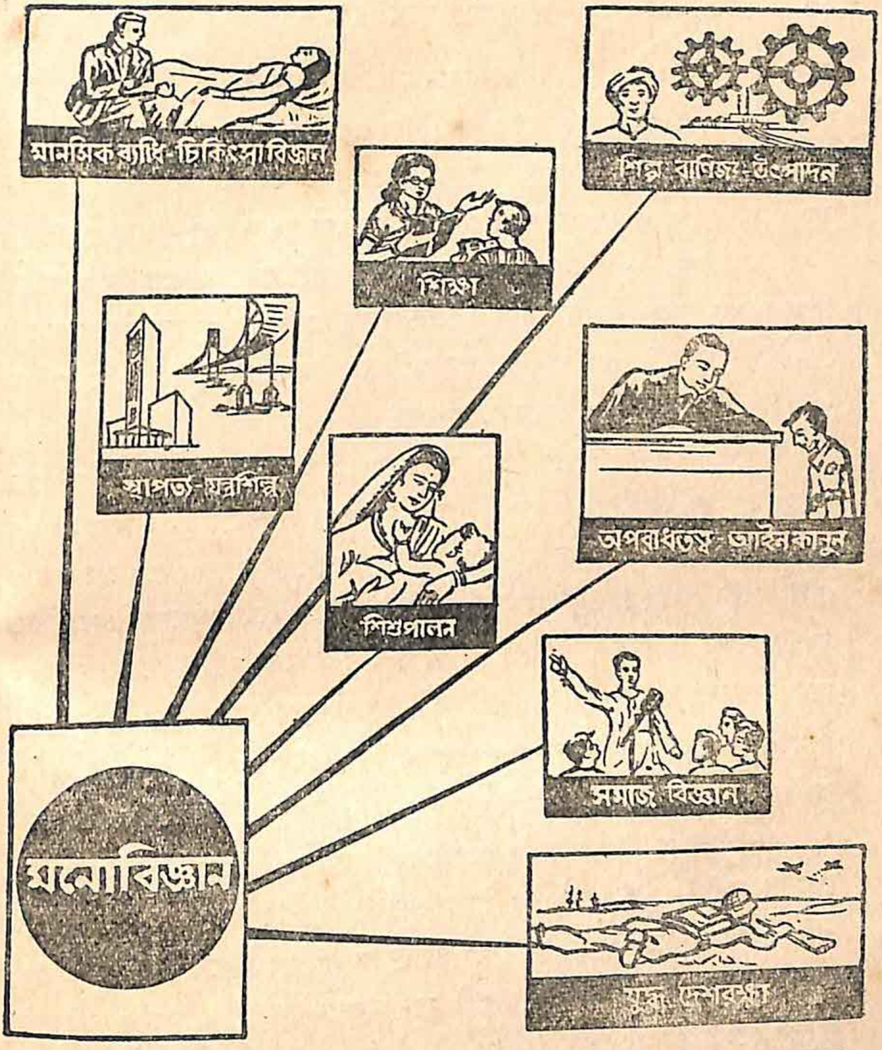
বিস্ময়ের কিছু নেই। বর্ত্তমান শতাব্দীর সূত্রপাত থেকেই পৃথিবীর সমস্ত প্রগতিশীল দেশগুলিতে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞান-সম্মত করার ব্যাপক প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে এবং বর্ত্তমানে শিক্ষাকে আশ্রয় করে এক নতুন পূর্ণাবয়ব মনোবিজ্ঞান গড়ে উঠেছে।

পূর্ব্বেই বলেছি যে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের জন্ম অতি সাম্প্রতিক হলেও এর পরিকল্পনা খুবই প্রাচীন। শিক্ষার পদ্ধতি যে মনোবিজ্ঞান-অনুমোদিত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে একথা প্রায় সমস্ত শিক্ষাবিদই স্বীকার করে গেছেন। প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটল্ সঙ্গীতকে পাঠ্যবিষয়ের একটি প্রধান অঙ্গ করার যে নির্দ্দেশ দিয়ে গেছলেন তার প্রধান কারণ হল যে তাঁর মতে সঙ্গীত মনের সঞ্চিত আবেগের বোঝাকে লাঘব করে দিয়ে মানসিক সাম্য ফিরিয়ে আনে এবং পাঠগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজ ও সার্থক করে তোলে। এ পদ্ধতির তিনি নাম দিয়ে গেছেন ক্যাথারসিস্ (Catharsis) বা বিরেচন-প্রক্রিয়া। আধুনিক ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের এ্যাব্রিক্সান (Abreaction) পদ্ধতির সঙ্গে অ্যারিষ্টটলের এই পদ্ধতির প্রচুর মিল আছে। অ্যারিষ্টটলের এই নির্দ্দেশকে শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রাচীনতম প্রয়োগ বলা যেতে পারে।

রোমান শিক্ষাবিদ্ কুইন্টিলিয়ান শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের আরও বিশদ ও সুনির্দ্দিষ্ট প্রয়োগের নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন। শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর অনুশাসনগুলির আধুনিকতা সময় সময় আমাদের বিস্মিত করে তোলে। তাঁর মতে শিশুকে কোনও কিছু শেখানোর আগে দেখতে হবে তার কি ধরনের মানসিক শক্তি ও সহজাত ক্ষমতা আছে। শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা সুরু হবে খেলার মধ্যে দিয়ে। দৈহিক শাস্তিকে শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে। শিশুর নিজস্ব অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির উপর শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানের বহু অধুনা-স্বীকৃত তথ্যের প্রয়োগ কুইন্টিলিয়ানের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ কমেনিয়াস্ শিক্ষণের পদ্ধতি কেমন করে মনোবিজ্ঞানসম্মত করা যায় তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করে গেছেন। তিনিই প্রথম ছবির বইএর সাহায্যে শিশুদের অক্ষর পরিচয়ের প্রথার প্রচলন করেন।

প্রসিদ্ধ ফরাসী মনীষী রুশো তাঁর "এমিল" বইতে সেই সময়ের শিক্ষাপদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং শিক্ষার নানা সমস্যা সম্বন্ধে নিজের মতামত দিয়ে গেছেন। যদিও তাঁর সিদ্ধান্ত বহুক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী, অবাস্তব ও আবেগজাত



[বিংশ শতাব্দীর একটা বড় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল মানব-অস্তিত্বের প্রায় সর্ব্ব ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রবেশ। শিল্প, বাণিজ্য, স্থাপত্য, সমাজ-বিজ্ঞান, যুদ্ধ, দেশরক্ষা, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, শিশুপালন, অপরাধ-তত্ত্ব, শিক্ষা প্রভৃতি মানবজীবনের সর্ব্বপ্রদেশেই মনোবিজ্ঞানের আধিপত্য দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে গড়ে উঠেছে মনোবিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা। যেমন,—সমাজ-বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে সামাজিক মনোবিজ্ঞান (Social Psychology)। শিশু-পালনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শিশু মনোবিজ্ঞান (Child Psychology)। শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শিল্পাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান (Industrial Psychology)। সেইরকম শিক্ষাকে আশ্রয় করে যে বিশেষ মনোবিজ্ঞান গড়ে উঠেছে তার নাম **শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান** (Educational Psychology)।]

তবুও বিস্ময়ের কথা এই যে শিক্ষার অনেক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ও সমাধান বর্ত্তমান মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিকেও প্রগতিশীলতার দিক দিয়ে ছাড়িয়ে যায়। যখন তিনি বলছেন, যে "তোমার ছাত্রদের ভাল করে পর্য্যবেক্ষণ করে তবে তোমার কাজ স্বরু কর। কেননা একথা পরিষ্কার যে তুমি তাদের সম্বন্ধে কিছুই জান না।" বা "কথা কথা কথা……নিজেদের অক্ষমতা ঢাকার জন্যই শিক্ষকেরা প্রাণহীন ভাষাকে শিক্ষার জন্য বেছে নিয়েছেন" কিংবা "প্রকৃতি চান যে শিশুরা পূর্ণবয়স্ক হবার আগে যেন শিশুই থাকে," তখন তিনি যে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের আধুনিকতম সূত্রগুলির প্রয়োগ করছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানকে গড়ে তুলতে যাঁরা সাহায্য করে গেছেন তাদের মধ্যে পেষ্টালষ্টির নাম সর্ব্বাগ্রে আসে। তিনিই প্রথম শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করে তোলার জন্য আন্দোলন স্বরু করেন এবং বাস্তবে সেই আন্দোলনকে রূপ দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মুন্ষ্টারবার্গের কথায় পেষ্টালষ্টি মনোবিজ্ঞানের একজন বড় সমর্থক হলেও তিনি মনোবিজ্ঞানের 'অ-আ-ক-খ'ও জানতেন না। ফলে সত্যকারের মনোবিজ্ঞানসম্মত কোন শিক্ষাপ্রণালী তিনি উদ্ভাবন করে যেতে পারেন নি। তবুও শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের স্রজকদের একজন হিসাবে তাঁর নাম যে শিক্ষার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মনোবিজ্ঞানের উপরে ভিত্তি করে প্রথম শিক্ষা-পদ্ধতি গড়ে তোলেন জার্ম্মানীর জোয়ান হার্ব্বাট। তাঁর উদ্ভাবিত শিক্ষাদানের পাঁচটি সোপান শিক্ষক সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং বহু দেশে বহুদিন আদর্শ পদ্ধতি বলে সমাদর লাভ করে এসেছে। অবশ্য আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে হার্ব্বাটের অনেক সিদ্ধান্তই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

জার্ম্মানীর আর একজন শিক্ষাবিদ্ ফ্রেড্রিক ফ্রয়েবেলের উদ্ভাবিত কিণ্ডার্গার্টেন পদ্ধতিতে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। অবশ্য ফ্রয়েবেল প্রধানত দার্শনিকই ছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর সূত্রপাত হতে বহু শিক্ষাবিদ্ শিক্ষার সমস্যাগুলি মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাধান করতে স্বরু করেন। এঁদের মধ্যে ফ্রান্সিস পার্কার, ষ্ট্যানলি হল, জন ডিউই, মারিয়া মণ্টেসরী, কিলপ্যাট্রিক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের এবং আরও অনেকের সম্মিলিত অবদানে আজ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়ে উঠেছে।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান ও সাধারণ মনোবিজ্ঞান

এই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান অবশ্য সাধারণ মনোবিজ্ঞান থেকে বিভিন্ন বা স্বতন্ত্র কোন শাস্ত্র নয়। এটি শেষোক্তরই একটি শাখা-বিশেষ। সাধারণ মনোবিজ্ঞানের যে সব গবেষণালব্ধ সূত্রগুলি সরাসরি শিক্ষার সমস্যা সমাধানে সক্ষম, সেগুলিই এই নতুন মনোবিজ্ঞানের মূলভিত্তি। সেগুলিকে আশ্রয় করে এবং শিক্ষার সমস্যাগুলি সামনে রেখে গবেষণা চালানোর ফলে যে সব নব নব সূত্র ও তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলিই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের অবয়ব সংগঠন করেছে। শিক্ষাকে সার্থক, আয়াসহীন ও কার্য্যকরী করে তুলতে হলে যে সব তথ্যের প্রয়োজন সেগুলি আবিষ্কার করাই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কাজ। ফলে এর গবেষণার ক্ষেত্র ও লক্ষ্য সাধারণ মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র ও লক্ষ্য অপেক্ষা অনেকাংশে সংকীর্ণ ও বিশেষধর্ম্মী হয়ে উঠেছে।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান কেবলমাত্র সাধারণ মনোবিজ্ঞানের ফলিতরূপ নয় যদিও সাধারণ মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ থেকেই এর জন্ম। কেননা সাধারণ মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে কেবলমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেই এর কাজ শেষ হয় নি। বরং সেখানেই হয়েছে এর কাজের সুরু। সেই সূত্রগুলিকে ভিত্তি করে শিক্ষার সমস্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক গবেষণা চালানোই এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই গবেষণালব্ধ নতুন তথ্যাদির উপরই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের বর্ত্তমান সৌধ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গবেষণাই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রাণ। এর বর্ত্তমান রূপ এবং ভবিষ্যৎ প্রসার সবই নির্ভর করে গবেষণার সাফল্যের উপর। শিক্ষার সমস্যাগুলি সমাধান করে শিক্ষাকে সহজ ও সার্থক করে তুলতে হলে বহু বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার প্রয়োজন। কেমন করে শিক্ষার লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়, কি পদ্ধতিতে শিক্ষাদান আয়াসহীন ও আনন্দদায়ক হতে পারে, কোন্ পরিস্থিতিতে শিখন-প্রক্রিয়া সহজ ও কার্য্যকরী হয়, কোন্ কোন্ সর্ত্ত স্মৃতির সহায়ক ইত্যাদি শিক্ষাঘটিত প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়াই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কাজ।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্ম্মপরিধি

১। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্ম্মসূচি শিক্ষার সকল সমস্যারই ক্ষেত্রে বিস্তৃত। কিন্তু শিখন-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গবেষণা চালানোই হল এর সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য। প্রাণী কি পন্থায় শেখে, শিক্ষার বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ও পরিমাণের সঙ্গে শেখার কার্য্যকারিতার কি সম্বন্ধ, মানসিক প্রক্ষোভ ও প্রেষণার উপর শিক্ষা কতটুকু নির্ভরশীল, কোন্ কোন্ পরিস্থিতি শিক্ষার অনুকূল এবং প্রতিকূল ইত্যাদি শিক্ষাঘটিত সমস্যাগুলির সমাধান করাই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের সর্ব্বপ্রধান কাজ।

২। ব্যক্তিসত্তার (Personality) বিভিন্ন দিকের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার বিষয়বস্তুকে সুনির্ব্বাচিত ও সুবিভক্ত করা হল শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের আর একটি কাজ।

৩। যদিও শিখন-প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট সমস্যাদি সমাধান করাই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের সর্ব্বপ্রধান কাজ, তবুও শিক্ষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আরও কতকগুলি বিষয়বস্তু আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের আওতায় এসে পড়েছে এবং সেগুলির উপরে গবেষণা চালানোও শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কার্য্যের অন্তর্গত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, শিশুর ব্যক্তিসত্তার গঠনের নানাদিক, তার প্রবৃত্তি-প্রক্ষোভের স্বরূপ, তার চাহিদা, আগ্রহের বৈশিষ্ট্য, মনোনিবেশের নিয়মাবলী, জন্মগত উত্তরাধিকারের প্রভাব, শাস্তি ও পুরস্কারের কার্য্যকারিতা, দলগত জীবনযাত্রার নানা বৈশিষ্ট্য, শিক্ষার সামাজিক দিক, ইত্যাদি।

৪। শিক্ষার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত এই রকম আর একটি বিষয়বস্তু হল বুদ্ধি বা মনের সাধারণ শক্তি। দেখা গেছে শেখার উৎকর্ষ এবং ক্ষিপ্রতা দুইই বেশ নির্ভর করে বুদ্ধির ওপর। বুদ্ধিমান ছেলে তাড়াতাড়ি শেখে, স্বল্পবুদ্ধির শিখতে দেরী হয়। অতএব বুদ্ধির স্বরূপ, বুদ্ধির ক্রমবিকাশ, বুদ্ধির পরিমাপ প্রভৃতি বিষয়গুলি পর্য্যবেক্ষণ করাও আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কার্য্যসূচীর অন্তর্গত হয়েছে।

৫। শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষকের কার্য্য শেষ হয় না। শিক্ষার্থী কি পরিমাণে সে শিক্ষা গ্রহণ করলো সেটা দেখাও শিক্ষাব্যবস্থার একটি অঙ্গ। স্কুল-কলেজে গতানুগতিক পরীক্ষা-গ্রহণের পদ্ধতি যে ভীষণভাবে ত্রুটিপূর্ণ,এমন কি

বহুক্ষেত্রে ক্ষতিকর এ সিদ্ধান্ত এখন সর্ব্বজনস্বীকৃত। আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের একটা বড় কাজ হল বিজ্ঞানসম্মত সার্থক পরীক্ষা-ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা। দীর্ঘ গবেষণার ফলে আজকাল স্কুল-কলেজের পাঠ্যবিষয়গুলির উপর প্রায় নিখুঁত পরীক্ষা-প্রণালী (Educational Tests) আবিষ্কার করা সম্ভব হয়ে উঠেছে।

৬। শিক্ষার সঙ্গে সমাজের নিবিড় সম্পর্ক এতদিন শোচনীয়ভাবে অবহেলিত হয়ে এসেছিল। ফলে শিক্ষা হয়ে উঠেছিল পুরোপুরি অবাস্তব, নিছক তথ্যে সীমাবদ্ধ। সামাজিক মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং সামাজিক সমস্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করা শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের আর একটি কাজ।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি

যদিও স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে মনোবিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে বহু বৎসর পূর্ব্বে তবুও এতদিন যে মনোবিজ্ঞান সত্যকার মনোবিজ্ঞানের পর্য্যায়ে উঠতে পারে নি তার প্রধান কারণ হল এর অনুসৃত পদ্ধতি ছিল পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক। সে যুগের মনোবিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে অপরের কথাবার্ত্তা, আচরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং ধারণা থেকেই সেই ব্যক্তির মনের প্রকৃতি ও গতি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য নির্ণয় করা যায় এবং এই ধরনের অনুমান-প্রসূত সিদ্ধান্তের সাহায্যে মনোবিজ্ঞান গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু নিছক অতীতের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে গড়া সিদ্ধান্ত বা ধারণা কখনই অভ্রান্ত হতে পারে না এবং ফলে এই সব মনোবিজ্ঞানীরা যে সব সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হতেন তা প্রায়ই পরস্পর-বিরোধী হত এবং কোন ব্যাপারেই সর্ব্বজনসম্মত তত্ত্ব গড়ে তোলা সম্ভব হত না। ফলে স্বভাবতই মনোবিজ্ঞান খেয়াল খুসীভরা জল্পনাকল্পনার গণ্ডী ছেড়ে একপাও এগোতে পারেনি। পরবর্ত্তী মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় সুনির্দ্দিষ্ট এবং সুনিয়ন্ত্রিত নিরীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন এবং ১৮৭৯ সালে জার্ম্মান মনোবিজ্ঞানী ভুণ্ট্ (Wundt) কর্ত্তৃক লিপজিগে (Leipzig) প্রথম

মনোবিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে মনোবিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার স্বরু হল।

ভুন্ট এবং তার কৃতী ছাত্রের দল মনোবিজ্ঞানের নানা অভিনব পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। বিংশ শতাব্দীর মুখে মনোবিজ্ঞানের বহু নতুন নতুন শাখার ও সৃষ্টি হয়। তাদের সকলের সম্মিলিত অবদানে মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতির দ্রুত উন্নতি ঘটে। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের (Freud) উদ্ভাবিত মানসিক প্রক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণের অভিনব পদ্ধতিগুলি মনোবিজ্ঞানকে, বিশেষ করে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানকে প্রচুর প্রভাবিত করেছে।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতির ক্ষেত্রে সত্যকার যুগান্তর এনেছে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান পদ্ধতির (Statistical method) উদ্ভাবন ও দ্রুত উন্নতি। ইতিপূর্ব্বে দুই একটি পদ্ধতি ছাড়া মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলিকে পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত বা যোল আনা ত্রুটিহীন বলা চলতো না। আধুনিক পরিসংখ্যান প্রণালীর আবিষ্কারের ফলে এই পদ্ধতিগুলিকে পরিমার্জ্জিত ও পরিশোধিত করে প্রায় ত্রুটীহীন এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলা সম্ভব হয়েছে।

১। পরীক্ষণ পদ্ধতি (Experimental Method)

পূর্ব্বেই বলেছি যে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান একটি গবেষণামূলক বিজ্ঞান। রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, শরীরতত্ত্ব প্রভৃতির মত আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানেও পরীক্ষণ পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত হয়। কোন ঘটনা বা প্রক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা এবং তার সঙ্গে অন্য ঘটনা বা প্রক্রিয়ার কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে পরীক্ষণ পদ্ধতিই হল সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী। আমরা জানি প্রকৃতি এক অবস্থায় একই রকম কার্য্য করে। অর্থাৎ যদি কোন বিশেষ বিশেষ সর্ত্তের অধীনে কোন একটি ঘটনা ঘটে, আর ঐ বিশেষ বিশেষ সর্ত্তগুলির যদি পুনরাবির্ভাব ঘটানো যায়, তবে ঘটনাটিরও পুনরাবৃত্তি ঘটে। মানব-আচরণও প্রাকৃতিক ঘটনার অন্তর্গত, অতএব সে ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা সত্য হবে। পরীক্ষণ পদ্ধতিতে আমরা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সর্ত্ত সৃষ্টি করে ঘটনাটিকে ঘটাই ও তার বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করি। ঐ বিশেষ বিশেষ সর্ত্তগুলির মধ্যে কোন্‌টির অস্তিত্ব একান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেটি না থাকলে ঘটনাটি ঘটতে পারে না, সেই সর্ত্তটিকে খুঁজে বার করি। সর্ত্তগুলির সব কটিই ঘটনাটি ঘটার

পক্ষে অপরিহার্য্য নয়, কিন্তু যেটি অপরিহার্য্য সেটি অনাবশ্যক সর্ত্তগুলির সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে যে সেটিকে খুঁজে বার করা খুবই শক্ত হয়ে উঠে। পরীক্ষণ পদ্ধতিতে এই অপরিহার্য্য সর্ত্তটিকে খুঁজে বার করার জন্য একটি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করা হয়। তার নাম পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তন-সাধন (Varying the circumstances)। এই পন্থায় অন্যান্য সর্ত্তগুলিকে অপরিবর্ত্তিত রেখে একটি বিশেষ সর্ত্তকে পরিবর্ত্তিত করে দেখা হয় যে ঐ বিশেষ সর্ত্তটি ঘটনাটি ঘটার পক্ষে অপরিহার্য্য কিনা বা ঐ বিশেষ সর্ত্তটি কি ধরনের এবং কতটা প্রভাব ঘটনাটির উপর বিস্তার করে। এই পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে বহু মানব-আচরণের সঠিক কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে অনেক ক্ষেত্রে যাকে আমরা পূর্ব্বে কারণ বলে মনে করতাম, পরীক্ষণ পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগের ফলে আজ তার অনেকগুলি ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দ্রুত ও সন্তোষজনক পাঠ-শিক্ষার পক্ষে শাস্তিদান সহায়ক কি না, শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের এই প্রয়োজনীয় সমস্যাটির সমাধান পরীক্ষা পদ্ধতির সাহায্যে পাওয়া যেতে পারে।

দু দল শিক্ষার্থীকে এমনভাবে বেছে নেওয়া হল যাদের শেখার ক্ষমতা ও বুদ্ধি মোটামুটি একই রকম। এবার তাদের একই পরিবেশে একই পাঠ্যবিষয় একই পদ্ধতিতে শেখান হল। পার্থক্যের মধ্যে প্রথম দলকে শেখানোর সময় "শাস্তির" ব্যবহার করা হল, দ্বিতীয় দলের বেলায় কোনরূপ শাস্তি দেওয়া হল না। এখন যদি দেখা যায় যে প্রথম দল অর্থাৎ যারা শাস্তি পেয়েছে, দ্বিতীয় দল অর্থাৎ যারা শাস্তি পায়নি, তাদের অপেক্ষা দ্রুত বা ভাল পাঠ শিখেছে তবে বুঝতে হবে যে শাস্তিদান শিক্ষার সহায়ক। আর যদি দেখা যায় যে পাঠ শেখার দিক দিয়ে দু'দলের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, তবে বুঝতে হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে শাস্তি দেওয়া না দেওয়া দুইই সমান। আর যদি দেখা যায় যে দ্বিতীয় দলের শিক্ষা প্রথম দল অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা মন্থর হয়েছে তবে বুঝতে হবে শাস্তিদান শিক্ষাগ্রহণের পক্ষে ক্ষতিকর।

প্রথম দলটি অর্থাৎ যাদের উপর শাস্তির প্রয়োগ করা হল, তাদের বলা হয় পরীক্ষণমূলক দল (Experimental Group) আর দ্বিতীয় দলটিকে অর্থাৎ যাদের শাস্তি না দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হল, তাদের বলা হয় নিয়ন্ত্রিত দল (Control Group)।

পরীক্ষণ-পদ্ধতির সাফল্যের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হল তিনটি বস্তু—প্রথমত, যে ঘটনাটি নিয়ে পরীক্ষা চালানো হবে (এখানে পাঠগ্রহণ) তার পুনরাবৃত্তি

পরীক্ষণ-মূলক ছাত্রদল (*Experimental Group*)	নিয়ন্ত্রিত ছাত্রদল (*Control Group*)
নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়	(একই) পাঠ্যবিষয়
+	+
নির্দ্দিষ্ট পরিবেশ	(একই) পরিবেশ
+	+
নির্দ্দিষ্ট শেখার ক্ষমতা	(একই) শেখার ক্ষমতা
+	+
নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি	(একই) পদ্ধতি
+	+
শাস্তিদান	× × ×
পাঠ-শিক্ষা	পাঠ-শিক্ষা

[শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানে
পরীক্ষণ-পদ্ধতির প্রয়োগ]

(repetition)। পরীক্ষণের বিষয়বস্তুর যদি পুনরাবৃত্তি না ঘটে, তবে পরীক্ষণ চালানোই সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, যে ব্যাপারটি নিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে (এখানে শাস্তিদান) সেটির উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণের (control) ক্ষমতা থাকা দরকার ; এবং তৃতীয়ত, পরীক্ষার বিষয়বস্তুগুলি পরিবর্ত্তনশীল (variable) হওয়া চাই। যে বস্তু সর্ব্বক্ষেত্রে অপরিবর্ত্তিত থাকে তার উপর পরীক্ষণ-পদ্ধতির প্রয়োগ করা যায় না। এখানে পাঠগ্রহণ, শাস্তিদান প্রভৃতি বিষয়গুলি পরিবর্ত্তনশীল হওয়াতেই পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হল।

২। ক্রমবিকাশ-বীক্ষণ পদ্ধতি (Developmental Method)

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের আর একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ হল ব্যক্তিসত্তার মানসিক ও আচরণগত ক্রমবিকাশের স্বরূপ ও গতিভঙ্গী নির্ণয় করা। ব্যক্তির জন্মগত উত্তরাধিকারের সঙ্গে পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সংঘাতে ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকের ক্রমবিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সংঘাতের প্রভাব কি ভাবে কাজ করে, কোন্ অবস্থায় কি পরিবর্ত্তন করে, কখনই বা অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে ইত্যাদি জানার জন্য ক্রমবিকাশ-বীক্ষণ পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। এই পদ্ধতিতে শিশুর জন্ম থেকে পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত বিকাশমান দিকগুলির পর্য্যবেক্ষণ করতে হয়। এই ধরনের পর্য্যবেক্ষণে অবশ্য দীর্ঘ সময় ও অধ্যবসায় লাগে। ফলে পর্য্যবেক্ষণ সুপরিকল্পিত না হলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা থাকে। বুদ্ধি, অনুভূতি, সামাজিক সচেতনতা প্রভৃতি ব্যক্তিসত্তার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি নবজাত শিশুর মধ্যে থাকে নিতান্ত অঙ্কুরাবস্থায়, সেগুলি কেমন করে পূর্ণবয়স্কের ক্ষেত্রে সুপরিণত ও জটিল হয়ে উঠে—শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের এই মূল্যবান তথ্যগুলি পাওয়া গেছে এই ক্রমবিকাশ-বীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে।

৩। কেস্-ষ্টাডি (Case Study) বা কেস্ হিষ্ট্রী (Case History) পদ্ধতি।

ক্রমবিকাশ-বীক্ষণ পদ্ধতিতে আমরা ব্যক্তির ক্রমবিকাশের প্রতিটি স্তর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি এবং সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত গঠন করি। সব সময়ে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেমন কোন মানসিক বিকারগ্রস্ত রুগী বা অপরাধপ্রবণ বালক বা অসাধারণ কৃতীমান পুরুষ কেমন করে তার বর্ত্তমান অবস্থায় এসে পৌছল জানতে হলে তার অতীত ক্রমবিকাশের ইতিহাস আমাদের জানা দরকার। এক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র পদ্ধতি হল তার জীবনের ঘটনাগুলি টুকরো টুকরো করে নানাস্থান থেকে সংগ্রহ করে, পরে সেগুলিকে একত্রিত করে তার ক্রমবিকাশের একটা মোটামুটি সম্পূর্ণ ইতিহাস খাড়া করা। এই পদ্ধতিটিকে কেস্-ষ্টাডি বা কেস্ হিষ্ট্রী পদ্ধতি বলা হয়।

ক্রমবিকাশ-বীক্ষণ পদ্ধতিতে ব্যক্তির ক্রমবিকাশের ইতিহাস সংগ্রহ করা হয়

প্রত্যক্ষভাবে, আর কেস্‌-ষ্টাডি বা কেস্‌ হিষ্ট্রী পদ্ধতিতে সেই কাজটাই করা হয় পরোক্ষভাবে। এই ইতিহাসের তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হয় নানা পন্থায়,—কিছুটা ব্যক্তির নিজের ভাষণ থেকে, কিছুটা তার আত্মীয়স্বজন বন্ধু-প্রতিবেশী প্রভৃতির বিবরণ থেকে আবার কিছুটা ব্যক্তির পরিবেশ, সমাজ-জীবন প্রভৃতির প্রভাব সরাসরি পর্য্যবেক্ষণ করে। একটা কেস্‌-ষ্টাডিতে কি ধরনের তথ্যাদি সংবলিত করা হয় তার একটা সংক্ষিপ্ত ছক নীচে দেওয়া হল।

১। ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, জন্মদিন, বয়স, জন্মস্থান, বৃত্তি ইত্যাদি।

২। যে সমস্যার জন্য পর্য্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তার বিবরণ।

৩। পরিবার—মা, বাবা, ভাই, বোন, অন্যান্য আত্মীয় প্রভৃতির পরিচয়। বাড়ীতে তার প্রতি অন্য সকলের কি ধরনের মনোভাব।

৪। শিক্ষা—পরিবারের শিক্ষার মান। ব্যক্তির ও তার পরিবারের শিক্ষার আদর্শের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব আছে কি না।

৫। স্বাস্থ্য, শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও দেহগত অন্যান্য তথ্য। যৌন বিকাশের বিবরণ।

৬। বুদ্ধির মান ও বিকাশ।

৭। প্রক্ষোভগত বিকাশ।

৮। সামাজিক বিকাশ। আচরণমূলক সমস্যাদি।

৯। বৃত্তি—আর্থিক সঙ্গতি।

১০। অভ্যাসমূলক বৈশিষ্ট্যাদি। বিশেষ আগ্রহ, "হবি" ইত্যাদি।

৪। চিকিৎসামূলক পদ্ধতি (Clinical Method)

বিংশ শতাব্দীতে মনোবিজ্ঞানের পাশাপাশি আর একটি মানবহিতকর বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে সেটি হল মানসিকব্যাধি চিকিৎসার শাস্ত্র (Psychiatry), ফ্রয়েড্‌, ইয়ুঙ্‌ (Jung), অ্যাড্‌লার (Adler) প্রভৃতি প্রখ্যাত মানসিক ব্যাধির চিকিৎসকগণের দীর্ঘ গবেষণার ফলে আজ এই নতুন বিজ্ঞানটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis) থেকে পাওয়া মানসিক ব্যাধির স্বরূপ সম্বন্ধে এতদিন অজানা বহু মূল্যবান তথ্য মানসিক ব্যাধির চিকিৎসাকে আজ অনেক নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞান-সম্মত করে তুলেছে। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে

মানসিকব্যাধির চিকিৎসার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কেননা শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের উপরই শিক্ষার কার্য্যকারিতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মনের দিক দিয়ে অসুস্থ ছাত্রের ক্ষেত্রে শিক্ষা অবাঞ্ছিত ফলেরই সৃষ্টি করে। ফলে মানসিক চিকিৎসা-শাস্ত্রে প্রচলিত কতকগুলি পদ্ধতি ব্যাপকভাবে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হতে সুরু হয়েছে। যেমন—

(ক) ফ্রয়েডের অবাধ অনুষঙ্গ (Free Association) পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে কোনরূপ দ্বিধা বা সংকোচ না করে, যা মনে আসে তাই বলে যাবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। ফলে দেখা যায় যে মনের গভীর তলদেশে লুকানো অজানা যে দ্বন্দ্বের ফলে তার মানসিক বিকার বা আচরণ-বৈষম্য দেখা দিয়েছিল তার প্রকৃত স্বরূপ ব্যক্তির অজ্ঞাতেই কথা প্রসঙ্গে ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে। চিকিৎসকের পক্ষে তখন ব্যাধির কারণ নির্ণয় করা সহজ হয়ে পড়ে।

(খ) প্রতিফলন অভীক্ষা (Projective Test)

ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের মূল নীতির উপর নির্ভর করে ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তির মনে অন্তর্নিহিত প্রক্ষোভমূলক জটিলতার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য বহু অভিনব অভীক্ষা আজকাল আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্যক্তির অপ্রকাশিত সত্তা এই অভীক্ষাগুলির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় বলে এগুলিকে প্রতিফলন অভীক্ষা বা (Projective Test) বলা হয়। রর্শা ইনকব্লট টেষ্ট্ (Rorschach Inkblot Test), কাহিনী সংবোধন অভীক্ষা (Thematic Apperception Test or TAT), শব্দ-অনুষঙ্গ অভীক্ষা (Word Association Test) ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(গ) প্রশ্নগুচ্ছ, ব্যক্তিসত্তা-নির্ণায়ক প্রশ্নাবলী (Questionnaire, Personality Inventory) ইত্যাদি।

এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে কতকগুলি বিশেষ প্রশ্নের লিখিত উত্তর দিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। ব্যক্তির দেওয়া উত্তর পরীক্ষা করে পরীক্ষক ব্যক্তির মানসিক সংগঠন, প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

৫। পরিসংখ্যান পদ্ধতি (Statistical Method)

বিংশ শতাব্দীতে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে পরিসংখ্যান পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ স্বরু হয়েছে। ফলে শিক্ষাশ্রয়ী পরিসংখ্যান (Educational Statistics) নামে একটি নতুন বিজ্ঞানই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। এই পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে যেমন একদিকে মানসিক এবং শিক্ষামূলক পরিমাপ-যন্ত্রগুলিকে অনেকখানি ক্রটিহীন করা সম্ভব হয়েছে, তেমনি আবার ফ্যাক্টর এনালিসিস্ (Factor Analysis) প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানসিক কার্য্যের বিভিন্ন দিকগুলিকে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন মানসিক শক্তির যথার্থ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটন করাও সম্ভব হয়ে উঠেছে।

৬। অন্তর্নিরীক্ষণ (Introspection)

ব্যক্তির নিজের মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করার নাম হল অন্তর্নিরীক্ষণ। যেমন, রাগ, দুঃখ বা আনন্দ হলে আমাদের কি ধরনের অনুভূতি হয় কিংবা কোন সমস্যা সমাধান করতে হলে কি ধরনের চিন্তা করি কিংবা অতীতের কোনও কিছু মনে করতে হলে কেমন করে মনের মধ্যে সেগুলোর ছবি জাগিয়ে তুলি ইত্যাদি একমাত্র অন্তর্নিরীক্ষণের মাধ্যমেই জানা যেতে পারে। অন্ত-র্নিরীক্ষণ নিছক মনের কথা বর্ণনা করা বা গল্পছলে নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করা নয়। গবেষকের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মনের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াকে পর্য্যবেক্ষণ করা এবং যতটা সম্ভব তার বাস্তব বিবরণ দেওয়াই হল সত্যকারের অন্তর্নিরীক্ষণ।

গত শতাব্দীতে অন্তর্নিরীক্ষণই ছিল মনোবিজ্ঞানের প্রধানতম পদ্ধতি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল মনোবিজ্ঞানীরা বিশেষ করে আচরণবাদীদের দল অন্ত-র্নিরীক্ষণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন। অন্তর্নিরীক্ষণের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ হল (১) এই পদ্ধতিটির উপর ব্যক্তির নিজের প্রভাব এত অধিক যে এ থেকে লব্ধ তথ্য মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। (২) ঘটনাটি যখন ঘটে তখন অন্তর্নিরীক্ষণ করা সম্ভবই হয় না। যাকে অন্তর্নিরীক্ষণ বলা হয় সেটি আসলে ঘটে ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর। অতএব এর উপর কল্পনা, অনুমান, অতিরঞ্জন প্রভৃতির প্রভাব

থাকতে বাধ্য। (৩) শিশু, অশিক্ষিত, দুর্ব্বল-ভাষা-সম্পন্ন ব্যক্ত প্রভৃতির ক্ষেত্রে অন্তর্নিরীক্ষণ সম্ভবপরই হয় না।

কিন্তু এত দোষ সত্ত্বেও অন্তর্নিরীক্ষণের উপকারিতার কথা ভুললে চলবে না। মনের বিবিধ প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে জানবার একমাত্র পন্থা হল অন্তর্নিরীক্ষণ। চিন্তা, কল্পনা, প্রক্ষোভের অনুভূতি, ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া, মনে করা, ভুলে যাওয়া প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির স্বরূপ একমাত্র অন্তর্নিরীক্ষণের মাধ্যমেই আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত হতে পারে। অন্তর্নিরীক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া তথ্য সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য না হলেও, এগুলি যে সত্যকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমাদের প্রচুর সাহায্য করতে পারে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যদিও অন্তর্নিরীক্ষণের ফলাফলকে গবেষণার চরম সিদ্ধান্ত রূপে পরিগণিত করা সম্ভব নয় তবুও মনোবিজ্ঞানে, বিশেষ করে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে এগুলিকে বহুক্ষেত্রে হাইপথেসিস বা বিকল্প বলে গ্রহণ করে মূল্যবান গবেষণা চালানো সম্ভব।

অন্তর্নিরীক্ষণকে মনোবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র একটি পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা না গেলেও, অন্যান্য পদ্ধতির সম্পূরক হিসাবে একে গ্রহণ করা খুবই চলতে পারে।

প্রশ্নাবলী

1. Define the nature and scope of Educational Psychology. (B. T. 1950, B. A. 1960)

Ans. (পৃঃ ২২—পৃঃ ২৯)

2. How does the knowledge of Psychology help a teacher in his work? Indicate the nature and scope of the psychology he requires. (B. T. 1951)

Aus. (পৃঃ ১৬—পৃঃ ২৭)

3. Why should an educator study psychology? (B. T. 1952)

Ans. (পৃঃ ১৬—পৃঃ ২১)

4. How and to what extent will the psychology that you have studied during the course of your training help you in your work as an educator? How do you propose to supplement your knowledge of Psychology? (B. T. 1954)

Ans. [প্রথমাংশ : উত্তর—পৃঃ ১৬—পৃঃ ২১

দ্বিতীয়াংশ : পুঁথি হতে সংগৃহীত মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানের সম্পূরক হিসাবে কাজ করতে পারে একমাত্র সেই জ্ঞানের বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ এবং তা থেকে পাওয়া নতুন তথ্য। প্রত্যেক শিক্ষকেরই উচিত মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিকে বাস্তবে অনুশীলন করা এবং তার ফলাফল পর্য্যবেক্ষণ করা। এতে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যাবে এবং গ্রন্থলব্ধ জ্ঞান অনেক পরিমাণে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠবে। অর্থাৎ প্রত্যেক শিক্ষককেই একজন ছোটখাট গবেষক হয়ে উঠতে হবে। সারা বিদ্যালয়টি হবে তাঁর গবেষণাগার, আর প্রত্যেকটি ছাত্রই হবে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু]

5. Is knowledge of the fundamental concepts of Psychology of real value to teachers ? (B. T. 1955)

Ans. (পৃঃ ১৬—পৃঃ ২১)

6. What are the problems that a teacher usually faces in the classroom ? Show how the knowledge of Educational Psychology helps him in solving some of them. (B. T. 1957)

Ans. (পৃঃ ১৬—পৃঃ ২১)

7. How will the psychology that you have studied during the training period help you as an educator ? What psychological topics do you consider to be most useful and why ? (B. T. 1958)

Ans. (পৃঃ ১৬—পৃঃ ২১)

8. Does psychology determine the aim of education ? How should a student of education get his knowledge of psychology ? (B. A. 1954)

Ans. প্রথমাংশ :—উঃ—(পৃঃ ১৮—পৃঃ ১৯)

দ্বিতীয়াংশ :—উঃ—শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি ... ৯—পৃঃ ৩৭)

9 What does the science of Psychology contribute to the practice of education (B. A. 1955)

Ans. (পৃঃ ১৬—পৃঃ ২১)

10. Discuss the scope and methods of modern Educational Psychology. (B. A. 1956)

Ans. (পৃঃ ২৮—পৃঃ ৩৭)

11. Expound the meaning and problem of Educational Psychology. (B. A. 1957, 1959)

Ans. (পৃঃ ২২—পৃঃ ২৯)

12. Is a scholarly knowledge of a subject an adequate equipment for the efficiency of teaching ? Discuss. (B. A 1958)

Ans.

[প্রাচীনপন্থী শিক্ষকগণ উপযুক্ত গ্রন্থলব্ধ জ্ঞানকেই সার্থক শিক্ষণের পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে করতেন। এছাড়া আর কিছুর প্রয়োজনীয়তাকে তাঁরা স্বীকার করতেন না। কিন্তু শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার পাত্র দুটি, একটি পাঠ্য বিষয়-বস্তু আর একটি ছাত্র নিজে। শিক্ষাবিদ্ আডামের ভাষায় ইংরাজী teach ক্রিয়াটির দুটি কর্ম্ম থাকে। যেমন, The teacher teaches John Latin এই বাক্যটিতে teach ক্রিয়ার কর্ম্ম John এবং Latin. অতএব শিক্ষকের পক্ষে Latin জানা যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি Johnকে জানাও অবশ্য প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ কেবলমাত্র পাঠ্য বিষয়বস্তুর জ্ঞান থাকলেই চলবে না। যে শিখবে তার সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা দরকার। এইখানেই শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রবেশ ঘটলো। ছাত্রকে ভাল করে জানা মানে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সম্যক্ থাকা দরকার। অতএব শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ালো অবিচ্ছেদ্য। এর পর পৃঃ ১৬—পৃঃ ২১ দ্রষ্টব্য]।

13. What are the methods of Educational Psychology ? Is Introspection a valid method ?

Ans. (পৃঃ ২৯—পৃঃ ৩৭)

14. Write an essay on the scope and methods of Educational Psychology. (B. A. 1962)

Ans. (পৃঃ ২৮—পৃঃ ৩৭)

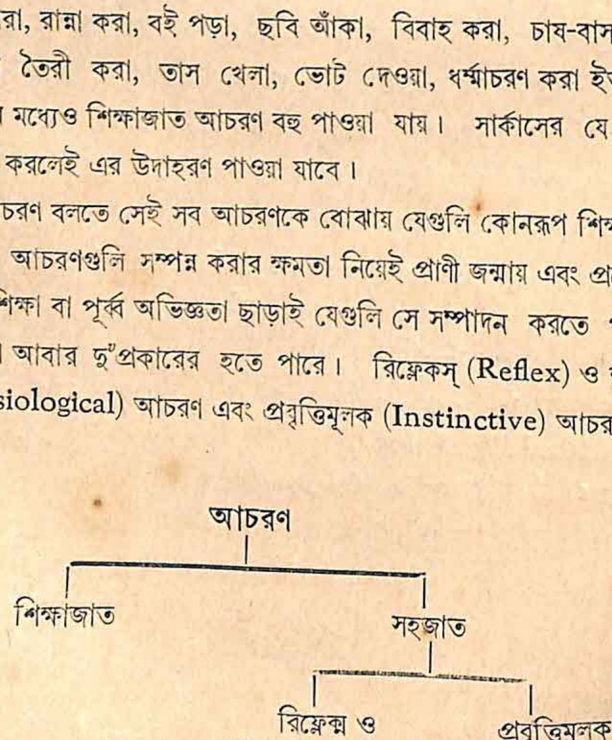
৩

প্রাণী আচরণ

আমরা দেখেছি যে প্রত্যেক প্রাণীকেই তার পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় এবং এই খাপ খাইয়ে নেওয়া বা সঙ্গতিবিধানের (Adjustment) যে প্রচেষ্টা তার নামই আচরণ।

প্রাণীর আচরণকে মোটামুটি দু শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—শিক্ষাজাত (Learned) আর সহজাত (Unlearned)। শিক্ষাজাত আচরণ হল সেই সব আচরণ যা প্রাণী জন্মের পর পরিবেশের চাপে এবং নিজের কোন চাহিদা পূরণের তাগাদায় আয়ত্ত করে। আমাদের আশপাশের যে কোন ব্যক্তির আচরণ বিশ্লেষণ করলে আমরা এই শ্রেণীর অসংখ্য শিক্ষাজাত আচরণের সন্ধান পাব, যেমন, কথা বলা, পোষাক পরা, রান্না করা, বই পড়া, ছবি আঁকা, বিবাহ করা, চাষ-বাস করা, লেখা, বাড়ীঘর তৈরী করা, তাস খেলা, ভোট দেওয়া, ধর্ম্মাচরণ করা ইত্যাদি। মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও শিক্ষাজাত আচরণ বহু পাওয়া যায়। সার্কাসের যে কোন জন্তুর কথা মনে করলেই এর উদাহরণ পাওয়া যাবে।

সহজাত আচরণ বলতে সেই সব আচরণকে বোঝায় যেগুলি কোনরূপ শিক্ষাজাত নয়, অর্থাৎ যে আচরণগুলি সম্পন্ন করার ক্ষমতা নিয়েই প্রাণী জন্মায় এবং প্রয়োজন হলে কোনরূপ শিক্ষা বা পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই যেগুলি সে সম্পাদন করতে পারে। সহজাত আচরণ আবার দু'প্রকারের হতে পারে। রিফ্লেকস্ (Reflex) ও শরীর-তত্ত্বমূলক (Physiological) আচরণ এবং প্রবৃত্তিমূলক (Instinctive) আচরণ।



রিফ্লেকস (Reflex)

রিফ্লেকস হল সহজাত আচরণের সরলতমরূপ। সময় সময় কোন বিশেষ জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদে কোন দৈহিক যন্ত্র আমাদের কোনরূপ প্রচেষ্টার অপেক্ষা না রেখেই সক্রিয় হয়ে উঠে এবং ঐ বিশেষ প্রয়োজনটি মেটাবার ব্যবস্থা করে নেয়। দেহের এই স্বতঃ সঙ্গতি-বিধানের প্রক্রিয়াকে রিফ্লেকস বলে। যেমন চোখের মধ্যে কোন ধূলো বা বালি পড়ার উপক্রম হলে চোখের পাতা আপনা আপনি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায়। নাকের ঝিল্লীতে কিছু ঢুকলে হাঁচি হয়। শ্বাসনালীতে খাদ্যকণা ঢুকলে বিষম লাগে। এইসব জৈবিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করতে আমাদের কোনরূপ ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। এই কাজগুলি দেহযন্ত্র স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে সম্পাদন করে। হাই তোলা, বমি করা, হাসা, কাসা প্রভৃতিও রিফ্লেকসের উদাহরণ। এ সবগুলিই কোন না কোন পারিবেশিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বাঞ্ছিত সঙ্গতি-বিধানের উদ্দেশ্যে দেহের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রচেষ্টা। হাঁটুর ঠিক নীচে যদি শক্ত কিছু দিয়ে ঘা দেওয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পা-টি সবেগে ঝাঁকানি দিয়ে উঠবে। এর নাম হাঁটু-ঝাঁকানি (Knee-jerk) রিফ্লেকস। অধিকাংশ গ্রন্থির রস নিঃসরণও একপ্রকারের রিফ্লেকস। যেমন জিভের লালাক্ষরণ, চোখের জল পড়া, ঘাম পড়া ইত্যাদি।

রিফ্লেকস্‌ও অন্যান্য আচরণের মত পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর সঙ্গতিবিধানের প্রয়াস। তবে অন্যান্য আচরণের তুলনায় এটি অপেক্ষাকৃত অনেক সরল, দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য এবং এর আবির্ভাবের কারণ দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রিফ্লেক্সের শারীরিক সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা "স্নায়ুতন্ত্র" পর্য্যায়ে দ্রষ্টব্য।

শরীরতত্ত্বমূলক আচরণ (Physiological Behaviour)

রিফ্লেক্সের সমগোত্রীয় আর একধরনের সহজাত আচরণ হল শরীরতত্ত্বমূলক (Physiological) প্রক্রিয়াগুলি, যেমন হৃদস্পন্দন, রক্তচলাচল, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, পরিপচন প্রক্রিয়া ইত্যাদি। রিফ্লেক্সের মতই এগুলিও স্বতঃপ্রণোদিত ও ব্যক্তির প্রচেষ্টা-নিরপেক্ষভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। রক্তচলাচল, হৃদ্‌স্পন্দন ইত্যাদি কতকগুলি প্রক্রিয়ার উপর ব্যক্তির কোনরূপ নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও নেই।

সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct)

সহজাত আচরণের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে প্রাণীর প্রবৃত্তিজাত আচরণগুলি

(Instinctive behaviours)। এই সহজাত প্রবৃত্তির (instinct) স্বরূপ ও কাজ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে বহুদিন ধরে তর্ক বিতর্ক চলে আসছে এবং এ সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী মতবাদ পাওয়া যায়। প্রবৃত্তি সম্বন্ধে এই মতবাদগুলিকে মোটামুটি দু' ভাগে ভাগ করা যায় প্রাচীন ও আধুনিক। প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগালের মতবাদই বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ম্যাকডুগালের তত্ত্বটি প্রবৃত্তি সম্বন্ধে প্রাচীনপন্থীদের মতবাদের প্রতিনিধিরূপী। অতএব এটি জানা হলে প্রাচীন মতবাদগুলির মৌলিক বৈশিষ্ট্য জানা হয়ে যাবে। ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তি-বাদ আবার শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ হওয়ায় আমরা এই মতবাদটি বিশদভাবে এখানে আলোচনা করব।

ম্যাকডুগালের মতে মানুষের মনে এমন কতকগুলি সহজাত বা উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত প্রবণতা (tendencies) আছে যেগুলি তার সমস্ত চিন্তা এবং কাজের অপরিহার্য্য উৎস বা প্রেষণা শক্তি (motive power) ; তিনি এই সহজাত প্রবণতাগুলিরই ইন্‌ষ্টিংক্ট(instinct) বা প্রবৃত্তি নাম দিয়েছেন।



{ ইন্‌ষ্টিংক্ট বা সহজাত প্রবৃত্তির সংগঠন }

প্রবৃত্তির স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে প্রবৃত্তি হল কতকগুলি সহজাত বিশেষধর্ম্মী মানসিক সংগঠন যেগুলি কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যে থাকে—এমন কতকগুলি জাতিগত বৈশিষ্ট্য যেগুলি প্রাণীর পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে আবির্ভূত হয়েছে এবং যেগুলি মনের প্রকৃতির জন্মগত উপাদান হওয়ায় কখনই মন থেকে মুছে ফেলা যায় না এবং যেগুলি কোন উপায়েই প্রাণী তার জীবনকালে আহরণ করতে পারে না ❋।

ম্যাকডুগালের দেওয়া প্রবৃত্তির সংজ্ঞা হল এই। প্রবৃত্তি একটি সহজাত বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জৈব-মানসিক প্রবণতা (Psycho-physical disposition) যা তার অধিকারীকে প্রবৃত্ত করে (১) কোন একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত বস্তু প্রত্যক্ষ করতে বা তাতে মনোযোগ দিতে (২) সেই বস্তু প্রত্যক্ষ করার পর

❋ Social Psychology—McDougall

কোন বিশেষ প্রকৃতির প্রক্ষোভ (emotion) অনুভব করতে এবং (৩) সেই বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ পদ্ধতিতে কাজ করতে বা অন্তত সেইভাবে কাজ করার একটা আবেগ অনুভব করতে।

প্রবৃত্তিমূলক আচরণের বিভিন্ন সোপ ঃ

ম্যাকডুগালের দেওয়া প্রবৃত্তির এই সংজ্ঞা থেকে প্রবৃত্তির কার্য্যপ্রণালীর চারটি স্বতন্ত্র সোপান দেখতে পাওয়া যায়।

প্রথম সোপানে

প্রবৃত্তিমূলক আচরণটি জাগাতে পারে এমন একটি উদ্দীপক ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করে বা তাতে মনোযোগ দেয়। যেমন মনে করা যাক কোন ব্যক্তি হঠাৎ দেখতে পেল যে একটা পাগলা কুকুর তার দিকে ছুটে আসছে। এই সোপানটিকে প্রবৃত্তির জ্ঞানমূলক (Cognitive) দিক বলা যেতে পারে।

দ্বিতীয় সোপানে

উদ্দীপক প্রত্যক্ষের সঙ্গে সঙ্গে তার মনে বিশেষ একটি প্রক্ষোভের অনুভূতি জাগবে। পাগলা কুকুরটাকে তার দিকে ছুটে আসতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে ভয়-রূপ প্রক্ষোভ জাগলো। এটি হল প্রবৃত্তির অনুভূতিমূলক (affective) দিক। ম্যাকডুগালের মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থলে আছে একটা করে বিশেষ প্রক্ষোভ এবং কোন প্রবৃত্তিমূলক আচরণ ঘটার পক্ষে এই প্রবৃত্তির কেন্দ্রগত প্রক্ষোভটি জাগা অপরিহার্য্য, কেননা তিনি মনে করেন যে প্রক্ষোভই জোগায় প্রবৃত্তি-জাত আচরণের পশ্চাতে প্রেষণামূলক শক্তি।

তৃতীয় সোপানে

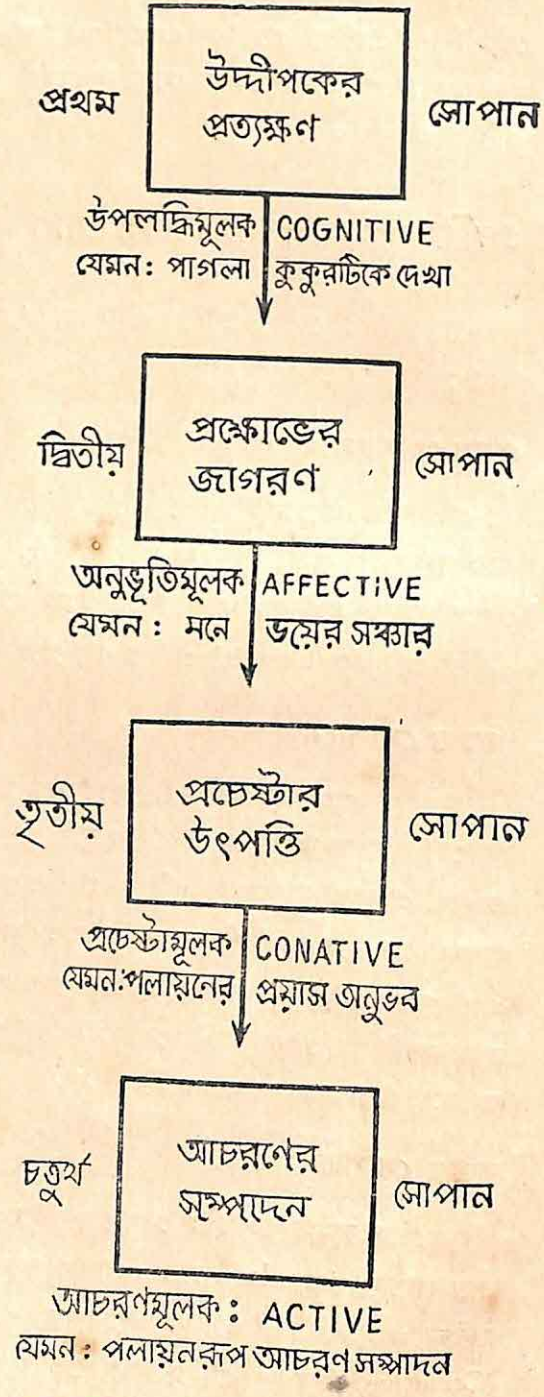
প্রক্ষোভ জাগার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় বিশেষ একটা পদ্ধতিতে কাজ করার তীব্র তাড়না (impulse) যেমন—পাগলা কুকুর দেখে ভয় জাগার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির মনে তীব্র ইচ্ছা হল পালাবার। এটা হল প্রবৃত্তির প্রচেষ্টামূলক (Conative) দিক। এই প্রচেষ্টার প্রকৃতি হল জৈবিক ও দৈহিক উভয় শ্রেণীর প্রবণতার সংমিশ্রণ।

চতুর্থ বা শেষ সোপানে

এ প্রচেষ্টা বাস্তবে আচরণের রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ পালাবার তাড়না মনে অনুভব করার পরে যখন ব্যক্তি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে সুরু করল তখন সত্যকার প্রবৃত্তিগত আচরণ (instinctive behaviour) সংঘটিত হল। এইটি হল প্রবৃত্তির দৈহিক অভিব্যক্তি বা আচরণমূলক (active) দিক।

ওপরের উদাহরণে বর্ণিত প্রবৃত্তির নাম পলায়ন-প্রবৃত্তি, যার কেন্দ্রগত প্রক্ষোভটির নাম হল ভয় এবং যার আচরণ হল পালানো-রূপ কাজটা।

প্রবৃত্তিমূলক আচরণ ঘটার পক্ষে প্রত্যেকটি সেপানাই অপরিহার্য্য। মাঝে যে কোন একটা সোপান বাদ গেলে সেইখানেই প্রবৃত্তির কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। যেমন ভয় না জাগলে পালাবার তাড়না অনুভূত হবে না আর পালাবার তাড়না অনুভূত না হলে পালানো কাজটি ঘটবে না।



ম্যাকডুগালের মতে কৌতূহল হল এইরকম আর একটি সহজাত প্রবৃত্তি, আর তার কেন্দ্রগত প্রক্ষোভের নাম হল বিস্ময়। পথে যেতে যেতে এক ব্যক্তি একটি চকচকে জিনিষ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখল (প্রথম সোপান—প্রত্যক্ষণ); তা দেখে তার মনে বিস্ময় জাগলো (দ্বিতীয় সোপান—প্রক্ষোভের জাগরণ); সঙ্গে সঙ্গে জিনিষটি কুড়িয়ে নেবার একটা তীব্র ইচ্ছা সে অনুভব করল (তৃতীয় সোপান—ইচ্ছার অনুভূতি); সেটা সে কুড়িয়ে নিলে (চতুর্থ সোপান—আচরণ)।

ম্যাকডুগালের মতে ইনষ্টিংক্ট বা প্রবৃত্তির সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর অন্তর্নিহিত **প্রক্ষোভ-প্রচেষ্টামূলক** (affective-conative) **কেন্দ্রটি**। অর্থাৎ এর কেন্দ্রে একটি বিশেষ প্রক্ষোভ থাকার ফলে, উপযুক্ত উদ্দীপকের আবির্ভাবে সেই কেন্দ্রগত সুপ্ত প্রক্ষোভটি জেগে ওঠে এবং প্রাণীর মধ্যে একটি বিশেষ প্রচেষ্টার সৃষ্টি করে। ম্যাকডুগালের মতে সেইজন্য প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে একটি বিশেষ প্রক্ষোভ। এই বিশেষ প্রক্ষোভটা অনেকটা মোটরগাড়ীর ইঞ্জিনের মত। এটি চালু হলে তবে প্রবৃত্তি-রূপ গাড়ীখানা চলবে। যেমন পলায়ন-রূপ প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ হল ভয়। কৌতূহল-রূপ প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ হল বিস্ময়। মনে রাখতে হবে, যে প্রবৃত্তির যে প্রক্ষোভ, সেই প্রক্ষোভ ছাড়া সেই বিশেষ প্রবৃত্তি সক্রিয় হবে না। অর্থাৎ ভয় ছাড়া পলায়ন-প্রবৃত্তি কাজ করবে না, বিস্ময় ছাড়া কৌতূহল জাগবে না।

ম্যাকডুগাল আরও বলেন যে, সহজাত আচরণটির পরিণতি ঘটতে পারে দু' ধরনের অনুভূতিতে, যদি প্রবৃত্তি-জাত আচরণটি বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পৌছতে পারে তবে একটা সুখ এবং তৃপ্তির আনন্দজনক অভিজ্ঞতা অনুভূত হবে। আর যদি সহজাত আচরণটি কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে একটা দুঃখের অনুভূতিতে সেই আচরণের পরিণতি ঘটবে।

ম্যাকডুগালের হিসাবে মানুষের সহজাত-প্রবৃত্তির মোট সংখ্যা ১৪টি। তাহাদের সহগামী ১৪টি প্রক্ষোভসমেত এই ১৪টি প্রবৃত্তির তালিকা নীচে দেওয়া হল।

১। **পলায়ন** **(Escape)**	**ভয়** **(Fear)**

বিপদ সম্বন্ধে সচেতনতা ভয় জাগার প্রধান কারণ। বিপদ বলতে বোঝায় দৈহিক বা সামাজিক নিরাপত্তার কোনরূপ অভাব। উচ্চশব্দ, আকস্মিক চীৎকার,

শারীরিক ব্যথা, দুর্ব্বোধ্য বা রহস্যময় কিছু, অনিশ্চয়তা প্রভৃতিও ভয় জাগার কারণ। এই প্রবৃত্তিটির আচরণ হল ভয়ের কারণ থেকে ছুটে দূরে চলে যাওয়া এবং নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করা।

২। **যুযুৎসা** **ক্রোধ**
(Combat) **(Anger)**

যে কোনরূপ প্রবৃত্তি-জাত আচরণে বাধাসৃষ্টি হলেই মনে ক্রোধ জাগে এবং বাধার কারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রবৃত্তি দেখা দেয়। ক্ষুধার খাদ্য যদি কেউ কেড়ে নেবার চেষ্টা করে, কিংবা সন্তানসন্ততির প্রতি যদি কেউ কোনরূপ বিদ্বেষজনক আচরণ করে তবে ক্রোধ দেখা দেবে এবং যুযুৎসা-প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়ে উঠবে।

৩। **ঘৃণা** **বিরক্তি**
(Repulsion) **(Disgust)**

নোংরা কিছু স্পর্শ করলে প্রাণীর মধ্যে বিরক্তি আসে এবং বস্তুটির প্রতি ঘৃণা জন্মায়। এই প্রবৃত্তির আদিমতম রূপ হল যখন মুখের মধ্যে নোংরা কিছু প্রবেশ করে তখন তা মুখ থেকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ফেলে দেওয়া। এইজন্যই থুথু ফেলা যে-কোনরূপ ঘৃণা প্রকাশের একটা সর্ব্বজনীন রূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ম্যাকডুগালের মতে এই প্রবৃত্তিটির সঙ্গে পলায়ন-প্রবৃত্তির সম্পর্ক খুবই নিকট।

৪। **বাৎসল্য** **মমতা**
(Parental) **(Tender emotion)**

সন্তানকে বিপদ থেকে রক্ষা করা, তার ক্ষুধার খাদ্য সরবরাহ করা প্রভৃতি হল বাৎসল্য-প্রবৃত্তির প্রকাশ। এর প্রক্ষোভ হল মমতা বা স্নেহ। সাধারণত সন্তানের অসহায় অবস্থা দেখলে বা কাতর চীৎকার শুনলে এই প্রক্ষোভের জাগরণ হয়। ম্যাকডুগালের মতে মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রবৃত্তি নানা পরিবর্ত্তিত রূপে প্রকাশ পায়।

৫। **অনুনয়** **দুঃখবোধ**
(Appeal) **(Distress)**

যখন প্রাণী দুঃখ হতে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় খুঁজে পায় না এবং নিজেকে অসহায় বলে মনে করে তখন তার মধ্যে অনুনয়-প্রবৃত্তি দেখা দেয়। প্রাণী তার চেয়ে যাকে অধিকতর ক্ষমতাবান বলে মনে করে তার কাছে সে দুঃখ হতে মুক্তি পাবার জন্য আবেদন জানায়।

৬। যৌনপ্রবৃত্তি (Mating)	কাম (Lust)

সাধারণত নারীর ক্ষেত্রে পুরুষ এবং পুরুষের ক্ষেত্রে নারী যৌনপ্রবৃত্তির জাগরণের কারণ। কতকগুলি বিশেষ দৈহিক যৌনবৈশিষ্ট্য বা যৌনচিহ্নও এই প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে উদ্দীপকরূপে কাজ করে থাকে এই প্রবৃত্তির আচরণও প্রধানত দেহগত। ফ্রয়েডের মতে এই প্রবৃত্তিটিই প্রাণীর সমগ্র জীবন-প্রচেষ্টার মূলে। তিনি এর নাম দিয়েছেন লিবিডো (Libido)।

৭। কৌতূহল (Curiosity)	বিস্ময় (Wonder)

কোন কিছু নতুন, দুর্ব্বোধ্য, পূর্ব্বে না দেখা এবং যার স্বরূপটা পুরোপুরি বোঝা যায় না—এমন বস্তু প্রাণীর মনে বিস্ময় জাগায় এবং সেটা ভাল করে জানার জন্য তার মধ্যে কৌতূহল রূপ প্রবৃত্তি দেখা দেয়।

৮। বশ্যতা (Submission)	হীনমন্যতা (Negative Self-feeling)

নিজের চেয়ে যাকে বড় বলে মনে করা যায়, এমন কারও সামনে উপস্থিত হলে প্রাণীর মধ্যে নিজের সম্বন্ধে একটা হীনভাব জাগে এবং সেই উচ্চতর ব্যক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করার প্রবৃত্তি দেখা দেয়।

৯। আত্ম-প্রতিষ্ঠা (Self-assertion)	আত্ম-গরিমা (Positive Self-feeling)

এই প্রবৃত্তিটি উপরের প্রবৃত্তির ঠিক বিপরীত। নিজের চেয়ে ছোট কারও উপস্থিতিতে প্রাণীর মধ্যে আত্মগরিমারূপ প্রক্ষোভ জাগে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার প্রবৃত্তি দেখা দেয়।

১০। যৌথ-প্রবৃত্তি (Gregarious)	একাকিত্ববোধ (Feeling of loneliness)

প্রাণীর মধ্যে দলবদ্ধভাবে বাস করাটা প্রবৃত্তিমূলক। কোন প্রাণী দলভ্রষ্ট বা একা হয়ে পড়লে সে মনে মনে একাকিত্ব বোধ করে এবং তার মধ্যে স্বজাতীয়দের সঙ্গে দল বাঁধার প্রবৃত্তি জাগে।

১১। খাদ্য-অন্বেষণ **ক্ষুধা**
(Food-Seeking) **(Gusto)**

প্রাণীর জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজন খাদ্য। সেইজন্য খাদ্য-অন্বেষণ হল সকল প্রকার প্রাণীর মধ্যেই প্রবলতম প্রবৃত্তি। ক্ষুধার অনুভূতি হল এর প্রক্ষোভ।

১২। সঞ্চয় **স্বত্ব-বোধ**
(Acquisition) **(Feeling of Ownership)**

প্রাণীর যে কোন চাহিদা মেটাতে পারে এমন বস্তু দেখলেই তা অধিকারে আনার আগ্রহ এবং তা সঞ্চয় করে রাখার প্রবৃত্তি তার মধ্যে জন্মায়। এর প্রক্ষোভ হল বস্তুটির উপর অধিকারের অনুভূতি।

১৩। নির্ম্মাণ **সৃজনী-স্পৃহা**
(Construction) **(Feeling of Creation)**

প্রাণীর নিজের এবং আত্মীয়দের জন্য আবাস-গৃহ নির্ম্মাণের স্পৃহা থেকেই এই প্রবৃত্তির সুরু। পরে অন্যান্য বস্তু নির্ম্মাণ করার প্রচেষ্টায় এই প্রবৃত্তির নিয়োগ দেখা যায়। নতুন কিছু সৃষ্টি করার অনুভূতি হল এর প্রক্ষোভ

১৪। হাস্য **আমোদ**
(Laughter) **(Amusement)**

ম্যাকডুগালের মতে ক্রোধ এবং সহানুভূতি এই দুইয়ের মাঝামাঝি প্রক্ষোভ হল আমোদ বোধ। বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে আমরা ক্রোধ বা সহানুভূতি বোধ করতে পারি। যখন আমরা এই দুয়ের একটাও করি না, তখন আমরা হাসি।

ম্যাকডুগালের প্রবণতা (Propensity) মতবাদ

ম্যাকডুগাল তাঁর পরবর্ত্তী বইতে * প্রপেনসিটি (Propensity) বা প্রবণতা বলে আর একটা কথার ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা অবশ্য তিনি ইন্‌ষ্টিংক্ট

*The Energies of Men—McDougall

কথাটা পরিত্যাগ করেন নি, বা তাঁর ইন্‌ষ্টিংক্ট মতবাদের মধ্যে কোন বিশেষ নতুনত্ব আনেন নি। ইন্‌ষ্টিংক্ট বা সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্নিহিত যে প্রক্ষোভ-প্রচেষ্টামূলক কেন্দ্র আছে এবং যে কেন্দ্রের জন্য প্রবৃত্তিমূলক আচরণ একটা বিশেষ নির্দ্দিষ্ট কাঠামো ধরে এগোয়, সেই কেন্দ্রটিরই তিনি প্রপেনসিটি বা প্রবণতা বলে আলাদা একটা নাম দিয়েছেন।

মানুষের এই সহজাত কর্ম্মপ্রবণতার পরিচয় দিতে গিয়ে ম্যাকডুগাল তাঁর পূর্ব্বের চোদ্দটি প্রবৃত্তির সঙ্গে আরও গোটাকয়েক নতুন নাম যোগ করেছেন এবং তাঁর এই পরের হিসাব অনুযায়ী মানুষের সহজাত কর্ম্মপ্রবণতার সংখ্যা দাঁড়ায় মোট সতেরটি। নীচে তাদের নামগুলি দেওয়া হলো।

প্রবণতা (Propensity)	তার কাজ (Function)
১। খাদ্য অন্বেষণ প্রবণতা (Food-seeking propensity)	খাদ্য সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করা।
২। বিরক্তি প্রবণতা (Disgust Propensity)	কতকগুলি ঘৃণা-উৎপাদক বস্তু পরিহার করা এবং সেগুলি থেকে দূরে থাকা।
৩। যৌন প্রবণতা (Sex propensity)	সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কামনা করা এবং তার সঙ্গ করা।
৪। ভীতি প্রবণতা (Fear propensity)	ব্যথা বা আঘাত দিতে সমর্থ এমন কিছুর অভিজ্ঞতা থেকে পালানো এবং নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়া।
৫। কৌতূহল প্রবণতা (Curiosity propensity)	নতুন কোন বস্তু বা স্থান পরীক্ষা করা।
৬। রক্ষণ বা বাৎসল্য প্রবণতা (Protective or Parental propensity)	শিশুকে খাওয়ান, বিপদ থেকে আগলানো এবং আশ্রয় দেওয়া।
৭। যৌথ প্রবণতা (Gregarious propensity)	সমজাতীয়দের সঙ্গ করা এবং দলভ্রষ্ট হয়ে পড়লে দলে ফিরে আসার চেষ্টা করা।

৮। আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবণতা (Self assertive propensity)	স্বজাতীয়দের উপর শাসন ও প্রভূত্ব করা, নিজেকে প্রতিষ্ঠা বা জাহির করা।
৯। বশ্যতা প্রবণতা (Submissive propensity)	অধিকতর শক্তিমানকে সম্মান দেখানো, তার অনুসরণ করা এবং তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করা।
১০। ক্রোধ প্রবণতা (Anger propensity)	কোন প্রবণতার প্রকাশে বাধার সৃষ্টি হলে রাগ করা এবং সেই বাধা জোর করে দূর করার চেষ্টা করা।
১১। আবেদন প্রবণতা (Appeal propensity)	নিজের ক্ষমতা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেলে সাহায্যের জন্য উচ্চস্বরে চীৎকার করা।
১২। সৃজন প্রবণতা (Constructive propensity)	আশ্রয়স্থল ও উপকরণাদি নির্মাণ করা।
১৩। সঞ্চয় প্রবণতা (Acquisitive propensity)	প্রয়োজনীয় বা আকর্ষণীয় কিছু সংগ্রহ করা বা নিজের আয়ত্বে আনা এবং তা সংরক্ষণ করা।
১৪। হাস্য প্রবণতা (Laughter propensity)	অপরের ত্রুটি বা অসাফল্যে হাসা।
১৫। আরাম প্রবণতা (Comfort propensity)	অস্বস্তিকর বা আরাম-নাশক কোন কিছু থেকে দূরে থাকা।
১৬। বিশ্রাম বা নিদ্রা প্রবণতা (Rest or Sleep propensity)	ক্লান্ত হলে শোওয়া, বিশ্রাম নেওয়া বা ঘুমানো।
১৭। পরিব্রাজন প্রবণতা (Migratory propensity)	নতুন স্থানে বেড়াতে যাওয়া।

উপরের ১৭টি প্রবণতা ছাড়াও ম্যাকডুগালের মতে মানুষের একাধিক অতি সরল এবং সাধারণ প্রবণতা আছে। এগুলির প্রধান কাজ হল দেহের কোন বিশেষ চাহিদা মেটানো, যেমন নিঃশ্বাস ফেলা, কাসা ইত্যাদি। ম্যাকডুগাল যে এগুলিকে রিফ্লেকস না বলে প্রবণতা বলে বর্ণনা করেছেন তার প্রধান কারণ হল তাঁর মতে এগুলির সম্পাদনের পেছনেও প্রচেষ্টা-প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি আছে।

ম্যাকডুগালের এই নতুন দেওয়া প্রবণতার তালিকার সঙ্গে পূর্ব্বের প্রবৃত্তির তালিকার নামের দিক দিয়ে খুব বড় একটা পার্থক্য নেই। কিন্তু ইন্‌ষ্টিংক্টের স্থানে প্রপেনসিটি কথাটার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে ম্যাক্‌ডুগাল একটা বড় কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। সেটা হচ্ছে, প্রবৃত্তিমূলক আচরণ বলতে যে বাঁধাধরা অপরিবর্ত্তনীয় আচরণ বোঝায় তা মানুষের ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। সাধারণত প্রবৃত্তি হল এমন একটা সহজাত অন্ধ শক্তি যার তাড়না প্রতিহত করার মত ক্ষমতা প্রাণীর নেই। প্রবৃত্তির গতিবেগ অদম্য। যেমন মৌমাছি চাক বাঁধবেই, গুটিপোকা গুটি তৈরী করবেই। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই ধরনের অন্ধ অদম্য অমোঘ প্রবৃত্তির কাজ খুব অল্পই দেখা যায়। ম্যাকডুগাল যখন প্রথম তাঁর প্রবৃত্তি মতবাদ প্রচার করেন তখন মানুষ এবং মানুষেতর প্রাণীর মধ্যে প্রবৃত্তির কাজের প্রকৃতি একই বলে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু পরে মানুষের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে প্রবণতা কথাটা ব্যবহার করায় তিনি মানব আচরণের পরিবর্ত্তনশীলতা ও বৈচিত্র্য স্বীকার করে নিয়েছেন।

সহজাত প্র বৃত্তির বৈশিষ্ট্য

ম্যাক্‌ডুগালের প্রবৃত্তি-মতবাদ বিশ্লেষণ করলে প্রবৃত্তির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায়।

১। প্রবৃত্তি সহজাত, শিক্ষা-প্রসূত নয়। মানব-শিশুর ক্ষেত্রে স্তন্যপান করা, হাঁসের বাচ্চার ক্ষেত্রে সাঁতার কাটা, মুরগীর বাচ্চার ক্ষেত্রে পাথর-কুচি ঠুকরে খাওয়া ইত্যাদি কাজগুলি কোনরূপ শিক্ষা ছাড়াই তারা করতে পারে।

২। শিক্ষা-প্রসূত না হলেও এগুলিতে পটুত্বের অভাব হয় না, এবং যে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এগুলির উদ্ভব সে সে উদ্দেশ্যের পক্ষে এগুলি যথেষ্ট। পাখীর বাসা তৈরী করা, মৌমাছির চাক বাঁধা ইত্যাদি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৩। ম্যাকডুগালের মতে প্রবৃত্তির সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর উদ্দেশ্যমূলক (purposive) স্বরূপ। কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণই উদ্দেশ্যহীন নয় এবং প্রত্যেকটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্যে পৌছনোর জন্য সৃষ্ট।

৪। এই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হল মূলত প্রাণীর বেঁচে থাকার তাগাগার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রবৃত্তি যেন প্রকৃতি-দত্ত কতকগুলি অস্ত্র যার সাহায্যে প্রাণী

তার পৃথিবীতে টিঁকে থাকার প্রাথমিক চাহিদাগুলি কারোও সাহায্য ছাড়াই মিটিয়ে ফেলতে পারে। যেমন মানব-শিশুকে যদি কেমন করে স্তন্যপান করতে হয় এটা শিখে নিয়ে তবে স্তন্যপান করতে হত তা হলে তার পক্ষে একদিনও বাঁচা সম্ভব হত না। খাদ্যকে পেষণ করে হজম করার জন্য মুরগীর ক্ষেত্রে পাথরের কুচি খাওয়া অবশ্য দরকার। এখন যদি মুরগীর বাচ্চাকে শিখে নিয়ে তারপর এ কাজটা করতে হত তবে সে কোন খাদ্যই হজম করতে পারত না। প্রাণীর বাঁচার জন্য এই অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলি আগে থেকেই প্রকৃতি প্রাণীকে শিখিয়ে রেখে দেয় যাতে জীবন-যুদ্ধের প্রথম দফাতেই সে নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায়।

৫। প্রাণীকে ব্যক্তিগতভাবে বাঁচতে সাহায্য করা ছাড়াও কতকগুলি প্রবৃত্তির লক্ষ্য হল সমগ্র জাতিকে টিঁকিয়ে রাখা। যৌন-প্রবৃত্তি এবং প্রজনন-মূলক আচরণের একমাত্র উদ্দেশ্য হল জাতিগত সংরক্ষণ। এ ছাড়া যৌথ-প্রবৃত্তি, বাৎসল্য, নির্ম্মাণ-প্রবৃত্তি প্রভৃতি প্রাণীর জাতিগত সংরক্ষণে যথেষ্ট সাহায্য করে।

৬। প্রবৃত্তি বিশেষ একটি প্রাণী-গোষ্ঠির মধ্যে সর্ব্বজনীন। যেমন মৌমাছি মাত্রেই চাক বাঁধে, সব শুঁয়োপোকাই গুটী তৈরী করে ইত্যাদি।

৭। প্রাণী সারাজীবন ধরেই প্রবৃত্তির প্রভাব অনুভব করে। তবে সমস্ত প্রবৃত্তিই সারাজীবন সক্রিয় থাকে না এবং থাকলেও অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, স্তন্যপান-প্রবৃত্তি বড় হলে থাকে না। আবার অনেক প্রবৃত্তি বিশেষ করে মানবের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে বদলে যায়। কিন্তু কতকগুলি প্রবৃত্তি আমৃত্যু সক্রিয় থাকে, যেমন আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি, খাদ্যান্বেষণ প্রবৃত্তি, কৌতূহল প্রবৃত্তি ইত্যাদি।

৮। সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে বুদ্ধির বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। বুদ্ধি-প্রসূত আচরণের প্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এই আচরণ পরিবেশ অনুযায়ী পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ পরিবেশ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে আচরণও বদলে যাবে। কিন্তু প্রবৃত্তি-জাত আচরণ পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত, অপরিবর্ত্তনীয়, অনেকটা যান্ত্রিক। সেজন্য এর কার্য্যকারিতা অব্যর্থ ও নিখুঁত। কিন্তু যেহেতু এর মধ্যে বুদ্ধির কোন প্রভাব নেই সেজন্য

যদি একবার এর নির্দ্দিষ্ট ছকের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে তবে এই আচরণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য।

৯। প্রবৃত্তি-জাত আচরণ বিশেষ জাতির ক্ষেত্রে বিশেষ রকমের, যদিও একই জাতির প্রাণীদের মধ্যে এর প্রকাশ একই প্রকৃতির। যেমন, সব বাবুই পাখীই একপ্রকারের বাসা তৈরী করে। সব মৌমাছিদের গড়া মৌচাকেরই গড়ন মোটামুটি অভিন্ন। এই মিলের পেছনে আছে অবশ্য দৈহিক গঠনের মিল। হাঁসের বাচ্চাদের জলে সাঁতার কাটতে হবে বলে তাদের পায়ের পাতা জোড়া। মুরগীকে ঠুকরে পাথরকুচি খেতে হবে বলে তার ঠোঁট লম্বা ইত্যাদি। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বিশেষ একটি প্রবৃত্তিকে প্রকাশ করতে হলে যে ধরনের দৈহিক গঠন দরকার প্রাণী সেই বিশেষ গঠন নিয়ে জন্মায়। আর সেইজন্য প্রাণীদের প্রবৃত্তিও যেমন ভিন্ন তাদের দৈহিক গঠনও সেইরকম ভিন্ন।

১০। প্রত্যেক সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে আছে প্রক্ষোভ-প্রচেষ্টা-মূলক একটি কেন্দ্র। এই কেন্দ্রগত প্রক্ষোভের অনুভূতি থেকে সৃষ্ট হয় প্রচেষ্টা, যা শেষে পর্য্যবসিত হয় আচরণে। এই প্রক্ষোভ-প্রচেষ্টামূলক কেন্দ্র আলোড়িত হলে প্রাণীর মধ্যে জাগে একটা অস্বস্তিকর উত্তেজনা (tension), এবং এই অস্বস্তিকর উত্তেজনা দূর হয় ঐ বিশেষ প্রবৃত্তি-জাত আচরণের সফল সম্পাদনের মধ্য দিয়ে।

সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct) ও বুদ্ধি (Intelligence)

প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা বলেছি যে প্রবৃত্তি-জাত আচরণ এবং বুদ্ধি-প্রসূত আচরণ—এই দুইয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্ত্তমান। বুদ্ধি এবং প্রবৃত্তির মধ্যে তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই—

বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি উভয়েই সহজাত।

বুদ্ধি একটি মানসিক শক্তি, প্রবৃত্তি হল মনের একটা কর্ম্ম-প্রবণতা। প্রবৃত্তি নিজে একটি শক্তি নয়, এর শক্তির উৎস হল এর অন্তর্নিহিত প্রক্ষোভ-প্রচেষ্টামূলক কেন্দ্র। বুদ্ধি কিন্তু নিজে একটি শক্তি।

বুদ্ধি পরিবর্ত্তন-ধর্ম্মী, এ থেকে জাত আচরণ বৈচিত্র্যে ভরা। পরিবেশের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন আচরণ সম্পাদন করাই হচ্ছে বুদ্ধির প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কাজ। প্রবৃত্তি অপরিবর্ত্তন-ধর্ম্মী, এ থেকে জাত আচরণ একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন এবং যান্ত্রিক। একটি নির্দ্দিষ্ট পরিবেশের সঙ্গে একটি নির্দ্দিষ্ট পন্থায় খাপ খাইয়ে নেবার সামর্থ্যটুকু মাত্র একটি প্রবৃত্তি রাখে, যদি কোনও কারণে সেই পরিবেশ কিছুমাত্র বদলে যায় তবে প্রবৃত্তি জাত আচরণও ব্যর্থ হয়ে যায়। বুদ্ধির শক্তিমত্তা পরিবর্ত্তনশীল এবং নতুন পরিবেশেই বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়।

বুদ্ধি অতীত শিক্ষাকে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে, কিন্তু প্রবৃত্তির কর্ম্মপ্রবণতা পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত ও শিক্ষার প্রভাবমুক্ত। অতীত শিক্ষার সাহায্য নেওয়ার ফলেই বুদ্ধি-জাত আচরণ এত বিচিত্র এবং বিভিন্ন হতে পারে আর শিক্ষার সাহায্য না নেওয়ার জন্যই প্রবৃত্তি-জাত আচরণ নতুনত্বহীন ও যান্ত্রিক।

প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধি, দুইই প্রকৃতি কর্ত্তৃক প্রাণীকে প্রদত্ত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি-বিধানের অস্ত্র। ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাসে প্রবৃত্তি হল পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণীর আদিমতম হাতিয়ার। আর তার তুলনায় বুদ্ধির আগমন ঘটে অনেক পরে। যখন কালক্রমে প্রাণীর পরিবেশ এতই জটিল ও সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে যে কেবলমাত্র প্রবৃত্তির সাহায্যে তার সঙ্গে সঙ্গতি-বিধান করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় তখন অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্র হিসাবে তার শস্ত্রাগারে বুদ্ধির আবির্ভাব ঘটে।

প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে কিন্তু প্রচুর মতভেদ আছে। হবহাউস, ম্যাকডুগাল, ড্রেভার প্রভৃতি প্রাচীনপন্থী প্রবৃত্তি-মতবাদীরা প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধির মধ্যে কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা টানতে রাজী নন। ম্যাকডুগালের মতে সহজাত আচরণের মধ্যে অ-সাধারণ পরিবেশের সঙ্গে সর্ব্বত্রই সার্থক সঙ্গতি-বিধানের ক্ষমতা দেখা যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে প্রবৃত্তির সঙ্গে সর্ব্বত্রই বুদ্ধি অঙ্গীভূত হয়ে আছে। অতএব প্রবৃত্তি আর বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য করা নিতান্তই অসঙ্গত। ড্রেভারের মতে প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধির মধ্যে কোনরূপ সুনিশ্চিত বিরোধিতা নেই। তাঁর মতে যে আচরণে অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা অল্প সে আচরণ প্রবৃত্তি-জাত আর যে আচরণে এই সম্ভাবনা অধিক সে আচরণ বুদ্ধি-জাত।†

---

† Instinct in Man : Drever

কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখতে গেলে এই বিতর্ক অর্থহীন। একথা খুবই সত্য যে বাস্তবে প্রাণীর কোন বিশেষ আচরণের কতটুকু প্রবৃত্তি-জাত আর কতটুকু বুদ্ধি-জাত তার সুনিশ্চিত পার্থক্যকরণ সম্ভব নয়। কেননা প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধি দুইই পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি-বিধানে প্রাণীর অস্ত্রস্বরূপ। যেখানে প্রবৃত্তি ব্যর্থ হয়ে যায় সেখানে বুদ্ধি আসে তার সাহায্যে। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধির পরিমাণ অল্প বলে তাদের আচরণের অধিকাংশই প্রবৃত্তি-জাত, তবুও তাদের মধ্যে বহুক্ষেত্রে বুদ্ধির প্রভাব দেখা যায়। উচ্চতর প্রাণী, বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে, আচরণের উপর বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশী এবং সেইজন্য মানুষের আচরণের মধ্যে প্রবৃত্তি-সুলভ যান্ত্রিকতার অভাব। কিন্তু তা বলে মানব আচরণের মধ্যে যে প্রবৃত্তির প্রভাব একেবারে নেই একথা বলা চলে না।

যদিও ব্যবহারিক জীবনে প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য করা যায় না তবুও তত্ত্বের দিক দিয়ে দুটি যে বিভিন্ন একথা স্বীকার করতেই হবে। কেননা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে এমন একটা দিন ছিল যখন বুদ্ধি বলে কোন বস্তু ছিল না, এবং তখন প্রাণীর আচরণ পুরোপুরি প্রবৃত্তি-জাত ছিল। এমন কি বর্ত্তমানেও নিম্নতম প্রাণীদের মধ্যে পুরোপুরি প্রবৃত্তি-পরিচালিত আচরণও প্রচুর পাওয়া যায়। সেইরকম উচ্চতর প্রাণী যে মানুষ, তার মধ্যে এমন আচরণও প্রচুর আছে যা সম্পূর্ণ প্রবৃত্তির প্রভাবমুক্ত। অবশ্য এখানে প্রাচীনপন্থী প্রবৃত্তি-মতবাদীরা আপত্তি জানাবেন এবং বলবেন যে সকল আচরণের মূলেই প্রবৃত্তির তাড়না কোন না কোন রূপে আছে। এ সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। তবুও আমাদের ঐ উপরের যুক্তিকে আর কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গেলে আমরা এমন একটা আগামী দিনের কথা ভাবতেও পারি যেদিন মানুষের সব আচরণই প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত হয়ে পুরোপুরি বুদ্ধি-পরিচালিত হয়ে উঠবে।

প্রবৃত্তি-জাত আচরণকে যান্ত্রিক বলে বর্ণনা করা হল বলে একথা যেন মনে না করা হয় যে প্রবৃত্তির আচরণ অন্ধ বা উদ্দেশ্যবিহীন। বরং তার বিপরীতটা ঠিক। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য-চরিতার্থের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেই প্রবৃত্তির জাগরণ ঘটে, নইলে নয়। যেমন নিজের নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেই না পালাবার প্রবৃত্তি জাগে! অতএব পালায়ন-রূপ কাজটাকে অন্ধ বা উদ্দেশ্যহীন কখনই বলা চলে না। তবে প্রবৃত্তিজাত আচরণকে যান্ত্রিক এইজন্য বলা হয় যে এর মধ্যে কোনরূপ বৈচিত্র্য বা পরিবর্ত্তনশীলতা নেই।

পরিবেশ বদলে গেলেও বা গতানুগতিক আচরণের দ্বারা উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা না থাকলেও প্রবৃত্তি-জাত আচরণের প্রকৃতি পাল্টায় না, একই ধারায় চলতে থাকে। কিন্তু বুদ্ধি-জাত আচরণের প্রকৃতি বিপরীত। পরিবেশের পরিবর্ত্তিত প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই আচরণও নিজেকে পরিবর্ত্তিত করার ক্ষমতা রাখে।

একটা উদাহরণ দিলেই প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির পার্থক্যটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ক্ষুধায় খাদ্যের দিকে ছুটে যাওয়া প্রাণীর প্রবৃত্তি-জাত। মনে করা যাক একটা ক্ষুধার্ত্ত বিড়ালের সামনে একটুকরো মাছ রাখা হয়েছে। মাছটা দেখা মাত্রই বিড়ালটি তার দিকে ছুটে যাবে। এটা তার প্রবৃত্তি-জাত আচরণ। এখন এই মাছ আর বিড়ালের মাঝখানে একটি বড় কাঁচের দেওয়াল রেখে দেওয়া হল, যার ফলে সোজাসুজি খাবারে গিয়ে পেঁ ৗছন যায় না বটে, তবে পাশ দিয়ে ঘুরে গেলে খাবারে গিয়ে পৌছন যায়। এখন বিড়ালটা ছুটে যেতেই কাঁচে গিয়ে ধাক্কা খেল। কিন্তু তা সত্বেও বার বার সে কাঁচের দেওয়ালে লাফিয়ে পড়তে লাগলো এবং সোজা পথে খাবারে পৌছনর চেষ্টা করতে লাগলো। এটা হল তার পুরোপুরি প্রবৃত্তিজাত আচরণ এবং এর প্রকৃতি একেবারে যান্ত্রিক।

বার বার এই ব্যর্থ চেষ্টার পর যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল তখন সে কাঁচটার চার পাশে ঘোরা ফেরা করতে সুরু করল এবং পাশ দিয়ে ঘুরে আসার পথটা খুঁজে পেতেই সেই পথে সে খাবারে গিয়ে পৌছল। এই দ্বিতীয় স্তরের আচরণগুলোকে আমরা বুদ্ধি-পরিচালিত বলব। কেননা এর মধ্যে পূর্ব্বের যান্ত্রিকতা নেই এবং এগুলি পরিবর্ত্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম। ম্যাকডুগাল প্রভৃতিরা প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ আচরণকেই প্রবৃত্তি-জাত বলতে চান। কিন্তু পুরোপুরি প্রবৃত্তিমূলক এবং বুদ্ধির হস্তক্ষেপ এই দুইয়ের মধ্যে সীমারেখা এতই স্পষ্ট এবং দুইয়ের প্রকৃতিও এত অভিন্ন যে এই পার্থক্যকরণ একান্ত সঙ্গত। অন্তত আচরণের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির মধ্যে যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে তা অনস্বীকার্য্য।

প্রবৃত্তি (Instinct) ও প্রক্ষোভের (Emotion) মধ্যে সম্পর্ক

আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি যে ম্যাকডুগালের মত অনুযায়ী প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। প্রবৃত্তিকে জাগায় প্রক্ষোভ এবং প্রক্ষোভই হচ্ছে

প্রবৃত্তির প্রেষণা-শক্তি। যে কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকে বিশেষ একটা প্রক্ষোভ।

কিন্তু ম্যাকডুগালের এই ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেছেন অনেক মনোবিজ্ঞানী, যেমন জন ড্রেভার, রিভার প্রভৃতি। অবশ্য ড্রেভার রিভার প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের প্রবৃত্তি সম্বন্ধে মতবাদ মোটামুটি ম্যাকডুগালের মতবাদের সমগোষ্ঠী। ড্রেভার বলেন যে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিমূলক অভিজ্ঞতার মধ্যে আছে তিনটি বস্তু, যথা, (১) একটি অনুভূত মানসিক তাড়না (impulse), (২) একটি প্রত্যক্ষিত বস্তু বা পরিস্থিতি এবং (৩) আগ্রহ (interest) বা সার্থক-বোধের (worth-whileness) একটা অনুভূতি যা পরিণতি লাভ করে সন্তুষ্ট বা পরিতৃপ্তিতে।

প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা দিতে গিয়ে ড্রেভার বলেছেন যে যদি কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ তার সহজ বাধাহীন পথে এগোয় এবং তার সার্থকবোধের অনুভূতি পরিতৃপ্তিতে পরিণতি লাভ করে তবে কোন প্রক্ষোভের জাগরণ ঘটবে না। কিন্তু যদি এই আচরণ কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন একটা মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি হবে এবং এই উত্তেজনাই কোন একটি বিশেষ প্রক্ষোভের রূপ নেবে। ড্রেভার বলতে চান যে প্রবৃত্তিজাত আচরণের সৃষ্টিকালে যে মানসিক তাড়না (impulse) অনুভূত হয় সেটা প্রক্ষোভ নয়। সত্যকারের প্রক্ষোভ জাগে তখনই যখন সেই প্রাথমিক মানসিক তাড়না কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই প্রক্ষোভের কাজ হল সেই বাধাপ্রাপ্ত তাড়নার পিছনে শক্তি জোগান এবং আচরণের তীব্রতা বাড়িয়ে যাতে বাধাটা অতিক্রম করা যায় তার ব্যবস্থা করা। সাধারণত এই প্রক্ষোভ জাগার ফলে প্রবৃত্তি-জাত আচরণের মধ্যে যে পরিবর্তন বা নতুনত্ব দেখা দেয় তাতে প্রাণীর পক্ষে সঙ্গতি-বিধানের কাজটা আরও উন্নতভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে যদি এই প্রক্ষোভ প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত হয়ে ওঠে তবে প্রবৃত্তিজাত আচরণ তার অভীষ্টলাভে একেবারেই সমর্থ হবে না। যেমন বিপদ দেখে প্রাণী পালাবার একটা তাড়না অনুভব করে, কিন্তু তখন তার মধ্যে ভয়রূপ কোন প্রক্ষোভ জাগে না। আর যদি সে বিনা বাধায় পালিয়ে যেতে পারে তবে তার মনে ভয় একেবারেই জাগবে না। কিন্তু যদি সে পালাতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবেই তার মনে ভয়-রূপ প্রক্ষোভ জাগবে। এই ভয় তার পালাবার তাড়নাকে আরও তীব্র

† Instinct in Man—Drever

করে তুলবে এবং প্রাণীটি পালাবার জন্য নানারূপ বিভিন্ন আচরণ করতে থাকবে। কিন্তু ভয় যদি অত্যন্ত বেশী হয়ে ওঠে তবে তার পালাবার সমস্ত আচরণই ব্যর্থ হয়ে উঠবে এবং শেষ পর্য্যন্ত সে পালাতেই পারবে না, যেমন দেখা গেছে যে বাঘের বা অজগরের সামনা সামনি পড়ে হরিণের বাচ্ছা এতই ভয় পেয়ে গেছে যে সে পালানোর সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে।

ড্রেভার প্রবৃত্তিজাত আচরণের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের জাগরণের একটা চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যখন কোন বিশেষ প্রবৃত্তিজাত আচরণ বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন সেই বিশেষ আচরণটি যে সেই বিশেষ পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর পক্ষে যথেষ্ট নয় এইটেই প্রমাণিত হয়। তখন সাময়িকভাবে প্রাণীর প্রাথমিক মানসিক তাড়না বাধাপ্রাপ্ত হয়, যাতে প্রাণী এই অবকাশে নতুন কোন উন্নত আচরণ সৃষ্টি করে উঠতে পারে। আর এই তাড়নার বাধা প্রাপ্তি ও আচরণের সাময়িক বিরতি থেকে জন্মায় প্রক্ষোভ।

এ থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছান যায়। প্রাণীকে তার জটিল পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতি-বিধান করতে হলে তার জন্মলব্ধ আচরণ-ধারা ক্রমশ বদলাতে হবে। আর যতই সে তার পুরাতন আচরণ-ধারা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সঙ্গতি-বিধানের নতুন নতুন প্রচেষ্টা শিখবে ততই তাকে নতুন নতুন প্রক্ষোভের অনুভূতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ এক কথায় প্রাণীর সঙ্গতি-বিধানের নব প্রচেষ্টার সৃষ্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে প্রক্ষোভের ক্রমবিকাশ। সেইজন্য যে প্রাণীজাতির মধ্যে আচরণ-বৈচিত্র্য যত বেশী তার প্রক্ষোভের জটিলতা অভিনবত্ব তেমনি প্রচুর। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে প্রবৃত্তি-মূলক আচরণ গতানুগতিক ও অপরিবর্তিত পথ ধরে চলে বলে তাদের মধ্যে প্রক্ষোভের বিচিত্রতা খুবই কম। কিন্তু মানুষের মধ্যে আচরণ পরিবেশ অনুযায়ী বহুবিধ হওয়ার ফলে তার মধ্যে প্রক্ষোভের প্রকাশ ও প্রকৃতি যেমন বিচিত্র তেমনই সংখ্যায় অগণিত।

অতএব ড্রেভারের মতে প্রবৃত্তিমূলক আচরণের মধ্যে যে প্রক্ষোভ থাকবেই তার কোন কথা নাই। কখন কখন প্রবৃত্তিজাত আচরণটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হলে প্রাণী কোনরূপ প্রক্ষোভ একেবারে অনুভব নাও করতে পারে। তবে তার প্রক্ষোভের অনুভূতি না থাকলেও একটা বিশেষ আগ্রহ-অনুভূতি বা সার্থকবোধ সমস্ত প্রবৃত্তিজাত আচরণের পেছনেই আছে। কিন্তু এই প্রাথমিক অনুভূতিটি

প্রক্ষোভ-জাতীয় নয়, সেটা কেবল একটা জৈব মানসিক শক্তি বিশেষ। প্রক্ষোভ দেখা দেয় তখনই যখন প্রাথমিক শক্তিটির প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

কিন্তু একথা ড্রেভার স্বীকার করেন যে কতকগুলো প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে ম্যাকডুগালের ব্যাখ্যাটা সত্য। অর্থাৎ কতকগুলো প্রবৃত্তিজাত আচরণ প্রক্ষোভকে বাদ দিয়ে ঘটতে পারে না। ড্রেভার এই কারণে প্রবৃত্তিকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করেছেন—বিশুদ্ধ (pure) ও প্রক্ষোভধর্মী (emotional)। বিশুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলি অর্থাৎ যে সকল প্রবৃত্তি প্রক্ষোভ ছাড়াই কাজ করতে পারে, তাদের অন্তর্গত হল সেই আচরণগুলি যেগুলি ব্যক্তি সঙ্গতি-বিধান (adjustment), মনোনিবেশ (attention), সঞ্চালন (locomotion), বাচন-ক্রিয়া (vocalisation) প্রভৃতির জন্য সম্পন্ন করে ; আর প্রক্ষোভ-ধর্মী প্রবৃত্তির অন্তর্গত হল দশটি প্রবণতা, যথা—ভয়, ক্রোধ, শিকার, সংগ্রহ, কৌতূহল, যৌথ-প্রবৃত্তি, পূর্ব্বরাগ, আত্মশ্লাঘা, হীনমন্যতা এবং বাৎসল্য।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ড্রেভারের প্রবৃত্তি মতবাদের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য দু'একটি বিষয়ে ছাড়া ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তি-মতবাদের উল্লেখযোগ্য কোনও পার্থক্য নেই।

ড্রেভারের প্রবৃত্তি মতবাদের একটা সূত্র বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ড্রেভার দেখিয়েছেন যে প্রবৃত্তিজাত আচরণ যদি সহজ পথে চলতে গিয়ে ব্যাহত হয় তবেই প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং যদি সেই প্রক্ষোভ অতি তীব্র হয়ে ওঠে তবে আচরণের সহজ অগ্রগতিই শেষ পর্য্যন্ত রুদ্ধ হয়ে যাবে। এ ঘটনাটি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। পড়া তৈরী করার সময় বা পড়া দেবার সময় যদি কোন কারণে ছাত্রের সহজ আচরণ ব্যাহত হয় তবে তার মনে বিরূপ প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে তার প্রচেষ্টা আরও বেশী করে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং শেষপর্য্যন্ত তার পক্ষে যতটুকু পারা সম্ভব তাও সে পারে না।

এইজন্য শিক্ষকের দেখা উচিত, প্রথমত ছাত্রের আগ্রহ ও ক্ষমতার উপযোগী নয় এমন কোন কাজ যেন ছাত্রকে করতে না দেওয়া হয়। কেননা, এ ধরনের কাজে প্রথমেই ব্যর্থতা আসে এবং ফলে ছাত্রের মনে বিরূপ প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়ত ছাত্রের ক্ষমতাকে কখনও বিদ্রূপ বা নিন্দা করা উচিত নয়। ফলে তার বিরূপ প্রক্ষোভ আরও তীব্র হয়ে উঠবে এবং অক্ষমতার মাত্রা বেড়ে যাবে। তৃতীয়ত শিক্ষার পরিবেশটি এমন করে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর মনে সর্ব্বদাই অনুকূল প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

প্রবৃত্তি (Instinct) ও অভ্যাসে[illegible]) ম[illegible] সম্পর্ক

প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে সম্পর্ক নিয়েও বেশ মতভেদ আছে। এ মতভেদের কারণ অবশ্য প্রবৃত্তির প্রকৃতি নিয়ে মতান্তরেই নিহিত।

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে দুটি সূত্রের কথা বলেছেন, প্রথমটি প্রবৃত্তির অনিত্যতার সূত্র (law of transitoriness) আর দ্বিতীয়টি প্রবৃত্তির নিরোধ বা পরিবর্ত্তনের সূত্র (Law of inhibition)।

প্রবৃত্তির অনিত্যতার সূত্রের দ্বারা জেমস বলতে চান যে প্রবৃত্তি বিশেষ একটা সময়ে পূর্ণতালাভ করে এবং তার পরে ধীরে ধীরে হীনশক্তি হতে থাকে এবং শেষে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে প্রবৃত্তিটি বিলুপ্ত হয়ে যাবার আগে তা থেকে একটা অভ্যাসের সৃষ্টি হতে পারে এবং যা পরে থাকে তা এই অভ্যাস, প্রবৃত্তি নয়। যেমন, যৌথপ্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে শিশু অপরের সঙ্গ খোঁজে, সমবয়সীদের সঙ্গে দল বাঁধে, কিন্তু বড় হলে এই যৌথপ্রবৃত্তিটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে দলবাঁধাটা তার চরিত্রে থেকে যায় একটা অভ্যাসরূপে। আবার যে প্রবৃত্তি থেকে কোন কারণে এরূপ কোন বিশেষ অভ্যাসের জন্ম হয়নি, সে প্রবৃত্তিটি কোন রূপ চিহ্ন না রেখেই একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়! যেমন শিশুর স্তন্যপান করার প্রবৃত্তিটি বড় হলে চলে যায় এবং তা থেকে কোনরূপ অভ্যাস সাধারণত জন্ম নেয় না।

জেমস স্পষ্টতই ম্যাকডুগাল প্রভৃতির মত প্রবৃত্তিকে অত প্রাধান্য দেন নি। তিনি প্রবৃত্তিকে অনেকটা অভ্যাস-গঠনের সোপান বলে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর মতে অভ্যাস-গঠন শেষ হয়ে গেলে প্রবৃত্তির কাজও শেষ হয়ে যায়।

তাঁর দ্বিতীয় সূত্রের অর্থ হল যে অভ্যাসের দ্বারা কোন বিশেষ প্রবৃত্তিকে পরিবর্তিত করা এমন কি রুদ্ধ করাও যেতে পারে। যেমন বাঘ দেখলে পালান মানুষের প্রবৃত্তিজাত, কিন্তু সার্কাসে যারা কাজ করে তারা পালায় না। এই প্রবৃত্তিজাত আচরণের পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় অভ্যাসের দ্বারা।

জেমসের প্রথম সূত্রটির ঘোরতর প্রতিবাদ করেছেন ম্যাকডুগাল। তাঁর মতে প্রবৃত্তি ক্ষণস্থায়ী নয় এবং অভ্যাসের গঠন শেষ করে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া তার ধর্ম্ম নয়। প্রবৃত্তি মনের চিরস্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনীয় কর্ম্মপ্রবণতা। এ থেকে অভ্যাসের

জন্ম হয় একথা সত্য, কিন্তু অভ্যাস সৃষ্টি করে এর কাজ শেষ হয়ে যায় না। অভ্যাস-গঠনের পরও প্রবৃত্তি অব্যাহত থাকে। ম্যাকডুগালের মতে প্রবৃত্তি যে ক্ষণস্থায়ী নয় তার বহু প্রমাণ প্রাণীজীবনে পাওয়া যায়। যেমন কোন একটি বন্যপাখীকে আজন্ম একটি ছোট খাঁচায় বন্দী করে রাখার পরে সেটি বেশ বড় হয়ে উঠলে ছেড়ে দেওয়া হল। তখন দেখা গেল যে তার প্রবৃত্তিজাত আচরণগুলি—যেগুলির প্রকাশ ইতিপূর্ব্বে একেবারেই হয়নি—পুরোপুরি অব্যাহতই আছে। প্রবৃত্তি যদি ক্ষণস্থায়ী হত তাহলে পাখীটির পক্ষে ছাড়া পাবার পর এই প্রবৃত্তিজাত আচরণগুলি সম্পন্ন করা সম্ভব হত না। ‡

কোনও কোনও মনোবিজ্ঞানী আবার প্রবৃত্তি এবং অভ্যাসের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য আছে বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা অভ্যাসকে একধরনের প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তিকে জন্মগত বা জাতিগত অভ্যাস (racial habit) বলে বর্ণনা করেন। এঁদের মতে প্রবৃত্তির যেমন প্রাণীকে বিশেষ একটি কাজে প্রবৃত্ত করার ক্ষমতা আছে তেমনি অভ্যাসেরও মধ্যে সেইরকম প্রেষণা-মূলক শক্তি (drive or motive power) আছে অর্থাৎ অভ্যাস নিজে থেকেই প্রাণীকে কাজে প্রবৃত্ত করতে পারে।

ম্যাকডুগাল অভ্যাসের এই প্রেষণামূলক শক্তির কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলতে চান যে প্রাণী যখন কোন অভ্যাসগত আচরণ সম্পাদন করে তখন সে অভ্যাসের কোন প্রেষণামূলক শক্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে করে না। তার সেই আচরণের পশ্চাতে কোন বিশেষ প্রবৃত্তির তাড়না থাকে। অর্থাৎ অভ্যাস পুরোপুরি যান্ত্রিক। এর নিজস্ব কোনও উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নেই। এটি কোন প্রবৃত্তিমূলক উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিছক উপলক্ষ্য মাত্র।

প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যকে স্বীকার করে নিলেও আমরা ম্যাকডুগালের অভ্যাস সম্বন্ধে উপরের উক্তিটি মেনে নিতে পারছি না। অভ্যাস প্রথমে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপলক্ষ্য হিসাবে সৃষ্ট হলেও পরে যে এটি নিজেই উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে এটা মনোবিজ্ঞানের প্রমাণিত তথ্য। উডওয়ার্থ দেখিয়েছেন যে, একটি আচরণ প্রথমে সৃষ্ট হতে পারে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপলক্ষ্যরূপে, কিন্তু পরে সেটি নিজেই উদ্দেশ্যে পরিণত হয়ে প্রেষণাশক্তির উৎস

‡ Outline of Psychology—McDougall

হয়ে উঠতে পারে। যেমন একজন তার স্বল্প আয়ে সংসার চালাবার জন্য (উদ্দেশ্য) মিতব্যয়িতার অভ্যাস (উপলক্ষ্য) সুরু করল। কিন্তু পরে যখন তার আয় প্রচুর হয়ে উঠল তখন সে তার মিতব্যয়িতা ছাড়তে পারল না। এখানে উপলক্ষ্য নিজেই উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। অলপোর্টের (Allport) প্রসিদ্ধ "উদ্দেশ্যের কর্ম্মমূলক স্বশাসনের তত্ত্ব" (Theory of functional autonomy of motive) এই তথ্যকেই ভিত্তি করে গঠিত।

প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে প্রথম ও প্রধান পার্থক্য হচ্ছে যে প্রবৃত্তি জন্মগত, অভ্যাস অর্জ্জিত। প্রবৃত্তিমূলক আচরণ স্বতঃপ্রণোদিত, প্রচেষ্টাবর্জ্জিত ও স্বশক্তি-চালিত। অভ্যাস ইচ্ছা-নির্ভর ও প্রচেষ্টা-প্রসূত। তবে যদি অভ্যাস চর্চ্চার ফলে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে ওঠে সে নিজেই শক্তির উৎস হয়ে দাঁড়াতে পারে। প্রবৃত্তি থেকেও আবার অভ্যাস সৃষ্ট হতে পারে। যেমন খাওয়ার অভ্যাসটা খাদ্য-অন্বেষণরূপ প্রবৃত্তি থেকে জাত।

অভ্যাসের প্রকৃতি ও গঠনতত্ত্ব সম্বন্ধে 'অভ্যাস' শীর্ষক পর্যায়টি দ্রষ্টব্য।

৫ বৃত্তি-মতবাদের সমালোচনা

এই হল প্রবৃত্তি সম্বন্ধে ম্যাকডুগাল প্রভৃতি প্রাচীনপন্থীদের মতবাদ। এই মতবাদটি বহুল প্রচারিত ও প্রচলিত হলেও বর্ত্তমানে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এটি সর্ব্বজনস্বীকৃত নয়। প্রাণী আচরণের উপর বিশদ গবেষণার ফলে এমন অনেক নতুন তথ্য হস্তগত হয়েছে যে সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে প্রবৃত্তি-মতবাদটি পুরোপুরি গ্রহণ করা যায় না।

প্রবৃত্তি-মতবাদের বিরুদ্ধে বহু সমালোচনার কয়েকটি নীচে দেওয়া হল।

১। মানুষের কোন একটি বিশেষ আচরণের ব্যাখ্যারূপে যদি একটি বিশেষ প্রবৃত্তিকে খাড়া করা হয় তবে সেই আচরণের সত্যকারের ব্যাখ্যা দেওয়া হল না। এতে মানব আচরণের মত একটা অতি-জটিল বস্তুকে অন্যায়ভাবে অতি-সরল করে ফেলা হল।

‡ Personality—G. W. Allport

২। প্রবৃত্তি-মতবাদে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিকে একটি পৃথক ও বিচ্ছিন্ন কর্ম্ম-প্রবণতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মানব-আচরণ কেবলমাত্র কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার সমষ্টি নয়। এর সুসংহত ও সামগ্রিক রূপ প্রবৃত্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। এক কথায় মানব-আচরণকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্তি অক্ষম।

৩। ম্যাকডুগালের মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির একটি বিশেষ সহগ প্রক্ষোভ আছে কিন্তু বাস্তবে এর বহু বিপরীত নিদর্শন দেখা যায়। অবশ্য ড্রেভার, গিনসবার্গ প্রভৃতি প্রবৃত্তি-মতবাদীরাও একথা স্বীকার করেন।

৪। প্রবৃত্তিগত আচরণ সর্ব্বজনীন নয়। মানুষের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রবৃত্তিগত আচরণের প্রচলন দেখা যায়। রুথ বেনেডিক্ট (Ruth Benedict), মার্গারেট মিড (Margaret Mead) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদগণের গবেষণায় মানব-আচরণের অদ্ভুত বৈষম্যের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। সভ্য মানুষদের মধ্যে মৌলিক আচরণের প্রকৃতি মোটামুটি একরকমের হলেও অসভ্য মানব-সমাজে আচরণের ধারার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। এমন অনেক মানব-সমাজ আছে যেখানে বাৎসল্য বলে কোন নির্দ্দিষ্ট প্রবৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। এস্কিমোদের মধ্যে যুযুৎসা-প্রবৃত্তি নেই বললেই চলে।

৫। মানুষের কোন আচরণই অপরিবর্ত্তনধর্ম্মী এবং যান্ত্রিক হয় না। তবে কেমন করে বলা চলে যে মানুষের আচরণ প্রবৃত্তিপ্রসূত? বস্তুত ম্যাকডুগালের বর্ণিত সতেরটি প্রবৃত্তিজাত আচরণের মধ্যে অল্প কয়েকটি ছাড়া অধিকাংশকেই আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা প্রবৃত্তিজাত বলতে রাজী নন। তাঁদের মতে মানুষের ক্ষেত্রে সত্যকারের প্রবৃত্তিজাত আচরণ ঘটে মাত্র কয়েকটি ব্যাপারে যেমন যৌন-আচরণ, খাদ্য-অন্বেষণ, যৌথ-আচরণ ইত্যাদি। অন্যান্য তথাকথিত প্রবৃত্তিমূলক আচরণগুলি আসলে এত পরিবর্ত্তনশীল ও বৈচিত্র্যময় যে ওগুলিকে প্রবৃত্তিজাত বলা চলে না।

৬। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের গবেষণা থেকে জানা যায় যে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলিকে আমরা আগে সহজাত বলে মনে করতাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি সহজাত নয়, সেগুলি অর্জ্জিত। অর্থাৎ অনেক আচরণকে আমরা

সহজাত ভেবে প্রবৃত্তি-প্রসূত বলে মনে করি, কিন্তু সেগুলি সহজাত বা প্রবৃত্তিমূলক নয়, সেগুলি শিক্ষা-প্রসূত।

৭। যে কোন উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যেরই পশ্চাতে আছে বিশেষ কোন শরীরগত সংগঠন, যেমন আছে রিফ্লেক্সের ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রবৃত্তির পেছনে কোন শরীরগত বৈশিষ্ট্য নেই, তবে কেমন করে প্রবৃত্তিকে সহজাত বলা চলে? এটি হল বার্নার্ডের সমালোচনা। এই সমালোচনায় অবশ্য ধরে নেওয়া হচ্ছে যে শারীরিক সংগঠন ছাড়া কোন কিছু উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায় না।

৮। বার্নার্ডের আর একটা সমালোচনা হল যে, যাকে সাধারণত প্রবৃত্তিজাত আচরণ বলা হয় আসলে সেটা মোটেই সরল ও অমিশ্র কোন আচরণ নয়, বরং যথেষ্ট জটিল ও বহু কার্য্যের একটি মিশ্র আচরণ। যেমন যৌন-আচরণ, বা মায়ের সন্তানের প্রতি বাৎসল্য, এগুলির কোনটিই একটি অমিশ্র আচরণ নয়। এগুলি একাধিক আচরণের সমষ্টি এবং ব্যক্তির চারপাশের সামাজিক পরিবেশ থেকে শেখা। বার্নার্ড অবশ্য প্রবৃত্তিকে একেবারে অস্বীকার করেন না। তাঁর মতে সত্যকারের প্রবৃত্তিজাত আচরণ কয়েকটি জৈবিক চাহিদা মেটাবার জন্য সম্পাদিত হয়, যেমন নিঃশ্বাস ফেলা, কাসা ইত্যাদি। এগুলির কোন সামাজিক গুরুত্ব নেই এবং ব্যক্তির আচরণ-নির্ণয়ে এগুলির কোন উল্লেখযোগ্য অংশ নেই।

৯। প্রবৃত্তির সংখ্যা নির্ণয়ে মনোবিজ্ঞানীরা একমত নন। কারও মতে প্রবৃত্তির সংখ্যা একটি বা দুটি; আবার কারও মতে কমপক্ষে একশটি। বার্নার্ড প্রায় ৫০০ জন প্রবৃত্তি-মতবাদীর মত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে প্রবৃত্তির সংখ্যা সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত।

১০। ম্যাকডুগালের মতে প্রাণীর সমস্ত কাজের প্রেষণা-শক্তি যোগায় একমাত্র প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি ছাড়া আচরণের প্রেষণা-শক্তির অন্য কোন উৎস নেই। কিন্তু আধুনিক বহু মনোবিজ্ঞানী একথা স্বীকার করেন না। অলপোর্টের প্রসিদ্ধ উদ্দেশ্যের কর্ম্মমূলক স্বশাসনের সূত্র (Theory of functional autonomy) হতে আমরা জানতে পারি যে, কোন অর্জ্জিত আচরণ বা অভ্যাস নিজে থেকেই প্রেষণা-শক্তি জোগাতে পারে। উডওয়ার্থ এই ঘটনাটিকেই উপলক্ষ্যের (mechanism) উদ্দেশ্যে

(drive) পরিণত হওয়া বলে বর্ণনা করেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে প্রবৃত্তি ছাড়াও প্রেষণা-শক্তির অন্য উৎস আছে।

প্রবৃত্তির আধুনিক মতবাদ

প্রবৃত্তি বা ইনষ্টিংক্টের উপর আধুনিক মতবাদের জন্য আমরা কনরাড্ লোরেঞ্জ Konrad Lorenz) নামক একজন ইউরোপীয় প্রাণীতত্ত্ববিদের নিকট ঋণী। প্রাণী-আচরণের উপর দীর্ঘ গবেষণা চালানোর ফলে লোরেঞ্জ প্রবৃত্তিজাত আচরণের প্রকৃতি ও কার্য্য সম্বন্ধে একটা নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন। আমরা নীচে তাঁর মতবাদটি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।*

লোরেঞ্জের মতে প্রাণীর সহজাত আচরণকে তিন শ্রেণীতে ফেলা যায়, যেমন (১) রিফ্লেক্স (Reflex), (২) ট্যাক্সিস (Taxis) এবং (৩) প্রবৃত্তিজাত কার্য্য (Instinctive movement)

রিফ্লেক্স হল কোন বিশেষ উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে প্রাণীদেহের কোন বিশেষ অঙ্গের বা মাংসপেশীর প্রতিক্রিয়া। যেমন লালাক্ষরণ, গ্রন্থির রস-নিঃসারণ ইত্যাদি।

ট্যাক্সিস হল কোন বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্য সম্পূর্ণ প্রাণীর সমগ্রভাবে প্রতিক্রিয়া। ট্যাক্সিস আচরণে প্রাণী হয় কোন বিশেষ উদ্দীপকের দিকে এগিয়ে যায়, নয় তা থেকে দূরে সরে আসে। এটি সব সময়ে কোন বিশেষ দিকে পরিচালিত আচরণ। স্রোতের বিরুদ্ধে মাছের সাঁতার কাটা, আলোর দিকে পোকার এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদি হল ট্যাক্সিসের উদাহরণ।

প্রবৃত্তিজাত কার্য্য কিন্তু রিফ্লেক্স বা ট্যাক্সিস থেকে অনেক দিক দিয়ে পৃথক। প্রথমত বিভিন্ন প্রাণীজাতির মধ্যে প্রবৃত্তিজাত কার্য্য বিভিন্ন হবে। একই রিফ্লেক্স এবং একই ট্যাক্সিস বহু বিভিন্ন প্রাণীজাতির মধ্যে থাকতে পারে কিন্তু একই প্রবৃত্তিজাত কার্য্য দুটি বিভিন্ন প্রাণীজাতির মধ্যে দেখা যাবে না। লোরেঞ্জের মতে প্রবৃত্তিগত আচরণের বৈষম্য দেখে প্রাণীজাতির শ্রেণীবিভাগ করা অনেক সহজ ও ত্রুটীহীন। বস্তুত এই প্রবৃত্তিজাত কার্য্যের পার্থক্য ও মিল দেখে লোরেঞ্জ অনেক প্রাণীর নতুন শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

---

* King Solomon's Ring—Lorenz

ট্যাক্সিস ও রিফ্লেক্সের সঙ্গে প্রবৃত্তিজাত কাজের দ্বিতীয় পার্থক্য হল রিফ্লেক্স ও ট্যাক্সিস যে কেবলমাত্র উদ্দীপক থেকে সৃষ্ট হয় তাই নয়, যতক্ষণ উদ্দীপকটি থাকে ততক্ষণ তারা সক্রিয় থাকে। উদ্দীপকটি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রিফ্লেক্সও অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু প্রবৃত্তিজাত কাজ উদ্দীপক থেকে সৃষ্ট হলেও উদ্দীপকের দ্বারা এর প্রকাশ নিয়ন্ত্রিত নয়। অর্থাৎ একবার প্রবৃত্তিজাত আচরণটি ঘটতে সুরু হলে উদ্দীপকের উপর তা আর নির্ভরশীল থাকে না। উদ্দীপক থাকুক আর না থাকুক এটি তার কাজ ঠিক করে যাবে। বন্দুকের ঘোড়াটি একবার টিপে দিলে বারুদের ক্যাপটি ফেটে যাওয়া, গুলিটিকে ধাক্কা মারা, গুলিটির বেরিয়ে যাওয়া প্রভৃতি কাজগুলি যেমন পর পর নিজে নিজে হয়ে যায়, সেই রকম একবার প্রবৃত্তিজাত আচরণ কোন উদ্দীপকের দ্বারা সক্রিয় হয়ে উঠলে তার পরবর্তী ধাপগুলি বন্দুকের ঘোড়া টেপার ক্ষেত্রের মতই পর পর নিজে নিজে ঘটে যাবে। সেইজন্য প্রবৃত্তিজাত আচরণকে বন্দুকের ঘোড়া-টেপার প্রক্রিয়ার (Triggered movement) সঙ্গে তুলনা করা হয়। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ট্যাক্সিস ও রিফ্লেক্স, উদ্দীপক-নিয়ন্ত্রিত কিন্তু প্রবৃত্তিজাত আচরণ উদ্দীপক-নিয়ন্ত্রিত নয়, যদিও উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল সব কাজই।

কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ একবার সুরু হয়ে গেলে উপযুক্ত উদ্দীপক থাকুক আর না থাকুক আচরণটির সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সেটি ঠিকভাবেই ঘটে চলবে। একবার একটা ষ্টার্লিং পাখীকে বন্দী অবস্থায় মানুষ করা হয়েছিল এবং তাকে কৃত্রিম উপায়ে খাওয়ান হত। কিন্তু লোরেঞ্জ দেখলেন যে পাখীটি তা সত্বেও পোকা শিকারের সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি—যেমন পোকাটাকে ধরা, সেটিকে মারা এবং গিলে ফেলা প্রভৃতি কাজগুলি ঠিক পর পর করে যাচ্ছে যদিও তার সামনে কোন পোকারই অস্তিত্ব নেই। লোরেঞ্জ এই ঘটনাটির নাম দিয়েছেন "শূন্যে সক্রিয়তা" (Vacuum Activity)। অতএব দেখা যাচ্ছে রিফ্লেক্সস ও ট্যাক্সিস উদ্দীপক-নির্ভর, প্রবৃত্তিজাত আচরণ উদ্দীপক-নিরপেক্ষ।

প্রবৃত্তিজাত আচরণের এই বৈশিষ্ট্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল যে কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ ঘটবার আগে সেই প্রবৃত্তিকে ঘিরে প্রাণীর মধ্যে সঞ্চিত হয় প্রতিক্রিয়ামূলক বিশেষ শক্তি (Reaction Specific Energy)। যতক্ষণ না উপযুক্ত উদ্দীপকের (Releaser) সামনা-সামনি প্রাণীটি আসছে এবং যতক্ষণ না ঐ প্রবৃত্তিটি মুক্তিলাভ করেছে ততক্ষণ এই শক্তি সঞ্চিত হতে থাকবে।

এই প্রক্রিয়ামূলক শক্তির সঞ্চয়ের ফলে প্রাণীর মধ্যে দুটি পরিবর্তন দেখা দেয়, প্রথম, প্রাণীর মধ্যে একটি অস্বস্তিকর উত্তেজনার (tension) সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়, প্রাণীর উদ্দীপক-বিচারের অনুভূতিবোধ ক্রমশ কমে আসে (lowering of the threshold)। এই সঞ্চিত শক্তি যতই তীব্র হয়ে ওঠে ততই প্রাণীর উত্তেজনা বেড়ে যায় এবং ততই উপযুক্ত উদ্দীপকের প্রয়োজনীয়তা কমে আসে। শেষ পর্য্যন্ত এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যখন যেমন-তেমন উদ্দীপকের দ্বারাই প্রবৃত্তিজাত আচরণটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং বন্দুকের ঘোড়া টেপার প্রক্রিয়ার মত একেবারে শেষ সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছে তবে থামে।

লোরেঞ্জের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রবৃত্তিজাত আচরণের কয়েকটি স্তর দেখান যেতে পারে।

প্রবৃত্তি → →	**প্রচেষ্টা → →**	**→ → লক্ষ্য**
প্রতিক্রিয়ামূলক বিশেষ শক্তির (Reaction Specific Energy) সঞ্চয় এবং উত্তেজনার (tension অনুভূতি	কোন বিশেষ লক্ষ্যে পৌছনোর বা কোনো বিশেষ কার্য্য করার জন্য অনুভূত মানসিক তাড়নার সক্রিয় বাহ্যিক প্রকাশ।	উপযুক্ত উদ্দীপকের দ্বারা রুদ্ধ প্রবৃত্তির মুক্তিলাভ ও উত্তেজনার পরিসমাপ্তি।

এই হল লোরেঞ্জের দেওয়া প্রবৃত্তিজাত আচরণের ব্যাখ্যা। প্রবৃত্তির এই আধুনিক মতবাদের সঙ্গে প্রাচীন মতবাদগুলির সর্ব্বপ্রধান পার্থক্য হল এই যে আধুনিক মতবাদে প্রবৃত্তিজাত আচরণের একটা পরিষ্কার, নিখুঁত এবং সুনির্দ্দিষ্ট বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং রিফ্লেক্স ও ট্যাক্সিস জাতীয় অন্যান্য সহজাত আচরণের সঙ্গে কোথায় এবং কতটুকু পার্থক্য তাও. পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাচীনপন্থী মতবাদগুলিতে প্রবৃত্তিকে একটা অস্পষ্ট, অনির্দ্দিষ্ট এবং অপরিমিত শক্তি বা প্রবণতা বলে বর্ণনা করায় প্রবৃত্তির সত্যকারের স্বরূপটা আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য ও হেঁয়ালী থেকে গেছল।

দ্বিতীয়ত এই মতবাদটি প্রাণী-আচরণ পর্য্যবেক্ষণের উপর সম্পূর্ণ ভিত্তি করে গড়া। এর মধ্যে অনুমান বা কল্পনার কোন স্থান নেই। ফলে এটি বিজ্ঞানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য।

তৃতীয়ত এই মতবাদে প্রবৃত্তির একটা সুনির্দ্দিষ্ট এবং যথাযথ বর্ণনা পাওয়ার

ফলে প্রাণী-আচরণের প্রকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া এখন সম্ভব হয়েছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে প্রাচীনপন্থীরা যেগুলিকে প্রবৃত্তিজাত আচরণ বলে এসেছেন তার কতকগুলি নিছক রিফ্লেক্স বা ট্যাক্সিস, কতকগুলি প্রকৃতই প্রবৃত্তিজাত আবার অনেকগুলিই শিক্ষাপ্রসূত আচরণ। প্রবৃত্তির নির্দ্দিষ্ট রূপ এবং তার আচরণের সীমারেখা জানা না থাকায় এই বিভিন্ন প্রকৃতির আচরণগুলি তাদের কাছে প্রবৃত্তিজাত বলে মনে হয়ে এসেছে।

লোরেঞ্জের দেওয়া প্রবৃত্তিজাত আচরণের ব্যাখ্যা যদি আমরা মেনে নিই তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে মানুষের ক্ষেত্রে নিছক প্রবৃত্তিজাত আচরণ খুব অল্পই পাওয়া যায়। মানব-আচরণ এতই বৈচিত্র্য ও পরিবর্ত্তন-ধর্ম্মী যে প্রবৃত্তির মত একটা যান্ত্রিক শক্তির দ্বারা তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। তার সত্যকার ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে অন্য জায়গায়।

প্রবৃত্তি ও শিক্ষার মধ্যে সম্পর্কে

প্রবৃত্তির প্রকৃতি ও কার্য্য নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এটা সকল শিক্ষাবিদই মেনে নিয়েছেন। শিক্ষা ও প্রবৃত্তির মধ্যে এই সম্পর্ক আমরা দুদিক দিয়ে আলোচনা করব, প্রথম, শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব ও দ্বিতীয়, প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব।

শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব (Effect of Instincts on Education)

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার সংগঠনের সঙ্গে সমার্থক। ব্যক্তিসত্তা (Personality) হল সেই বস্তু যা এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তি থেকে পৃথক করে দেয় এবং তার সমজাতীয় বহুর মধ্যে তার স্বাতন্ত্র্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তার সঙ্গীদের কাছে অবশ্য তার ব্যক্তিসত্তার পরিচায়ক হচ্ছে তার সাধারণ আচরণ-বৈশিষ্ট্য, সামাজিক ব্যবহার, অভ্যাস, বিশেষ প্রতিক্রিয়া, পছন্দ-অপছন্দ, মতামত, মনোভাব ইত্যাদি। এগুলির দ্বারাই তার সঙ্গীরা তার ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে ধারণা তৈরী করে নেয়। কখন কখনও চরিত্র (character) কথাটিও এই অর্থে ব্যবহৃত

হয়ে থাকে। ব্যক্তিসত্তা বা চরিত্রের সংগঠন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা যাবে।

শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন তার ব্যক্তিসত্তা বা চরিত্র বলে কোন বস্তুই থাকে না। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হবার পরমুহূর্ত্ত থেকেই তার ব্যক্তিসত্তা সংগঠনের কাজ সুরু হয়ে যায়। যৌবন সুরু হবার আগেই মোটামুটি ভাবে তার ব্যক্তিসত্তার একটা কাঠামো তৈরী হয়ে গেলেও ব্যক্তিসত্তা-সংগঠনের কাজ কোনদিনই একেবারে শেষ হয় না। মানুষ গড়ার কারখানায় কাজের একেবারে বিরতি কোনদিনই ঘটে না।

ব্যক্তিসত্তা হল দুটি শক্তির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার সম্মিলিত ফল। একটি হল, শিশু যে সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মেছে সেগুলি, এক কথায় যাকে বলা হয় উত্তরাধিকার বা বংশধারা (heredity)। আর একটি হল তার পরিবেশ (environment)। এই দুইয়ের সংঘাতে ব্যক্তি যা তাই হয়ে ওঠে।

এখন শিশুর উত্তরাধিকারের মধ্যে একটা বড় স্থান অধিকার করে থাকে তার সহজাত প্রবৃত্তিগুলি অর্থাৎ বিশেষ কতকগুলি পরিস্থিতিতে বিশেষ কতকগুলি ভাবে কাজ করার প্রবণতা। শিশুর প্রাথমিক আচরণগুলি এই প্রবৃত্তি বা প্রবণতাগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে এবং তার পরবর্ত্তী বয়স্ক জীবনের আচরণ-ধারার উপরও যে তাদের প্রভাব থাকবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু প্রশ্ন হল প্রবৃত্তির এই প্রভাব কতখানি এবং তার গুরুত্বই বা কতটুকু। প্রাচীনপন্থী প্রবৃত্তি-বাদীরা একবাক্যে বলেন যে এই প্রভাব অপরিসীম এবং যেহেতু শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে প্রবৃত্তির প্রভাবই একমাত্র প্রভাব সেইজন্য এর গুরুত্বও অপরিমিত। তাঁদের মতে শিশুর প্রাথমিক আচরণগুলি সম্পূর্ণ প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত এবং পরবর্ত্তী জীবনের আচরণগুলি অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী জটিল এবং বিচিত্র হলেও মূলত সেগুলিও সেই প্রবৃত্তি-প্রসূত। যেমন কৌতূহল প্রবৃত্তি শিশুর জানার ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলে এবং জানতে প্রবুদ্ধ করে। শিশু বড় হয়ে যখন লেখাপড়া শেখে বা বিজ্ঞানের রহস্য ভেদের জন্য গবেষণা চালায় বা অজ্ঞাত রাজ্যে পাড়ি দেয় তখনও তার আচরণের মূলে আছে সেই কৌতূহল প্রবৃত্তি, যদিও তার আচরণ বহুলাংশে জটিল ও বিচিত্র হয়ে উঠেছে। সেই রকম যৌথ প্রবৃত্তি এবং সংগঠন প্রবৃত্তি। শিশুর প্রাথমিক সঙ্গলাভের ইচ্ছা এবং কাদা-বালি দিয়ে বাড়ী তৈরী করার চেষ্টা পরিণতজীবনে দেখা দেয় ক্লাব-সংঘ-সমাজ প্রভৃতি গড়ার আচরণরূপে এবং শিল্প-কলা-সাহিত্য-ভাস্কর্য্য প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে নতুন

কিছু সৃষ্টি করার প্রচেষ্টারূপে। এইভাবে দেখান যেতে পারে যে ব্যক্তির পরিণত জীবনের সমুদয় আচরণই তার সহজাত প্রবৃত্তি থেকে প্রসূত।

প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে আসে প্রক্ষোভ। ম্যাকডুগালের মতে প্রবৃত্তি একা কাজ করতে পারে না, তার সঙ্গে অবশ্যই থাকবে প্রক্ষোভ, যোগাবে প্রাণীর কাজের পিছনে প্রেষণা শক্তি। অতএব শিশুর ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা ব্যক্তিসত্তার উপাদান বলতে অমারা পাচ্ছি দুটি জিনিস, একটি সহজাত-প্রবৃত্তি, অপরটি তার সহগামী প্রক্ষোভ। শিশুর পরিণতজীবনের আচরণের কাঠামো নির্ভর করছে এই দুটি বস্তুর উপর। যেমন, শিশু বড় হয়ে সৃজনশীল বা সঙ্গপ্রিয় হবে কিনা নির্ভর করছে তার সংগঠন প্রবৃত্তি বা যৌথ প্রবৃত্তির উপর। সেইরকম শিশুর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি এবং তার সহগামী আত্মগরিমার প্রক্ষোভ যদি যথাযথ বিকাশলাভ করে তবে শিশু বড় হয়ে সবল ব্যক্তিত্বের লোক হয়ে উঠবে এবং বিপরীতভাবে, যদি তার বশ্যতার প্রবৃত্তি ও তার সহজাত হীনমন্যতার প্রক্ষোভ বৃদ্ধি পায় সে বড় হয়ে দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক বলে গণিত হবে।

ম্যাকডুগাল প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি থেকে জাত অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মানুষের ব্যক্তিসত্তার সমগ্র সংগঠনটিরই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শিশু জন্মায় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন প্রবৃত্তি নিয়ে। এই প্রবৃত্তিগুলি ও তাদের সহগামী প্রক্ষোভগুলি থেকে শিশুর সমস্ত প্রাথমিক আচরণগুলিই জন্ম নেয়। তখন তার ব্যক্তিসত্তা থাকে অসংহত ও অসংগঠিত। শিশু একটু বড় হলে এই প্রক্ষোভগুলি সুসংহত হয়ে সেন্টিমেণ্টের আকার ধারণ করে এবং তার বিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তিজাত আচরণগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট হয়ে ওঠে। এই সেন্টিমেণ্টগুলি তৈরী হওয়া থেকেই ব্যক্তিসত্তা বা চরিত্রের গঠন সুরু হয় এবং যখন সেন্টিমেণ্টগুলি সুসংগঠিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ ও উদ্দেশ্য-চালিত আচরণধারার জন্ম দেয় তখনই তার ব্যক্তিসত্তা বা চরিত্রের সংগঠন শেষ হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিসত্তার জন্ম সেন্টিমেণ্টের সংগঠন থেকে এবং সেন্টিমেণ্টের জন্ম প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভ থেকে। অতএব প্রবৃত্তিকে ব্যক্তিসত্তার ভিত্তি বা মূল উপাদান বলে বর্ণনা করা চলতে পারে।

প্রবৃত্তিবাদীরা তাঁদের এই মতবাদটি নানাভাবে বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন যে সহগামী প্রক্ষোভগুলি নিয়ে শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলিই হচ্ছে ব্যক্তিসত্তার মূলভিত্তি। আবার কেউ বলেছেন যে প্রবৃত্তিগুলি হচ্ছে চরিত্রের মূল উপাদান ইত্যাদি।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে কিন্তু প্রবৃত্তির এই একাধিপত্য আর স্বীকার করা হয় না। শিশুর ব্যক্তিসত্তা-গঠনে প্রবৃত্তির প্রভাবকে মেনে নেওয়া হলেও প্রবৃত্তির প্রভাব যে একমাত্র প্রভাব, একথা সত্য নয়। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আগেই করা হয়েছে। শিশুর ব্যক্তিসত্তা-গঠনে যে শক্তিটি সবচেয়ে বেশী কাজ করে সেটি হল তার চাহিদা (needs)। এগুলির অধিকাংশই অর্জ্জিত। পরিবেশের সংস্পর্শে এসে শিশুর নিত্য নূতন চাহিদার সৃষ্টি হয়। শিশু তার এই চাহিদাগুলি পূর্ণ করার চেষ্টা করে এবং তার সেই প্রচেষ্টাই তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। তার পরিণত বয়সের ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ নির্ভর করে তার এই চাহিদাগুলির তৃপ্তি বা অতৃপ্তির উপর।

শিশুর বৃদ্ধির প্রাথমিক স্তরে প্রবৃত্তির আধিপত্য থাকলেও শিশু একটু বড় হলেই তার মধ্যে নানা চাহিদা সৃষ্ট হতে থাকে এবং তখন তার আচরণ এই চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হয়। একথা সত্য যে অনেক চাহিদা আছে যা প্রবৃত্তি-প্রসূত, কিন্তু এমন অসংখ্য চাহিদা আছে যা শিশু তার পরিবেশের সংস্পর্শে এসে অর্জ্জন করে থাকে।

শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে প্রবৃত্তির প্রভাবকে আংশিক মেনে নিলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব যথেষ্ট থেকে যায়। এ কথাটা অনস্বীকার্য্য যে শিশুর প্রাথমিক আচরণগুলির উপর প্রবৃত্তির প্রভাব অত্যন্ত বেশী। অতএব বিচক্ষণ শিক্ষক এই তথ্যটিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজে লাগাতে পারেন।

প্রথমত, শিশুর শিক্ষা প্রবৃত্তিমুখী হবে। অর্থাৎ প্রবৃত্তির বিরোধী কোন শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। প্রবৃত্তির গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যদি শিক্ষা দেওয়া হয় ত সে শিক্ষা সহজ ও বাধাহীন হবে। শিশুর প্রবৃত্তিকে ব্যাহত করে এমন শিক্ষা যে অনর্থকই হয় তা নয়, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে তা ক্ষতিকরও।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষক শিশুর সহজ প্রবৃত্তিগুলিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে শিক্ষাকে অধিকতর আয়াসহীন ও কার্য্যকরী করে তুলতে পারেন। যেমন শিক্ষায় মনোযোগ অবশ্য প্রয়োজনীয়। শিশুর কৌতূহলরূপ প্রবৃত্তিকে যদি ঠিকমত উদ্বুদ্ধ করা যায় তবে মনোযোগও স্বাভাবিকভাবে এসে যাবে। যৌথপ্রবৃত্তিকে ঠিকমত কাজে লাগিয়ে শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে সহযোগিতা ও সংঘবদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারেন। সংগঠন-প্রবৃত্তিকে সুযোগ দিয়ে শিশুর সৃজনীশক্তিকে বিকশিত করতে পারেন। ইত্যাদি।

তৃতীয়ত প্রবৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত করে শিক্ষক শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত গুণাবলী সৃষ্টি করতে পারেন এবং অবাঞ্ছিত প্রবণতাগুলি দূর করতে পারেন। আমরা দেখেছি যে মানুষের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি অনেকাংশে নমনীয় ও পরিবর্তনশীল। পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ ও বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষক প্রবৃত্তিগুলিকে প্রয়োজনমত পরিপুষ্ট বা অবরুদ্ধ করে শিশুর ব্যক্তিসত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। যেমন শিশুর কৌতূহল প্রবৃত্তিকে ঠিক পথে পরিচালিত করে তার মধ্যে বিদ্যার্জ্জনের আসক্তি সৃষ্টি করা যায়, তার সঞ্চয় প্রবৃত্তিকে উপযুক্ত অভিব্যক্তির অবকাশ দিয়ে দেশ বিদেশের ছবি বা ডাক-টিকিট বা মুদ্রা জমাবার মত শিক্ষাপ্রদ হবি (hobby) তার মধ্যে গড়ে তোলা যায়, তার সংঘবদ্ধতার প্রবৃত্তিকে উৎসাহ দিয়ে তার মধ্যে সুনাগরিকতার গুণাবলী সৃষ্টি করা যায়, তার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিকে ব্যক্ত হবার সুযোগ দিয়ে তার মধ্যে সুপ্ত নেতৃত্বের ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলা যায় ইত্যাদি।

প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব (Effects of Education on Instincts)

আমরা দেখেছি যে শিক্ষার দ্বারা সহজাত প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্ত্তন সম্ভব। উইলিয়াম জেমস ত বিশ্বাস করেন যে শিক্ষার দ্বারা প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বিলোপসাধনও ঘটান যায়। ম্যাকডুগাল প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীরা এই চরম মত গ্রহণ না করলেও এটা স্বীকার করেন যে মানবপ্রবৃত্তি যথেষ্ট মাত্রায় পরিবর্ত্তনশীল এবং প্রয়োজন ও পরিবেশের চাপে নানা রূপ গ্রহণ করে।

শিক্ষার দ্বারা কেমন করে প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন সাধন করা যেতে পারে তার দু' একটা উদাহরণ এখানে দেওয়া হল।

প্রথম পন্থা হল **অবদমন** (Repression), অর্থাৎ প্রবৃত্তির প্রকাশ জোর করে রুদ্ধ করা। এ উপায়টি মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং প্রায়ই কার্য্যকরী হয় না। অবদমিত প্রবৃত্তি ভিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দেয় এবং উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী করে। সাধারণত যখন শাস্তির ভয় বা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে শিশুকে কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয় তখন আসলে শিশুর প্রবৃত্তিকে অবদমিত করাই হয়। কিন্তু এ ধরনের প্রচেষ্টা সাধারণত স্থায়ী হয় না এবং যেখানে স্থায়ী হয় সেখানে মানসিক জটিলতার সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় পন্থার নাম হল **উন্নয়ন** (sublimation)। এই পন্থায় প্রবৃত্তির গতিধারাকে তার স্বাভাবিক অথচ অবাঞ্ছিত পথ থেকে সরিয়ে এনে বাঞ্ছিত অন্য পথে পরিচালিত করা হয়। যে শিশু যুযুৎসাপ্রবৃত্তির প্রভাবে সঙ্গীদের সঙ্গে প্রায় মারামারি করে, বক্সিং, কুস্তি, লাঠিখেলা প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর খেলার মধ্যে দিয়ে তার বিপথগামী প্রবৃত্তির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। যে শিশু আজেবাজে টুকিটাকি জিনিয জমায়, তার সঞ্চয়-প্রবৃত্তিকে শিক্ষাকর বস্তু জমানোর মধ্যে দিয়ে উন্নীত করে তোলা যেতে পারে। সেইরকম শিশুর অবাঞ্ছিত অর্থহীন কৌতূহলকে বাঞ্ছিত শিক্ষাদায়ক জিজ্ঞাসায় এবং তার বিরক্তি বা ঘৃণাকে অপ্রেয় বা অকাম্যের প্রতি ঘৃণায় উন্নীত করা যেতে পারে।

তৃতীয় পন্থার নাম হল **বিরেচন** (catharsis)। এই পন্থায় প্রবৃত্তিকে তার সহজ ও কাম্য পথে অভিব্যক্ত হতে দিয়ে শান্ত করা হয়। এটি অবদমন (repression) পন্থার ঠিক বিপরীত। যে সব ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিকে অবদমিত করা হয়েছে এবং যার ফলে মানসিক সাম্য নষ্ট হতে চলেছে সে সব ক্ষেত্রে বিরেচন পদ্ধতি গ্রহণ করতেই হয়। ফ্রয়েড এই পদ্ধতিটির নাম দিয়েছেন এ্যাব্রিকশান (abreaction)। কিন্তু সর্ব্বত্র বা সাধারণের পক্ষে এ পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব নয়।

এ ছাড়া আরও কতকগুলি পন্থার নাম করা যায়, যেমন—প্রবৃত্তিটিকে প্রকাশের সুযোগ যদি না দেওয়া হয় তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সেই প্রবৃত্তিটি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেছে। পরিবেশের পরিবর্ত্তনও একটা ফলদায়ক পন্থা। বিশেষ পরিবেশে হয়ত বিশেষ কোন প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। তখন যদি সেই পরিবেশের পরিবর্ত্তন করা যায় তবে প্রবৃত্তিটি আর কাজ না করতেও পারে। সেই রকম বিপরীতধর্ম্মী প্রবৃত্তিকে বিকাশের সুযোগ দিয়ে কোন প্রবৃত্তিটিকে শক্তিহীন করে তোলা যেতে পারে। কোন শিশুর বশ্যতা প্রবৃত্তিকে দূর করতে হলে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি যাতে বিশেষভাবে বিকাশলাভ করে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তার ঘৃণার ভাবকে দূর করতে হলে তার মনে শ্রদ্ধা বা ভালবাসার ভাব জাগানোই প্রকৃষ্ট উপায়।

প্রশ্নাবলী

1. Define instinct and describe how teachers in their daily work can appeal to the instincts of children. (B. A. 1956)

Ans. (পৃঃ ৪১—পৃঃ ৪৫ + পৃঃ ৬৮—পৃঃ ৭২)

2. Explain the nature of instinct and discuss whether instinct is emotional. (B. A. 1957)

Ans. (পৃঃ ৪১—পৃঃ ৪৫ + পৃঃ ৫৬—পৃঃ ৫৯)

3. Define instinct and its importance in education. (B. A. 1958, B. T. 1955, B. A. 1960)

Ans. (পৃঃ ৪১—পৃঃ ৪৫ + পৃঃ ৬৮—পৃঃ ৭৩)

4. The foundations of character, as recent Psychology has taught us, consists essentially in the instincts together with their accompanying emotions—Elaborate the statement. (B.A. 1955)

Ans. (পৃঃ ৬৮—পৃঃ ৭২)

5. How is habit distinguished from instinct ? (B. A. 1955, B. A. 1963, B. T. 1960)

Ans. (পৃঃ ৬০—পৃঃ ৬২)

6. What are instincts ? How far are they universal in their character ? What is their importance in the education of human beings ? How can they be modified ? (B. T. 1951, 1960)

Ans. (পৃঃ ৪১—পৃঃ ৪৫ + পৃঃ ৬৮—পৃঃ ৭৩)

7. How is the knowledge of instinct so essential for an educator ? "The whole task of education is to sublimate the instincts." Explain. (B.T. 1952)

Ans. (পৃঃ ৬৮—পৃঃ ৭৩)

8. What are instincts ? How are they important in education ? (B.T. 1953)

Ans. (পৃঃ ৪১—পৃঃ ৪৫ + পৃঃ ৭৫—পৃঃ ৭৭)

9. Distinguish between intelligence and instinctive beha viours and discuss whether instinct is the spring of all actions. (B.T 1956)

Ans. (পৃঃ ৫৩—পৃঃ ৫৬ + পৃঃ ৭৫—পৃঃ ৭৭)

10. How are the emotions related to instincts ? (B.T 1958)

Ans. (পৃঃ ৫৬—পৃঃ ৫৯)

11. What is an instinct ? Name a few principal instincts with a short description of each of them. How is instinct related to emotion ? (B.A 1962)

Ans. (পৃঃ ৪১—পৃঃ ৪৯ + পৃঃ ৫৬—পৃঃ ৫৯)

12. What is the difference between instinctive behaviour and intelligent behaviour ? How far is children's behaviour instinctive or otherwise ? (B. T. 1962)

Ans. (পৃঃ ৫৩—পৃঃ ৫৬ + পৃঃ ৭৫—পৃঃ ৭৭)

৪

মানব আচরণের উৎস (Sprfng of Human Behaviour)

মনোবিজ্ঞানের কাজ হল প্রাণীর আচরণ ব্যাখ্যা করা। অর্থাৎ বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রাণী অন্য কোনো ভাবে আচরণ না করে বিশেষ একভাবে আচরণ কেন করে তার কারণ নির্ণয় করা। এর জন্য আচরণের মূল বা উৎস কোথায় তা আবিষ্কার করা দরকার।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে এটি জানার প্রয়োজনীয়তা আরও অনেক বেশী। কেননা শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের একটি বড় কাজ হল শিশুকে কতকগুলো বাঞ্ছিত আচরণ শিখতে সাহায্য করা এবং তার প্রকৃতিদত্ত সম্ভাবনাগুলি যাতে পূর্ণ বিকাশলাভ করে তা দেখা। অতএব শিশুর আচরণের মূল বা উৎস কোথায় তা জানা প্রথমেই দরকার। এই জন্যই মানব-আচরণের উৎস নির্ণয়নই হল শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্ম্মসূচীর প্রথম সোপান।

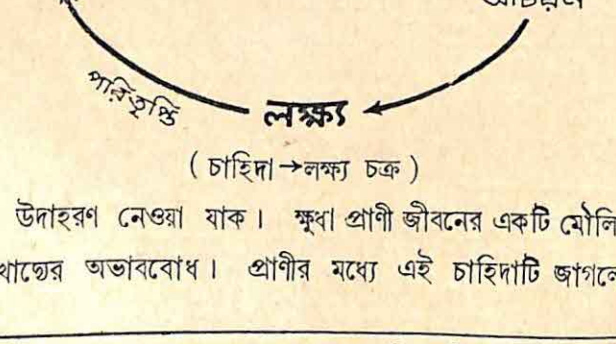
আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখেছি যে ম্যাকডুগাল প্রভৃতি প্রবৃত্তি-বাদীরা সহজাত প্রবৃত্তিকে প্রাণীর আচরণের প্রকৃত উৎস বলে বর্ণনা করেছেন এবং প্রাণীর সকল আচরণই প্রবৃত্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমরা এও দেখেছি যে মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যা অনেকখানি সত্য হলেও মানুষের ক্ষেত্রে এ মতবাদ সম্পূর্ণ অচল। তবে মানব-আচরণের প্রকৃত উৎস কোথায়?

মানব-আচরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর অপরিমিত পরিবর্ত্তনশীলতা ও অপরিসীম বৈচিত্র্য। বিবিধতার দিক দিয়ে মানব আচরণ সকল প্রকার গণনার বাইরে। যে কোন পরিণত ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে সম্পাদিত আচরণগুলি পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে সেগুলি যেমন সংখ্যাবহুল তেমনই বৈচিত্র্যময়। অথচ নবজাত শিশুর আচরণ সে তুলনায় অনেক স্বল্প ও সরল। শিশু যত বড় হয় ততই সে নতুন নতুন আচরণ শেখে এবং ততই তার আচরণ দিন দিন জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে।

এখন প্রশ্ন হল শিশুর এই নতুন আচরণ শেখার পশ্চাতে কিসের চাপ থাকে? কেন শিশু নিত্য নূতন আচরণ শিখে চলে? এক কথায় এর উত্তর হল শিশুর চাহিদা (need)। চাহিদা কথাটির অর্থ হল অভাব-বোধ। প্রাণী যখন কোন বিশেষ বস্তুর অভাব (want) বোধ করে তখন তার মধ্যে সেই বস্তুটির চাহিদা

(need) জাগে। আর যখনই সে সেই বস্তুটি পায় তখনই তার অভাব-বোধ দূর হয়ে যায়, এবং তার চাহিদাও থাকে না। এই চাহিদার জাগরণ আর চাহিদার তৃপ্তির মধ্যে আরও কয়েকটি স্তর আছে। প্রাণীর মধ্যে কোনও একটি বিশেষ চাহিদা জাগলে তার মধ্যে দেখা দেয় একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি (tension) এবং এই অস্বস্তিকর অনুভূতিই প্রাণীকে সক্রিয় করে তোলে। অর্থাৎ তার সেই অস্বস্তিকর অনুভূতিটি দূর করার জন্য প্রাণী আচরণ করতে সুরু করে। যতই এই চাহিদাটা অতৃপ্ত থেকে যায় ততই এই অস্বস্তিকর অনুভূতিটি বেড়ে চলে এবং প্রাণীও আচরণ করে চলে, চেষ্টা করে তার অভাবের বস্তুটি পেতে ও চাহিদা মেটাতে। বস্তুত প্রাণীর মধ্যে কোনোও চাহিদা জাগা মানে তার দেহমনোগত যে সাম্যাবস্থা (equilibrium)[১] পূর্ব্বে ছিল তা নষ্ট হয়ে যাওয়া। আর যতক্ষণ না এ সাম্যাবস্থা ফিরে আসে ততক্ষণ প্রাণীর প্রচেষ্টার শেষ হয় না। যে মুহূর্ত্তেই সে তার অভাবের বস্তুটি পেয়ে যায় তৎক্ষণাৎ তার চাহিদা দূর হয়ে যায় এবং অস্বস্তিকর অনুভূতি চলে গিয়ে তার দেহমনের লুপ্ত সাম্যাবস্থা ফিরে আসে।

প্রাণীর মধ্যে কোনো চাহিদার উৎপত্তি এবং বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে তার পরিতৃপ্তি অনেকটা চক্রের আকারে সংঘটিত হয়ে থাকে। নীচের ছবি থেকে এ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।



(চাহিদা→লক্ষ্য চক্র)

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। ক্ষুধা প্রাণী জীবনের একটি মৌলিক চাহিদা। এটি হল খাদ্যের অভাববোধ। প্রাণীর মধ্যে এই চাহিদাটি জাগলে দেখা দেয়

---

[১] স্বাভাবিক অবস্থায় মানবদেহের সমস্ত দিকগুলির মধ্যে একটা সাম্যাবস্থা বিরাজ করে। তাকে শরীরতত্ত্বের ভাষায় দেহসাম্য (homoestasis) বলা হয়।

একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি, যা থেকে জন্ম নেয় খাদ্য-অন্বেষণরূপ আচরণ। যতক্ষণ না খাদ্য পাওয়া যাচ্ছে এবং তার দ্বারা প্রাণীর ক্ষুধার চাহিদাটি মিটছে ততক্ষণ প্রাণীর আচরণ চলতে থাকে। আর যেই চাহিদাটি মিটে যায় সঙ্গে সঙ্গে আচরণও বন্ধ হয়ে যায়। প্রাণীর সমস্ত আচরণই এইভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে।

অতএব দেখা যাচ্ছে চাহিদাই প্রাণীর সমস্ত কার্য্যের প্রেষণা-শক্তি জুগিয়ে থাকে এবং এক কথায় চাহিদাই হল প্রাণী-আচরণের প্রধানতম উৎস।

মানব চাহিদার (Human Needs) প্রকৃতি

চাহিদাকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম জৈবিক চাহিদা (Physiological or Organic needs) আর দ্বিতীয় মানসিক চাহিদা (Psychological needs).

জৈবিক চাহিদা হল সেই সব চাহিদা যা ব্যক্তিকে তার দেহগত অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য মেটাতে হয়। যেমন, অক্সিজেনের চাহিদা, বিশেষ একটা তাপমাত্রার চাহিদা, খাদ্য-জল প্রভৃতির চাহিদা। এগুলি প্রধানত দেহের নানা যন্ত্রের অভাব বা প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য দেখা দিয়ে থাকে এবং এ থেকে উদ্ভূত আচরণ অপেক্ষাকৃত সরল ও সুনির্দ্দিষ্ট। এই চাহিদাগুলি সহজাত (innate) এবং সাধারণত যাকে আমরা প্রবৃত্তি (instinct) বলে থাকি এই চাহিদাগুলি সেই শ্রেণীর। এগুলিকে মৌলিক (primary) চাহিদাও বলা হয়ে থাকে। এই চাহিদাগুলি মোটামুটি সর্ব্বজনীন এবং এ থেকে উদ্ভূত আচরণগুলিও সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রায় একই রকমের।

শিশু জন্মাবার পর যে সকল আচরণ করে সেগুলি এই জৈবিক বা মৌলিক চাহিদাগুলির দ্বারাই মূলত নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তখন তার একমাত্র দ্রষ্টব্য কেমন করে তার দেহগত অভাবগুলি মিটিয়ে সে পৃথিবীতে টিকে থাকবে।

কিন্তু শিশু কিছুটা বড় হবার পর থেকেই জৈবিক অভাব ছাড়াও আরও কতকগুলি অভাব সে বোধ করতে থাকে। নিম্নশ্রেণী প্রাণীর সঙ্গে মানুষের একটা বড় পার্থক্য হল এই যে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের বাঁচাটা কেবলমাত্র দেহগত অর্থাৎ দেহের অভাব মেটাতে পারলেই তাদের কাজ শেষ হয়ে গেল, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বাঁচাটা দু রকমের—প্রথমত দেহগত, দ্বিতীয়ত সমাজগত। দেহগত চাহিদাগুলি

মেটাতে পারলেই দেহগত বাঁচার কাজ শেষ হল। কিন্তু সামাজিক বাঁচার জন্য তাকে আরও অনেক চাহিদা মেটাতে হবে। শিশু যতই বড় হতে থাকে ততই সে এই সামাজিক বাঁচার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে এবং ততই তার নিত্যনূতন অভাব-বোধ দেখা দেয়। তার কাছে ক্রমশঃ জৈবিক চাহিদার চেয়ে এই সামাজিক চাহিদাগুলির গুরুত্ব অধিক হয়ে ওঠে এবং কালক্রমে এই ক্রম-বর্দ্ধমান সামাজিক চাহিদাগুলি তার আচরণের প্রধান নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায়। এই রকম একটা সামাজিক চাহিদা হল সহপাঠীদের মহলে শিশুর নিজের স্বীকৃতিলাভের প্রয়োজনীয়তা। এই স্বীকৃতিলাভের জন্য শিশু নানা রকম আচরণ করতে পারে এবং অনেক সময় স্বচ্ছন্দে তার জৈবিক চাহিদাকেও অস্বীকার করে থাকে।

মানুষের সামাজিক চাহিদার সংখ্যা গুণে শেষ করা যায় না। এগুলি নিত্য বর্দ্ধমান ও পরিবর্ত্তনশীল। এগুলির প্রকৃতি পরিবেশের বিভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন। তবে সাধারণ সভ্য মানুষের সমাজে শিক্ষা ও কৃষ্টির সমতার জন্য পরিবেশের বেশ কিছুটা মিল আছে। সেজন্য দেখা গেছে অনেকগুলি চাহিদা প্রায় সমস্ত সভ্যসমাজের মানুষের মধ্যেই এক। সেগুলির একটা মোটামুটি তালিকা নীচে দেওয়া হল।

১। **বাঁচা ও দৈহিক নিরাপত্তার চাহিদা**—এ থেকে নানা রকমের আচরণের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, বিপজ্জনক কিছু থেকে পালান, নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লওয়া, খাদ্য-জল অনুসন্ধান করা, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, হাসপাতাল তৈরী করা, ওষুধ আবিষ্কার করা, স্বাস্থ্যবিভাগ স্থাপন করা, চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করা ইত্যাদি।

২। **স্বাচ্ছন্দ্যের চাহিদা**—এ থেকে উদ্ভূত আচরণ হল আর্থিক সঙ্গতি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, দারিদ্র্য থেকে দূরে থাকা, শারীরিক কষ্টকর বা মানসিক অস্বস্তিকর কিছু এড়িয়ে যাওয়া, চাকরি খোঁজা, অর্থ সঞ্চয় করা ইত্যাদি।

৩। **সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা**—যে সমাজে ব্যক্তি বাস করে সেই সমাজে তার একটা নিজস্ব ও স্বীকৃত স্থান থাকা প্রয়োজন। এর একটা অভিব্যক্তি হল শিশুর অপরের সঙ্গ খোঁজা ও নির্জ্জনতা পরিহার করা। শিশু যতই বড় হতে থাকে ততই তার মধ্যে পিতা-মাতা, বাড়ী, স্কুল প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা অধিকার-বোধ জাগতে থাকে। একে **অধিকৃতির চাহিদা** (Need for

Belongingness) বলা হয়। এই চাহিদা থেকেই পরে জন্মায় স্বদেশ, পূর্ব্বপুরুষ, ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ।

সমাজে স্বীকৃতি-লাভের এই চাহিদা থেকে বহু বিভিন্ন আচরণের উৎপত্তি হতে পারে। সমাজ যাতে ব্যক্তিকে স্বীকার করে নেয় এর জন্য ব্যক্তি সমাজ-সৃষ্ট নিয়ম-কানুন মেনে চলে এবং সমাজ-নিষিদ্ধ আচরণগুলি থেকে নিবৃত্ত থাকে। বন্ধুত্ব, ভালবাসা, প্রতিবেশীর প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি নানা আচরণ এই চাহিদা থেকেই জন্মায়।

৪। **আত্ম-স্বীকৃতির চাহিদা**—প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের সম্বন্ধে একটা মূল্য-বোধ আছে, সে মূল্য বেশীই হোক আর কম হোক। অপরের কাছে এই মূল্যের স্বীকৃতি পাওয়ার ইচ্ছাটাও মানুষের একটা মৌলিক চাহিদা। এই চাহিদার জন্যই শিশু পরীক্ষায় ভাল করার, খেলার মাঠে অপরকে হারিয়ে দেবার বা অন্য কোনও প্রচেষ্টায় নিজের পারদর্শিতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। বয়স্ক জীবনে ঐশ্বর্য্য লাভের, যশ-মান অর্জ্জনের বা অন্যান্য ক্ষেত্রে সাফল্যলাভের প্রচেষ্টা এই চাহিদারই অভিব্যক্তি। রাজনীতি, যুদ্ধ, রাষ্ট্র-জীবন বা ছোট বড় সামাজিক অনুষ্ঠানে যাঁরা নেতৃত্ব গ্রহণ করে থাকেন—তাঁদের আচরণ মূলত এই চাহিদা-প্রসূতই। আত্মসম্মানবোধ এই চাহিদারই অভিব্যক্তি এবং এই চাহিদার পরিতৃপ্তিতে জন্মায় আত্মশ্লাঘা।

৫। **নূতনত্বের চাহিদা**—পরিতৃপ্তি মানুষের কাম্য হলেও যে কোন বস্তুর অভাব পরিতৃপ্ত হলেই মানুষের আসে সেই পুরাতন বস্তুর প্রতি বিরাগ এবং নতুন বস্তু পাবার আকাঙ্ক্ষা। এই নতুনত্বের আকাঙ্ক্ষা নানা আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। নতুন জামা কাপড় তৈরী করা থেকে নতুন দেশ বিদেশ দেখা, নতুন কিছু সংগ্রহ করা, নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করা প্রভৃতি যে কোন নতুন অভিজ্ঞতালাভ এই পর্য্যায়ে পড়ে।

৬। **সক্রিয়তার চাহিদা**—সক্রিয়তা প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যে জীবনীশক্তি নিয়ে প্রাণী জন্মায় কেবলমাত্র বেঁচে থাকায় তার সবটা ব্যয়িত হয়ে যায় না। অবশিষ্ট শক্তি তখন প্রকাশ পায় নানা কাজ কর্ম্মের মধ্য দিয়ে। এই সক্রিয়তার চাহিদা থেকে জন্ম নিয়েছে শিল্প-কলা, সঙ্গীত, সাহিত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি। খেলাধূলা, উৎসব, ভ্রমণ প্রভৃতি এই চাহিদা থেকে জন্ম নেয়। শিশুর মধ্যে এ

চাহিদার প্রকাশ খুব বেশী দেখা যায় এবং এটিকে সৃজনমূলক পথে নিয়ে যেতে পারলে শিশুর সৃজনী-শক্তি সুষ্ঠু বিকাশলাভ করতে পারে।

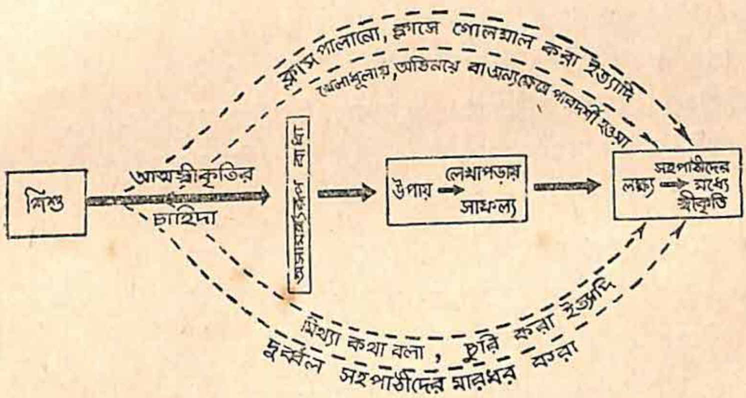
৭। **স্বাধীনতার চাহিদা**—ইচ্ছামত কথা বলা, কাজ করা এবং চলা ফেরার স্বাধীনতার চাহিদাও মানুষের মৌলিক। এ চাহিদা থেকে জন্মায় সকল রকম বন্ধন, শাসন, নিয়ম-শৃঙ্খলা, বিধি-নিষেধ থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রচেষ্টা। সাধারণত স্কুলে বা বাড়ীতে এই চাহিদার প্রতি সুবিচার করা হয় না এবং শিক্ষার পরিবেশকে বিধি-নিষেধের দ্বারা এমনভাবে শৃঙ্খলিত করে ফেলা হয়, যার ফলে শিশু সেই পরিবেশকে এড়িয়ে চলে। নতুন কিছু করা, নতুন জিনিষ সৃষ্টি করা, কোন নতুন চিন্তা করা—এসবই মূলত এই চাহিদারই অভিব্যক্তি।

৮। **যৌনতৃপ্তির চাহিদা**—এ চাহিদাটি মূলত জৈবিক এবং যৌন-উত্তেজনার তৃপ্তি এই চাহিদার লক্ষ্য। যৌনমূলক সকল আচরণই এই চাহিদাপ্রসূত। পূর্ব্বরাগ, বিবাহ, দাম্পত্য-জীবন যাপন প্রভৃতি আচরণ এই পর্য্যায়ে পড়ে। শিশুর ক্ষেত্রে এই চাহিদাটি সাধারণত যৌন-কৌতূহল ও যৌন-জিজ্ঞাসা রূপে দেখা দেয়।

শিশুর চাহিদা ও শিক্ষা (Child's Needs & Educatfon)

আমরা দেখেছি যে চাহিদা থেকে জন্মায় আচরণ এবং সে আচরণের বিরতি ঘটে চাহিদার তৃপ্তিতে। এখন যদি শিশুর কোন বিশেষ চাহিদার তৃপ্তি লাভ না ঘটে তবে চাহিদাজনিত যে অস্বস্তিকর উত্তেজনা তার মধ্যে সৃষ্ট হয়েছিল তা কখনই দূর হবে না, বরং ক্রমশঃ বেড়েই চলে। এর ফলে শিশু তার চাহিদা মেটানোর জন্য আরও নানারকম আচরণ করে চলবে। তার পরিচিত ও অভ্যস্ত আচরণগুলি শেষ হয়ে গেলে সে নূতন ও অনভ্যস্ত আচরণ করে দেখবে যে তার চাহিদা সে মেটাতে পারে কিনা এবং যতক্ষণ না আংশিক বা বিকৃতভাবেও তার চাহিদা সে মেটাতে পারছে ততক্ষণ সে চেষ্টা করতে ত্রুটি করবে না। ফলে দেখা গেছে যে শিশুর মধ্যে নানারূপ অদ্ভুত আচরণের সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণত পিতামাতা বা শিক্ষকেরা এই আচরণগুলির যথার্থ কারণ নির্ণয় করতে পারেন না এবং মনে করেন যে দুষ্টবুদ্ধি বা খামখেয়ালের জন্যই শিশু এই রকম আচরণ করছে। প্রকৃতপক্ষে যাকে আমরা সাধারণত সমস্যামূলক আচরণ (problem behaviour)

বলে থাকি সেটি স্বাভাবিক পন্থায় চাহিদার তৃপ্তি করতে না পারায় অস্বাভাবিক পথে তৃপ্তি করার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত সম্পূরক (compensatory) আচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছন যখন শিশুর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে তখন সে সেই লক্ষ্যের স্থানে একটা বিকল্প লক্ষ্য (substituted goal) স্থাপন করে এবং সেই বিকল্প লক্ষ্যে পৌছনর মধ্যে দিয়ে নিজের চাহিদাটী তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। পরিবেশের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে এই খাপ খাওয়াতে না পারাকে অপসঙ্গতি (maladjustment) বলে এবং এই ধরনের শিশুদের অপসঙ্গত (maladjusted) শিশু বলা হয়।



[স্বাভাবিক পথে চাহিদা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় শিশুর নানাবিধ সম্পূরক আচরণ]

যেমন, স্কুল-পরিবেশে সহপাঠীদের মধ্যে শিশুর আত্মস্বীকৃতি লাভের স্বাভাবিক পথ হল লেখাপড়ায় উৎকর্ষ দেখান। এখন কোন কারণে যদি একটি বিশেষ শিশু এ চাহিদাটি তৃপ্ত করতে না পারে তখন সেই শিশু সম্পূরক আচরণের আশ্রয় নেবে, যেমন ক্লাসে গোলমাল করা, ক্লাস পালান, মারামারি করা, মিথ্যা-কথা বলা, চুরি করা ইত্যাদি। এ সকল আচরণের সাহায্যে যে স্বীকৃতি সে সহজ উপায়ে পেল না সেই স্বীকৃতি সে অস্বাভাবিক পন্থায় পাবার চেষ্টা করবে। অবশ্য সব সময়েই সম্পূরক আচরণটি যে আ বাঞ্ছিত হবে তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে এই প্রতিকল্প আচরণ আবার ভালও হয়। যেমন যে ছেলে লেখাপড়ায় ভাল হতে পারল না, সে হয়ত খেলাধূলায়, অভিনয়ে বা ডিবেটে সুনাম কিনে তার ঈপ্সীত আত্মস্বীকৃতি আদায় করল।

অতএব দেখা যাচ্ছে চাহিদার সহজ ও স্বাভাবিক তৃপ্তি হল শিশুর সুষ্ঠু ব্যক্তিসত্তা গঠনের একমাত্র উপায়। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রথম ও প্রধান শিক্ষা হল এই যে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখার জন্যে যাতে তার চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত হয় তা দেখা। এই মহৎ সত্য থেকেই জন্ম নিয়েছে বর্ত্তমান শতাব্দীর শিক্ষাকে শিশুর চাহিদা-কেন্দ্রিক (need-centred) করে তোলার বিশ্বব্যাপী আন্দোলন।

এদিক দিয়ে শিক্ষকের করণীয় অনেক কিছু আছে।*

প্রথমত শিশুর চাহিদাগুলি যাতে অনর্থক বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। অবশ্য সমস্ত চাহিদার পূর্ণ-তৃপ্তি সম্ভব নয়। সে সকল ক্ষেত্রে যাতে শিশু বঞ্চিত সম্পূরক আচরণ গ্রহণ করে সেদিকে যত্ন নিতে হবে।

দ্বিতীয়ত শিক্ষার পরিবেশকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিশুর চাহিদাগুলি তৃপ্তিলাভের অবকাশ পায়। ধরা যাক, শিশুর সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা। এই চাহিদাটির তৃপ্তির উপর শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ অনেকখানি নির্ভর করে। স্কুল পরিবেশটি এমন হবে যেখানে শিশু সহজভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে এবং অন্যান্য সহপাঠীদের সঙ্গে মিলে-মিশে সমগ্র পরিস্থিতির মধ্যে নিজের একটা সুনির্দ্দিষ্ট স্থান বেছে নিতে পারে। সেইরকম তার আত্ম-স্বীকৃতির চাহিদা। এ চাহিদাটার তৃপ্তির ব্যবস্থাও স্কুলে করতে হবে। কেবল-মাত্র লেখাপড়ায় ভাল হলে স্বীকৃতি দেওয়ার সংকীর্ণ ব্যবস্থা যে সকল স্কুলে আছে সে সকল স্কুলে বহু শিশুরই আত্মস্বীকৃতির চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যায়। সেইজন্য স্কুলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা দেখিয়ে স্বীকৃতিলাভের ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে সকল প্রকার প্রতিভাসম্পন্ন শিশুই তার প্রাপ্য স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত না হয়। শিশুর নতুনত্বের চাহিদা এবং সক্রিয়তার চাহিদা যাতে যথাযথ পরিতৃপ্তি লাভ করে তার যথেষ্ট ব্যবস্থা স্কুলে রাখতে হবে। খেলাধূলা, অভিনয়, অঙ্কন, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি নানা নতুন ও সৃজনমূলক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশুর এই অতিপ্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি যাতে তৃপ্তিলাভ করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

তৃতীয়ত মনে রাখতে হবে যে শিশুর সমস্যামূলক আচরণের প্রকৃত কারণ

* শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের তৃতীয় খণ্ডে 'মানসিক স্বাস্থ্যবিধি' পর্য্যায়টী দ্রষ্টব্য।

হল চাহিদার অতৃপ্তি। অতএব যদি কোন অবাঞ্ছিত আচরণকে দূর করতে হয় তবে আচরণের চিকিৎসা না করে তার মূল কারণ যে অতৃপ্ত চাহিদা তার চিকিৎসা করতে হবে। আধুনিককালে যেসব শিশু চিকিৎসাগার বা শিশু পরিচালনাগার (Child Guidance Clinic) স্থাপিত হয়েছে সেগুলির কর্ম্মসূচী মূলত এ নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্নাবলী

1. What is a need? How does it influence human behaviour? How many kinds of needs are there?

Ans. (পৃঃ ৭৬—পৃঃ ৮২)

2. Distinguish between needs and instincts. In what ways does the concept of need excel the traditional concept of instinct in explaining human behaviour?

Ans. (পৃঃ ৭৬—পৃঃ ৮৯)

3. What are the springs of human behaviour—needs or instincts? Discuss elaborately.

Ans. (পৃঃ ৭৬—পৃঃ ৮২)

4. Give a short description of the major human needs. Show how they form the very foundation of human personality.

Ans. (পৃঃ ৭৮—পৃঃ ৮২)

5. How can a school environment help the satisfaction of the basic needs of a child and ensure the development of a healthy personality?

Ans. (পৃঃ ৭৮—পৃঃ ৮২)+(৩য় খণ্ড : মানসিক স্বাস্থ্যবিধি—পৃঃ ৩১—পৃঃ ৩৪)

6. What is a problem behaviour? How does it originate? What should be the approach of a teacher in handling such behaviours?

Ans. (পৃঃ ৮০—পৃঃ ৮২)+(৩য় খণ্ড : মানসিক স্বাস্থ্যবিধি—পৃঃ ৮—পৃঃ ৩৪)

7. How would you distinguish between human instincts and needs? What is the importance of instincts in education? (B. A. 3yr. 1962)

Ans. (পৃঃ ৭৬—পৃঃ ৮০ + পৃঃ ৬৮—পৃঃ ৭৩)

৫

বুদ্ধির স্বরূপ (Nature of Intelligence)

বুদ্ধি একটি মানসিক শক্তি বিশেষ। অন্যান্য অমূর্ত্ত বস্তুর মত বুদ্ধিরও সংজ্ঞা দেওয়া শক্ত, যদিও খ্যাত অখ্যাত বহু মনোবিজ্ঞানী এর একটা সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য কোনও সংজ্ঞাই আজ পর্য্যন্ত সর্ব্ববাদীসম্মত বলে মেনে নেওয়া হয় নি।

বুদ্ধির উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্ত্তনের ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করলে বুদ্ধির স্বরূপ সম্বন্ধে বেশ কিছুটা জানা যাবে। প্রাণীবিকাশের আদিমতম স্তরে বুদ্ধি বলে কোনো বস্তু ছিল না বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি-বিধানে প্রাণীর একমাত্র অস্ত্র ছিল তার প্রবৃত্তি। খাদ্য-অন্বেষণ, বিপদ থেকে আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা প্রভৃতি বেঁচে থাকার প্রাথমিক কাজগুলি প্রবৃত্তির দ্বারাই সংঘটিত হত। কিন্তু পরিবেশ যত জটিল হতে সুরু করল ততই প্রবৃত্তির কর্ম্মক্ষমতা কমে আসতে লাগলো। তখন জীবনযুদ্ধে নতুন ও অধিকতর শক্তিশালী অস্ত্ররূপে দেখা দিল বুদ্ধি। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে বুদ্ধির প্রাথমিক কাজ হল জটিল এবং নূতন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে প্রাণীকে সাহায্য করা এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বুদ্ধির উৎপত্তি।

প্রবৃত্তির কাজ পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে প্রাণীকে সাহায্য করা, কিন্তু যেখানে প্রবৃত্তি ব্যর্থ হয় সেখানে বুদ্ধি সফল হয়। তার কারণ হল বুদ্ধির ব্যাপক পরিবর্ত্তনশীলতা। প্রবৃত্তির প্রচেষ্টা যান্ত্রিক এবং সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এর কাজ সীমাবদ্ধ। বুদ্ধির প্রচেষ্টা বৈচিত্র্য-ধর্ম্মী এবং কার্য্য-পরিধি সীমাহীন।* নতুন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে প্রাণীকে সাহায্য করা যে বুদ্ধির সর্ব্বপ্রথম কাজ এটা সকল মনোবিজ্ঞানীই মেনে নিয়েছেন। বার্ট (Burt) বলেছেন যে বুদ্ধি হচ্ছে দেহ-মনের নতুন সম্বন্ধ স্থাপনার মাধ্যমে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা। ষ্টার্নের (Stern) মতে নতুন পরিস্থিতি এবং সমস্যার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর সাধারণ ক্ষমতা হল বুদ্ধি। গডার্ড (Goddard) বলেন যে প্রাণীর আসন্ন সমস্যার সমাধান ও ভবিষ্যৎ সমস্যা ধারণা করতে বুদ্ধি সাহায্য করে।

* প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির তুলনা—পৃঃ ৫৩—পৃঃ ৫৬

এখন কথা হল, বুদ্ধির কোন বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিবর্ত্তিত পরিবেশের সঙ্গে এই উন্নততর সঙ্গতিবিধান করা বুদ্ধির পক্ষে সম্ভব হয় অথচ সেটা সম্ভব হয় না প্রবৃত্তির পক্ষে। তার উত্তর হল, বুদ্ধি কর্তৃক মনের চিন্তা-শক্তির অধিকতর ও উন্নততর ব্যবহার। চিন্তন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে এটি আমাদের বাহ্যিক মূর্ত্ত আচরণের একটি মানসিক ও অমূর্ত্ত রূপ। অর্থাৎ যখন সত্যকারের "কলকাতা থেকে দিল্লী যাওয়া" কাজটা আমরা মনে মনে সম্পন্ন করি তখনই আমরা বলি যে 'কলকাতা থেকে দিল্লী যাওয়া' সম্বন্ধে চিন্তা করছি। অথচ মনে মনে কাজটা করার ফলে আমাদের সময় ও পরিশ্রম অনেক কম লাগছে এবং কোনরূপ পার্থিব বাধা আমাদের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। আর সত্যকার কলকাতা থেকে দিল্লী যেতে যে সময়টা লাগত সেই সময়ের মধ্যে ঐরকম লক্ষ লক্ষ চিন্তা করে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব। বুদ্ধিই চিন্তন-প্রক্রিয়ার এই অপরিমিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে বাস্তব সমস্যার সমাধানে কাজে লাগায়। যখন প্রাণী কোনও একটা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন সেই সমস্যা সমাধানের যত রকম সম্ভাব্য পন্থা আছে সেগুলি সে চিন্তা-শক্তির সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখতে পারে এবং তার মধ্যে যেটিকে সবচেয়ে ভাল বলে মনে হয় সেটিকে সে তার সমস্যা-সমাধানে নিয়োজিত করতে পারে। একেই বলে বুদ্ধির প্রয়োগ। প্রবৃত্তি চিন্তা-শক্তির সাহায্য নেয় না বলেই তার প্রচেষ্টা নূতনত্ববিহীন, চিরনির্দ্দিষ্ট ও যান্ত্রিক।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে বুদ্ধি হল সেই মানসিক ক্ষমতা যেটা চিন্তনপ্রক্রিয়ার উন্নততর ব্যবহার করতে পারে এবং বাস্তব সমস্যা-সমাধানে তাকে নিয়োজিত করে থাকে। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী টারম্যান (Terman) বুদ্ধির অনেকটা এই ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে বুদ্ধি হল অমূর্ত্ত বা বস্তুবিবর্জ্জিত (abstract) চিন্তা করার ক্ষমতা। কিন্তু কেবলমাত্র অমূর্ত্ত চিন্তার উপর জোর দিলেই বুদ্ধির কাজের সবটুকু বলা হল না। অমূর্ত্ত চিন্তন যে বুদ্ধির একটা বড় বৈশিষ্ট্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু বুদ্ধি-জাত চিন্তার আর একটা বৈশিষ্ট্য হল এর সম্বন্ধ-নির্ণয়ের ক্ষমতা। দুটি বা দু'য়ের বেশী বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করাও হচ্ছে বুদ্ধির কাজ। যে কোন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান পেতে হলে সেই সমস্যার অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্বন্ধ-নির্ণয় আগে করতে হয়। এই সম্বন্ধ-নির্ণয়নও বুদ্ধির সাহায্য ছাড়া হয় না। অতএব বুদ্ধিকে সম্বন্ধ-ঘটিত চিন্তা করার ক্ষমতা বলেও বর্ণনা করা যেতে পারে।

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী স্পীয়ারম্যানের (Spearman) দেওয়া বুদ্ধির সংজ্ঞায় সম্বন্ধনির্ণয়কেই বড় করা হয়েছে। তাঁর মতে বুদ্ধি বলতে বোঝায় ত্রিবিধ শক্তি, যথা

(ক) অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ন (apprehension of experience)

(খ) সম্বন্ধের নির্ণয়ন (eduction of relation)

(গ) সম-সম্বন্ধ-বোধকের নির্ণয়ন (eduction of correlates)

স্পীয়ারম্যান মনের এই ত্রিবিধ প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন জ্ঞান-বিকাশের সূত্র (Noegenetic laws)। তাঁর মতে আমাদের সমস্ত জ্ঞানই এ ত্রিবিধ পন্থায় অর্জ্জিত হয়ে থাকে।ক

এতেও কিন্তু বুদ্ধির সমস্ত বৈশিষ্ট্য বলা হয়ে গেল না। বুদ্ধির আর একটা কাজ হল পরিস্থিতির প্রয়োজনীতা অনুযায়ী দেহ-মনের সব চেয়ে ভাল সংগঠন (organisation) সম্পন্ন করা। এর জন্য প্রয়োজন মনের সমস্ত দিকগুলোর সমন্বয়-সাধন করা এবং সেই লব্ধ সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিবেশের যোগ্যতম প্রতিক্রিয়া নির্ণয় করা। প্রাণী যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন বুদ্ধি তার বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে একটা সমন্বয় এনে সেগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে আসন্ন সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত করে। গেষ্টাল্ট (Gestalt) মতবাদী মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধির এই মানসিক সংগঠন করার ক্ষমতার উপরই সব চেয়ে বেশী জোর দিয়েছেন।

এই থেকে আমরা বুদ্ধির আরও একটা প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যে যেতে পারি। সেটি হচ্ছে বুদ্ধির পৃথকীকরণ (abstraction) এবং সামান্যীকরণ (generalisation) করার ক্ষমতা। কোনও বস্তু থেকে অপ্রয়োজনীয় গুণ বা গুণাবলী বাদ দিয়ে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় গুণটি বা গুণগুলি আলাদা করে নেওয়ার নাম হল পৃথকীকরণ এবং সেই পৃথকীকৃত গুণ বা গুণগুলি সেই বস্তুর সমশ্রেণীভুক্ত আর সকলের মধ্যে আছে বলে সিদ্ধান্ত করা'র নাম হলো সামান্যীকরণ। বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে ধারণা (concept) তৈরী করতে এই প্রক্রিয়া দুটি অপরিহার্য্য।

বুদ্ধির আর একটি কাজ হল বিচার-করণে (reasoning) সাহায্য করা। সমস্যার সমাধান এবং সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌছতে বিচার-করণ হল একমাত্র পন্থা। বিচার-করণ আবার দু'প্রকারের হতে পারে—আগমন (induction) এবং নিগমন (deduction)। প্রথম পদ্ধতিতে আমরা বিশেষ বিশেষ ঘটনা দেখে সামান্য

ক Psychology Down The Ages :—Spearman

সত্যে পৌঁছই এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সামান্য সত্য থেকে বিশেষ সত্যে আসি। দু'রকম বিচারপদ্ধতিই আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

বুদ্ধি এবং জ্ঞান (knowledge) কিন্তু এক নয়। যা প্রাণী শিক্ষার মাধ্যমে লাভ করে তার নাম জ্ঞান। কিন্তু বুদ্ধি হল একটি ক্ষমতা। বরং একে বলা যেতে পারে সেই মানসিক ক্ষমতা যেটা অতীতের লব্ধ জ্ঞানকে বর্ত্তমানের সমস্যা সমাধানে নিযুক্ত করে থাকে। কেবলমাত্র জ্ঞান থাকলেই সমস্যার সমাধান করা যায় না। তার যথাযোগ্য প্রয়োগ করতে না পারলে সমস্যা সমস্যাই থেকে যায়। বুদ্ধিই অতীতে শেখা জ্ঞানকে বর্ত্তমানে কাজে লাগাতে পারে।

ক্ষিপ্রতার (speed) সঙ্গেও বুদ্ধির একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বুদ্ধিজাত চিন্তা যে কেবলমাত্র কার্য্যকারিতার দিক দিয়ে উৎকৃষ্ট তা নয়, এর ক্ষিপ্রতাও উল্লেখযোগ্য। যে কোনো মানসিক কাজ সম্পন্ন করার ক্ষিপ্রতা বুদ্ধির উপর নির্ভর করে বলে বিশ্বাস করা হয়।

বুদ্ধির সংজ্ঞা (Definition of Intelligence)

অতএব দেখা যাচ্ছে যে বুদ্ধি বলতে আমরা বুঝি এমন একটি **মানসিক ক্ষমতা** যা আমাদের সমর্থ করে করতে —

১। **নূতন এবং পরিবর্ত্তিত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন,**

২। **চিন্তন-শক্তির উন্নততর ব্যবহার,** যার মধ্যে আবার অন্তর্গত

(ক) অমূর্ত্ত (abstract) চিন্তন

(খ) সম্বন্ধ-ঘটিত (relational) চিন্তন

(গ) পৃথকীকরণ (abstraction) ও সামান্যীকরণ (generalisation)

(ঘ) বিচার-করণ (reasoning) যা আবার দু'প্রকারের,

(i) নিগমনমূলক (deductive)

(ii) আগমনমূলক (inductive)

৩। **সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়াগুলির সুষ্ঠু সংগঠন (organisation),**

৪। **অতীত জ্ঞানকে বর্ত্তমান-সমস্যার সমাধানে নিয়োজন এবং**

৫। **মানসিক কার্য্যের দ্রুত সম্পাদন।**

যদিও বুদ্ধির একবাক্যে সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়, তবু বুদ্ধির এই বর্ণনাটি প্রায় সম্পূর্ণ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বুদ্ধির বিভিন্ন তত্ত্ব (Theories of Intelligence)

বুদ্ধি বলতে আমরা যা বুঝি সেটি একটি ক্ষমতা না একাধিক ক্ষমতা, এ প্রশ্ন নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ আছে। সাধারণত এ সম্বন্ধে তিন শ্রেণীর বিভিন্ন ধারণা প্রচলিত আছে। প্রথম ধারণা অনুযায়ী বুদ্ধি একটা একক ক্ষমতা, যার অধীনে ও পরিচালনায় মনের অন্যান্য ক্ষমতাগুলি কাজ করে থাকে। বুদ্ধি যেন রাজা-বিশেষ এবং অন্যান্য ক্ষমতাগুলি তার প্রজার মত। এই ধারণাকে রাজতন্ত্রমূলক বলা চলতে পারে। দ্বিতীয় ধারণায়, বুদ্ধিকে একটি প্রধান ক্ষমতা বলে বর্ণনা না করে কতকগুলি ক্ষমতার সমন্বয় বলে কল্পনা করা হয়েছে। এই কয়েকটি ক্ষমতা সম্মিলিতভাবে সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়া পরিচালিত করে। এই ধারণাটিকে অভিজাততন্ত্র-মূলক বলা যেতে পারে। তৃতীয় ধারণায় বুদ্ধি বলে কোন একটি বা কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতার অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া হয় নি। তার পরিবর্তে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষমতার অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়েছে এবং এদের মিলিত শক্তিকেই বুদ্ধি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ধারণাকে বুদ্ধির গণতন্ত্রমূলক ধারণা বলা যেতে পারে।

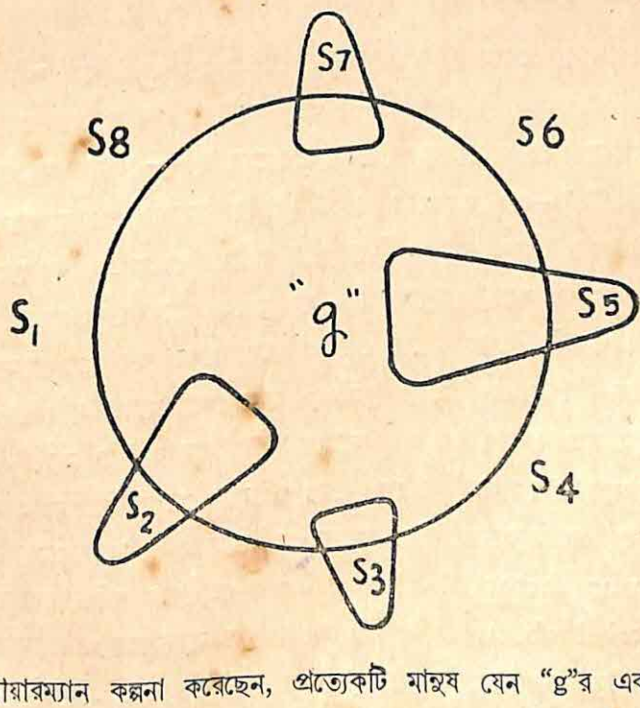
বুদ্ধি সম্বন্ধে উপরের ত্রিবিধ ধারণা বহুদিন ধরেই প্রচলিত আছে এবং গবেষণা-ভিত্তিক না হওয়ায় এই মতবাদগুলিকে এতদিন নিছক অনুমান-প্রসূত বলে মনে করা হত। কিন্তু আধুনিক কালের বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে বুদ্ধি সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ পাওয়া গেছে তার মধ্যেও অনুরূপ তিন শ্রেণীর বিভাগ দেখা যায়।

নীচে বুদ্ধির উপর তিনটি প্রসিদ্ধ মতবাদের বর্ণনা করা হলো—

(ক) স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব (Spearman's Two Factor Theory)

প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী স্পীয়ারম্যানই প্রথম বুদ্ধি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা-প্রসূত একটি মতবাদ উপস্থাপিত করেন। তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের সমস্ত কাজের (যার মধ্যে কিছু না কিছু মনের সক্রিয়তা আছে) পেছনে দু'রকম

মানসিক শক্তির নিয়োগ আছে। একটা হচ্ছে সাধারণ শক্তি (general ability), যার নাম দিয়েছেন তিনি "g" এবং আর একটি বিশেষ শক্তি, যার নাম দিয়েছেন তিনি "s"। এই "g" শক্তিটি সর্ব্বগামী, অর্থাৎ সমস্ত কাজেই তার প্রয়োগ লাগবেই, যদিও অবশ্য নিয়োজিত "g"র পরিমাণ সব কাজে এক হবে না। আর "s" হল কোন কাজের পক্ষে একটি বিশেষ শক্তি, সেই কাজটি ছাড়া অন্য কাজে সেই "s"টির প্রয়োগ হবে না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক কাজের জন্য একটা আলাদা "s" আছে যেমন পড়ার "s", অঙ্ক কষার "s", বিচার করার "s" ইত্যাদি। যেহেতু বিবিধতার দিক দিয়ে কাজ অসংখ্য রকমের হতে পারে, সেহেতু সংখ্যার দিক দিয়ে "s"ও গণনাতীত। "g" কিন্তু একটি, যদিও এর প্রবেশ সর্ব্বত্র এবং কম হোক বেশী হোক এর প্রয়োগ অপরিহার্য্য।



স্পায়ারম্যান কল্পনা করেছেন, প্রত্যেকটি মানুষ যেন "g"র একটি নিজস্ব ভাণ্ডার নিয়ে জন্মায়, যা থেকে কোন কিছু করার সময় সে কিছু পরিমাণ "g" নেয় এবং তার সঙ্গে সেই কাজের বিশেষ "s"টি যোগ করে দিয়ে সে সেই কাজটি সম্পন্ন করে। যেমন—

"পড়া"রূপ কাজ করতে লাগে "g"র কিছুটা + পড়ার "s"

"অঙ্ক কষা"রূপ কাজ করতে লাগে "g"র কিছুটা+অঙ্ককষার "s" ইত্যাদি

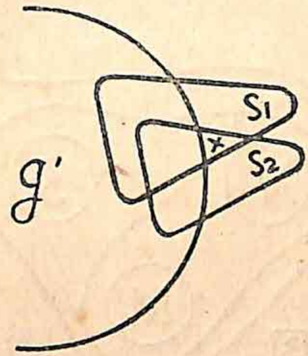
স্পীয়ারম্যানের এ মতবাদটি উপরের ছবির মাধ্যমে পরিষ্কার বোঝান যায়।

দেখা যাচ্ছে যে স্পীয়ারম্যানের এই মতবাদ অনুযায়ী আমাদের সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়ার মূলে দুটি উপাদান (Factor) বর্ত্তমান। সেইজন্য এই মতবাদটিকে দ্বি-উপাদান (Two-Factor) তত্ব বলা হয়।

বুদ্ধি সম্বন্ধে প্রাচীন রাজতন্ত্রমূলক ধারণার সঙ্গে স্পীয়ারম্যানের এই তত্ত্বটির তুলনা করা যায়। কিন্তু প্রচলিত ধারণার মত স্পীয়ারম্যানের এই মতটি নিছক অনুমান-প্রসূত নয়। বিভিন্ন মানসিক কার্য্যের মধ্যে সহ-পরিবর্ত্তনের (correlation) মান নির্ণয় এবং জটিল গাণিতিক গণনার সাহায্যেই স্পীয়ারম্যান তাঁর এই প্রসিদ্ধ তত্ত্বে পৌছতে পেরেছেন।

দ্বি-উপাদান তত্ত্বের যে বর্ণনা উপরে দেওয়া হল সেটি হল স্পীয়ারম্যানের প্রাথমিক ব্যাখ্যা। কিন্তু শীঘ্রই এই ব্যাখ্যার অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ল। স্পীয়ারম্যানের মতে মানসিক শক্তি দু'প্রকারের, "g"—যা সব কাজের পেছনে থাকে, এবং "s"—যা কেবলমাত্র একটি বিশেষ কাজের পেছনে থাকে। এর মাঝামাঝি আর কিছু নেই। কিন্তু পরে পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হল যে এমন কতকগুলি শক্তি আছে যা "g"র মত সব কাজে লাগে না বটে তবে "s"র মত কেবলমাত্র একটি বিশেষ কাজে লেগেও তার কাজ শেষ হয়ে যায় না। এই শক্তিগুলিকে বিশেষ এক শ্রেণীর (group) কাজ সম্পন্ন করার সময় দেখা যায়। এরা "g"র মত সর্ব্বজনীনও নয় আবার "s"র মত সঙ্কীর্ণও নয়। এককথায় এরা "g" আর "s"র মাঝামাঝি এক ধরনের শক্তি। যেহেতু বিশেষ এক শ্রেণীর কাজের সময় এগুলি কার্যকরী হয়, সেহেতু এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে শ্রেণীগত শক্তি (group factor)। এই রকম একটা শ্রেণীগত শক্তি হল ভাষামূলক শক্তি (verbal ability)। এটিকে "g"র মত সব কাজে পাওয়া যায় না বটে তবে ভাষাঘটিত যত রকম কাজ আছে (যেমন পড়া, লেখা, মুখস্থ করা, বিচার করা ইত্যাদি) সেগুলির সবের মধ্যেই এটিকে কিছু না কিছু পরিমাণে পাওয়া যাবে। যেমন পরের পাতার ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম কাজে $g+s^1$ লেগেছে এবং দ্বিতীয় কাজে $g+s^2$ লেগেছে। কিন্তু তা ছাড়া আরও একটি শক্তি (× চিহ্নিত) এই দুটি কাজের মধ্যে সমভাবে বর্ত্তমান। প্রথমটি যদি 'লেখা' রূপ কাজ হয় এবং

দ্বিতীয়টি যদি 'মুখস্থ করা' হয় তবে এদের উভয় ক্ষেত্রেই শ্রেণীগত শক্তিরূপে থাকবে 'v' বা ভাষামূলক শক্তি।



এই রকম আরও কয়েকটি শ্রেণীগত শক্তির নাম হল গাণিতিক শক্তি (numerical ability or n), যান্ত্রিক শক্তি (mechanical ability or m) ইত্যাদি।

(খ) থার্ষ্টোনের মৌলিক শক্তিতত্ত্ব (Thurstone's Primary Ability Theory)

প্রসিদ্ধ মার্কিন মনোবিজ্ঞানী থার্ষ্টোন বুদ্ধি বলে কোন একক শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তার পরিবর্তে তিনি সাতটি মৌলিক শক্তির (Primary ability) উল্লেখ করেছেন, যেমন,

১। ভাষাবোধ (Verbal Comprehension বা V)

২। সংখ্যা ব্যবহার (Number Facility বা N)

৩। স্মরণ (Memory বা M)

৪। আগমনমূলক বিচারকরণ (Inductive Reasoning বা R)

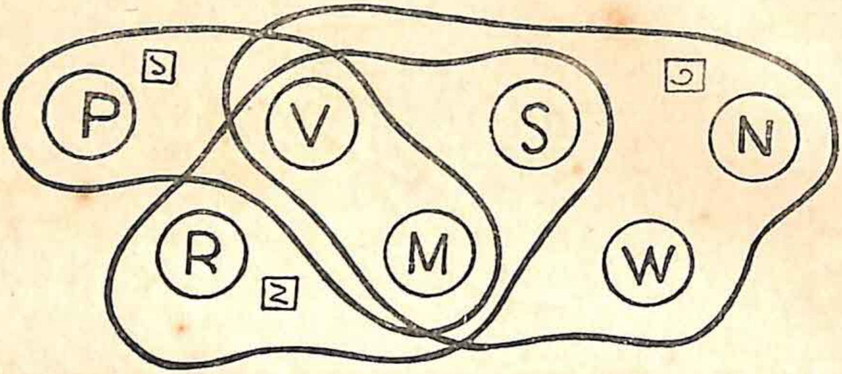
৫। উপলব্ধিমূলক শক্তি (Perceptual Ability বা P)

৬। অবস্থান-মূলক ধারণা (Space বা S)

৭। ভাষা উৎকর্ষ (Word Fluency বা W)

থার্ষ্টোনের মতে যাকে আমরা বুদ্ধি বলে থাকি সেটি আসলে ওপরের এই মৌলিক শক্তি কয়টির সম্মিলিত রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য সব কয়টি

শক্তিই যে সব কাজেতে দরকার হয় তা নয়। এই সাতটি শক্তির মধ্যে কখনও বিশেষ কয়েকটি একত্রিত হয়ে একটি কাজ করে, আবার আর কয়েকটি একত্রিত হয়ে অন্য আর একটি কাজ করে। নীচের ছবিতে থার্স্টোনের তত্ত্বটির একটি নক্সা দেওয়া হল।



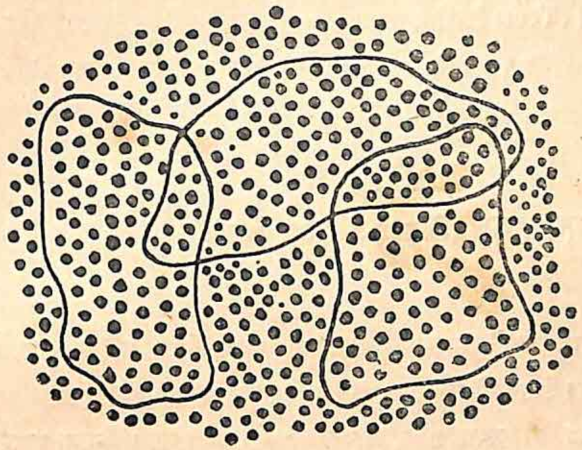
এখানে কল্পনা করা হচ্ছে যে ১নং কাজে লাগলো ভাষাবোধ (V), স্মৃতি (M) এবং উপলব্ধি শক্তি (P); আবার ২নং কাজে লাগলো ভাষাবোধ (V), স্মৃতি (M), অবস্থান-ধারণা (S) এবং বিচার-করণ (R)। আবার ৩নং কাজে লাগছে ভাষাবোধ (V), স্মৃতি (M), অবস্থান-ধারণা (S), সংখ্যা-ব্যবহার (N) এবং শব্দ ব্যবহারের উৎকর্ষ (W) ইত্যাদি। কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভর করছে কোন্ কোন্ শক্তি কখন জোট বাঁধবে।

থার্স্টোনের তত্ত্বটি প্রাচীন বুদ্ধি সম্বন্ধে অভিজাততন্ত্রমূলক ধারণার সঙ্গে তুলনীয়, যদিও থার্স্টোনের মতবাদটিও স্পীয়ারম্যানের তত্ত্বের মত জটিল গাণিতিক গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত।

(গ) টমসনের বাছাই তত্ত্ব বা বহু-শক্তি তত্ত্ব (Thompson's Sampling Theory or Multi-ability Theory)

গড্‌ফ্রে টমসন, আর একজন ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক, কিন্তু উপরের দু'শ্রেণীর ব্যাখ্যার কোনটাই গ্রহণ করেন নি। তিনি বুদ্ধির তৃতীয় ব্যাখ্যার জনক। তাঁর মতে মনের মধ্যে অগণিত শক্তিকণা আছে, যেগুলির কোনটিরই পৃথক করে সংজ্ঞা বা বর্ণনা দেওয়া যায় না। এগুলিকে আমাদের মানসিক শক্তির একক (Unit) বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। যখন আমরা কোনো মানসিক কাজ করি, তখন

এই অসংখ্য শক্তি-কণার মধ্যে কতকগুলি একসঙ্গে জোট বাঁধে এবং ঐ কাজটি করতে আমাদের সমর্থ করে। কি ভাবে এবং কোন শক্তি-কণাগুলি একটি বিশেষ



কাজ করার সময় জোট বাঁধবে তা নির্ভর করে ঐ কাজটির প্রকৃতির উপর এবং শক্তি-কণাগুলির অন্তর্নিহিত ক্ষমতার উপর। এই জন্য টমসনের এই তত্ত্বটিকে "বাছাই তত্ত্ব" (Sampling Theory) বলা হয়। উপরে টমসনের শক্তি-কণা তত্ত্বের একটি কল্পিত চিত্র দেওয়া হলো।

বুদ্ধির পরিমাপ (Measurement of Intelligence)

বুদ্ধির স্বরূপ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও বুদ্ধির পরিমাপ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা মোটামুটি একটা সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন। অর্থাৎ কিভাবে বুদ্ধিকে মাপা যেতে পারে এ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে সকলেই প্রায় একমত।

বর্ত্তমানে বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence Test) বলতে যা বোঝা যায় তার আবিষ্কর্ত্তা হলেন আলফ্রেড বিনে (Alfred Binet) নামে এক ফরাসী মনোবিজ্ঞানী। ১৯০০ সালে প্যারী নগরের স্কুল কর্তৃপক্ষগণ স্কুলের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় শোচনীয় ফল দেখে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। শিক্ষকদের মতে ছেলেমেয়েদের অমনোযোগ ও দুষ্টবুদ্ধিই এর জন্য দায়ী। আবার কেউ কেউ বললেন যে যথেষ্ট বুদ্ধির অভাবই ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় অনগ্রসরতার কারণ। এই জটিল সমস্যার সমাধানের ভার পড়লো সেই সময়কার প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী

বিনের হাতে। বিনে দেখলেন যে এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে প্রথমেই বুদ্ধি মাপার একটা উপায় বার করতে হবে। অনেক গবেষণার পর বিনে বুদ্ধি পরিমাপের একটি অভীক্ষা (Test) তৈরী করলেন। এই অভীক্ষাটি বর্ত্তমানে "বিনে-সাইমন স্কেল" নামে প্রসিদ্ধ। সাইমন (Simon) ছিলেন বিনের সহকর্ম্মী এবং এই উদ্ভাবনে তাঁর প্রধান সহায়ক।

বিনে-সাইমন স্কেল (Binet-Simon Scale)

(ক) বিনের অভীক্ষাটি কতকগুলি প্রশ্ন বা সমস্যা নিয়ে গঠিত। অভীক্ষার্থীকে প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে বা সমস্যাগুলি সমাধান করতে বলা হয়।

(খ) এই প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি আবার এক শ্রেণীর নয়। নানা ধরনের কাজের ভিতর দিয়ে সেগুলির সমাধান করতে হয়। যেমন, মুখস্থ করা, মনে করা, চিনতে পারা, তুলনা করা, সম্বন্ধ-নির্ণয় করা, বিচার করা, ভুল বার করা, সংখ্যা ব্যবহার করা ইত্যাদি বিভিন্ন মানসিক কাজের সম্পাদনের মাধ্যমেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হয়। বিনে প্রথমেই ধরে নিয়েছিলেন যে বুদ্ধি একটি বিশেষ শক্তি নয়, এটি একটি সাধারণ শক্তি। অতএব কোন বিশেষ প্রকার কাজের ভিতর দিয়ে এর পরিমাপ করা যাবে না। একে যথাযথ পরিমাপ করতে হলে বহু বিভিন্নধর্ম্মী কাজ ও সমস্যা সমাধান করতে দিতে হবে। এক প্রকারের কাজ থাকলে সকলের প্রতি সুবিচার করা হবে না। কিন্তু যদি বিভিন্ন প্রকারের কাজ থাকে তবে সকলের বুদ্ধিকেই পূর্ণ প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হবে। এই কারণেই সমস্যার বিবিধতা বিনের অভীক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

(গ) বিনের অভীক্ষাটিকে একটি স্কেল (Scale) বলা হয়। যে কোন স্কেলের বৈশিষ্ট্য হল যে এতে ক্রমবর্দ্ধমান ধারায় কতকগুলি একক (Unit) পর পর সাজান থাকে। যেমন, ইঞ্চির স্কেল, সেন্টিমিটারের স্কেল ইত্যাদি। বিনের অভীক্ষাতেও কতকগুলি একক ক্রমবর্দ্ধমান ধারায় সাজান আছে। অভীক্ষার্থীর বয়স অনুযায়ী এই এককগুলি বিভক্ত। এই স্কেলে নিম্নতম একক হল তিন বৎসর বয়সের জন্য নির্দ্ধারিত কতকগুলি প্রশ্ন বা সমস্যা, তার উপরের এককটি

চার বৎসরের জন্য নির্দ্ধারিত কতকগুলি প্রশ্ন বা সমস্যা, তার উপরের এককটি পাঁচ বৎসরের জন্য এবং এইভাবে ক্রমশ ধাপে ধাপে উঠে সর্ব্বোচ্চ একক ১৫ বৎসরে গিয়ে স্কেলটি শেষ হয়েছে। বিনের অভীক্ষার আধুনিকতম সংস্করণে নিম্নতম একক সুরু হয়েছে দু'বৎসর থেকে এবং প্রতিটি ধাপে ছ'মাস বা ১ বৎসর করে বেড়ে সবচেয়ে উপরের একক উন্নত-বয়স্কে শেষ হয়েছে। বয়স অনুযায়ী এককের বিভাগ থাকার জন্য বিনের অভীক্ষাকে বয়সগত স্কেলও (Age Scale) বলা হয়।

(ঘ) উপরের বর্ণনা থেকে একটা জিনিষ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে বিনের অভীক্ষায় প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি ক্রমবর্দ্ধমান দুরূহতার (graded difficulty) নীতি অনুযায়ী সাজানো। অর্থাৎ অভীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম প্রশ্নটি সবচেয়ে সহজ এবং সর্ব্বশেষ প্রশ্নটি সবচেয়ে শক্ত এবং মধ্যবর্ত্তী প্রশ্নগুলি তাদের দুরূহতার মান অনুযায়ী সাজানো। এইভাবে সাজানোর মূলে রয়েছে অতি স্পষ্ট একটি সত্য যথা শিশুর মানসিক ক্ষমতাও তার বয়স-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে থাকে।

কোন্ প্রশ্নটির দুরূহতার মান কতটুকু এবং কোন্ বয়সের জন্য সেটি যোগ্য এই অতি জটিল সিদ্ধান্তে পৌছতে বিনেকে বহু গবেষণা করতে হয়েছে এবং বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের উপর প্রশ্নগুলি বারবার প্রয়োগ করে তবে তাঁকে সেগুলির দুরূহতার মান নির্ণয় করতে হয়েছে।

(ঙ) বিনের বুদ্ধির অভীক্ষার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এতে মানসিক বয়সের (Mental Age) ব্যবহার। সত্য বলতে কি বিনের মানসিক বয়সের অভিনব পরিকল্পনাই আধুনিক কালের বুদ্ধির অভীক্ষার এত সাফল্য এনে দিয়েছে। আমরা আগেই দেখেছি যে বিনের অভীক্ষায় বিভিন্ন বয়সের জন্য বিভিন্ন ও নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি (বর্ত্তমান সংস্করণে ছয়টি) প্রশ্ন বা সমস্যা দেওয়া আছে। এখন যদি কোন বালক একটি বিশেষ বয়সের (ধরা যাক, ৭ বৎসর) জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন কয়টির ঠিকমত উত্তর দিতে পারে তবে বলা হবে যে ঐ বালকটির মানসিক বয়স ঐ বৎসরের (অর্থাৎ সাত), তার আসল বয়স যতই হোক না কেন। সেই রকম কোন বালক আট বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নগুলি পারলে বলা হবে যে তার মানসিক বয়স আট, নয় বৎসরের প্রশ্নগুলি পারলে বলা হবে তার মানসিক বয়স নয় ইত্যাদি।

(চ) এখন আট বছরের ছেলের উচিত আট বছরের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নগুলি পারা, অর্থাৎ আট বছরের ছেলের উচিত আট বছরের মানসিক বয়স থাকা। অন্তত সাধারণ আট বছরের ছেলের মানসিক বয়স আট বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। যদি আট বছরের ছেলে ন'বছরের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নগুলি পারে তবে বুঝতে হবে তার মানসিক বয়স সাধারণ আট বছরের ছেলের চেয়ে বেশী এবং সে যদি সাত বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নের উপর অন্য কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারে তবে বুঝতে হবে যে তার মানসিক বয়স সাধারণ আট বছরের ছেলের চেয়ে কম।

কিন্তু কেবলমাত্র মানসিক বয়স এবং সময়গত বয়স জানলেই কোন ব্যক্তির বুদ্ধির সঠিক পরিমাপ পাওয়া গেল না। কেননা আট বছরের ছেলের পক্ষে বার বছরের মানসিক বয়স থাকাটা যতটা বুদ্ধির পরিচায়ক, এগার বছরের ছেলের পক্ষে ঐ একই মানসিক বয়স থাকা ততটা বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। অতএব প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিমাপ জানার জন্য বিনে মানসিক বয়সকে সময়গত বয়স দিয়ে ভাগ করে এ'দুয়ের একটা অনুপাত (ratio) বার করলেন। এই অনুপাতটাই ব্যক্তির সত্যকার বুদ্ধিমত্তার সূচক। বিনের প্রবর্ত্তিত এই পদ্ধতি থেকেই বর্ত্তমানে বুদ্ধ্যঙ্ক বা I. Q. (Intelligence Quotient) বার করার পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে। বুদ্ধ্যঙ্ক বার করার সূত্রটি হল—

$$\text{বুদ্ধ্যঙ্ক} = \frac{\text{মানসিক বয়স} \times ১০০}{\text{সময়গত বয়স}}$$

উপরের সূত্রটি প্রয়োগ করে আমরা দেখতে পাই যে,

যে ছেলের সময়গত বয়স ৮, এবং মানসিক বয়স ৭,

$$\text{তার বুদ্ধ্যঙ্ক} = \frac{১০০ \times ৭}{৮} = ৮৮।$$

অতএব সে সাধারণ আট বছরের ছেলের চেয়ে স্বল্পবুদ্ধি।

যে ছেলের সময়গত বয়স ৮, এবং মানসিক বয়সও ৮

$$\text{তার বুদ্ধ্যঙ্ক} = \frac{১০০ \times ৮}{৮} = ১০০$$

অতএব সে সাধারণ আট বছরের ছেলের মত বুদ্ধিসম্পন্ন।

যে ছেলের সময়গত বয়স ৮, এবং মানসিক বয়স ৯

$$\text{তার বুদ্ধ্যঙ্ক} = \frac{১০০ \times ৯}{৮} = ১১৩$$

অতএব সে সাধারণ আট বছরের ছেলের চেয়ে অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন।

এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যাচ্ছে যে, যে কোন বয়সেই ১০০ বুদ্ধ্যঙ্ক হল সেই বয়সের গড় (average) ব্যক্তির বুদ্ধির মানের সূচক। কারোও ১০০র কম বুদ্ধ্যঙ্ক হলে বুঝতে হবে সেই বয়সের গড় ব্যক্তির চেয়ে তার বুদ্ধি কম, আর ১০০র বেশী বুদ্ধ্যঙ্ক হলে বুঝতে হবে যে সেই বয়সের গড় ব্যক্তির চেয়ে তার বুদ্ধি বেশী।

(ছ) বুদ্ধির অভীক্ষার আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এর সমস্যা বা প্রশ্নগুলি এমন ধরনের হবে যা সমাধান করতে কোন অর্জ্জিত জ্ঞানের প্রয়োজন হবে না। কেননা বুদ্ধি হল সহজাত মানসিক শক্তি, এটি অর্জ্জিত কোন বৈশিষ্ট্য নয়। অতএব এমন কোন প্রশ্ন করা চলবে না যার সমাধানেতে বিশেষভাবে অর্জ্জিত জ্ঞানের দরকার হবে। যেমন, তাজমহল কে তৈরী করেছিলেন বা ক' ডিগ্রীতে এক সমকোণ হয় ইত্যাদি প্রশ্ন দিয়ে বুদ্ধির পরিমাপ করা যাবে না। প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি এমন প্রকৃতির হবে যার সমাধান করতে মনের নিছক সাধারণ শক্তির প্রয়োগ লাগবে, কোন অর্জ্জিত জ্ঞানের সাহায্য দরকার হবে না। তবেই হবে সত্যকারের বুদ্ধির পরীক্ষা। যেমন, "একজন লোক বাড়ী ফিরে এসে দেখল যে চোরে তার বাড়ীতে ঢুকে সব চুরি করে নিয়ে গিয়েছে, তখন তার কি করা উচিত?"—এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে সামান্যই অর্জ্জিত জ্ঞান লাগে। আসলে যা লাগে তাকেই আমরা বুদ্ধি বলে থাকি। বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে এই ধরনের অর্জ্জিত-জ্ঞান-নিরপেক্ষ প্রশ্ন দেবারই চেষ্টা করা হয়।

কিন্তু তত্ত্বের দিক দিয়ে একথা ঠিক হলেও পুরোপুরি অর্জ্জিত জ্ঞানকে বাদ দিয়ে বুদ্ধির অভীক্ষা রচনা করা যায় না। কেননা বুদ্ধি একটি অন্তর্নিহিত মানসিক শক্তি। তবে তাকে প্রকাশ করতে হলে প্রয়োজন কোন মাধ্যমের এবং ভাষা, কৌশল, পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সাহায্য বুদ্ধিকে ব্যক্ত করার জন্য অপরিহার্য।

(জ) অতএব পুরোপুরি অর্জ্জিত জ্ঞানকে বাদ দিয়ে কোন বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী সম্ভব হয়না। আধুনিক বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে বিপরীতার্থক এবং সমার্থক শব্দ বলা, বাক্যের অর্থ-নির্ণয়, সংখ্যাঘটিত প্রশ্ন প্রভৃতি নানা অর্জ্জিত-জ্ঞান-নির্ভর সমস্যা পাওয়া যায়। তবে অভীক্ষাকারকগণ ততটুকু অর্জ্জিত জ্ঞানই ব্যবহার করেন

যতটুকু তাঁরা মনে করেন যে অভীক্ষার্থীদের সকলের মধ্যেই সমভাবে বর্ত্তমান আছে। যেমন ৮ বছরের ছেলেকে বলা হল, "সপ্তাহের দিনগুলোর নাম বল।" এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে সে সাধারণ সভ্যসমাজে যে কোনো আট বছরের ছেলেই সপ্তাহের দিন কটার নাম জানে। বিনে সাইমন স্কেলেও এই ধরনের অর্জ্জিত জ্ঞান-ভিত্তিক বহু সমস্যার উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। বর্ত্তমানে প্রচলিত বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে ভাষাধর্ম্মী অর্জ্জিত জ্ঞানের প্রাচুর্য্য এত যে অনেকে এগুলিকে বুদ্ধির অভীক্ষা না বলে বিদ্যাবত্তার দক্ষতার অভীক্ষা (Scholastic Aptitude Test) নাম দেওয়ার পক্ষপাতী।

(ঝ) বুদ্ধির অভীক্ষা সম্বন্ধে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা সত্যকারের বুদ্ধিকে পরিমাপ করতে পারি না, আমরা পরিমাপ করি বুদ্ধির প্রকাশ বা অভিব্যক্তিকে। অতএব আমরা যা পরিমাপ করি এবং সত্যকারের বুদ্ধি এ দুইই অভিন্ন কিনা তাও নিশ্চয় করে বলা যায় না। তাছাড়া কারোও পুরো বুদ্ধিটাকে পরিমাপ করা যায় কিনা তাও বলা চলে না।

বুদ্ধির অভীক্ষায় সমস্যাবলীর দৃষ্টান্ত

আমরা আগেই দেখেছি যে বুদ্ধি একটি সাধারণ ক্ষমতা এবং এটিকে পরিমাপ করতে হলে নানা রকমের সমস্যা দিতে হয়। এইজন্যই বিনে স্কেলে এবং অন্যান্য প্রচলিত বুদ্ধির অভীক্ষায় বহুরকমের সমস্যা পাওয়া যায়। তার কয়েকটির নাম ও বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

১। বস্তু, ছবি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতির নাম বলা (Naming or Identifying)

যেমন, ঃ—একটা ঘোড়ার ছবি দেখিয়ে বলা হল, "এটা কি বলত ?"

২। স্মৃতি-শক্তি পরীক্ষা (Memory)

যেমন ঃ—একটা বাক্য বা গল্প বলে অভীক্ষার্থীকে সেটিকে মন থেকে বলতে বলা হয়।

৩। সংখ্যার পুনরাবৃত্তি (Counting Digits)

যেমন ঃ—৬—৫—৯—৪ এই সংখ্যার সারিটি অভীক্ষার্থীকে শুনিয়ে তাকে সেটির পুনরাবৃত্তি করতে বলা হয়।

৪। দুটি বস্তু বা ধারণার মধ্যে তুলনা (Comparison)

যেমন :—(ক) একটি ক্রিকেট বল ও কমলালেবুর মধ্যে কোথায় কোথায় মিল, আর কোথায় কোথায় পার্থক্য ?

(খ) দারিদ্র্য এবং দুর্দ্দশার মধ্যে মিল এবং অমিল কোথায় কোথায় ?

৫। বোধ-শক্তি (Comprehension)

যেমন :—(ক) আমরা তৃষ্ণার্ত্ত হলে কি করতে বাধ্য হই ?

(খ) হারিয়ে গেছে এমন একটি তিন বছরের ছেলেকে হঠাৎ পথে দেখলে তুমি কি করবে ?

৬। বস্তু গণনা (Counting Objects)

৭। শব্দ-সম্ভার পরীক্ষা (Vocabulary — Synonyms, Antonyms etc.)

যেমন :—(ক) কমলালেবু কাকে বলে ?

(খ) "রোগ"এর আর একটি প্রতিশব্দ বল (সমার্থক-শব্দ)

(গ) "সাহসী"র ঠিক বিপরীত অর্থ হয় এমন একটি শব্দ বল। (বিপরীতার্থক শব্দ)

(ঘ) "ধৈর্য্য", "অধ্যবসায়", "সংযোগ", "প্রতিহিংসা"র অর্থ বল (অমূর্ত্ত শব্দ)।

৮। অসম্ভবতা-নির্ণয় (Absurdity)

যেমন :—(ক) হাত দুটো পিছন থেকে বাঁধা এবং পা দুটো বাঁধা অবস্থায় একটি যুবককে বন্ধ ঘরের মধ্যে পাওয়া গেল। লোকে ভাবলো যুবকটি নিজেই নিজেকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখেছিল।—এই উক্তিটির মধ্যে এমন কি আছে যা বাস্তবে সম্ভব নয়।

(খ) একটা অসঙ্গতিপূর্ণ ছবি দেখিয়ে বলা হয়, "এর মধ্যে কোথায় কোথায় ভুল আছে বার কর।"

৯। উপমান (Analogy)

যেমন :—(ক) "পাখীতে ওড়ে, মাছে······" (উঃ—সাঁতার কাটে)

(খ) সূর্য্য দেয় উত্তাপ, ফুল······

(গ) ঋণ হলো দায়, আয় হলো······

(ঘ) ৯'এর সঙ্গে ৬'এর যা সম্পর্ক, "ন"র সঙ্গে···র সে সম্পর্ক ?

১০। বিচার-করণ (Reasoning)

যেমন :—(ক) একটা কাগজকে দু'বার ভাঁজ করার পর তার একটা কোণে একটা ছোট ফুটো করা হল। তার পর প্রশ্ন করা হলো, কাগজটা খুললে কটা ফুটো দেখা যাবে ?

(খ) প্রশ্ন করা হলো—লোকে চশমা পরে কেন ?—সুন্দর দেখাবে বলে, না, চোখ খারাপ বলে, না ফ্যাসানের খাতিরে ?।

১১। শ্রেণীভুক্ত করণ (Classification)

যেমন :—(ক) টেবিল, বই, চেয়ার, আলমারী—এই ৪টি বস্তুর মধ্যে কোন্‌টির এই শ্রেণীতে থাকার কথা নয় ?

(খ) বেড়ানো, ওড়া, সাঁতার কাটা, লেখাপড়া করা—এই ৪টি কাজের মধ্যে কোন্ কাজটি অন্য শ্রেণীর ?

১২। সংখ্যা-সারি (Number Series)

যেমন :—শূন্যস্থানগুলিতে ঠিকমত সংখ্যা বসাও—

(ক) ১	৩	৫	৭	৯	১১	—	—
(খ) ৬	৯	১২	১৫	১৮	২১	—	—
(গ) ৯	১২	১০	১৩	১১	১৪	—	—
(ঘ) ১	৪	৯	১৬	২৫	৩৬	—	—

১৩। বিচ্ছিন্ন বাক্য (Dissected Sentence)

যেমন :—নীচের কথাগুলিকে এমনভাবে সাজাও যাতে অর্থবোধক একটি বাক্য হয়—

(ক) খুব যাত্রা উদ্দেশ্যে করলাম গ্রামের ভোরে সুরু।

(খ) সাহসী কাজ লোকে সৎ করে।

১৪। সমস্যা সমাধান (Problem Solving)

যেমন :—একটি ছেলেকে মা নদীতে পাঠালেন ঠিক ১ সের জল আনতে। তাকে দিলেন ১টি ৩ সেরী পাত্র আর একটি ৮ সেরী পাত্র। এখন ছেলেটি কি করে ঠিক ১ সের জল আনবে দেখিয়ে দাও। মনে রেখো ১ সেরের কম বা বেশী জল আনা চলবে না।

১৫। **প্রবাদ-বিশ্লেষণ (Proverb)**

যেমন ঃ—নীচের প্রবাদগুলির কি অর্থ বল—

(ক) অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়।

(খ) ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।

(গ) উলু বনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ নেই।

(ঘ) দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

১৬। **ব্যবহারিক কার্য্যঘটিত সমস্যা (Practical Problems)**

যেমন ঃ—(ক) ফর্ম্ম বোর্ড (একটি কাঠের বোর্ডে বৃত্ত, চতুষ্কোণ, ত্রিভুজ প্রভৃতির আকারে গর্ত্ত থাকে। অভীক্ষার্থীকে ঐ গর্ত্তগুলিতে ঠিক মাপ মত কাঠের টুকরো বসাতে হয়।

(খ) নানা রঙের ও আকৃতির পুঁতি দিয়ে বিশেষ কোন নক্সা অনুযায়ী মালা গাঁথতে হয়।

(গ) একটি আয়তক্ষেত্র বা রম্বসের ছবিকে দু'টুকরো বা তিন টুকরো করে অভীক্ষার্থীকে দেওয়া হয় টুকরোগুলিকে জুড়ে পূর্ব্বের নক্সামত করতে।

(ঘ) গোলকধাঁধায় (maze) ঠিক পথ বার করার সমস্যা বুদ্ধির অভীক্ষায় প্রায়ই দেওয়া হয়।

(ঙ) এ ছাড়া ছবি আঁকা, রেখা টানা প্রভৃতির সমস্যাও দেওয়া হয়ে থাকে।

অর্জ্জিতজ্ঞান বা বিদ্যাবত্তার অভীক্ষা (Achievement or Scholastic Test)

বিদ্যাবত্তার অভীক্ষা হল এক ধরনের অর্জ্জিত জ্ঞানের অভীক্ষা। স্কুলে বা কলেজে একটি ছাত্র একটা বিশেষ সময়ে কোন বিশেষ বিষয়ে কতটুকু শিখল সেটা পরীক্ষা করার জন্যই বিদ্যাবত্তার অভীক্ষার প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন, ইংরাজী বা ভূগোল বা ইতিহাসের উপর বিদ্যাবত্তার অভীক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বুদ্ধির অভীক্ষা হল মনের সহজাত সাধারণ শক্তির মান নির্ণয়ের অভীক্ষা। এই পরীক্ষায় অর্জ্জিত জ্ঞানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না, বরং যতটা অর্জ্জিত জ্ঞানকে বাদ দেওয়া যায় ততই এই অভীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা বাড়ে।

এমন একটি স্তরে এসে পৌছচ্ছে যখন সে আর একটি প্রশ্নেরও নির্ভুল উত্তর দিতে পারছে না ততক্ষণ পর্য্যন্ত অভীক্ষাটির প্রয়োগ চালিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের নির্ভুল সমাধানের জন্য অভীক্ষার্থীর কিছু কিছু মানসিক বয়স পাওনা হয়। এই অর্জ্জিত মানসিক বয়সের গণনা করা হয় 'মাসের' হিসাবে। স্কেলের প্রথম ৬ বৎসর অর্থাৎ ২ বৎসর থেকে ৪½ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেকটি প্রশ্নের নির্ভুল সমাধানের জন্য অভীক্ষার্থীর মানসিক বয়স প্রাপ্য হবে ১ মাস হিসাবে, ৫ বৎসর থেকে সাধারণবয়স্ক বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক প্রশ্নের নির্ভুল সমাধানের জন্য অভীক্ষার্থীর পাওনা হবে ২ মাস করে মানসিক বয়স এবং উন্নত বয়স্ক (১) বৎসরের প্রত্যেক প্রশ্নের নির্ভুল সমাধানের জন্য পাওনা হবে ৪ মাস করে, উন্নত বয়স্ক (২) বৎসরের প্রত্যেক প্রশ্নের নির্ভুল সমাধানের জন্য ৫ মাস করে এবং উন্নত বয়স্ক (৩) বৎসরের প্রত্যেকটি প্রশ্নের নির্ভুল সমাধানের জন্য ৬ মাস করে। কয়েকটা উদাহরণ নিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। মনে করা যাক একটি ছেলে ৪ বৎসর পর্য্যন্ত সব প্রশ্ন পারল। তারপর সে পারল ৪½ বৎসরের ৪টি প্রশ্ন, ৫ বৎসরের ৩টি, ৬ বৎসরের ২টি এবং ৭ বৎসরের ১টি। তার মৌলিক বয়স হল ৪ বৎসর এবং তার অর্জ্জিত মানসিক বয়স হল—(৪ × ১) + (৩ × ২) + (২ × ২) + (১ × ২) = ১৬ মাস। অতএব তার মোট মানসিক বয়স হল ৪ বৎসর + ১৬মাস = ৫ বৎসর ৪ মাস। এখন যদি এই ছেলেটির সময়গত বয়স হয় ৪ বৎসর ৮ মাস, তবে তার I. Q. বা বুদ্ধ্যঙ্ক হবে $\frac{(\text{৫ বঃ ৪ মাঃ}) \times \text{১০০}}{(\text{৪ বঃ ৮ মাঃ})} = \text{১১৪}$।

আর একজন অভীক্ষার্থী মনে করা যাক ১৩ বৎসর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রশ্ন পারল। তারপরে সে পারল ১৪ বৎসরের ৫টি প্রশ্ন, সাধারণ বয়স্ক বৎসরের ৪টি প্রশ্ন, উন্নত বয়স্ক (১) বৎসরের ৩টি প্রশ্ন, উন্নত বয়স্ক (২) বৎসরের ২টি প্রশ্ন এবং উন্নত বয়স্ক (৩) বৎসরের ১টি প্রশ্ন। এই অভীক্ষার্থীটির মৌলিক মানসিক বয়স হল ১৩ বৎসর এবং তার অর্জ্জিত মানসিক বয়স হল—(৫ × ২) + (৪ × ২) + (৩ × ৪) + (২ × ৫) + (১ × ৬) মাস = ১০ + ৮ + ১২ + ১০ + ৬ মাস = ৪৬ মাস। অতএব তার মোট মানসিক বয়স হবে ১৩ বৎসর + ৪৬ মাস বা ১৬ বৎসর ১০ মাস। এখন যদি এই অভীক্ষার্থীর সময়গত বয়স হয় ১৩ বৎসর ১ মাস তবে তার I. Q বা বুদ্ধ্যঙ্ক হবে—

$$\frac{(\text{১৬ বঃ—১০ মাঃ}) \times \text{১০০}}{(\text{১৩ বঃ—১ মাঃ})} = \text{১২৯}।$$

বয়স্কব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্কের হিসাব

বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক হিসাব করার নিয়ম একটু বিভিন্ন। দেখা গেছে যে ১৫ বৎসরের পর বুদ্ধির আর বিশেষ উন্নতি হয় না। সেজন্য মনোবিজ্ঞানীরা মোটামুটিভাবে ১৫ বৎসরেই বুদ্ধির বৃদ্ধির সীমারেখা টেনে দিয়েছেন। অতএব কোনো বয়স্কের বুদ্ধির মান গণনা করার সময় ১৫ বৎসরকেই সর্ব্বোচ্চ বয়স হিসাবে ধরা হয়, সত্যকার বয়স তার যতই হোক না কেন। যেমন, যদি কোন অভীক্ষার্থীর সময়গত বয়স হয় ২৪ বৎসর ২ মাস এবং তার মানসিক বয়স হিসাবে দাঁড়ায় ১৭ বৎসর ২ মাস তখন বুদ্ধ্যঙ্ক হবে—

$$\frac{(১৭ \text{ বঃ}—২ \text{ মাঃ}) \times ১০০}{১৫ \text{ বঃ}} = ১১৪ \text{।}$$

ষ্ট্যানফোর্ড স্কেলে সর্ব্বোচ্চ মানসিক বয়স হতে পারে ২২ বৎসর ১০ মাস এবং সে হিসেবে সর্ব্বোচ্চ বুদ্ধ্যঙ্ক হতে পারে ১৭১।

ষ্ট্যানফোর্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর থেকে বুদ্ধির অভীক্ষা নিয়ে নানা দেশে গবেষণা স্থরু হয় এবং ফলে বহু নতুন ও অভিনব বুদ্ধির অভীক্ষা সৃষ্ট হয়। এগুলি অধিকাংশই অবশ্য বিনের বুদ্ধির অভীক্ষার মূলতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বুদ্ধির অভীক্ষার শ্রেণীবিভাগ

আধুনিক বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে বিভিন্ন দিক দিয়ে শ্রেণী বিভাগ করা যায়। প্রথমত, সমস্যা বা প্রশ্নের প্রকৃতির দিক দিয়ে বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে ভাষামূলক (Verbal) এবং ভাষাবিহীন (Non-verbal) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। দ্বিতীয়ত, সংগঠনের দিক দিয়ে সেগুলিকে ব্যক্তিক (Individual) ও যৌথ (Group) এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ বুদ্ধির অভীক্ষা মোট চার রকমের হতে পারে—ভাষামূলক ব্যক্তিক, ভাষাবিহীন ব্যক্তিক, ভাষামূলক যৌথ ও ভাষাবিহীন যৌথ।

ভাষামুলক (Verbal) ও ভাষাবিহীন Non-verbal অভীক্ষা

ভাষামূলক অভীক্ষাগুলির উপাদান প্রধানত ভাষাধর্ম্মী। অভীক্ষার্থীকে লিখিত এবং কথিত ভাষার সাহার্য্যেই প্রদত্ত সমস্যাগুলি সমাধান করতে হয়। সমস্যার মধ্যেও প্রচুর ভাষার ব্যবহার থাকে। শব্দ বা বাক্যের অর্থ বলা, সমার্থক বা

বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহার করা, লিখিত বাক্য গড়া ও তার অর্থ বোঝা ইত্যাদি বহুভাবে ভাষার ব্যবহার এই সব অভীক্ষায় থাকে। বিনে সাইমন স্কেলটি একটি ভাষামূলক ব্যক্তিক অভীক্ষা। আর্মি আল্‌ফা একটি ভাষামূলক যৌথ অভীক্ষা।

ভাষাবিহীন বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে কথিত বা লিখিত ভাষার ব্যবহারকে যতটা সম্ভব (একেবারে সম্ভব নয়) বর্জ্জন করা হয়। এমন অনেক অভীক্ষার্থী আছে যারা ভাষা-ব্যবহারে খুব পটু নয় বা কোন কারণে তাদের ভাষা-শিক্ষায় দুর্ব্বলতা থেকে গেছে। তাদের বুদ্ধির প্রকৃত পরিমাপ ভাষামূলক অভীক্ষাগুলির মাধ্যমে যথাযথ হতে পারে না। বিশেষ করে নিরক্ষর ও শিশুদের ক্ষেত্রে ভাষামূলক অভীক্ষার ব্যবহার করা চলতেই পারে না। তাদের জন্য ভাষাবিহীন অভীক্ষার উদ্ভাবন হয়েছে। এই শ্রেণীভুক্ত অভীক্ষাগুলি আবার নানা রকমের হতে পারে।

সম্পাদনী অভীক্ষা (Performance Test)

এই পর্য্যায়ে প্রথমে পড়ে সম্পাদনী অভীক্ষা (Performance Test)। এগুলিতে নানা আকৃতি ও রঙের কাঠের বা প্লাষ্টিকের টুকরোর সাহায্যে প্রদত্ত কোন বিশেষ নক্সার অনুকরণে একটি নক্সা তৈরী করতে হয় বা কোন প্রদত্ত সমস্যার সমাধান করতে হয়। প্রধানত দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহারের সাহায্যেই এই অভীক্ষাগুলির সমাধান করতে হয় বলে এগুলির নাম সম্পাদনী অভীক্ষা (Performance Test)। কিন্তু সমস্যাটির সমাধানে বা প্রদত্ত নক্সাটির গঠনে সাফল্য এবং ক্ষিপ্রতার মধ্যে দিয়ে অভীক্ষার্থীর বুদ্ধির পরিমাপ করা যায় বলে বিশ্বাস করা হয়। এ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অবশ্য যথেষ্ট মতভেদ আছে। প্রচলিত সম্পাদনী অভীক্ষার মধ্যে আলেকজাণ্ডারের পাস এ্যালংগ (Alexander's Pass-Along), 'কোহ্'এর ব্লক ডিজাইন (Koh's Block Design), ডিয়ারবর্নের ফর্মবোর্ড (Dearborn's Form Board), পোর্টিয়াস গোলকধাঁধা (Porteus Maze), হিলির পাজল (Healey Puzzle) প্রভৃতির নাম করা যায়। কোনো কোনো বুদ্ধির অভীক্ষায় ভাষামূলক এবং দু'রকম ভাষাবর্দ্ধিত সমস্যাই দেওয়া হয়ে থাকে। ওয়েকসলার বেলেভিউ ইণ্টেলিজেন্স স্কেল (Wechsler Bellevue Intelligence Scale বা WBIS) এই ধরনের একটি ব্যক্তিক বুদ্ধির অভীক্ষা।

আর একটি ভাষাবিবর্জ্জিত ব্যক্তিক প্রসিদ্ধ বুদ্ধির অভীক্ষা হল গুডএনাফের

(Goodenough) মানুষ-আঁকার (Man-drawing) অভীক্ষা ।এ তে অভীক্ষার্থীকে নিজের মন থেকে একটা মানুষের ছবি আঁকতে বলা হয়। শিল্পনৈপুণ্যের দিক দিয়ে ছবিটির কোনরূপ বিচার করা হয় না। কেবল দেখা হয় মানুষের দেহের প্রয়োজনীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে কতগুলি অভীক্ষার্থী ছবিতে আঁকতে পারল·এবং তাদের পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধে তার ধারণাই বা কতটা নির্ভুল। ৪ থেকে ১০ বৎসরের শিশুদের বুদ্ধির অভীক্ষা হিসাবে এই অভীক্ষাটি আজকাল বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

গোলকধাঁধায় পথ বার করাও একটা অতি-প্রচলিত সম্পাদনী অভীক্ষা। এগুলি নানা রকমের হয়ে থাকে। কখনও কাগজে আঁকা গোলকধাঁধায় পেন্সিল দিয়ে সংক্ষিপ্ততম পথটি বার করতে বলা হয় আবার কখনও কাঠের ছোট ছোট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা গোলকধাঁধায় আঙুল বা ষ্টাইলাস (Stylus) দিয়ে বেরোবার পথটি আবিষ্কার করার সমস্যা দেওয়া হয়। যে যত কম ভুল করে এবং যত অল্প সময়ে সমস্যাটির সমাধান করতে পারে তার তত বেশী বুদ্ধি আছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

সম্পাদনী অভীক্ষা ছাড়াও কাগজে কলমে উত্তর করা যায় এমন ভাষাবিহীন অভীক্ষাও আছে। আর্মি বিটা অভীক্ষাটি এই ধরনের একটি ভাষাবর্জিত যৌথ অভীক্ষা। ছবি নকসা ইত্যাদি আঁকার মধ্যে দিয়ে এই অভীক্ষাটির উত্তর দিতে হয়।

ব্যক্তিক (Individual) অভীক্ষা ও যৌথ (Group) অভীক্ষা

বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে তাদের সংগঠন ও প্রয়োগপদ্ধতির দিক দিয়ে ব্যক্তিক অভীক্ষা এবং যৌথ অভীক্ষায় ভাগ করা হয়েছে।

ব্যক্তিক অভীক্ষা হল সেই সব অভীক্ষা যেগুলি এক সময়ে একজনের বেশী অভীক্ষার্থীর উপর প্রয়োগ করা যায় না। এই অভীক্ষাগুলিতে অভীক্ষক একটি মাত্র অভীক্ষার্থীর সামনে সমস্যাগুলিকে একটির পর একটি উপস্থাপিত করেন এবং সেগুলির প্রতি অভীক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করে যান। বিনে সাইমন স্কেলটি একটি ব্যক্তিক অভীক্ষা।

যৌথ অভীক্ষাতে কিন্তু তা করতে হয় না। অভীক্ষক একসঙ্গে বহু অভীক্ষার্থীর উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করতে পারেন। সাধারণত ছাপা ছোট বইয়ের আকারে অভীক্ষাটি তৈরী করা হয়। তাতে সমস্যাগুলি ছোট ছোট এবং সহজবোধ্য প্রশ্নের আকারে থাকে এবং কেমন করে সেগুলি সমাধান করতে হবে তাও উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া থাকে। অভীক্ষার্থী সেই নির্দ্দেশমত সমস্যাগুলির উত্তর সেই

বইতে লিখে দেয়। উত্তর লেখার কাজটাও আজকাল খুব সরল ও সহজ করে তোলা হয়েছে। সাধারণত টিক দেওয়া বা নীচে দাগ দেওয়া বা ক্রশ-চিহ্ন দেওয়া প্রভৃতি অতি সহজ কাজের মাধ্যমেই অভীক্ষার্থী প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারে।

বলা বাহুল্য ব্যক্তিক অভীক্ষার চেয়ে যৌথ অভীক্ষার কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। এর প্রয়োগে অনেক সময় ও পরিশ্রম বাঁচে। একটি ব্যক্তিক অভীক্ষা প্রয়োগ করতে কম করে দুই থেকে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। এখন ব্যক্তিক অভীক্ষার সাহায্যে একটি ক্লাসের ৫০টি ছেলের বুদ্ধির পরিমাপ করতে বহুদিন লেগে যাবে। কিন্তু যৌথ অভীক্ষার সাহায্যে একদিনেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাদের সকলের বুদ্ধির পরিমাপ করা সম্ভব হবে। দ্বিতীয়ত ব্যক্তিক অভীক্ষা প্রয়োগের সময় যথেষ্ট শিক্ষণপ্রাপ্ত অভীক্ষক না হলে অভীক্ষাটিই ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যৌথ অভীক্ষায় নির্দ্দেশদান সহজ ও সুনির্দ্দিষ্ট। ফলে এগুলির প্রয়োগের জন্য অভিজ্ঞ বা বিশেষরূপে শিক্ষণপ্রাপ্ত অভীক্ষকের প্রয়োজন হয় না। অভীক্ষা প্রয়োগের কৌশল ও পদ্ধতি সম্বন্ধে ভাল করে অনুশীলন করে নিলে সাধারণ লোকের পক্ষেও যৌথ অভীক্ষা প্রয়োগ করা সম্ভব।

কিন্তু আবার নির্ভরশীলতার দিক দিয়ে ব্যক্তিক অভীক্ষার দাবী আগে। কেননা অভীক্ষা প্রয়োগের সময় অভীক্ষার্থী পরিবেশের সঙ্গে কতটা নিজেকে মানিয়ে নিতে পারল সেটার উপর অভীক্ষার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। যৌথ অভীক্ষায় অভীক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকে অনেকখানি অবহেলা করা হয়। কিন্তু ব্যক্তিক অভীক্ষায় অভীক্ষক অভীক্ষার্থীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে থাকেন বলে তার মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলির উপর সুবিচার করতে পারেন।

কিন্তু আজকের দ্রুত গতিশীল জগতে সময়-সংক্ষেপের দাম অনেক। ফলে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যৌথ অভীক্ষার অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে নতুন অভীক্ষার অধিকাংশই যৌথ অভীক্ষা। যৌথ অভীক্ষার প্রথম ব্যাপক প্রচলন করেন আমেরিকার সামরিক বিভাগ প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। তাঁরা স্থির করেন যে সামরিক কার্য্যে যাদের নেওয়া হবে তাদের বুদ্ধি পরীক্ষা করে নেওয়া হবে। যেহেতু হাজার হাজার সৈনিক ও কর্ম্মচারীদের ব্যক্তিক অভীক্ষার মাধ্যমে বুদ্ধির পরীক্ষা করা সম্ভব নয় সেজন্য বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে দুটি যৌথ বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী করা হয়। প্রথমটির নাম আর্ম্মি আলফা (Army Alpha) অভীক্ষা। এটি ভাষামূলক (verbal) এবং এর সমস্যাগুলিকে ভাষার পঠন ও লিখনের মধ্যে

দিয়ে সমাধান করতে হয়। দ্বিতীয়টির নাম আর্মি বিটা (Army Beta) অভীক্ষা। ইতিপূর্ব্বে ওটিস (Otls) নামে একজন মনোবিজ্ঞানী এ সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণা করেন। তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্বের উপর নির্ভর করেই এই নতুন অভীক্ষাটি গঠিত হয়। এই অভীক্ষাটি ভাষাবিবর্জিত এবং এর সমস্যাগুলি সমাধানে ভাষার ব্যবহার লাগে না। অসম্পূর্ণ ছবি সম্পূর্ণ করা, গোলকধাঁধায় পথ বার করা প্রভৃতি ভাষা-নিরপেক্ষ সমস্যার দ্বারা এই অভীক্ষাটি গঠিত। অশিক্ষিত এবং বিদেশীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্যই এই অভীক্ষাটি প্রস্তুত করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাতে 'আর্মি আলফা' অভীক্ষাটির আবার নতুন করে সংস্কার করা হয়। এই নতুন সংস্করণটি আর্মি জেনারেল ক্লাসিফিকেসান অভীক্ষা (Army General Classification Test বা AGCT) নামে পরিচিত।

বুদ্ধির অভীক্ষার উপকারিতা (Uses of Intelligence Test)

বর্ত্তমান শতকে নানা কারণে বুদ্ধির অভীক্ষার দ্রুত উন্নতি ঘটেছে। বুদ্ধির অভীক্ষা কোন্ দিক দিয়ে আমাদের কাজে লাগে নীচে তার কয়েকটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হল।

(ক) বুদ্ধির অভীক্ষা ব্যক্তির বুদ্ধির মান নির্ণয়ে সাহায্য করে। অর্থাৎ বুদ্ধির সাধারণ মানের চেয়ে যদি কারও বুদ্ধি কম বা বেশী থাকে তা আমরা এই বুদ্ধির অভীক্ষার মাধ্যমে জানতে পারি।

(খ) বুদ্ধির অভীক্ষার মাধ্যমেই আমরা জানতে পেরেছি যে সব মানুষের বুদ্ধি সমান নয়। স্কুলের লেখাপড়ার সঙ্গে বুদ্ধির সম্বন্ধ অতি-ঘনিষ্ঠ। বুদ্ধিমান ছেলে দ্রুত শেখে, বুদ্ধিহীনের শেখার গতি মন্থর। অতএব স্কুলে একটি ক্লাসে যদি বিভিন্ন বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্র রেখে তাদের একই ভাবে পড়ানো যায়, তাতে মাঝারি বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেরা মোটামুটি উপকৃত হলেও, অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন এবং অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন, এই দু'দলেরই বিশেষ কোন উপকার হয় না। এই ব্যক্তিগত বৈষম্যের (Individual difference) নীতি আজ কাল সর্ব্বত্রই মেনে নেওয়া হয়েছে এবং সমস্ত প্রগতিশীল বিদ্যালয়েই এই নীতির প্রয়োগের চেষ্টা চলছে। বিভিন্ন বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের এক ক্লাসে না রেখে তাদের সাধারণত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যেমন—ভাল, মাঝারি এবং মন্দ এবং এই তিন শ্রেণীর ছাত্রের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী তাদের ভিন্ন ভাবে শিক্ষা

দেওয়া হয়ে থাকে। বুদ্ধির মান অনুযায়ী ছাত্রদের এই শ্রেণীবিন্যাস (Classification) করা সম্ভব হয় বুদ্ধির অভীক্ষার প্রয়োগের দ্বারা।

(গ) বুদ্ধির অভীক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ গণনা করতে সাহায্য করে। স্কুল-কলেজ বিদ্যালয়ের সকল স্তরের লেখাপড়ায়, বিশেষ করে সাহিত্যধর্ম্মী শিক্ষায়, সাফল্যের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার বেশ নিকট সম্বন্ধ আছে। আধুনিক পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে দেখা গেছে যে ক্লাসের পরীক্ষায় কৃতিত্ব এবং বুদ্ধির অভীক্ষায় কৃতিত্বের মধ্যে সহপরিবর্ত্তনের (correlation) মান বেশ উঁচু (পরিসংখ্যানের ভাষায় ·৪০ থেকে ·৬০)। ফলে কোন ছাত্রের বুদ্ধ্যঙ্ক দেখে বলা চলে যে সে ভবিষ্যতে লেখাপড়ায় কৃতিত্ব অর্জ্জন করবে কিনা এবং করলে কতটুকু করবে। যদি দেখা যায় যে কোন ছেলের বুদ্ধ্যঙ্ক বেশ কম তবে বলা চলতে পারে যে সাধারণ স্কুল কলেজের সাহিত্য-ধর্ম্মী লেখাপড়ায় সে বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না।

(ঘ) এই থেকেই বুদ্ধির অভীক্ষার আধুনিক যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক পরিচালনে (Educational Guidance) আজকাল বুদ্ধির অভীক্ষার ব্যাপক প্রয়োগ সুরু হয়েছে। অর্থাৎ কোন ছেলের বুদ্ধির মান দেখে ভবিষ্যতে লেখাপড়ার কোন্ পথে তার যাওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তাকে নির্ভরযোগ্য নির্দ্দেশ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। যে ছেলের বুদ্ধ্যঙ্ক কম তাকে সাধারণ স্কুল কলেজের সাহিত্যধর্ম্মী লেখাপড়ার দিকে না গিয়ে কোন ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করার নির্দ্দেশ দেওয়া যেতে পারে। আবার যে ছেলের বুদ্ধ্যঙ্ক বেশ উঁচু তাকে উন্নত সাহিত্যমূলক পাঠস্তর অনুসরণ করার নির্দ্দেশ দেওয়া যেতে পারে। কার কোন্ শ্রেণীর শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত এটা পূর্ব্বাহ্নে জানা গেলে শিক্ষার্থীকে তার প্রয়োজন মত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় এবং অনুপযোগী শিক্ষাগ্রহণের ফলে সাধারণত শ্রম ও উৎসাহের যে অপরিমিত অপচয় ঘটে থাকে তার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়।

(ঙ) বৃত্তিমূলক পরিচালনেও (Vocational Guidance) বুদ্ধির অভীক্ষার ব্যবহার অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে। এমন বহু বৃত্তি আছে যেগুলির সাফল্য বুদ্ধির উচ্চমানের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষকতা, আইনজীবিকা, ব্যবসা-পরিচালনা, শাসন-সংক্রান্ত কার্য্যাদি, সংবাদপত্র সম্পাদনা, ডাক্তারী প্রভৃতি

এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আবার মোটর চালনা, যন্ত্রপাতি-সংক্রান্ত কার্য্যাদি, জরীপের কাজ, ফ্যাক্টরীর কাজকর্ম্মাদি, সীবন শিল্প, মৃৎশিল্প, ভাস্কর্য্য, বয়নশিল্প, যুদ্ধবৃত্তি, গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতি বহু জীবিকা আছে যাতে উচ্চবুদ্ধির মান না থাকলেও মোটামুটি সাফল্য লাভ করা চলতে পারে। বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে বিশেষ কোন ব্যক্তির কোন্ বৃত্তি অনুসরণ করা উচিত সে সম্বন্ধে অত্যন্ত মূল্যবান নির্দ্দেশ দেওয়া সম্ভবপর। অবশ্য কেবলমাত্র বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যেই কোন্ বৃত্তি নেওয়া উচিত বলা যায় না। এর জন্য ব্যক্তির মধ্যে কি কি বিশেষ মানসিক শক্তি বা দক্ষতা আছে এবং তার আগ্রহ, মনঃপ্রকৃতি (temperament) ইত্যাদির স্বরূপ কি তাও জানতে হয়। সেজন্য বিশেষধর্ম্মী অভীক্ষার প্রয়োগ করতে হয়।

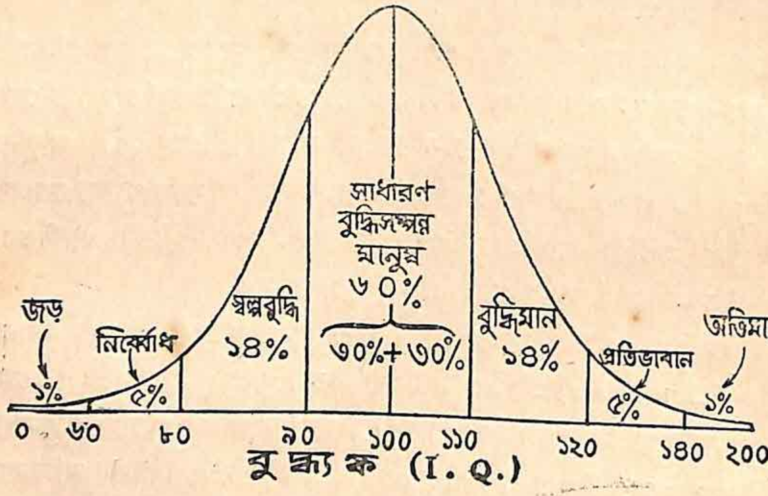
(চ) বুদ্ধির অভীক্ষার এই সকল গুণের জন্য আজকাল স্কুলকলেজে ছাত্রছাত্রী গ্রহণ করা থেকে সুরু করে বড় বড় অফিসে, সেনাবিভাগে, দায়িত্বপূর্ণ চাকুরীতে লোক নেবার সময় বুদ্ধির অভীক্ষার ফলাফলের সাহায্য নেওয়া হয়। আধুনিক যুগে যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ চাকুরীতে নিয়োগের সময় যে সকল পরীক্ষা করা হয়, বুদ্ধির অভীক্ষা তার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। সেনা-নৌ-বিমান বিভাগে বুদ্ধির অভীক্ষা ছাড়া কোনরূপ নিয়োগই করা হয় না।

(ছ) মানসিক বিকার, ছেলেমেয়েদের সমস্যামূলক আচরণ, কিশোর অপরাধ (delinquency) প্রভৃতির চিকিৎসা করার সময় বুদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ করাটা প্রাথমিক কার্য্য বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। কেননা বুদ্ধিহীনতার সঙ্গে মনের বিকার বা অস্বাভাবিকতার একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।

বুদ্ধির বণ্টন (Distribution of Intelligence)

সকল মানুষের বুদ্ধি যে সমান নয় এটা আমাদের সর্ব্বজনস্বীকৃত লৌকিক অভিজ্ঞতা। সকলের কিছু না কিছু বুদ্ধি থাকলেও, তার পরিমাণ মোটেই সমান নয়। কারও ভাগে পড়েছে বেশী, আবার কারও ভাগে কম। এই সত্যটুকু আমাদের জানা থাকলেও, এই অসমান বণ্টনের প্রকৃত স্বরূপটা এতদিন আমাদের জানা ছিল না। সেটা জানা সম্ভব হয়েছে বুদ্ধির অভীক্ষার দৌলতে।

এখন জানা গেছে যে বুদ্ধির বণ্টনে প্রকৃতি অধিকাংশ লোকের প্রতি সুবিচারই করেছে। শতকরা প্রায় ৬০ জন লোকেরই আছে মাঝামাঝি বুদ্ধি এবং বুদ্ধ্যঙ্কের হিসাবে বলা যায় যে তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ থেকে ১১০ এর মধ্যে থাকবে। আবার ৯০ বুদ্ধ্যঙ্কের নীচে আছে প্রায় শতকরা ২০ জন; এরা হল প্রকৃতির অবহেলিত ছেলেমেয়ে। এদের এক কথায় বলা চলে ক্ষীণবুদ্ধি। এদের মধ্যেও আবার বুদ্ধির মানের দিক দিয়ে শ্রেণীবিভাগ আছে। ১১০ বুদ্ধ্যঙ্কের উপরেও সেই রকম আছে শতকরা ২০ জন। এরা প্রকৃতির দ্বারা বিশেষভাবে অনুগৃহীত। এদের নাম দেওয়া যায় উন্নত-বুদ্ধি। এদেরও বুদ্ধির মানের দিক দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। জনসমাজে বুদ্ধির এই বণ্টনকে যদি চিত্রের আকার দেওয়া যায়,



তবে আমরা ঘণ্টার আকারের একটি ছবি পাব। অধিকাংশ লোক মাঝামাঝি বুদ্ধি-সম্পন্ন বলে ছবিটির মাঝখান উঁচু এবং ফোলা। ক্ষীণবুদ্ধি এবং উন্নতবুদ্ধি লোকেদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম বলে ছবিটির দু'ধার ক্রমশঃ নীচু ও সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। এই ছবিটিকে স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্র (Normal Distribution Curve) বলা হয়। বুদ্ধি ছাড়াও আরও অনেক বৈশিষ্ট্য, যেমন দৈর্ঘ্য, জন্মহার, প্রভৃতির বণ্টনও এই চিত্রের মত।

ক্ষীণবুদ্ধি (Feebleminded)

আমরা দেখেছি যে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে প্রায় ২০ জনেরই বুদ্ধি সাধারণ

বুদ্ধির মানের চেয়ে কম। অর্থাৎ বুদ্ধ্যঙ্কের হিসাবে তাদের ৯০ এর কম বুদ্ধ্যঙ্ক। এদের বলা হয় ক্ষীণবুদ্ধি (feebleminded)। এদের মধ্যে আবার ১৪ জন ক্ষীণবুদ্ধি হলেও মোটামুটি জীবনধারণের মত বুদ্ধি তাদের আছে। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৮০ থেকে ৯০ এর মধ্যে। এদের আমরা স্বল্পবুদ্ধি (moron) বলতে পারি। এরা কোন চিন্তামূলক কাজ করতে পারে না বা লেখাপড়ায় বেশীদূর এগোতে পারে না। খুব ঘসামাজা করলে বড় জোর স্কুলফাইনালের বেড়াটা ডিঙোতে পারে। কিন্তু শেখালে হাতের কাজ ভালই শেখে। সহজ যন্ত্রপাতির কাজ, বেতের কাজ, বোনা, শেলাই ইত্যাদি কাজ শিখে সকল সমাজেই অনেক স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তি সাধারণ মানুষদের মধ্যে মিলে মিশে জীবন যাপন করে।

এর চেয়ে নীচের ধাপে যারা, তাদের বলা চলে **নির্ব্বোধ** (imbecile)। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৬০ থেকে ৮০র মধ্যে। এরা রীতিমত বোকা। লেখাপড়া করা দূরে থাকুক ভাল করে নিজের মনের ভাবটাও এরা ভাষায় ব্যক্ত করতে পর্য্যন্ত পারে না। চেষ্টা করলে মোটামুটি বইটা পড়া, নামটা সই করা ইত্যাদি কাজগুলি এদের দ্বারা হতে পারে। এরা নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে কোনো কাজ করতে পারে না, তবে শিক্ষা পেলে সহজ হাতের কাজ এরাও শিখতে পারে। এদের সংখ্যা আনুমানিক শত করা ৫ জন।

সবচেয়ে শেষ ধাপে আছে **জড়** (idiot)। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৬০ এরও নীচে। এদের সম্বন্ধে লেখাপড়ার কথা ওঠে না। এরা ভাল করে কথা বলতে পারে না, বললেও বোঝে না। এরা একা চলাফেরা করতে পারে না। নিজের ভালমন্দও বোঝে না। অনেক চেষ্টা করলে এদের ছোটখাট কাজ করতে শেখান যায়। সংখ্যায় এরা শতকরা একজন।

প্রকৃতির অবহেলিত এই ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব আজ কাল সকল সভ্য মানব-সমাজই স্বীকার করে নিয়েছে। সাধারণ বিদ্যালয়ে বা সাধারণ পদ্ধতিতে এদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। স্বল্পবুদ্ধি (moron) ছেলেমেয়েদের সাধারণ স্কুলে পড়ানো চললেও তাদের জন্য পৃথক শ্রেণীবিভাগ এবং বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হয়। নির্ব্বোধ (imbecile) এবং জড় (idiot) ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষ শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা বর্ত্তমানে সব সভ্য দেশেই আছে। এই বিশেষ শিক্ষালয়গুলিতে ইন্দ্রিয়গুলির উৎকর্ষসাধনের জন্য বিশেষ পন্থা নেওয়া হয় এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির উন্নতির দ্বারা বুদ্ধির অভাব মেটানোর চেষ্টা করা হয়।

ক্ষীণবুদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধ-প্রবণতার একটা সম্পর্ক দেখা গেছে। কিশোর বয়সে যে সব ছেলেমেয়ে দুষ্কৃতিপরায়ণ হয়ে ওঠে, তাদের মধ্যে দেখা গেছে অনেকেই নিম্নবুদ্ধি-সম্পন্ন। পরিণত জীবনের অপরাধীদের পরীক্ষা করেও দেখা গেছে যে তাদের মধ্যেও নিম্নবুদ্ধির সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধি স্বল্প থাকার ফলে এসব ব্যক্তির বিচার-করণের ক্ষমতা কম থাকে এবং ফলে ভবিষ্যৎ কর্মের গুরুত্ব তারা বুঝতে পারে না। এইজন্য তারা সহজেই প্রলোভনে ভুলে যায় এবং যে কাজকে সমাজে অপরাধ বা অকরণীয় বলে মনে করা হয় সেকাজ করতে তারা ইতস্তত করে না।

উন্নত-বুদ্ধি (Gifted Children)

নিম্নবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের মত উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদেরও বুদ্ধির মানের দিক দিয়ে শ্রেণীবিভাগ করা চলে যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১১০ থেকে ১২০র মধ্যে তারা বুদ্ধির দিক দিয়ে সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে এক ধাপ উপরে। ক্লাসে বা বাড়ীতে যাদের সাধারণত আমরা চালাক বা বুদ্ধিমান আখ্যা দিয়ে থাকি তারাই এই পর্য্যায়ে পড়ে।

এর উপরের ধাপে পড়ে প্রতিভাবানের দল। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১২০ থেকে ১৪০এর মধ্যে। আচারে ব্যবহারে লেখাপড়ায় এদের পরিষ্কারভাবে সাধারণ ছেলে-মেয়েদের থেকে বেশ পৃথক বলে মনে হয়। ১৪০এর উপর যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তাদের সংখ্যা খুবই কম। এদের অতিমানবের পর্য্যায়ে ফেলা চলতে পারে। এদের মানসিক শক্তি অপরিমিত এবং উপলব্ধি, বিচার-করণ, সমস্যা-সমাধান প্রভৃতি কাজে এদের দক্ষতা অকল্পনীয়। নূতন চিন্তা ও ভাবের জনক সাধারণত এরাই হয়ে থাকে।

উন্নতবুদ্ধি হলেই যে জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারবে এমন কোন কথা নেই। পার্থিব কৃতিত্বের জন্য যেমন বুদ্ধির দরকার, তেমনি দরকার শিক্ষার এবং জ্ঞানের। কিন্তু দেখা গেছে নানা কারণে এই উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ভালভাবে হয়ে ওঠে না। প্রথমত, গতানুগতিক যে প্রথায় আমাদের স্কুলে কলেজে পড়ানো হয়ে থাকে তাতে উন্নতবুদ্ধিদের প্রতি মোটেই সুবিচার করা হয় না। ক্লাসে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন অনুযায়ী পড়ানোর ফলে উন্নতবুদ্ধিদের কাছে সে পড়ার কোনো আকর্ষণ থাকে না। ক্লাসে যা পড়ানো হচ্ছে, তা হয় তাদের কাছে

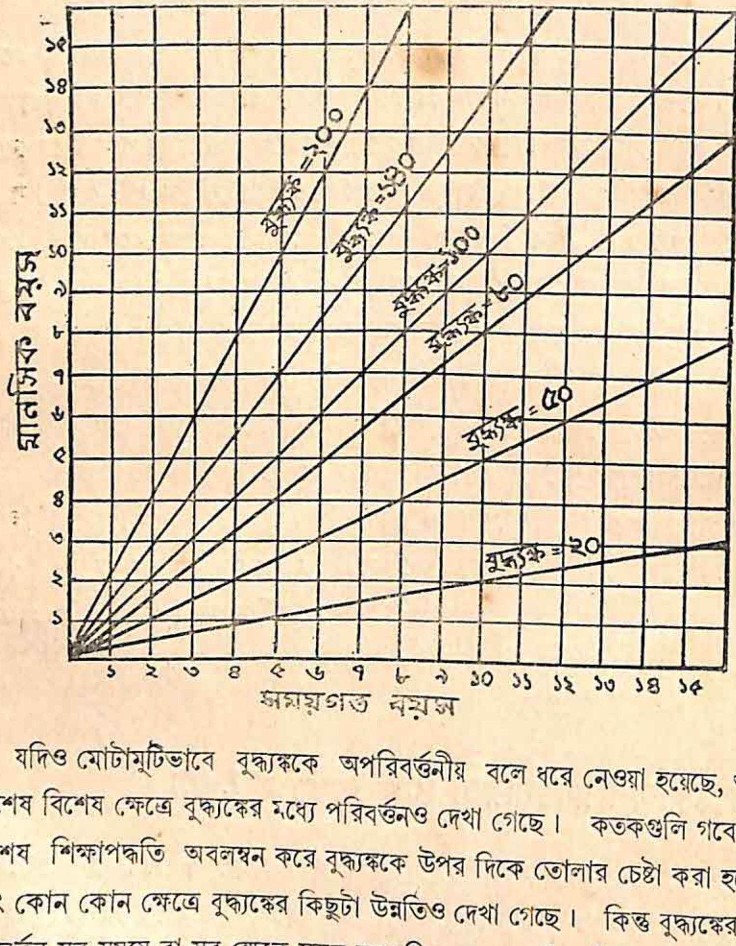
অনেক জানা, নয় তাদের প্রয়োজনের মানের অনেক নীচে। ফলে তারা ক্লাস পালায়, দুষ্কৃতি করার দিকে ঝোঁকে বা লেখাপড়াকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করতে শেখে। এইজন্যই দেখা গেছে যে স্কুলে বুদ্ধির অভীক্ষায় যারা উৎকর্ষ দেখিয়েছে তারা পরবর্ত্তী জীবনে প্রায়ই সাধারণ সাফল্যের চেয়ে বেশী কিছু লাভ করতে পারে নি।

এইজন্য আধুনিক যুগে উন্নতবুদ্ধিদের জন্যও বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাধারণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এদের না পড়িয়ে পৃথকভাবে এদের পড়ানোর পদ্ধতি আজকাল সকল প্রগতিশীল স্কুলেই প্রবর্তিত হয়েছে। সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন এবং নবীন ভাবধারার স্বষ্টির সাহায্যে সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে হলে এই উন্নতবুদ্ধিরা যাতে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া সমস্ত সমাজেরই কর্ত্তব্য। এমন কি উন্নতবুদ্ধিদের একেবারে পৃথক করে নিয়ে বিশেষ স্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থা কোন কোন দেশে প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডের পাব্লিক স্কুলগুলি এই ধরনের স্কুল এবং তার অনুকরণে ভারতেও পাব্লিক স্কুল খোলা স্বরু হয়েছে। পাব্লিক স্কুলগুলির মাধ্যমে এই সমস্যাটির সমাধান করা গেলেও এগুলি দুটি কারণে বর্জ্জনীয়। প্রথম, এগুলির পরিকল্পনা গণতন্ত্রের আদর্শবিরোধী, দ্বিতীয়ত উন্নতবুদ্ধিদের সাধারণ ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে একেবারে পৃথক করে ফেলার ফলে তাদের মধ্যে অন্যায় শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও অসামাজিক মনোভাব জাগিয়ে তোলা হয়। সেইজন্য সবচেয়ে ভাল পথ হল একই স্কুলে সকলকে রেখে বুদ্ধির মান অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করে শিক্ষা দেওয়া। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ত্রি-ধারা (three-stream) পন্থায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে এই সমস্যার একটা সমাধান করা হয়েছে।

বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্ত্তনীয়তা (Constancy of I. Q.)

সাধারণভাবে বুদ্ধ্যঙ্ককে অপরিবর্ত্তনীয় বলা হয়। অনেকের ধারণা যে ছেলেবেলায় বোকা থাকলে পরে বুদ্ধিমান হতে পারে বা ছেলেবেলায় যাকে চালাক বলে মনে হয়েছে বড় হলে সে বোকা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অসংখ্য পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে এ ধারণা ভুল। বোকা ছেলে বড় হলে বোকাই থাকে। চালাক ছেলে বড় হলে বোকা হয়ে যায় না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বাড়লেও (বুদ্ধির এই বৃদ্ধি আনুমানিক ১৫ বৎসরেই শেষ হয়ে যায়), তার বয়স এবং বুদ্ধির বৃদ্ধির মধ্যে অনুপাত একই থাকে। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের ভাষায় তার বুদ্ধ্যঙ্ক বদলায় না।

আমরা আগেই জেনেছি যে বুদ্ধির বাড় সকলের সমান নয়। কোনো ৫ বৎসরের ছেলের বুদ্ধির মান নানা রকমের হতে পারে। কিন্তু তার মানসিক বয়স এবং সময়গত বয়সের মধ্যে অনুপাত সব সময়ে একই থাকবে এবং তার বয়স বাড়লেও বুদ্ধ্যঙ্ক বদলাবে না। নীচের ছবি থেকে এ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।



যদিও মোটামুটিভাবে বুদ্ধ্যঙ্ককে অপরিবর্ত্তনীয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, তবুও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বুদ্ধ্যঙ্কের মধ্যে পরিবর্ত্তনও দেখা গেছে। কতকগুলি গবেষণায় বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করে বুদ্ধ্যঙ্ককে উপর দিকে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বুদ্ধ্যঙ্কের কিছুটা উন্নতিও দেখা গেছে। কিন্তু বুদ্ধ্যঙ্কের এই পরিবর্ত্তন সব সময়ে বা সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, যদিও বহু মনোবিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে উপযুক্ত পরিবেশের নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে বুদ্ধ্যঙ্কের মধ্যে পরিবর্ত্তন আনা যায়। তবে সাধারণভাবে বুদ্ধ্যঙ্ককে অপরিবর্ত্তনীয় বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। যদি চার বছরের কোন ছেলের বুদ্ধ্যঙ্ক পাওয়া যায় ৭০, তবে নিশ্চিন্তভাবে এটুকু বলা চলে যে ১০ বা ১২ বৎসর বয়সেও তার বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০।৭৫র মধ্যেই থাকবে, ১০০ বা তার বেশী হবে না।

প্রশ্নাবলী

1. Describe any intelligence test and show how it measures intelligence. How are Intelligence Tests useful to a teacher ?

(B. T. 1952, 1954 1956).

Ans. (পৃঃ ১০১-১০২—পৃঃ ১০৮-১১১)

2. What is intelligence ? What is the object of intelligence tests ? Discuss the question with reference to intelligence test verbal and non-verbal.

(B. T. 1955)

Ans. (পৃঃ ৮৪—পৃঃ ১০৮)

3. What are intelligence tests ? How do they resemble and differ from achievement tests ? Classify the different intelligence tests and indicate their relative usefulness.

(B. T. 1958).

Ans. (পৃঃ ৯৩—পৃঃ ১১১)

4. What are Performance Tests ? Fully describe one test by which intelligence is measured. (B. A. 1954)

Ans. (পৃঃ ১০৬—১০৭+পৃঃ ৯৩—৯৮)

5. What are Intelligence Tests ? What are their uses ? Describe any standardised Intelligence Test and indicate how it measures intelligence. (B. T. 1954, 1957, 1960)

Ans. (পৃঃ ৯৩—৯৮+পৃ : ১০৯—১১১+পৃঃ ১০৩—পৃঃ ১০৫)

6. Analyse the concept of Intelligence. How can you measure intelligence ? Discuss the practical uses of such measurement. (B.T. 1959)

Ans. (পৃঃ ৮৪—পৃঃ ১১১)

7. What are intelligence tests ? How do they differ from scholastic tests ? Discuss their respective function with illustration. (B. T. 1960, 1962)

Ans. (পৃঃ ৯৩—৯৮+পৃঃ ১০২)

8. What is intelligence? Why are some psychologists in favour of using the name 'Scholastic Aptitude Tests' instead of Intelligence Test? (B.T. 1963)

Ans. (পৃঃ ৯৩—৯৮+পৃঃ ১০২)

[বিনে-সাইমন স্কেল এবং ঐ স্কেলের অনুসরণে গঠিত বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে ভাষামূলক দক্ষতা ও অর্জ্জিত জ্ঞানের বহুল ব্যবহার করা হয় বলে অনেকে এই অভীক্ষাগুলিকে বিদ্যাবত্তার দক্ষতার অভীক্ষা বলতে চান। অর্থাৎ এই অভীক্ষাগুলির দ্বারা শিশুর পুঁথিগত বিদ্যা আহরণের দক্ষতা কতটা আছে তারই পরিমাপ করা হয়, নিছক বুদ্ধির পরিমাপ হয় না। বস্তুত এই ধরনের অভীক্ষাগুলির সঙ্গে স্কুল কলেজে সাফল্যের সহপরিবর্ত্তনেরও উচ্চ মান (·৬০) পাওয়া যায় এবং সেইজন্য বর্ত্তমানে বহুদেশে শিক্ষার্থীর সাহিত্যধর্ম্মী পাঠস্তরে প্রবেশের যোগ্যতার বিচার করা হয় এই ধরনের অভীক্ষার ফলাফলের দ্বারা।

বিনে-সাইমন স্কেল এবং অনুরূপ ভাষামূলক বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে একথা অনেকখানি সত্য হলেও ভাষাবর্জ্জিত বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি সম্পর্কে একথা বলা চলে না। উদাহরণস্বরূপ আর্মি-বিটা অভীক্ষা বা ঐ ধরনের অন্য কোন ভাষাবর্জ্জিত অভীক্ষাকে কখনই বিদ্যাবত্তর দক্ষতার অভীক্ষা বলা চলবে না। তেমনই গুড্এনাফের 'মানুষ-আঁকার অভীক্ষাটি' সম্বন্ধেও একথা বলা যাবে না।]

Is I. Q. constant? Give reasons for your answer.

Ans. (পৃঃ ১১৫—১১৬) (B. T. 1963)

৫

স্মৃতি (Memory)

'মনে করতে পারা'টা প্রাণীমাত্রেরই সহজাত বৈশিষ্ট্য। সকল প্রাণীই পূর্ব্বে শেখা বস্তু অল্পবিস্তর মনে করতে পারে। আমাদের এই ক্ষমতাটিই সাধারণ ভাষায় স্মৃতি বলে পরিচিত।

স্মৃতি বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায় তা নিয়ে প্রাচীনকালে বহু জল্পনাকল্পনা চলেছিল এবং বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী স্মৃতির বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে এসেছেন। কারও মতে স্মৃতি একটি মানসিক শক্তি, কারও মতে স্মৃতি একটি মানসিক কাজ, আবার কেউ কেউ স্মৃতিকে কল্পনা করেছিলেন এমন একটি ভাণ্ডার বা পাত্র বলে যেখানে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার প্রতীকগুলোকে জমিয়ে রাখি। এর মধ্যে প্রাচীনকালে স্মৃতির শক্তিতত্ত্বটিই সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা কল্পনা করতেন যে মন কতকগুলি শক্তির সমষ্টি। তাঁদের মতে চিন্তা করা, কল্পনা করা, বিচার করা, মনোযোগ দেওয়া, কল্পনা করা, প্রভৃতি এক একটি মনের বিশিষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট শক্তি। এগুলি চর্চার ফলে শক্তিশালী হয়, এবং চর্চার অভাবে দুর্ব্বল হয়ে ওঠে। তাঁদের মত স্মৃতিও এই ধরনের একটা মানসিক শক্তি। এই মনোবিজ্ঞানীদের শক্তিবাদী (Faculty Psychologist) নাম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্ত্তমানে মনের এই শক্তিবাদ তত্ত্বটি পরিত্যক্ত হয়েছে।

অবশ্য আধুনিক উপাদান বিশ্লেষকগণও (Factor Analysts) অনেকটা প্রাচীন শক্তিবাদীদের মতই মনের কতকগুলি শক্তির কল্পনা করেছেন। থার্ষ্টোনের মতে মনের সাতটি মৌলিক শক্তি আছে এবং স্মৃতি (memory) সেই সাতটির অন্যতম (পৃঃ ৯১ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু আধুনিক মানসিক শক্তির পরিকল্পনা প্রাচীন শক্তির পরিকল্পনা থেকে অনেক পৃথক। সুনির্দ্দিষ্ট মানসিক শক্তি বলতে যা বোঝায় অধুনা কল্পিত মানসিক সত্তাগুলি ঠিক সে রকম নয়। প্রথমত এগুলিকে একধরনের মনের উপাদান (factor) বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ধরে নেওয়া হয়েছে যে এগুলি আমাদের বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার পেছনে থাকে এবং সেগুলিকে সম্পন্ন হতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত এগুলির অস্তিত্ব নিরূপন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে সহপরিবর্ত্তন (coraelation) নির্ণয়ের জটিল গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে

প্রকৃতপক্ষে স্মৃতি হল একটি মানসিক প্রক্রিয়া। আরও নিখুঁতভাবে বলতে গেলে স্মৃতি একটি মানসিক প্রক্রিয়া নয়, তিনটি স্বতন্ত্র মানসিক প্রক্রিয়ার সমষ্টি। যথা শিখন (learning), সংরক্ষণ (retaining) এবং স্মরণ (remembering)।

স্মৃতির প্রথম ধাপে আসে শিখন। যা শেখা হয়নি তা মনে রাখার কথা ওঠে না। অতএব শিখন হল স্মৃতির অপরিহার্য্য প্রাথমিক সোপান।

স্মৃতির দ্বিতীয় ধাপে আসে শেখা বস্তুটির সংরক্ষণ (retention) বা মনে রাখা। এই ধাপে, আমরা যেটা শিখলাম সেটি আমরা মনের মধ্যে ধরে রাখি। এই প্রক্রিয়াটি স্মৃতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় স্তর। শেখা বস্তুটিকে কি ভাবে মনের মধ্যে ধরে রাখা হয় তার নিখুঁত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে শেখা বস্তুটির একটা বিশেষ প্রতীক (symbol) আমাদের মস্তিষ্কের কোষে কোন ভাবে যে সংরক্ষিত করা হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের মতে স্মৃতির অংশগুলি পৃথক পৃথক ভাবে মস্তিষ্কের কোন একটি কুঠরীতে থাকে এবং দরকার পড়লে তাদের গুপ্ত আশ্রয় থেকে টেনে বার করে আনা হয়। তাছাড়া এই স্মৃতির অংশগুলি অপরিবর্ত্তিত অবস্থাতেই চিরকাল নিজেদের নির্দ্দিষ্ট সত্তা বজায় রেখে আসে, যদিও সময়ের অতিবাহনে তারা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকে। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে এ ব্যাখ্যা একান্ত ভুল।

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী মুলার (Muller) স্মৃতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁর বহু প্রচলিত স্মৃতিছাপ (memory trace) তত্ত্বটি উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর এই তত্ত্ব অনুযায়ী মস্তিষ্কের কোষে আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুগুলি কতকগুলি ছাপরূপে সংরক্ষিত হয়। এই ছাপগুলি অনেকটা প্লেটে বা ফিল্মে সংরক্ষিত ছবির সঙ্গে তুলনা করা যায়। একটা ফোটো প্লেট বা ফিল্ম যেমন একটা ত্রি-আয়তন বস্তুর দ্বি-আয়তন ছবি ধরে রাখতে পারে তেমনই আমাদের সবরকম অভিজ্ঞতাকেই ছাপরূপে আমাদের মস্তিষ্ক ধরে রাখতে পারে। যখন মনে করার প্রয়োজন হয় তখন আমরা সেই ছাপগুলিকে জাগিয়ে তুলতে পারি এবং তাদেরই সাহায্যে আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতাকে পুনঃসৃষ্টি করতে পারি।

কিন্তু নানা সাম্প্রতিক পরীক্ষণ থেকে মুলারের এই তত্ত্বটি ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক সংব্যাখ্যানে মস্তিষ্কে যা সংরক্ষিত হয় তা কোনো বিশেষ নির্দ্দিষ্ট সত্তাসম্পন্ন কোন পৃথক বস্তু নয়। অর্থাৎ প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের কল্পিত স্মৃতির

অংশ বা মূলারের কল্পিত স্মৃতিছাপ বলে নির্দ্দিষ্ট অস্তিত্বের কোন বস্তু মস্তিষ্কে সঞ্চিত হয় না। সত্যকার মস্তিষ্কে যা সংরক্ষিত হয় তা হল বিশেষ একটি মস্তিষ্কের সংগঠন (brain structure)। অর্থাৎ এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে যখনই আমরা কিছু শিখি, সেটি কারোও টেলিফোন নাম্বারই হোক আর আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক-তত্বই হোক, তখনই আমাদের মস্তিষ্কে গঠনমূলক কোন পরিবর্ত্তন ঘটে। এখন ঐ বিশেষ শেখা বস্তুটি মনে রাখার অর্থ হল মস্তিষ্কের ঐ পরিবর্ত্তিত সংগঠনটি সংরক্ষিত করা। হোয়াগল্যাণ্ড (Hoagland) মস্তিষ্কের এই সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে তারযন্ত্রের বার্ত্তাগ্রহণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। একটি তারে যখন সংবাদ সংরক্ষিত হয় তখন ঐ তারের পরমাণুগুলির মধ্যে বিশেষ একটা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। তারের সেই পারমাণবিক পরিবর্ত্তনের রূপে সংবাদটিকে ধরে রাখা হয় এবং দরকার পড়লেই সেটিকে আবার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। মস্তিষ্কেরও এই রকম সংগঠনঘটিত পরিবর্ত্তনের মাধ্যমে আমরা শেখা বস্তুটিকে সংরক্ষিত করে থাকি। হোয়াগল্যাণ্ডের এই ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক উদাহরণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মস্তিষ্কের সংরক্ষণ-পদ্ধতির সন্তোষজনক ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তৃতীয় বা শেষ ধাপে ঘটে এই মস্তিষ্কে সংরক্ষিত বস্তুটিকে স্মরণ করার কাজটি। অর্থাৎ যেটা আমরা সংরক্ষণ করেছি সেটিকে দরকারমত আমরা প্রকাশ বা অভিব্যক্ত করি। হোয়াগল্যাণ্ডের ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে বলতে হয় যে যখন আমরা কিছু স্মরণ করি তখন আমাদের মস্তিষ্কের সংগঠনের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে যাকে আমরা সচরাচর স্মৃতি বলে থাকি তার প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ—

শিখন (learning)—→**সংরক্ষণ** (retaining)—→**স্মরণ** (remembering)

স্মরণের শ্রেণী বিভাগ

স্মরণ প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দুটি বিভিন্ন শ্রেণীর স্মরণের সন্ধান পাই। প্রথম,মনে করা (recalling) এবং দ্বিতীয় 'চেনা' (recognising), এই দুটি প্রক্রিয়ার দ্বারা স্মরণের কাজ হলেও প্রকৃতির দিক দিয়ে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। যখন আমরা পূর্ব্বে জানা কোন নাম বা সাল বা ঘটনা মনে জাগানোর চেষ্টা করি তখন আমাদের স্মরণ-প্রক্রিয়াটিকে মনে করা নাম দিই। এখানে আমাদের মনে করার কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য একটি উদ্দীপক থাকে বটে, কিন্তু সেটির সঙ্গে প্রকৃত বস্তুটির যোগাযোগ থাকলেও সেটি একটি

পৃথক বস্তু। কিন্তু 'চেনা'র ক্ষেত্রে প্রকৃত মনে করার বস্তুটিকেই উপস্থাপিত করা হয় এবং সেটি ঠিক সেই বস্তুটি কিনা তাই চিনতে বলা হয়।

মনে করার দৃষ্টান্ত : ইংরাজী বর্ণমালায় L'র পর কোন্ বর্ণটি আসে ?

চেনার দৃষ্টান্ত : P. O, S, B, M, A—এর মধ্যে কোন্‌টিকে এম্ বলা হয় ?

মনে করা (Recall)

মনে করা বলতে তাহলে বোঝাচ্ছে সেই মানসিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা পূর্ব্বে শেখা যে কোন বস্তুকে মনে জাগিয়ে তোলা হয়। এই ধরনের মনে করা বস্তুর শ্রেণী নানা প্রকারের হতে পারে, যেমন,

১। কোন তালিকা, পদ, তথ্য বা উপাদান যা আমরা পূর্ব্বে শিখেছিলাম এবং এখন যেগুলিকে ইচ্ছা করে মনে করছি।

২। কোন পূর্ব্বে শেখা কাজ সম্পন্ন করা।

৩। ইন্দ্রিয়জাত প্রতিরূপগুলিকে জাগিয়ে তোলা।

৪। ইচ্ছা না থাকলেও যে সব কথা বা ধারণা মনে এসে যায়।

৫। কোন একটা উদ্দেশ্য সম্পাদনে যেখানে স্বেচ্ছায় কোন একটি বিশেষ বিষয় মনে করা। যেমন, একটা বাক্য পড়তে গিয়ে তার মানেটা মনে করার চেষ্টা করা।

৬। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে চিন্তন বা যাকে আমরা বিচারকরণ বলি।

প্রত্যক্ষ (Direct) ও অপ্রত্যক্ষ (Indirect) মনে করা

যখন একটা বস্তু থেকে আমাদের স্মরণ সরাসরি ঈপ্সীত বস্তুটিতে যায় তখন সেই মনে করাকে প্রত্যক্ষ মনে করা বলা হয়। আর যখন মনে করা কাজটি অন্য এক বা একাধিক মধ্যবর্ত্তী বস্তুর মধ্যে দিয়ে ঈপ্সীত বস্তুতে পৌঁছয় তখন তাকে অপ্রত্যক্ষ মনে করা বলে। যেমন একজনকে শেখান হল নীচের শব্দযুগ্মগুলির মধ্যে প্রথমটি শুনলেই দ্বিতীয়টি বলবে। অর্থাৎ তার স্মৃতিতে প্রতি শব্দদ্বয়ের মধ্যে একটি করে অনুষঙ্গ স্থাপন করে দেওয়া হল। যেমন

পৃথিবী—মৃত্যু খাদ্য—সুখ মহাকাব্য—বীর

ইত্যাদি

এখন একদিন বা এক সপ্তাহ পরে ঐ ব্যক্তিকে শব্দযুগ্মগুলির প্রথমটি তার সামনে উপস্থাপিত করে দ্বিতীয়টি বলতে বলা হল। যদি দেখা যায়, যে সে সরাসরি অর্থাৎ কোন বস্তুর কথা না ভেবে প্রথম শব্দ থেকে দ্বিতীয় শব্দে যেতে পারল তাহলে তার মনে করাকে প্রত্যক্ষ মনে করা বলা হয়। আর যদি প্রথম শব্দ থেকে দ্বিতীয় শব্দে যেতে মধ্যবর্ত্তী এক বা অনেক শব্দ বা ধারণার কথা ভেবে তাকে যেতে হয় তাহলে তার মনে করাকে অপ্রত্যক্ষ মনে করা বলা হবে। এই মধ্যবর্ত্তী স্মৃতিগুলি কিন্তু ঈপ্সীত শব্দ না হলেও ঈপ্সীত শব্দে পৌছবার পক্ষে সহায়ক। যেমন, কেউ 'পৃথিবী' শুনে বলল 'জন্ম' বা 'খাদ্য' শুনে বলল 'তৃপ্তি' বা 'মহাকাব্য' শুনে বলল 'যুদ্ধ'। পরে এই মধ্যবর্ত্তী শব্দ বা ধারণাগুলিই অভীক্ষার্থীকে তাদের প্রকৃত শব্দটিতে পৌছতে সাহায্য করে।

মনে করার গতি

মিকট (Michotte) এবং পর্টিকের (Portych) পরীক্ষণ থেকে দেখা যায় যে স্মরণের ক্ষেত্রে নির্ভুল উত্তর পাওয়া যদি, প্রশ্ন করা হয়—

শেখার ঠিক পরেই	তবে ১·৫ সেঃ পরে
শেখার এক দিন পরে	তবে ২·৪ সেঃ পরে
শেখার এক সপ্তাহ পরে	তবে ৩·০ সেঃ পরে

আংশিক বা অসম্পূর্ণ মনে করা

অনেক সময় দেখা যায় কোন নাম বা তারিখ বা নম্বর মনে আসি আসি করেও আসছে না। তখন বুঝতে যে হবে তখনও পুরো মনে পড়েনি অর্থাৎ এ সময়ে কোন রকমের একটা ধাক্কা বা ঝাকুনি পেলেই হঠাৎ সেটা মনে পড়ে যেতে পারে। অনেক সময় দেখা গেছে যে কোনভাবে ঈপ্সীত নাম বা কথাটির একটা অংশ বা অস্পষ্ট মিলসম্পন্ন কিছু ব্যক্তির চোখে পড়লে বা শুনলেও পূর্ণ স্মরণ এসে যায়।

প্রতিরূপ ও স্মরণ

স্মরণের একটি বড় বিষয়বস্তু হল প্রতিরূপ। প্রতিরূপ নানা প্রকারের হতে পারে। শব্দতালিকা বা লিখিত পদ্যাংশ, গদ্যাংশ ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষণ চালান সম্ভবপর কিন্তু প্রতিরূপের চিরপরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির জন্য প্রতিরূপ নিয়ে পরীক্ষণ চালান বেশ দুরূহ। তবু স্মরণের বহু পরীক্ষণ প্রতিরূপ নিয়ে সম্পন্ন হয়েছে।

চেনা (Recognition)

স্মরণের বিষয়বস্তু যত ব্যাপক, চেনা'র বিষয়বস্তু তত ব্যাপক হতে পারে না। চেনা কথাটি প্রযোজ্য কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তুর ক্ষেত্রে। চেনা কাজটি মনে করার চেয়ে অনেক বেশী ইন্দ্রিয়-নির্ভর। কেননা চেনা কাজটি সম্পন্ন করতে কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লাগেই। কোন কিছু দেখে বা শুনে বা স্পর্শ করে বা গন্ধ শুঁকে বা আস্বাদ নিয়েই আমরা বলতে পারি যে বস্তুটি আমরা চিনি কি না।

স্মরণ এবং চেনার সংঘটনমূলক পার্থক্য হচ্ছে যে স্মরণে ঈপ্সীত বস্তুটি দেওয়া থাকে না, খুজে নিতে হয়, চেনাতে বস্তুটি দেওয়াই থাকে, সেটি সেই বস্তু কিনা তাই বলতে হয়। স্মরণের ক্ষেত্রে 'ক'কে উপস্থাপিত করে 'খ'কে মনে করতে বলা হয়, যেমন বাবরের নাম করে বললাম তার ছেলে কে বল? কিন্তু চেনার ক্ষেত্রে 'ক'টি দেওয়াই থাকে এবং ঐটি 'ক' কিনা তাই চিনতে বলা হয়। যেমন আরও দশটা ছবির মধ্যে বাবরের ছবি রেখে বললাম, বলত এর মধ্যে বাবর কে? এইজন্যই চেনা 'স্মরণের' চেয়ে শক্ত। ২৫টি অর্থহীন শব্দতালিকা একবার ৯৬ জন অভীক্ষার্থীকে পরিবেশন করে 'স্মরণ' ও 'চেনা'—দুভাবে তাদের স্মৃতির পরীক্ষা করা হল। দেখা গেল স্মরণ প্রক্রিয়ায় নির্ভুল মনে করতে পারল ১২ জন, কিন্তু 'চেনা' প্রক্রিয়ায় নির্ভুল মনে করল ৪২ জন। এ থেকে দেখা যাচ্ছে চেনা মনে করা'র চেয়ে প্রক্রিয়ারূপে অধিকতর সহজসাধ্য।

চেনা কাজটি ভুল হতে পারে যদি উপস্থাপিত উদ্দীপকটির সঙ্গে প্রকৃত উদ্দীপকটির কিছুমাত্রায় মিল থাকে। এই মিলের মাত্রা যত বেশী হবে ততই ভুল চেনার হার বাড়বে। উদাহরণস্বরূপ যদি প্রশ্ন করা যায়, নীচের সালগুলির মধ্যে কোন্‌টি গান্ধীজীর ডাণ্ডী অভিযানের সাল?

১৯০৩, ১৯৩০, ১৯৪৭, ১৯৩৯

এখানে প্রকৃত উত্তর হল ১৯০৩ কিন্তু অনেকে প্রদত্ত সংখ্যাগুলির মধ্যে নিছক আকৃতিগত মিল থাকায় ১৯৩০ বা ১৯৩৯ও উত্তররূপে বলতে পারে। অবশ্য যদি পূর্ব্বশিখন অতিদৃঢ় হয় তাহলে এই মিল থাকা সত্ত্বেও চেনা ভুল না হতে পারে।

স্মৃতি ও শিখন

শিখনের সঙ্গে স্মৃতির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। স্মৃতি ছাড়া কোন কিছু শেখাই সম্ভব নয়। যে ছেলে হামাগুড়ি দিতে শিখলো, বা যে ছাত্র লিখতে শিখলো, বা যে

কুকুর মুখে করে লাঠিটা আনতে শিখলো, তারা যদি সেই শেখাটা মনে না রাখতে পারে তা হলে পরের দিন আবার তাদের গোড়া থেকে শেখা সুরু করতে হবে এবং কোনদিনই কোন শেখা এগোবে না। অতএব স্মৃতিকে শেখার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে বর্ণনা করা যায়।

শেখার বিষয়বস্তুকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়—সঞ্চালনমূলক (motor) এবং ভাষামূলক (verbal)। ভাষামূলক বস্তুর মত সঞ্চালনমূলক অভিজ্ঞতাগুলিকেও আমরা মনে রেখে থাকি, যেমন রান্না করা, সাইকেল চড়া, সাঁতার কাটা এ সব কাজও আমরা স্মৃতি থেকে করে থাকি। বার বার করতে করতে অনেক সঞ্চালনমূলক কাজ আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। অবশ্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ কাজই সঞ্চালনমূলক এবং ভাষামূলক কাজের মিশ্রণ।

স্মৃতি এক না বহু ?

আমরা দেখেছি যে স্মৃতি একটি বিশেষ শক্তি নয়। এটি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার প্রভাব অনুযায়ী মস্তিষ্কের বিশেষ আকৃতি ধারণের প্রক্রিয়া। অতএব এই প্রক্রিয়াটি সর্ব্বক্ষেত্রে যে একই ভাবে কাজ করবে তার কোনো অর্থ নেই। কোন বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রক্রিয়া কখনও ভাল হয়, আবার কখনও কখনও আশানুরূপ হয় না। যেমন, কারও পক্ষে ইতিহাস মনে রাখা সহজ হয়, কিন্তু অঙ্ক মনে রাখা শক্ত হয়। প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই কাহিনী, আলোচনা প্রভৃতি অর্থসম্পন্ন বিষয়গুলি মনে রাখতে কষ্ট হয় না, কিন্তু ইতিহাসের সাল, বাড়ীর নম্বর প্রভৃতি অর্থহীন বিষয়গুলি মনে রাখা শক্ত হয়। আবার চোখে দেখা জিনিষ অনেক বেশী মনে থাকে, কানে শোনা বা বইতে পড়া জিনিষের চেয়ে। এসব কারণে বলা হয় যে স্মৃতি একটি নয়, স্মৃতি বহু। স্মৃতিগত এই বৈষম্যের কারণ কিন্তু এ নয় যে মস্তিষ্কের এ প্রক্রিয়া ক্ষেত্রভেদে কম হয় বা বেশী হয়। আসলে এই বৈষম্য নির্ভর করে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রকৃতি ও শিখন-পদ্ধতির উপর। কতকগুলি বিষয় সহজেই মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করেও মস্তিষ্কের সংগঠনে ঈপ্সিত পরিবর্ত্তন আনতে পারে, আবার কতকগুলি বিষয় তা পারে না। শিখনের পদ্ধতি সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। অর্থাৎ কোন পদ্ধতিতে শিখলে সংরক্ষণ ভাল হয় আবার কোন পদ্ধতিতে শিখলে সংরক্ষণ দুর্ব্বল হয়।

বার্গসঁর শ্রেণীবিভাগ

স্মৃতির এই বৈশিষ্ট্যের জন্য নানা চিন্তাবিদ্ স্মৃতির নানা শ্রেণীবিভাগ করেছেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক বার্গসঁর (Bergson) মতে স্মৃতি দুপ্রকারের, অভ্যাস স্মৃতি (Habit Memory) ও প্রতিরূপ স্মৃতি (Image Memory)। কোনো শিক্ষণীয় বস্তুর বার বার চর্চা বা অনুশীলনের ফলে যখন সেটা অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন সেটি মনে করাকে অভ্যাস স্মৃতি বলা চলে। এই ধরনের স্মৃতির মধ্যে কোনরূপ ইচ্ছামূলক প্রচেষ্টা থাকে না এবং এটি পরিপূর্ণ যান্ত্রিক প্রকৃতির। কোন ছেলে যখন নামতা মুখস্থ বলে বা ভাল করে শেখা কোন কবিতা আবৃত্তি করে তখন সে পুরোপুরি অভ্যাস থেকেই করে থাকে। তার শেখা বিষয়বস্তুটির অংশগুলি তার মনে পরস্পরের সঙ্গে শৃঙ্খলের মত বাঁধা থাকে এবং প্রথমটি মনে পড়লেই একটির পর একটি বাকিগুলি নিজে নিজে এসে যায়। ব্যক্তিকে কোনরূপ আর প্রচেষ্টা করতে হয় না। এই স্মৃতিকে যান্ত্রিক (rote) স্মৃতিও বলা হয়। বার্গসঁর মতে অভ্যাস স্মৃতির ঠিক বিপরীত হলো প্রতিরূপ স্মৃতি (Image Memory)। এই ধরনের স্মৃতিতে শিক্ষার বিষয়-বস্তুটি টুকরো টুকরো ভাবে ব্যক্তির মনে আসে না। তার সম্পূর্ণ প্রতিরূপটি একসঙ্গে তার মনে জেগে ওঠে। এই শ্রেণীর স্মৃতিতে সত্য সত্যই অতীতের একটা ঘটনা মনে করার কাজটি সংঘটিত হয় এবং এতে ব্যক্তির নিজস্ব প্রচেষ্টা থাকে। এইজন্য এই স্মৃতিকে বার্গসঁ প্রকৃত স্মৃতি (True Memory) নামও দিয়েছেন। তবে কেবলমাত্র প্রতিরূপমূলক স্মৃতিকেই প্রকৃত স্মৃতি আখ্যা দেওয়া চলে না। কেননা স্মৃতির উপাদান প্রতিরূপ ছাড়াও অন্য অনেক কিছু হতে পারে। যেমন, ধারণা (concept), ভাষা, সংখ্যা প্রভৃতি।

আধুনিক শ্রেণীবিভাগ

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা নানা রকম স্মৃতির কথা উল্লেখ করেছেন। যথা—

যান্ত্রিক স্মৃতি (Rote Memory)—যখন শিক্ষার বিষয়বস্তুটির অর্থ বা বিভিন্ন অংশগুলির অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ না বুঝে ব্যক্তি সেটি মনে রাখে তখন তাকে যান্ত্রিক স্মৃতি বলে। যেমন, নামতা বা অর্থহীন শব্দ-তালিকা বা গাড়ীর বা টেলিফোন নম্বর ইত্যাদি মনে রাখা।

বিচারমূলক স্মৃতি (Logical Memory)—যখন শিক্ষার বিষয়বস্তুটির অর্থ বুঝে এবং বিচার-শক্তির সাহায্যে তাহার অন্তর্নিহিত সঙ্গতি হৃদয়ঙ্গম করে সেটি মনে

Pratinajana

রাখা হয় তখন তাকে বিচারমূলক স্মৃতি বলে। যেমন কোন একটা গদ্য বা পদ্যের অংশ পড়ে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে সেটিকে মনে রাখা। যান্ত্রিক স্মৃতির চেয়ে এই স্মৃতি অনেক বেশী সহজসাধ্য ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

অনুষঙ্গমূলক স্মৃতি (Associative Memory)—যখন আমরা একটা বস্তুর সঙ্গে অপর একটি বস্তুকে এমনভাবে মনের মধ্যে সংবদ্ধ করতে পারি যাতে একটির কথা বা ছবি মনে হলে অপরটির ছবি মনে আসে তখন সেই স্মৃতিকে অনুষঙ্গমূলক স্মৃতি বলা হয়। কারও নাম, বাড়ীর নম্বর, টেলিফোন নম্বর ইত্যাদি মনে রাখা এই স্মৃতির অন্তর্ভুক্ত। যান্ত্রিক স্মৃতি ও অনুষঙ্গমূলক স্মৃতির মধ্যে প্রভেদ খুব বেশী নয় এবং অনেক যান্ত্রিক স্মৃতিই অনুষঙ্গমূলক। অনুষঙ্গের সাহায্যে যান্ত্রিক স্মৃতি সৃষ্টি করা এবং তাকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘদিন স্থায়ী করা সম্ভব হয়। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সাধারণ মানুষের বেলায় যান্ত্রিক স্মৃতি কষ্টসাধ্য এবং বেশীদিন স্থায়ী হয় না। যান্ত্রিক স্মৃতিকে স্থায়ী করতে হলে অতিরিক্ত মাত্রায় পুনরাবৃত্তি করতে হয় অর্থাৎ যাতে বিষয়টির অতিশিখন হয় তার ব্যবস্থা করতে হয়। গাড়ির নম্বর, বাড়ির নম্বর বা ইতিহাসের সাল ইত্যাদি মুখস্থ করতে গেলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

চাক্ষুষ স্মৃতি (Visual Memory)—যখন চোখে দেখা কোন বস্তুর আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যাদি আমরা মনে রাখি তখন তাকে চাক্ষুষ স্মৃতি বলা হয়। এই রকম **শ্রাবণ স্মৃতি, স্পর্শজ স্মৃতি, ঘ্রাণজ স্মৃতি, স্বাদজ স্মৃতি** প্রভৃতি হতে পারে। কোন একটা সুর বা শব্দ কোন বিশেষ স্পর্শ, কোন বিশেষ গন্ধ, কোন বিশেষ আস্বাদ ইত্যাদি আমরা খুবই মনে রাখতে পারি। এই ইন্দ্রিয়জাত স্মৃতিগুলির মধ্যে আমাদের দৈনন্দিন জ্ঞানে সবচেয়ে অধিক পরিমাণে আমরা ব্যবহার করে থাকি চাক্ষুষ স্মৃতির, কেন না আমাদের জ্ঞানের বড় একটা অংশ হল চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দান।

প্রতিরূপ (Images)

ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি যখন আমরা সেটিকে মনে রাখার চেষ্টা করি তখন প্রকৃতপক্ষে তার একটা প্রতীক আমরা মস্তিষ্কে সংরক্ষণ করি। এই ইন্দ্রিয়মূলক অভিজ্ঞতার প্রতীকের নাম হল প্রতিরূপ (image)। প্রায়ই দেখা যায় যে কোন কিছু পূর্ব্বে দেখা বা শোনা বা স্পর্শ করা বা ঘ্রাণ গ্রহণ করা বা আস্বাদন গ্রহন করার অভিজ্ঞতা মনে করার চেষ্টা করলে তার একটি অস্পষ্ট ছবি

আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একেই প্রতিরূপ বলে। যতগুলি ইন্দ্রিয়, প্রতিরূপও তত প্রকারের হতে পারে।

তবে প্রতিরূপই একমাত্র স্মৃতির উপাদান নয়। আমরা যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষণ (perception) করি, সেগুলি অন্যান্যরূপে আমাদের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হতে পারে। ভাষা, ধারণা (concept), সংখ্যা ইত্যাদিও আমাদের স্মৃতির উপাদান হতে পারে। কোন কাজ করার প্রক্রিয়া, দেহের বিশেষ অঙ্গের সঞ্চালন যেমন ঝাঁকানি বা পিছলে যাওয়া প্রভৃতি সঞ্চালনমূলক প্রক্রিয়াও আমরা মনে রাখতে পারি।

স্মৃতি, কল্পন ও চিন্তন (Memory, Imagination & Thinking)

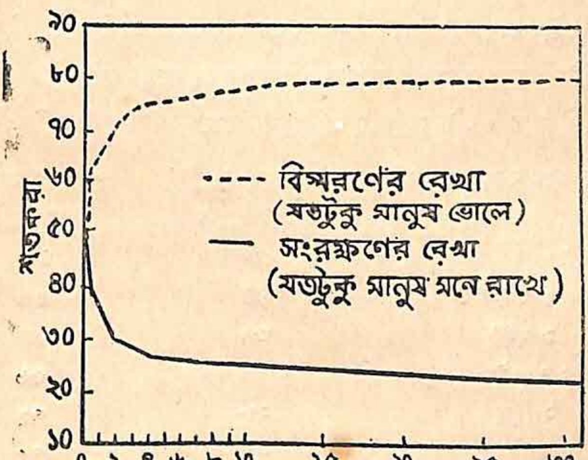
মনে করা ও কল্পনা করা উভয়েই মানসিক প্রক্রিয়া। উভয়ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত শেখা বস্তুগুলির প্রতীকগুলিকে জাগিয়ে তুলি।তবে পার্থক্যের মধ্যে মনে করার বেলায় যেমনটি আমরা শিখেছিলাম প্রতীকগুলিকে হুবহু সেইভাবে জাগিয়ে তুলি এবং প্রতীকগুলির বিন্যাসে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করি না। কিন্তু কল্পনা করার বেলায় ঐ প্রতীকগুলিকে খুসীমত নতুনভাবে সাজাই। ফলে স্মৃতির ক্ষেত্রে জাগিয়ে তোলা প্রতীকগুলোর সঙ্গে অতীতের অভিজ্ঞতার কোনও পার্থক্য থাকে না। সেগুলির বিন্যাসের ধারা, অনুক্রম, সবই বাস্তব অভিজ্ঞতায় যেমন ছিল স্মৃতিতেও তাই থাকে কিন্তু কল্পনের ক্ষেত্রে জাগিয়ে তোলা প্রতীকগুলো এবং আমাদের অতীতের প্রকৃত অভিজ্ঞতার মধ্যে কোন মিল থাকে না। যেমন, ঘোড়া, পাখীর ডানা, প্যারিস, ইফেল টাওয়ার প্রভৃতির ছবি পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা থেকে মনে আনার নাম স্মরণ করা আর এগুলিকে ইচ্ছামত সাজিয়ে যদি মনে করা যায় যে প্যারিসের ইফেল টাওয়ারের উপর দিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে উড়ে যাচ্ছি তবে সেটি হল কল্পনা করা। এই জন্য অনেকে স্মৃতিকে পুনরাবৃত্তি-মূলক (reprcductive) কল্পন এবং প্রকৃত কল্পনাকে সৃজনমূলক (productive) কল্পন বলে বর্ণনা করেন। এককথায় স্মৃতি হল পূর্ণ বাস্তব-নির্ভর আর কল্পনা হল বাস্তব-বিলাসী।

প্রকৃতপক্ষে কল্পন হল চিন্তন-প্রক্রিয়ার (Thinking) একটি বিশেষ প্রকার। চিন্তন, কল্পন, বিচার-করণ এগুলির প্রত্যেকটিই এক প্রকার মানসিক আচরণ এবং প্রত্যেকটিই স্মৃতির উপর নির্ভরশীল। স্মৃতিও একপ্রকার মানসিক আচরণ, তবে এই আচরণে কোনও নতুনত্ব নেই এবং পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্য যখন

তার মধ্যে নতুনত্ব আনা হয় তখনই সেটা চিন্তনের পর্য্যায়ে গিয়ে পড়ে। যা শিখেছি তা যদি হুবহু মনে করি তখন হল স্মৃতি আর যখন শেখা প্রতীকগুলোর সাহায্যে নতুন মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করি তখন সেটা হল চিন্তন বা কল্পন বা বিচারকরণ। ("চিন্তন"এর পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

বিস্মৃতি (Forgetting)

আলো ও অন্ধকারের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্মৃতি ও বিস্মৃতির মধ্যে ঠিক সেই সম্বন্ধ। মস্তিষ্কে শেখা অভিজ্ঞতার সংরক্ষণের নাম হল স্মৃতি এবং সেই সংরক্ষণের অভাব হল বিস্মৃতি। কোন কিছু একবার শেখার পর যদি দেখা যায় সেটি মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয় নি তখন তাকে বিস্মৃতি বলা হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে স্মৃতি ও বিস্মৃতি মূলত একটি প্রক্রিয়া। দুটি বিভিন্ন দিক থেকে দেখার জন্য একই প্রক্রিয়ার দুটি বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে।



[স্মরণ ও বিস্মরণের রেখা]

ওপরের ছবিতে দেখা যাচ্ছে যদি কেউ দুদিনে ৩০%মনে রাখে, তবে দুদিনে সে ৭০% ভোলে, তেমনই যদি ৬ দিনে ২৪% মনে রাখে তবে সে ঐ ৬ দিনে ৭৬% ভুলেছে, যদি ১ মাসে ২৫% মনে রাখে তবে ১ মাসে ৭৫% সে ভোলে।

বিস্মৃতির প্রকৃতি (Nature of Forgetting)

ভুলে যাওয়া মনে রাখার মতই মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ভুলে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তাও প্রচুর। একটা জিনিষ শিখতে গিয়ে যে ভুলগুলি শিক্ষার্থী অসতর্কতায় একবার শিখে ফেলে সেগুলি সে পরে ভুলে না গেলে শুদ্ধ পন্থাটা কখনই সে শিখতে পারে না। শুদ্ধ বস্তুগুলি মনে রাখতে হলে অশুদ্ধ বস্তুগুলি প্রথমে তাকে ভুলতেই হবে। অতএব প্রয়োজনীয় বস্তু মনে রাখতে হলে অপ্রয়োজনীয়কে ভুলতে হবে, নির্ভুলকে মনে রাখতে হলে ভুলকে ভুলতে হবে। অতএব ভোলা কেবল স্বাভাবিকই নয়, অপরিহার্য্যও।

স্মৃতি ও বিস্মৃতি নিয়ে যে মনোবিজ্ঞানী প্রথম গবেষণা স্বরু করেন তাঁর নাম এবিংহস্ (Ebbinghaus)। ইনিই প্রথম স্মৃতিকে পরীক্ষণাগারে নিয়ে আসেন। এঁর পরিচালিত পরীক্ষণগুলি থেকে মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেছে।

মানুষ কি হারে ভোলে তার একটা মোটামুটি হিসাব তিনি দিয়ে গেছেন। যদি একটি অর্থ-বর্জ্জিত শব্দ তালিকা মুখস্থ করার পর কিছু সময়ের ব্যবধানে সেটি মনে করার চেষ্টা করা হয় তবে দেখা যাবে যে আমরা তালিকাটির কিছুটা ভুলে গেছি, সম্পূর্ণটা মনে করতে পারছিনা। কত সময় পরে কতটা মনে থাকে, আর কতটা ভুলে যাই তার একটা তালিকা এবিংহস দিয়েছেন। তালিকাটি এইরূপ—

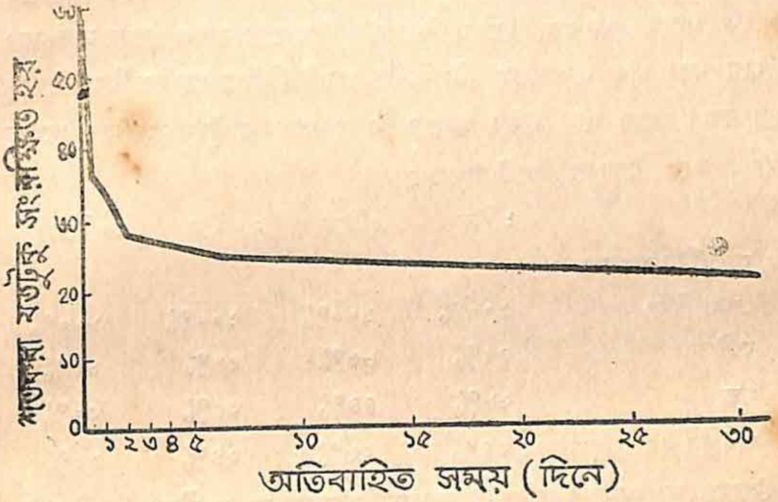
শেখা ও মনে করার মাঝে সময়ের ব্যবধান	শতকরা কতটা মনে থাকে	শতকরা কতটা ভুলে যাই
২০ মিনিট	৫৮	৪২
১ ঘণ্টা	৪৪	৫৬
৯ ঘণ্টা	৩৬	৬৪
২৪ ঘণ্টা	৩৪	৬৬
২ দিন	২৮	৭২
৬ দিন	২৫	৭৫
৩১ দিন	২১	৭৯

[এবিংহসের মতে স্মরণ ও বিস্মরণের হার]

এবিংহসের তালিকাটি রেখায় রূপান্তরিত করলে নীচের চিত্রটি পাওয়া যায়।

এবিংহসের এই গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে যে কোন কিছু শেখার পর প্রথমেই আমাদের একটা বড় রকমের বিস্মৃতি ঘটে। একে প্রাথমিক বিস্মরণ বলা চলে।

উপরের তালিকা অনুযায়ী অর্থহীন শব্দতালিকা বা বিষয়ের ক্ষেত্রে ৪২% বিস্মরণ ঘটছে ২০ মিনিট পরেই। তারপর ২০ মিনিট থেকে ২ দিন পর্যন্ত বিস্মরণ ঘটে



[এবিংহসের সংরক্ষণ-রেখা (Curve of Retention)।

বেশ দ্রুত, আরও ৩০%। কিন্তু ২ দিনের পর থেকে বিস্মরণের গতি মন্থর হয়ে যায় এবং ১৫ দিন বা এক মাসের পর তেমন উল্লেখযোগ্য বিস্মরণ আর ঘটে না। এ দীর্ঘ সময়ে মাত্র আরও ৫% বিস্মরণ ঘটে কিন্তু তারপর আর বিস্মরণ ঘটে না বললেই চলে। এ থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছান যায়। সেটি হচ্ছে যে মানুষ কখনও কোন কিছু সম্পূর্ণ ভুলে যায় না। সমস্ত শেখা বস্তুর কিছু না কিছু তার মস্তিষ্কে চিরকাল সংরক্ষিত হয়ে থাকবে। এবিংহসের প্রদত্ত উপরের চিত্রটিকে সংরক্ষণের রেখা (Curve of Retention) বলা হয়।

এবিংহসের পর বহু আধুনিক মনোবিজ্ঞানী বিস্মরণের হার নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁদের প্রদত্ত তালিকা এবিংহসের তালিকার সঙ্গে পুরোপুরি না মিললেও মৌলিক নীতির দিক দিয়ে এবিংহসের তালিকার সঙ্গে সেগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই।

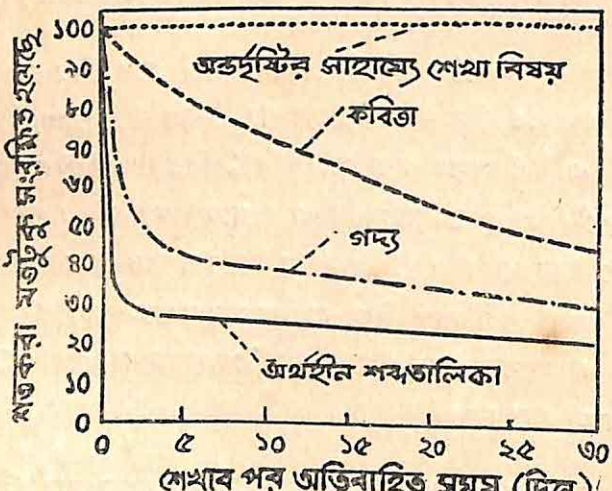
বিস্মরণ ও বিষয়বস্তুর প্রকৃতি

বিস্মরণের হার সম্বন্ধে উপরে দেওয়া তালিকা অবশ্য অর্থহীন শব্দতালিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থপূর্ণ বিষয়ে বিস্মরণের হার অন্যপ্রকারের হবে। সেখানে প্রাথমিক বিস্মরণ যেমন কম, তেমন পরবর্ত্তী বিস্মরণের হারও তেমন দ্রুত নয়।

মনে করা যাক একজনকে নিম্নলিখিত চারটি বিভিন্ন প্রকৃতির বিষয় শিখতে দেওয়া হল। তার পর বিভিন্ন সময়ের অন্তর তার কতটুকু সংরক্ষিত হয়েছে তা পরীক্ষা করে নীচের তালিকাটি পাওয়া গেল।

	১দিনে	৫দিনে	২০দিনে	৩০দিনে
১। অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শেখা বিষয়	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
২। কবিতা	৯৫%	৮৬%	৫৬%	৪৫%
৩। গদ্য	৬৮%	৪৪%	৩৫%	৩০%
৪। অর্থহীন শব্দতালিকা	৩৪%	২৬%	২৪%	২২%

উপরের পরীক্ষণের ফলটিকে চিত্রে রূপায়িত করলে আমরা নীচের চিত্রটি পাই



এই রেখা-চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে সব চেয়ে দ্রুত ও অধিক বিস্মরণ ঘটে অর্থহীন শব্দতালিকার ক্ষেত্রে, তার পর হয় গদ্য-বিষয়ে, তার পর হয় কবিতায়। যে বিষয়বস্তু আমাদের অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে আমরা একবার হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি,

সেটার ক্ষেত্রে বিস্মরণ একেবারেই ঘটে না বলা চলে। উদাহরণস্বরূপ একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণ একত্রে দুই সমকোণ, এ সত্যটুকু যদি কাউকে একবার পরীক্ষণের সাহায্যে উপলব্ধি করতে সাহায্য করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে কখনও সে সেটা ভুলবে না। এই থেকে সংরক্ষণের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা কথা বলা চলে যে বিষয়বস্তু যতই অর্থপূর্ণ হবে ততই সেটি ভাল ভাবে ও দীর্ঘ দিন মনে রাখা সম্ভব হবে।

বিস্মরণের কারণ (Causes of Forgetting)

মানুষ ভোলে কেন, এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা হচ্ছে। আমরা জানি যে কোন বস্তু ভুলে যাওয়া মানে মস্তিষ্কে বস্তুটির সংরক্ষণ না হওয়া। দেখা গেছে যে অনেকগুলি কারণে সংরক্ষণ না হতে পারে। কারণগুলি কখনও পৃথকভাবে আবার কখনও মিলিত ভাবে কাজ করতে পারে। নীচে এই রকম কয়েকটি কারণ নিয়ে আলোচনা করা হল।

১। চর্চ্চার অভাব (Disuse)

সাধারণত কোন বস্তুর চর্চ্চার অভাবকে আমরা সে বস্তুটি ভুলে যাওয়ার কারণ বলে মনে করে থাকি। যখন কোন বস্তু আমরা ভুলে যাই তখন ধরে নিই যে সেই বস্তুটি নিয়ে আর চর্চ্চা বা আলোচনা না করার ফলেই আমরা সেটি ভুলে গেছি। এই ব্যাখ্যাটি কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেন না। প্রথমত অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বস্তুটির যখন কোনরূপ চর্চ্চা করা হচ্ছে না, বা মনে করার চেষ্টা হচ্ছে না সে সময়ে বস্তুটির সংরক্ষণের পরিমাণ আগের চেয়ে বেড়েই গেছে, কমা দূরে থাকুক। এই ঘটনাটিকে স্মৃতি-রেশ (Reminiscence) বলা হয়। দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বস্তুটির চর্চ্চাকালেই বিস্মরণ ঘটতে সুরু হয়েছে। তৃতীয়ত, চর্চ্চার অভাবকে বিস্মরণের কারণ বলা মানে সময়ের অতিবাহনকে কারণ বলে ধরে নেওয়া। কিন্তু সময়কে কোন কিছুর কারণ বলা অসঙ্গত। কেননা, সময় হচ্ছে সমস্ত ঘটনারই একটা সাধারণ পটভূমিকা বিশেষ। যদিও আমরা কথায় বলি যে সময়ে ফলটি পাকে বা সময়ে মানুষ বৃদ্ধ হয় বা সময়ে লোহাতে মরচে পড়ে, তবুও এর কোনো ঘটনাটিরই কারণ হিসেবে সময়কে ধরা যেতে পারে না। এদের সত্যকারের কারণ

খুঁজতে হবে অন্য জায়গায়। এই জন্যেই আমরা চর্চ্চার অভাবকে ভুলে যাওয়ার কারণ বলতে পারি না।

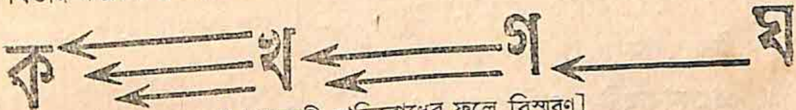
২। পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধ (Retro-active Inhibition)

আমরা যখন একটা বিষয় শেখার পর আর একটি বিষয় শিখি, তখন দেখা যায় যে প্রথম বিষয়টির কিছুটা আমরা ভুলে গেছি। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিষয়টি পিছন দিকে এগিয়ে গিয়ে আমাদের শেখা প্রথম বিষয়টিকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। এই মানসিক প্রক্রিয়াকে পশ্চাদমুখী প্রতিরোধ (Retro-active Inhibition) বলা হয়। যেমন, মনে করা যাক একজন একটি বাংলা কবিতা মুখস্থ করল। তারপর সে আবার একটা বাংলা গদ্যাংশ মুখস্থ করল। এখন যদি সে প্রথম কবিতাটির কতটা মুখস্থ আছে তা পরীক্ষা করতে যায়, তাহলে সে দেখবে যে সে প্রথম কবিতাটির কিছুটা ভুলে গেছে, যদিও দ্বিতীয় গদ্যাংশটি তার ঠিকই মুখস্থ আছে। এক্ষেত্রে প্রথম কবিতাটির বিস্মরণের কারণ হল পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধ। দ্বিতীয় গদ্যাংশটির শেখা বিষয়বস্তুগুলি পেছন দিকে এগিয়ে গিয়ে পূর্ব্বে শেখা প্রথম কবিতার বিষয়বস্তুর সঙ্গে এমন ভাবে গোলমাল বাঁধিয়ে বসে যে প্রথম কবিতাটির সংরক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অর্থাৎ প্রথম কবিতাটির কিছুটা আমরা ভুলে যাই। দুটি উপায়ে পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধের প্রভাবকে দুর্ব্বল বা বিলুপ্ত করা যায়। যথা—

এখন যদি প্রথম শেখা ও দ্বিতীয় শেখার মধ্যে কিছুটা সময়ের বিরতি দেওয়া হয়, তাহলে এই পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধ আর তেমন কাজ করতে পারে না। অবশ্য এই অন্তর্বর্ত্তী বিরতিকালে এমন কোন কাজ করা চলবে না যাতে মস্তিষ্কের পরিশ্রম হয়, অর্থাৎ এই বিরতিকালে মস্তিষ্ককে যতদূর সম্ভব বিশ্রাম দিতে হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধ তখনই কাজ করে যখন দুটি শেখা পর পর ঘটে এবং তাদের মধ্যে কোন সময়ের বিরতি থাকে না।

দ্বিতীয়ত, যদি এই দুটি শেখা বিষয়বস্তুর মধ্যে আকৃতিগত মিল থাকে তবেই এই প্রতিরোধ ঘটে থাকে। যদি প্রথম বিষয়বস্তু ও দ্বিতীয় বিষয় বস্তুর মধ্যে কোনরূপ মিল না থাকে, যেমন যদি প্রথমটি ইংরাজী কবিতা ও দ্বিতীয়টি বাংলা কবিতা বা প্রথমটি বাংলা গদ্য ও দ্বিতীয়টি সংখ্যা-তালিকা হয় তাহলে এই প্রতিরোধ অল্পই ঘটে। কেননা, এই সম্পূর্ণ অমিলের ক্ষেত্রে দুটি শেখা বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন রকম গোলমাল সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে না।

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রাশি রাশি বস্তু প্রতিনিয়তই শিখছি অথচ তার খুব অল্পই আমাদের শেষ পর্য্যন্ত মনে থাকে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে এর প্রধান কারণ হল পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধ। যেমন প্রথম একটি বস্তু (ক) শেখার পর যখন আমরা দ্বিতীয় বস্তু (খ) শিখলাম তখন প্রথম বস্তুটির (ক) কিছুটা ভুলে গেলাম। তারপর আবার যখন তৃতীয়বস্তু (গ) শিখলাম তখন প্রথম বস্তুর (ক'র) আরও কিছু এবং দ্বিতীয় বস্তুর (খ'র) কিছু ভুললাম। আবার যখন চতুর্থ বস্তু (ঘ) শিখলাম তখন প্রথম বস্তুর (ক'র) আরও কিছুটা দ্বিতীয় বস্তুটির (খ'র) আরও কিছুটা এবং তৃতীয় বস্তুটির (গ'র) কিছু ভুললাম।



[পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধের ফলে বিস্মরণ]

এইভাবে যত নতুন বস্তু আমরা শিখে যাই তত পুরোন বস্তুর কিছুটা করে ভুলতে থাকি এবং শেষে আগের দিকের শেখা বস্তুগুলি ক্রমবর্দ্ধমান হারে ভুলতে থাকি। এই স্বাভাবিক বিস্মরণ যদি না ঘটতো তবে আমাদের মস্তিষ্কে এত অসংখ্য বিষয়বস্তু সংরক্ষিত হয়ে থাকত যে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা কষ্টকর হয়ে উঠত।

৩। শিখনের মাত্রা (Degree of Learning)

শিখনের উৎকর্ষের মাত্রার উপরও বিস্মরণ অনেকটা নির্ভর করে। প্রত্যেক বস্তু শেখার একটা মাপকাঠি আছে, যেটাতে পৌছলে আমরা বলতে পারি যে বস্তুটি আমরা শিখেছি। এখন যদি কেউ এই সীমারেখা ছাড়িয়েও শিখে চলে তবে তার শেখাকে অতি-শিখন (over-learning) বলা চলে। আর যদি ঐ সীমারেখার নীচে সে থাকে তবে তার শেখাকে ন্যূন-শিখন (under-learning) বলা হয়। এটা একটা প্রমাণিত সত্য যে অতি-শেখা বস্তু ন্যূন-শেখা বস্তুর চেয়ে বেশী মনে থাকে। অতএব আমরা ন্যূন-শিখনকে (under-learning) ভুলে যাওয়ার একটা কারণ বলতে পারি।

৪। পরিবর্ত্তিত পরিবেশ (Altered Environment)

আমরা যখন কোন একটি বিষয় শিখি তখন আমাদের সেই সময়কার

পরিবেশের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের শেখা এবং মনে করার প্রচেষ্টার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়ে,[১] অর্থাৎ আমাদের মনে করার প্রক্রিয়ার পক্ষে পরিবেশের বৈশিষ্ট্যগুলির থাকা একান্ত অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে। এখন যদি কোন কারণে ঐ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবেশ থেকে অনুপস্থিত থাকে তবে দেখা যাবে যে আমাদের মনে করাটাও শক্ত হয়ে উঠেছে এবং আমরাও ঐ বিষয়টি ভাল করে শেখা সত্ত্বেও ভুলে গেছি। আবার যদি কোন প্রকারে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবেশে ফিরে আসে তবে ঐ বিষয়টি সহজে মনে এসে যাবে। এইজন্যই যখন আমরা কোন বিশেষ পরিবেশে একটা বস্তু শিখি সেটা অন্য পরিবেশে আমরা মনে করতে অসুবিধা বোধ করি। বাড়ীতে নিজের পড়ার ঘরে ভাল করে তৈরী করা পড়াটা এই কারণেই পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার হলে গিয়ে ভুলে যায়।

৫। প্রক্ষোভঘটিত প্রতিরোধ (Emotional Blocking)

ভয়, রাগ, ঘৃণা, লজ্জা প্রভৃতি প্রক্ষোভ যদি তীব্রভাবে জেগে ওঠে তবে দেখা যায় যে ভাল করে শেখা বিষয়ও মনে পড়ছে না। কোনও প্রক্ষোভ সক্রিয় হয়ে উঠলে শরীরের মধ্যে অটোনমিক নার্ভগুলি (autonomic nerves) সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে দেহ মনে একটা উত্তেজিত অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সাময়িকভাবে বিস্মৃতি ঘটে।

৬। আঘাতজনিত বিস্মরণ (Shock Amnesia)

সংরক্ষণ হল মস্তিষ্কের একটি প্রক্রিয়া। যদি কোন কারণে মস্তিষ্কে কোনরূপ আঘাত লাগে তবে আংশিক ভাবে বিস্মরণ ঘটতে পারে। খেলাধূলা, দুর্ঘটনা, যুদ্ধ প্রভৃতি কারণে অনেক সময় মাথায় আঘাত লাগার ফলে আঘাত জনিত বিস্মরণ (Shock Amnesia) হতে দেখা গেছে।

৭। নেশাকারক বস্তু (Drugs)

মদ, আফিং, কোকেন প্রভৃতি যদি দীর্ঘকাল অতিরিক্ত ব্যবহার করা যায়, তবে মস্তিষ্কের কোষগুলি দুর্ব্বল হয়ে ওঠে এবং স্মৃতিভ্রম ঘটতে পারে।

৮। অবদমন (Repression)

বিখ্যাত মনসমীক্ষক ফ্রয়েড বিস্মরণের একটা নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে ভুলে যাওয়াটা একটি ইচ্ছাকৃত মানসিক প্রক্রিয়া। অর্থাৎ যা আমরা ভুলতে চাই

[১] একে অনুবর্তন (Conditioning) প্রক্রিয়া বলা হয়।

তাই আমরা ভুলি। অবশ্য আমাদের এই চাওয়া বা ইচ্ছাটা সচেতন মনের চাওয়া বা ইচ্ছা নয়, সেটি অচেতন মনের। তিনি দেখিয়েছেন যে আমাদের মনের অনেকখানি আমাদের কাছে একেবারে অজানা। সেই মনটার তিনি নাম দিয়েছেন অচেতন মন (Unconscious)। আর যাকে সাধারণত আমরা মন বলে আখ্যা দিয়ে থাকি, সেটি আসলে আমাদের সম্পূর্ণ মনের একটি অংশ মাত্র। মনের এই অংশটুকুর নাম তিনি দিয়েছেন চেতন মন (Conscious mind)। এখন যদি আমাদের চেতন মনে এমন কোন চিন্তা বা ইচ্ছার উদয় হয় যেটা আমাদের কাছে অবাঞ্ছিত, তবে আমরা সেই চিন্তা বা ইচ্ছাকে চেতন মন থেকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে আমাদের অচেতন মনে নির্ব্বাসিত করি। ফলে সেটি আর আমাদের চেতন মনে থাকে না, অর্থাৎ আমরা সেটিকে ভুলে যাই। চেতন মন থেকে এই অচেতন মনে নির্ব্বাসিত করার নাম হলো অবদমন (Repression)। অতএব ফ্রয়েডের মতে চেতন মন থেকে কোন চিন্তাকে অচেতন মনে অবদমিত করাকেই আমরা ভুলে যাওয়া আখ্যা দিয়ে থাকি।

এখন প্রশ্ন হল, যদি ভুলে যাওয়াটা ইচ্ছাকৃতই হবে তবে আমরা যে সব বস্তু ভুলতে চাই না (যেমন, কোন দরকারী কাজের কথা বা পরীক্ষার পড়া) সেগুলি ভুলে যাই কেন? আবার এমন অনেক বস্তু আছে যেগুলি আমরা ভুলতে চাই যেমন, কোন দুঃখ, শোক বা লজ্জার স্মৃতি অথচ সেগুলি ভুলতে পারিনা কেন? এর উত্তর হল যে কোন্‌টা আমরা ভুলতে চাই আর কোনটা চাই না সেটার চরম নির্ণায়ক কিন্তু সর্ব্বত্র আমাদের সজ্ঞান "আমি" নয়। আমাদের 'আমি'রও কিছুটা চেতন আবার কিছুটা অচেতন অংশ আছে। ফলে, কোন্‌টা আমাদের কাছে বাঞ্ছিত অতএব মনে রাখতে হবে, আর কোন্‌টা আমাদের কাছে অবাঞ্ছিত অতএব ভুলে যেতে হবে, সেটা স্থির করবে আমাদের সমগ্র অহং-সত্তাটি (Ego)। অতএব আমাদের আচরণের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক আমাদের আংশিক সচেতন অহংসত্তাটি নয়। যে বস্তুটি বাহ্যত মনে হচ্ছে আমরা ভুলতে চাই না অথচ ভুলে যাচ্ছি, আসলে সেটি আমাদের সমগ্র অহংসত্তাটির কাছে বাঞ্ছিত নয়। যেমন, পরীক্ষার পড়া বা বাধ্য হয়ে কোনও কর্ত্তব্য পালনের কথা বা লৌকিকতার চাপে চিঠি লেখার কথা ইত্যাদি। এগুলিকে চেতন মনে আমরা পছন্দ করলেও অচেতন মনে এড়িয়ে যেতে চাই। তেমনই আবার কোনও দুঃখ, শোক বা লজ্জার কাহিনীও আমরা ভোলবার চেষ্টা করলেও ভুলতে পারি না। এর কারণ দুটি। প্রথম, আমাদের

অহংসত্তা হয় সেগুলিকে সত্য সত্য ভুলতে চায় না, যদিও চেতন সত্তা ভুলতে চায়। আর দ্বিতীয়ত, ঐ চিন্তা বা কথাগুলি বার বার মনে আনার ফলে ওগুলির অতি-শিখন হয়ে যায় এবং ফলে ওগুলি আমাদের অহংসত্তা ভুলতে চাইলেও স্থায়ীভাবে আরও মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয়ে পড়ে।

ঘুম (Sleep)

ঘুমের সঙ্গে সংরক্ষণের একটা নিকট সম্পর্ক আছে। দেখা গেছে যে, কোন বিষয় শেখার পর যদি কিছুক্ষণ ঘুমান যায় তবে জেগে থাকার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল সংরক্ষণ হয়। জেগে থাকলে (কিছু না করলেও) কোনও না কোনও চিন্তা এসে সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটাবেই, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে যেহেতু মস্তিষ্ককোষে কোনরূপ পশ্চাদমুখী প্রতিরোধ (Retroactive Inhibition) ঘটার সম্ভাবনা থাকে না, সেহেতু সংরক্ষণ বিনা বাধায় ঘটে ও বিস্মরণের হার কম হয়। এইজন্য ঘুমের আগে শেখা বস্তু ভালভাবে মনে থাকে।

স্মৃতি-রেশ (Reminiscence)

মনে করা যাক একজনকে ১৬টি শব্দের একটি তালিকা মুখস্থ করতে দেওয়া হল। কিছুক্ষণ পরে তাকে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে সে মাত্র ১২টি শব্দ মনে করতে পারছে। অতএব বোঝা গেল যে তার সংরক্ষণ হয়েছে ১৬টি শব্দের মধ্যে ১২টি শব্দ বা ৭৫%। এখন পরের দিন তাকে আবার পরীক্ষা করা হল এবং দেখা গেল যে সে ১৪টি শব্দ মনে করতে পারছে। এবার কিন্তু তার সংরক্ষণের পরিমাণ হল ৮৭%। অথচ ইতিমধ্যে সে ঐ শব্দগুলি আর নতুন করে মুখস্থ করেনি। কেবলমাত্র সময়ের ব্যবধানে সংরক্ষণের যে উন্নতি ঘটে তার নাম স্মৃতি-রেশ (Reminiscence)। এই মানসিক ঘটনাটির মনোবিজ্ঞানীরা নানারকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

স্মৃতির উন্নতি (Memory Training)

স্মৃতির উন্নতি করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে জানতে সকলেরই অল্পবিস্তর কৌতূহল আছে। স্মৃতির উন্নতি চানও সকলেই। বিশেষ করে যাঁদের বৃত্তিনির্ব্বাহে স্মৃতির

উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়,যেমন বড় বড় কোম্পানীর অধিকর্ত্তা, ব্যবসাদার, শিক্ষক, সেলস্‌ম্যান প্রভৃতি তাঁরা তাঁদের স্মৃতির ক্ষমতা বাড়াতে সর্ব্বদাই উৎসুক।

কিন্তু যখনই আমরা স্মৃতিকে মানসিক শক্তি বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছি তখনই এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে গেছে। যেহেতু স্মৃতি কোনও একটি বিশেষ শক্তি নয়, সেহেতু এর কোনরূপ উন্নতি করাও সম্ভব নয়। স্মৃতির চর্চ্চা করলে স্মৃতির ক্ষমতা বাড়ে, এই ছিল প্রাচীন শক্তিবাদী মনোবিজ্ঞানীদের মত। কিন্তু প্রথমে উইলিয়াম জেমস পরে আরও অনেক মনোবিজ্ঞানী প্রমাণ করে দিয়েছেন যে স্মৃতির চর্চ্চা করলে স্মৃতির শক্তি বাড়ে না।

তবে স্মৃতির পেছনে আছে একটি মস্তিষ্কের প্রক্রিয়া যার নাম দিয়েছি আমরা সংরক্ষণ। এই সংরক্ষণের মাত্রার উপর নির্ভর করছে স্মৃতির উৎকর্ষ বা অনুৎকর্ষ।

সুষ্ঠু স্মরণের সর্ত্তাবলী (Conditions of good memory)

এখন দেখা গেছে যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি বা অবস্থায় সংরক্ষণ কাজটি ভাল হয়ে থাকে আবার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি বা অবস্থায় সংরক্ষণ আশানুরূপ হয় না। এই বিশেষ পরিস্থিতি বা অবস্থাগুলিকে আমরা সুষ্ঠু স্মরণের সর্ত্ত (Conditions of good memory) নাম দিতে পারি। একথা ভাবলে ভুল হবে যে এই বিশেষ সর্ত্তগুলির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ শক্তি বেড়ে যায়। সংরক্ষণের শক্তি সব সময়েই ঠিক থাকে তবে ঐ বিশেষ সর্ত্তগুলির উপস্থিতিতে সংরক্ষণ প্রক্রিয়াটি অধিকতর কার্য্যকরী হয় মাত্র। যতক্ষণ এই সর্ত্তগুলি বর্ত্তমান থাকবে ততক্ষণই সংরক্ষণের উৎকর্ষ দেখা যাবে, আর সর্ত্তগুলি অনুপস্থিত থাকলে সংরক্ষণেরও উৎকর্ষ কমে যাবে। অতএব স্মৃতির উন্নয়ন করা যায় না, কিন্তু এমন কতকগুলি অনুকূল সর্ত্ত আছে যেগুলি মনে রাখার সময় পালন করলে স্মৃতি অধিকতর কার্য্যকরী হয়ে থাকে।

এই সর্ত্তগুলিকে আমরা সাধারণভাবে কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, যথা শারীরিক (physical), মানসিক (mental), প্রক্ষোভমূলক (emotional), পদ্ধতিমূলক (methodical) ও পরিবেশমূলক (environmental)। এই বিভিন্ন শ্রেণীর সর্ত্তগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা নীচে দেওয়া হল।

১। শারীরিক (Physical)

সুষ্ঠু স্মরণ অনেকখানি নির্ভর করে শারীরিক অবস্থার উপর। রোগ বা অসুস্থতা মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজকর্ম্মগুলিকে ব্যাহত করে এবং তার ফলে অনিবার্য্যরূপে সংরক্ষণ ক্ষুন্ন হয়। অতএব শারীরিক সুস্থতা সুষ্ঠু স্মরণের প্রথম সর্ত্ত।

২। মানসিক (Mental)

(ক) প্রেষণা (motivation) :—মানসিক সর্ত্তের মধ্যে প্রথমে আসে প্রেষণা, বা যা মনে রাখতে হবে তা শেখবার আন্তরিক আগ্রহ বা ইচ্ছা। অনিচ্ছায় বা অর্দ্ধ-ইচ্ছায় শেখা বস্তু মস্তিষ্কে ভালভাবে সংরক্ষিত হয় না। এটি একটি পরীক্ষণ প্রমাণিত তথ্য যে বিনা প্রেষণায় কোন প্রকারের শিখন সম্ভব নয়। অতএব সুষ্ঠু স্মরণের একটা অপরিহার্য্য সর্ত্ত হল শিক্ষণীয় বস্তুটির প্রতি প্রেষণাবোধ।

(খ) মনোযোগ (attention):— প্রেষণা বা ইচ্ছা যদি থাকে তবে স্বাভাবিক-ভাবেই মনোযোগের সৃষ্টি হয়। মনে রাখতে হলে বিষয়বস্তুটিতে যাতে ঠিকমত মনোযোগ দেওয়া হয় সেটি দেখতে হবে। অনেক সময় উপযুক্ত মনোযোগ না দেওয়ার জন্য সংরক্ষণ হয় না। দেখা গেছে যে ছাত্রেরা ক্লাসে অধ্যাপকের বক্তৃতার নোটস নেয়। কিন্তু যদি নোটস লেখায় মনোযোগ বেশী থাকে তবে বক্তৃতা শোনা হয় না, ফলে অনেক সময় না বুঝেই নোটস করতে হয় এবং পরে সে নোটস কোন কাজেই লাগে না। সেই জন্য বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়, নোটস মাঝে মাঝে করতে হয়। মনোযোগ দিয়ে শোনা বিষয় আমরা সহজে ভুলি না।

(গ) সংবোধন (comprehension) :— শিক্ষণীয় বস্তুটি যে পরিমাণে শিক্ষার্থী বুঝতে পারে তার উপর সংরক্ষণের মাত্রা নির্ভর করে। দেখা গেছে, যে বস্তুটি যত বেশী শিক্ষার্থী বুঝতে পারে তত বেশী সেটি সে মনে রাখতে পারে। আর যে বস্তুর অর্থ না বুঝে যন্ত্রের মত শিক্ষার্থী মুখস্থ করবে সে বস্তুটি মনে রাখা তত তার পক্ষে শক্ত হবে। অবশ্য অর্থ বোঝা না বোঝা অনেকখানি নির্ভর করে বস্তুটির প্রকৃতির উপর।

৩। প্রক্ষোভমূলক (Emotional)

প্রক্ষোভমূলক সমতা হল মনে রাখার আর একটি অতি প্রয়োজনীয় সর্ত্ত। শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকলেই মস্তিষ্কের প্রক্রিয়াগুলি

সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হতে পারে আর যদি কোন কারণে কোন বিশেষ প্রক্ষোভ অস্বাভাবিক মাত্রায় তীব্র হয়ে ওঠে তাহলে স্মৃতিও বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

অতিরিক্ত মাত্রায় বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ বা দুঃখিত অবস্থায় কিছু শেখা বা মনে রাখার চেষ্টা করাটা বেশ শক্ত এমন কি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ভুলে যাওয়ার কারণগুলির মধ্যে প্রক্ষোভঘটিত প্রতিরোধকে একটা বড় কারণ বলে ধরা হয়েছে। এইজন্যই শিক্ষার্থীকে কিছু শেখাতে হলে তার মানসিক সাম্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে দেখা সর্ব্বপ্রথমে দরকার। প্রক্ষোভের দিক দিয়ে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীকে কিছু শেখানো নিরর্থক ও অপচয়বহুল।

৪। পদ্ধতিমূলক (Methodical)

সুষ্ঠ সংরক্ষণ অনেকখানি নির্ভর করে পদ্ধতির নির্ব্বাচনের উপর। দেখা গেছে যে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করলে স্মৃতি সবল ও দীর্ঘস্থায়ী হয় আবার ভুল পদ্ধতিতে শেখার চেষ্টা করলে শিখতেও যেমন দেরী হয় তেমনই মনে রাখাও কষ্টকর হয়। পদ্ধতি নানা প্রকারের হতে পারে এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রকৃতির উপর পদ্ধতির নির্ব্বাচন নির্ভর করে।

সুষ্ঠু সংরক্ষণের সহায়ক কতকগুলি পদ্ধতির নীচে উল্লেখ করা হল।

(ক) সমগ্র পদ্ধতি : অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বিশেষভাবে কার্য্যকরী।

(খ) অংশ পদ্ধতি : অর্থহীন বিষয়বস্তু, অতিদীর্ঘ বিষয়বস্তু, কৌশল ইত্যাদি শেখার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রযোজ্য।

(গ) মধ্যগ পদ্ধতি : অতিদীর্ঘ অথচ অর্থপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে সমগ্র পদ্ধতি ও অংশ পদ্ধতির মিশ্রিত এই পন্থা অবলম্বন করা উচিত।

(ঘ) আবৃত্তি পদ্ধতি : সাধারণ কোন কিছু মুখস্থ করার সময় পঠন পদ্ধতি ও আবৃত্তি পদ্ধতি, এই দুরকম পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, আবৃত্তি পদ্ধতি সাধারণ পঠন পদ্ধতির চেয়ে মনে রাখার পক্ষে অধিকতর সহায়ক।

(ঙ) সবিরতি পদ্ধতি : বিরতিহীন পদ্ধতিতে কোন কিছু শেখার চেয়ে মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে শেখা অনেক বেশী কার্য্যকরী এবং এই পদ্ধতিতে সংরক্ষণ সুদৃঢ় ও স্থায়ী হয়।

(চ) অনুষঙ্গ পদ্ধতি : শেখার বিষয়বস্তুগুলিকে অনুষঙ্গের সাহায্যে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে ফেলতে পারলে সেগুলি মনে রাখা সহজ হয়ে ওঠে। অনুষঙ্গ বলতে বোঝায় দুটি বিষয় বা চিন্তার মধ্যে কোনরকম একটা সম্পর্ক বা যোগাযোগের ধারণা। কখনও কখনও এই সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত থাকে আবার কখনও এই ধারণা চেষ্টা করে তৈরী করা যায়।

(ছ) প্রতিরূপের সাহায্যে মনে রাখার কাজটি সুষ্ঠু ও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। যখন কোন কিছু মনে রাখার প্রয়োজন হয় তখন তার প্রতিরূপটিকে মনের মধ্যে গেঁথে রাখতে পারলে বিষয়টির সংরক্ষণ সহজ এবং স্থায়ী হয়।

(জ) ছন্দ বা সুরের সাহায্যে শেখা বস্তু মনে রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। সুর করে মুখস্থ করা কবিতা, নামতা ইত্যাদি বহুদিন মনে থাকে।

(ঝ) কতকগুলি স্মৃতিসহায়ক কৌশল (mnemonic devices) আছে যেগুলি অবলম্বন করলে বস্তু বা ঘটনা মনে রাখা সহজ হয়। এ ছাড়া শেখা বস্তুর চর্চা (rehearsal) বা অনুশীলন বস্তুটিকে মনে রাখতে সাহায্য করে।

(ঞ) পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধ ভুলে যাওয়ার একটা বড় কারণ। শিখনের সময় এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত যার ফলে এই প্রতিরোধ সবচেয়ে কম হয়। যেমন পড়ার মাঝে মাঝে বিরতি দেওয়া, একই ধরনের বিষয়বস্তু পর পর না পড়া ইত্যাদি সাবধানতা অবলম্বন করলে স্মৃতি সুদৃঢ় ও স্থায়ী হয়।

৫। পরিবেশমূলক (Environmental)

(ক) শান্ত পরিবেশ : মনে রাখার একটি প্রয়োজনীয় সর্ত্ত হল যে পড়া বা শেখাটা যেন শান্ত পরিবেশে সম্পন্ন হয়। যদি পরিবেশ প্রতিকূল হয় তাহলে মনোযোগ ও একাগ্রতা ব্যাহত হয় এবং সংরক্ষণের কাজও ঠিকমত সম্পন্ন হয় না।

(খ) অপরিবর্ত্তিত পরিবেশ : যে পরিবেশে কোন কিছু শেখা হয়েছে সে পরিবেশের পরিবর্ত্তন হলে মনে রাখা কষ্টকর হয়ে ওঠে। অতএব শিখনের পরিবেশ যতটা অভিন্ন থাকে ততই স্মৃতি সহজ ও সুদৃঢ় হয়।

স্মৃতির বিস্তার (Memory Span)

একবার শুনে প্রত্যেকেই বিশেষ দৈর্ঘ্যসম্পন্ন একটি সংখ্যা বা অক্ষরের সারি নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারে। কিন্তু সংখ্যা বা অক্ষরের সারিটি যদি ক্রমশ

দৈর্ঘ্যে বাড়িয়ে যাওয়া হয় তবে এমন একটি সময় আসে যখন একবার শুনে সেটি আর নিখুঁতভাবে আবৃত্তি করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এতে প্রমাণিত হয় যে সকলেরই স্মৃতির ক্ষমতার একটা সীমা আছে। যতটুকু একবার শুনে ব্যক্তি আবৃত্তি করতে পারে সেইটিকে তার স্মৃতির বিস্তার (Memory Span) বলে বর্ণনা করা হয়। কোন ব্যক্তির স্মৃতির বিস্তার নির্ণয় করতে হলে তাকে ক্রম-বর্দ্ধমান দৈর্ঘ্যের সংখ্যাসারি (অক্ষরের বা শব্দের সারি দিয়েও পরীক্ষা করা যায়) পর পর দিয়ে দেখতে হয় যে কতদূর পর্য্যন্ত সে নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারে। নীচে এইরকম দুটি সারি, একটি সংখ্যার অপরটি অক্ষরের সারি, দেওয়া হল।

৯ ৭ ১ ৩
২ ৮ ৩ ৫ ৯
৬ ৪ ৯ ২ ৭ ১
৭ ৩ ১ ৯ ৪ ৬ ৯
৫ ২ ৬ ৮ ৫ ৩ ১ ৭
৮ ৩ ৭ ২ ৬ ১ ৪ ২ ৫
৩ ৯ ৭ ৪ ১ ৮ ৫ ২ ৭ ৪
(সংখ্যা-সারি)

গ চ ম ট
প ক ব জ ল
ত অ ন ব চ হ
ম ই ফ ব ল দ চ
র ধ গ ন ল ব ত স
ধ ম ঝ প র ক ঞ চ ট
ব ন ঠ দ গ হ ঝ ড ণ থ
(অক্ষর-সারি)

মনে করা যাক, এক ব্যক্তি সংখ্যা-সারির প্রথম ৪টি সারি নিখুঁত বলতে পারল, কিন্তু ৫ম সারিটি পুরো বলতে পারল না। ৪র্থ সারিতে ৭টি সংখ্যা থাকায় মোটামুটিভাবে বলা চলে যে সংখ্যার ক্ষেত্রে ব্যক্তিটির স্মৃতির বিস্তার (Memory Span) হল ৭। তেমনই কেউ যদি ৬ষ্ঠ সংখ্যা সারি পর্য্যন্ত নির্ভুল বলতে পারে তাহলে তার স্মৃতির বিস্তার হবে ৯। এইভাবে অক্ষরের ক্ষেত্রেও স্মৃতির বিস্তার মাপা যেতে পারে।

স্মৃতির বিস্তারের পরিমাপ ব্যক্তিকে বুদ্ধির অভীক্ষায় প্রায়ই দেওয়া হয়। কেননা, দেখা গেছে যে স্মৃতির বিস্তারকে মনের বৃদ্ধির সূচক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কেননা বুদ্ধির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির বিস্তারও বাড়ে। আরও দেখা গেছে যে, সাধারণ ব্যক্তির স্মৃতির বিস্তার প্রায় ৭ এর কাছাকাছি।

প্রশ্নাবলী

1. Describe some experimental works that have been conducted on forgetting of learned materials. What is over learning? (B.T. 1950)

Ans. (পৃঃ ১২৯—পৃঃ ১৩৮)

2. What is memory? Is there a memory or memories? (B.T. 1952)

Ans. (পৃঃ ১১৯—পৃঃ ১২৭)

3. Distinguish Memory and Imagination. What are the conditions of good memory? (B.A. 1956)

Ans. (পৃঃ ১২৮+পৃঃ ১৩৯—পৃঃ ১৪২)

4. Why do we forget what we want to remember and remember what we want to forget? (B.T 1955)

Ans. (পৃঃ ১৩৩—পৃঃ ১৩৮)

5. Distinguish between recall and recognition. Can memory be trained?

Ans. (পৃঃ ১২২—পৃঃ ১২৪+পৃঃ ১৩৯—পৃঃ ১৪২)

6. Elucidate the factors in memory and discuss the characteristics of good memory. (B.A. 1960)

Ans. (পৃঃ ১১৯+পৃঃ ১৩৯—পৃঃ ১৪২)

7. How can memory be improved? (B. A. 3-Yr. 1963)

Ans. (পৃঃ ১৩৯—পৃঃ ১৪২)

৬

মনোযোগের স্বরূপ (Nature of Attention)

সাধারণ ভাবে আমরা মনোযোগকে একটা মানসিক শক্তি বলেই ধরে নিয়ে থাকি। আবার অনেকে মনোযোগকে মনের একটি বিশেষ অবস্থা বলে বর্ণনা করে থাকেন। প্রাচীন শক্তিবাদী মনোবিজ্ঞানীরাও মনোযোগকে একটি মানসিক শক্তি বলে মনে করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে চর্চ্চার দ্বারা মনোযোগের শক্তিকে বাড়াতে পারা যায়।

কিন্তু এ ধারণা যে ভুল এ কথা নানা গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া বিশেষ। আমাদের চারধারে প্রতিমুহূর্ত্তেই অসংখ্য উদ্দীপক ছড়ানো রয়েছে। তাদের প্রত্যেকেরই যেন প্রচেষ্টা আমাদের কাছ থেকে সাড়া বা প্রতিক্রিয়া আদায় করা। কিন্তু সেদিক দিয়ে আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আমরা একই মুহূর্ত্তে একটির বেশী দুটি উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিতে পারি না। স্বভাবতই আমাদের এই উদ্দীপকের জনতা থেকে একটি বিশেষ উদ্দীপককে বেছে নিতে হবে এবং তার প্রতি সাড়া দিতে হবে। বহু উদ্দীপকের মধ্যে থেকে একটি উদ্দীপকের এই মানসিক নির্ব্বাচন ও তার প্রতি সাড়া দেওয়া—এই মানসিক কাজ দুটির একত্র নাম হল মনোযোগ দেওয়া। যেমন, এই মুহূর্ত্তে একাধিক উদ্দীপক আমাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। পাখার হাওয়া, টেবল ল্যাম্পের আলো, বাইরে মোটরগাড়ীর হর্নের আওয়াজ, পাশের বাড়ীর পিয়ানোর টুং টুং শব্দ, সামনের বাগান থেকে ভেসে আসা হাসনাহানার গন্ধ, আমার সামনে রাখা লেখার প্যাডটা ইত্যাদি একরাশ উদ্দীপক তাদের আবেদন আমার কাছে এনে হাজির করেছে। কিন্তু এতগুলি উদ্দীপকের আবেদন অগ্রাহ্য করে আমি একমাত্র আমার লেখার প্যাডটাকে বেছে নিয়েছি এবং তার আবেদনেই সাড়া দিয়েছি, অর্থাৎ লিখে চলেছি। আমার এই বহু উদ্দীপকের মধ্যে থেকে একটিকে বেছে নেওয়ার কাজটাকেই মনোযোগ দেওয়া বলা হয়। এক কথায় আমি লেখার কাজে মন দিয়েছি।

মনোযোগের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

মনোযোগ দেওয়ার কাজটি বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলি বৈশিষ্ট্য পাই। মানুষের সব আচরণই পরিবর্ত্তিত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা মাত্র। মনোযোগও তাই। যখন বিশেষ একটি উদ্দীপককে বেছে নিয়ে তার প্রতি আমরা সাড়া দিতে যাই তখন পরিবেশের সঙ্গে আমাদের নতুন করে সঙ্গতিবিধান করতে হয় বলে আমাদের মধ্যে নানারূপ পরিবর্ত্তন দেখা দেয়।

প্রথম, সঞ্চালনমূলক পরিবর্ত্তন (motor changes)। যেমন বসা বা দাঁড়ানোর মধ্যে পরিবর্ত্তন, ঘাড় বাড়িয়ে দেখা বা মাথাটা হেলিয়ে শোনার চেষ্টা করা ইত্যাদি ভঙ্গীগত পরিবর্ত্তন ছাড়াও শরীরের কতকগুলি বিশেষ পেশীর মধ্যে একটা কাঠিন্যও এই সময় দেখা দেয়।

দ্বিতীয়, ইন্দ্রিয়ঘটিত পরিবর্ত্তন (sensory changes)। যেমন দেখার বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে হলে চোখ ঘোরানো ও যথা স্থানে দৃষ্টি স্থাপন করা ইত্যাদি নানা চক্ষুমূলক পরিবর্ত্তন আমাদের সম্পন্ন করতে হয়। চোখের মধ্যেও পেশীগত নানা পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে। সেইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেও মনোযোগ দেবার সময় নানা পরিবর্ত্তন দেখা দেয়।

তৃতীয়, মস্তিষ্ক-ঘটিত পরিবর্ত্তন (nervous changes)। মনোযোগ দেবার সময় মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের অনুরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে থাকে।

মনোযোগের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যক্ষণের স্পষ্টতা (clarity of perception) অর্থাৎ যে বস্তুটির উপর আমরা মনোযোগ দিচ্ছি সে বস্তুটি আমাদের কাছে আরও বেশী পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের প্রত্যক্ষণের আওতায় সব সময়েই বহু বস্তু রয়েছে। কিন্তু সেগুলির সবই আমরা সব সময়ে পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষণ করি না। সেগুলির মধ্যে যে বস্তুটির প্রতি আমরা মনোযোগ দেব সেই বস্তুটির প্রত্যক্ষণই আমাদের কাছে পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে, অন্যগুলি নয়। পাশের ঘরে কারা কথা বলছে। যদি আমি সেদিকে মনোযোগ না দি তবে কি কথা হচ্ছে বুঝতে পারব না, কিন্তু যে মুহূর্ত্তেই ওদিকে মনোযোগ দেব ওদের কথাবার্ত্তা আমার কাছে পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মনোযোগের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল যে যখন কোন বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিই তখন সেই বস্তুটি আমাদের সচেতনতার কেন্দ্রে (centre of consciousness) এসে

উপস্থিত হয়। আমাদের সচেতনতায় সব সময়েই বহু বস্তু রয়েছে। কিন্তু সব সময় সব বস্তুই আমাদের সচেতনতার কেন্দ্রে থাকে না। যখন যে বস্তুটির প্রতি মনোযোগ দিই সেটি ছাড়া আর সবই থাকে আমাদের সচেতনতার নানা প্রান্তভূমিতে ছড়িয়ে এবং সেগুলির সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতাও নানা মাত্রার হতে পারে। কিন্তু যখনই সেগুলির মধ্যে কোন বিশেষ বস্তুটির প্রতি মনোযোগ দিই তখনই সেই বস্তুটি সচেতনতার প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে এসে উপস্থিত হয়।

মনোযোগের নির্দ্ধারক বা সর্ত্ত (Determiners or Conditions of Attention)

আমাদের মনোযোগ কিসের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়? অর্থাৎ আমাদের চারপাশে সবসময়েই অসংখ্য উদ্দীপক রয়েছে, অথচ তাদের মধ্যে একটা বিশেষ উদ্দীপক আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় কেন? এর কারণগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—এক, আভ্যন্তরীণ নির্দ্ধারক (Internal Determiners) এবং দুই, বাহ্যিক নির্দ্ধারক (External Determiners)। এই দুধরনের নির্দ্ধারককে এক কথায় মনোযোগের সর্ত্তাবলী (Conditions of Attention) বলা হয়।

আভ্যন্তরীণ নির্দ্ধারক বলতে সেই সব বস্তুকে বোঝায়, যেগুলি থাকে ব্যক্তির মধ্যে। এই পর্য্যায়ের নির্দ্ধারকগুলিকে এক কথায় মানসিক প্রস্তুতি (Mental Set) নাম দেওয়া যেতে পারে। মানসিক প্রস্তুতি বলতে বোঝায় বিশেষ কোনো একটি বা এক শ্রেণীর উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেবার জন্য মনের দিক দিয়ে তৈরী হয়ে থাকা। যেমন কোন একটা নতুন দেশে নতুন একজন উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ, একজন ভূতত্ত্ববিৎ এবং একজন মনোবিজ্ঞানী বেড়াতে গেলেন। প্রথম ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করবে সে দেশের ফুল, ফল, গাছপালা। দ্বিতীয় ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করবে সে দেশের মাটি, পাথর, শিলাখণ্ড। আর তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সে দেশের মানুষের আচরণ। এই মানসিক প্রস্তুতির পেছনে আবার বহুরকম শক্তি কাজ করতে পারে যেমন, ব্যক্তির আগ্রহ, কৌতূহল, চাহিদা, রুচি ইত্যাদি।

বাহ্যিক নির্দ্ধারক হল সেই সব বৈশিষ্ট্য যা থাকে উদ্দীপকের মধ্যেই। এগুলিও আবার নানা রকমের হতে পারে, যেমন—

১। **প্রকৃতি**—কোন কোন উদ্দীপকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে। যেমন, রঙীন জিনিষ সাদা জিনিসের চেয়ে বেশী আকর্ষণীয়।

২। **তীব্রতা**—উজ্জ্বল আলো, উচ্চ শব্দ, তীব্র ব্যথা প্রভৃতির প্রতি সহজেই আমাদের মনোযোগ যায়।

৩। **আকৃতি**—বিরাট আয়তনের কোন কিছু ক্ষুদ্র আয়তনের বস্তুর চেয়ে আমাদের অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়।

৪। **পুনরাবির্ভাব**—একটি উদ্দীপককে যদি বার বার আমাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয় তবে আমরা সেটির প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হই।

৫। **অবস্থিতি**—কোন কোন বিশেষ অবস্থিতি আমাদের সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন, বইয়ের পাতার উপরের দিকটায় নীচের দিকের চেয়ে আগে আমাদের দৃষ্টি পড়ে। অতএব ঐ বিশেষ অবস্থিতিতে যদি কোনো উদ্দীপক থাকে তবে সেটি আগেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৬। **পরিবর্ত্তন**—উদ্দীপকের মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হলে সেটি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন, একজন লোক চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেলেই আমাদের দৃষ্টি সে দিকে চলে যাবে।

৭। **নতুনত্ব**—যা অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক তা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

৮। **গতি**—স্থির বস্তুর চেয়ে গতিবান বস্তু আমাদের অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন, গতিশীল নিয়ন আলোর বিজ্ঞাপনগুলো।

৯। **বিচ্ছিন্নতা**—অন্য সকল উদ্দীপক থেকে যদি একটি বিশেষ উদ্দীপককে সরিয়ে আনা হয় তবে এই বিচ্ছিন্ন উদ্দীপকটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

মনোযোগের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Attention)

প্রকৃতি অনুযায়ী মনোযোগ তিন প্রকারের হতে পারে, যেমন, ১। স্বতঃপ্রসূত বা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ (involuntary or non-volitional) ২। ইচ্ছাপ্রসূত (voluntary or volitional) এবং ৩। অভ্যাসমূলক (habitual)।

যখন আমরা নিছক উদ্দীপক বা পরিস্থিতির তাগাদায় মনোযোগ দিতে বাধ্য , তখন সেই মনোযোগকে স্বতঃপ্রসূত বা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ বলা হয়। যেমন বিদ্যুৎ চমকানো, মটরগাড়ীর টায়ার ফাটার শব্দ, আকস্মিক ব্যথা, তীব্র ইলেকট্রিক শক ইত্যাদির প্রতি মনোযোগ স্বতঃপ্রসূত ভাবেই আসে, সেগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে আমাদের কোন মানসিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। স্বতঃপ্রসূত মনোযোগ অনেকটা রিফ্লেক্স জাতীয় এবং সেই বিশেষ উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেবার জন্য মানসিক প্রস্তুতি থাকুক আর না থাকুক মনোযোগ আপনা হতেই সেদিকে চলে যাবে।

আর যখন কোন উদ্দীপকের প্রতি আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক মনোযোগ দিই তখন সেই মনোযোগকে ইচ্ছাপ্রসূত মনোযোগ বলা হয়। এ ধরনের মনোযোগ আমাদের দৈনন্দিন কাজে কর্মে প্রতিনিয়তই আমরা দিয়ে থাকি। ইচ্ছাপ্রসূত মনোযোগের প্রয়োজন হয় সেই সকল ক্ষেত্রে যখন অপেক্ষাকৃত আকর্ষণীয় কোন উদ্দীপক আমাদের মনোযোগ করে বসে এবং সেই আকর্ষণীয় উদ্দীপকের দাবীকে উপেক্ষা করে অন্য কোনও কম আকর্ষণীয় বস্তুর প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হয় যেমন, একঘেয়ে কোনও আলোচনা বা বক্তৃতা শোনা, নীরস কোনও রিপোর্ট বা প্রবন্ধ পড়া ইত্যাদি। এ সকল ক্ষেত্রে মনোযোগ দিতে আমাদের বেশ একটা ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে হয়। মনের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে আকর্ষণীয় কোনও বস্তুর প্রতি মনোযোগ দেওয়া। ফলে মনের স্বাভাবিক প্রবণতা ও ইচ্ছাশক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং ততক্ষণই মনোযোগ অটুট থাকে যতক্ষণ এই দ্বন্দ্বে ইচ্ছার শক্তি প্রবলতর থাকে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার মনোযোগ দেওয়াটা একপ্রকার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এই মনোযোগকে অভ্যাসগত (habitual) মনোযোগ বলা হয়। এ ধরনের মনোযোগের বৈশিষ্ট্য হল যে উদ্দীপকের কোনও সহজ আকর্ষণ না থাকলেও তার প্রতি মনোযোগ দিতে কোনরূপ ইচ্ছা বা প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না। যেমন, মোটরচালকের ক্ষেত্রে মোটরগাড়ীর হর্ন শোনা, মায়ের ক্ষেত্রে বাচ্চার কান্না শোনা, প্রুফরীডারের ক্ষেত্রে বানান ভুল দেখা ইত্যাদি মনোযোগের দৃষ্টান্তগুলি অভ্যাসের স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। তার ফলে এগুলির প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ না থাকলেও নিছক অভ্যাসের বশে স্বতঃপ্রসূত মনোযোগ এগুলির প্রতি সৃষ্টি হয়ে থাকে।

প্রকৃতির দিক দিয়ে স্বতঃপ্রসূত মনোযোগ আর অভ্যাসগত মনোযোগের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে প্রথম শ্রেণীর মনোযোগের মূলে আছে উদ্দীপকের আকর্ষণ করার ক্ষমতা আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মূলে আছে ব্যক্তির অভ্যাস।

যে সকল বিষয়ে এককালে মনোযোগ দিতে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন হত, অভ্যাসে পরিণত হলে সেই সকল ক্ষেত্রে মনোযোগ স্বতঃপ্রণোদিত ভাবেই আসে। যে ছেলেকে স্কুলে অঙ্কের বইতে জোর করে মনোযোগ দিতে হয়েছিল, বড় হয়ে সে যখন গণিতের অধ্যাপক হল, তখন তার চেয়ে কঠিন কঠিন অঙ্কের বইতে মনোযোগ দিতে তার আর মানসিক প্রচেষ্টা লাগল না।

ইচ্ছাপ্রসূত মনোযোগই কালক্রমে অভ্যাসগত মনোযোগে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরের মূলে থাকে আমাদের প্রয়োজন-বোধ, আগ্রহ, সামাজিক প্রথা, মনোভাব ইত্যাদি।

ইচ্ছা-নিরপেক্ষ (non-volitional) মনোযোগকে আবার কোনও কোনও মনোবিজ্ঞানী দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যথা, আরোপিত (enforced) এবং স্বাভাবিক (spontaneous)। আরোপিত ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ বলতে সেই মনোযোগকে বোঝায় যেটা কোন প্রবৃত্তি থেকে জন্ম নেয় এবং প্রবৃত্তির তাগাদাতেই সক্রিয় থাকে। যেমন, ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় খাওয়ার সময় যে মনোযোগ সেটি আরোপিত ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ। ক্ষুধা-প্রবৃত্তি যেন এই মনোযোগটি ব্যক্তির উপর আরোপ করে দিয়েছে এবং যতক্ষণ এই প্রবৃত্তিটি সক্রিয় থাকে ততক্ষণ মনোযোগও অব্যাহত থাকে।

স্বাভাবিক ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগের মূলে আছে কোন অর্জ্জিত আগ্রহ বা সেন্টিমেন্ট। যেমন, কারও ছবি তোলায় গভীর আগ্রহ জন্মে গেছে। তার ফলে ছবি বা ছবি-ঘটিত অন্য কিছুতে তার মনোযোগ স্বাভাবিক ভাবেই যাবে।

ইচ্ছাপ্রসূত মনোযোগকেও আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, অবিভক্ত (implicit) এবং বিভক্ত (explicit)। অবিভক্ত ইচ্ছাপ্রসূত মনোযোগের ক্ষেত্রে মনোযোগের পশ্চাতে থাকে একটিমাত্র ও অবিভক্ত ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ। আর বিভক্ত ইচ্ছাপ্রসূত মনোযোগের ক্ষেত্রে মনোযোগকে অব্যাহত রাখার জন্য বার বার ও একাধিক ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার লাগে। স্পষ্টতই প্রথম শ্রেণীর মনোযোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং অধিকতর কার্য্যকরী হয়।

মনোযোগের বিকাশ (Development of Attention)

শিশুর মনোযোগের বিকাশ পর্য্যবেক্ষণ করলে তিনটি স্তর পাওয়া যায়।

প্রথম শৈশবে শিশুর মনোযোগ ইচ্ছা-নিরপেক্ষ থাকে। এ সময়ে উদ্দীপকের প্রকৃতি অনুযায়ীই তার সমস্ত মনোযোগ নিয়ন্ত্রিত হয়। ইচ্ছার প্রয়োগ করে মনোযোগ দেওয়া তার পক্ষে তখন সম্ভব হয় না। সেইজন্য অতি শৈশবে এমন কোন বস্তু বা বিষয় শেখানর চেষ্টা করা উচিত নয় যাতে তাকে জোর করে মনোযোগ দিতে হবে। রঙচঙে জিনিষপত্র, প্রচুর ছবিওয়ালা বই ইত্যাদি সহজেই তার মনোযোগ আকর্ষণ করে।

শিশু আর একটু বড় হলে ক্রমশ ইচ্ছার দ্বারা সে তার মনোযোগকে নিয়ন্ত্রিত করতে শেখে। অর্থাৎ এসময় থেকে তার ইচ্ছাপ্রসূত মনোযোগের সৃষ্টি হয়। তার কাছে আকর্ষণীয় নয় এমন বস্তুর প্রতিও সে মনোযোগ দিতে সমর্থ হয়। বিশেষ করে স্কুলে নানা কাজ ও পড়াতে ইচ্ছাপ্রসূত মনোযোগ প্রয়োগ করতে সে বাধ্য হয়।

তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ পরিণত বয়সে তার মধ্যে অভ্যাসমূলক মনোযোগ দেখা দেয়। এই সময় তার কাছে আকর্ষণীয় নয় এমন বস্তুর প্রতি সে বিনা আয়াসে মনোযোগ দিতে শেখে। নিজের কাজকর্ম, বৃত্তির চাপ, পরিবেশের চাহিদা, হবি, শখ ইত্যাদি থেকে ব্যক্তির মধ্যে নানা রকম অভ্যাসমূলক মনোযোগ দেখা দেয়।

মনোযোগ ও আগ্রহ (Attention & Interest)

আমরা জানি যে, উদ্দীপকের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা স্বভাবতই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। এগুলির ক্ষেত্রে উদ্দীপক জোর করে আমাদের মনোযোগ অধিকার করে, আমাদের মন সেটির প্রতি সাড়া দেবার জন্য তৈরী থাক আর না থাক।

কিন্তু যে সকল উদ্দীপকের এইভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করার ক্ষমতা নেই, সে সকল ক্ষেত্রে আমাদের মনোযোগ নিয়ন্ত্রিত হয় আভ্যন্তরীণ নির্দ্ধারকের দ্বারা—এককথায় যার নাম দিয়েছি আমরা মানসিক প্রস্তুতি। মানসিক প্রস্তুতির একটা বড় উপাদান হল আগ্রহ (interest)। যে বস্তুটির প্রতি আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে সেই বস্তুর প্রতি মনোযোগ দেবার জন্য আমাদের

মানসিক প্রস্তুতিও স্বভাবত থাকবে। ভাল করে ভেবে দেখতে গেলে আগ্রহ ও মনোযোগের মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বর্ত্তমান। মনোযোগ হল মনের উদ্দীপক-নির্ব্বাচনী প্রক্রিয়া, এবং এর পেছনে আছে মনের একট বিশেষ সংগঠন যাকে আমরা মানসিক প্রস্তুতি বা আগ্রহ বলে থাকি। যখন এই মানসিক সংগঠনটি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে তখন তাকে আগ্রহ বলি, আর যখন সেটি সক্রিয় হয়ে উঠে এবং বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়ার রূপ নেয় তখন তাকে বলি মনোযোগ। এক কথায় বিশেষ একটি উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেওয়ার ইচ্ছাটা যখন নিছক ইচ্ছারূপে মনে থাকে তখন তাকে বলি আগ্রহ, আর যখন হাজার উদ্দীপকের মধ্যে থেকে ঐ উদ্দীপকটিকে বেছে নিয়ে ঐটির প্রতি সাড়া দিই তখন তাকে বলে মনোযোগ। ম্যাকডুগালের ভাষায় আগ্রহ হল সুপ্ত মনোযোগ (latent attention) এবং মনোযোগ হল আগ্রহের সক্রিয় রূপ (Interest in action)।

এই আগ্রহের পিছনে আবার থাকতে পারে নানা কারণ, যেমন, জৈবিক চাহিদা, মানসিক চাহিদা, কৌতূহল, মনোভাব, অনুকরণ, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি।

শিক্ষায় আগ্রহ ও মনোযোগ

কোন কিছু শিখতে হলে মনোযোগের প্রয়োজন সব চেয়ে আগে। পঠনীয় বিষয়টির প্রতি ঠিকমত মনোযোগ দিতে না পারলে সেটি শেখা হতেই পারে না। আবার আগ্রহের সঙ্গে মনোযোগের সম্বন্ধও অঙ্গগত। যা ভিতরে আগ্রহ, তাই বাইরে মনোযোগ। অতএব শিক্ষার সঙ্গে আগ্রহের সম্পর্ক যে অতি নিবিড় একথা বলা বাহুল্য।

তাহলে একথাও বলা চলতে পারে যে শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি যাতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ থাকে সেটি সর্ব্বাগ্রে দেখতে হবে। এক কথায় শিশুর শিক্ষাকে তার আগ্রহের উপর গড়ে তুলতে হবে, অন্য কিছুর উপর নয়।

শিক্ষাকে আগ্রহ-ভিত্তিক করে তোলাটা আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান কর্ম্মসূচী। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই শিক্ষাবিদগণ এ নীতির উপর বিশেষ করে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। জার্ম্মান শিক্ষাবিদ জোয়ান হার্ব্বার্ট শিক্ষায় শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করাটা শিক্ষকের প্রথম কর্ত্তব্য বলে বর্ণনা করেছেন। আধুনিক শিক্ষাবিদ জন ডিউই আগ্রহের এক নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে

ব্যক্তির ঈপ্সীত ক্রমবিকাশের পথে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে তার সত্তার এগিয়ে যাওয়ার নামই আগ্রহ। অতএব আগ্রহ হবে শিক্ষাব্যবস্থার পথ-নির্দ্দেশক। তাঁর মতে শিশুর মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা বলে কোন বস্তু হতে পারে না। কেননা আগ্রহ সত্তার বিকাশলাভের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রয়াস, তা বাইরে থেকে সৃষ্টি করা যায় না।

শিক্ষাকে আগ্রহ-ভিত্তিক করতে হলে তাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। এ কথাটার কিন্তু অনেকে ভুল অর্থ করেন। তাঁরা মনে করেন যে শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে তোলার অর্থ হল—যা কিছু শক্ত, কঠিন বা শ্রমসাপেক্ষ তা শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বাদ দিতে হবে এবং রমণীয় ও চিত্তাকর্ষক বস্তু দিয়ে শিক্ষাসূচীকে ভরে তুলতে হবে। তাঁরা এইজন্যই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে "কোমল শিক্ষাব্যবস্থা" (soft pedagogy) বলে সমালোচনা করেন এবং এ নীতির ফলে শিক্ষার মান যে অবনত হয়ে যাবে এই মতই তাঁরা পোষণ করেন।

প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভুল এবং আগ্রহ কথাটির অশুদ্ধ অর্থ থেকেই এ ব্যাখ্যার জন্ম।

শিক্ষাকে আগ্রহ-ভিত্তিক করে তোলার অর্থ এ নয় যে শিক্ষার মানকে নীচু করতে হবে বা শিক্ষার মধ্যে শক্ত কিছু দেওয়া চলবে না। একথার প্রকৃত অর্থ হল যে বস্তুটি গ্রহণ করার জন্য শিশুর মধ্যে যেন যথেষ্ট স্বাভাবিক উৎসাহ থাকে। দেখা গেছে যে শিশুর মধ্যে যদি পাঠগ্রহণের জন্য যথার্থ আসক্তি থেকে থাকে তবে সে পাঠ যতই দুরূহ বা কষ্টসাপেক্ষ হোক না কেন অতি সহজেই সে তা গ্রহণ করবে, অবশ্য যদি সে পাঠ শিশুর মানসিক সামর্থ্যের উপযোগী হয়। অতএব দেখা যে যাচ্ছে শিক্ষাকে চিত্তাকর্ষক করার আধুনিক আন্দোলন মনস্তত্ত্বমূলক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাঁরা এই আন্দোলনকে "কোমল শিক্ষানীতি" বলে সমালোচনা করে থাকেন তাঁরা আসলে এর মূল সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারেন নি।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে যেখানে মনোযোগ স্বতঃপ্রসূত বা ইচ্ছানিরপেক্ষ সেখানে না হয় বলা চলে যে মনোযোগের পিছনে শিশুর আগ্রহ আছে এবং সে সকল ক্ষেত্রে শিক্ষাও যে স্বভাবতই আগ্রহ-ভিত্তিক হবে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ত আর স্বতঃপ্রসূত মনোযোগ আসে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বহু পাঠে শিক্ষার্থী স্বতঃপ্রসূত মনোযোগ দিতে পারে না এবং তাকে জোর করে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের সাহায্যে মনোযোগ আনতে হয়। সে

সকল ক্ষেত্রে কি করে শিক্ষাকে আগ্রহ-ভিত্তিক বলে বর্ণনা করা যায়?

এর উত্তরে এটুকু বলা যেতে পারে যে অপেক্ষাকৃত দুরূহ ও বাহ্যত নীরস পাঠে শিক্ষার্থীকে মনোযোগ আনতে হলে তার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে হয়, একথা সত্য। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে সেই পাঠ-গ্রহণে তার আগ্রহের অভাব আছে। বহির্জগতের পরস্পর প্রতিযোগী অসংখ্য উদ্দীপক থেকে মনোযোগকে সরিয়ে এনে অপেক্ষাকৃত কম আকর্ষণীয় কোনও উদ্দীপকের উপর মনোযোগকে নিবদ্ধ করতে হলে ইচ্ছার প্রয়োগ অপরিহার্য্য। কিন্তু এই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের পিছনে যদি শিক্ষার্থীর সত্যকারের আগ্রহবোধ না থাকে তবে সে মনোযোগ স্থায়ী হয় না এবং শিক্ষাও কার্য্যকরী হয় না। যখন ক্লাসরুমে শিক্ষার্থী কোনও দুরূহ অর্থনীতি বা দর্শনের তত্ত্বব্যাখ্যা শুনছে তখন তাকে জোর করে সেই বক্তৃতায় মনোযোগ নিবদ্ধ করে রাখতে হচ্ছে বটে, কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তির পিছনে নিশ্চয়ই কাজ করে ঐ বক্তৃতাটি শোনার সার্থকতা সম্বন্ধে একটা দৃঢ় বিশ্বাস। একেই আমরা আগ্রহ বলতে পারি।

এই আগ্রহ বা সার্থকতা সম্বন্ধে জ্ঞানের অপর নাম হল চাহিদা-বোধ। যে বস্তু সম্বন্ধে ব্যক্তির মধ্যে চাহিদা জন্মায়, তা পাবার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই তার আগ্রহ আসে। প্রাচীন এবং বহু আধুনিক শিক্ষাবিদেরই ধারণা যে শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ বাইরে থেকে সৃষ্টি করা যায়। এই বিশ্বাসের বশেই শিক্ষার ক্ষেত্রে শাস্তি ও পুরস্কার দেবার প্রথা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। শিক্ষক বা পিতামাতারা বিশ্বাস করতেন যে শাস্তির ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে শিশুর পাঠে আগ্রহ জন্মাবে। কিন্তু এটি একটি বিরাট মনস্তত্ত্বমূলক ভুল। আগ্রহ হল স্বাভাবিক প্রেরণাবোধ, ডিউইর ভাষায় ব্যক্তিসত্তার নিজের বিকাশের পথে এগিয়ে যাবার স্বাভবিক প্রয়াস। অতএব শাস্তি-পুরস্কারের সাহায্যে যে আগ্রহ সৃষ্টি হয় সে আগ্রহ ক্ষণস্থায়ী, দুর্ব্বল ও কৃত্রিম। তা থেকে স্থায়ী ফল পাওয়ার আশা করা কখনই যেতে পারে না। সেজন্য স্বাভাবিক আগ্রহ সৃষ্টি করতে হলে দেখতে হবে যে শিক্ষণীয় বস্তুর প্রতি যাতে শিক্ষার্থীর সত্যকারের চাহিদা জন্মায় এবং শিক্ষাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিশুর ব্যক্তিসত্তার প্রয়োজনের সঙ্গে তার পূর্ণসঙ্গতি থাকে। সাধারণত বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার বস্তু ও পদ্ধতি এতদিন নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে। এর ফলে শিশুর নিজস্ব চাহিদার কাছে শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি একেবারে অপরিচিত বলে মনে হত এবং শিশু কোনদিনই সেগুলি গ্রহণ করতে

আগ্রহ বোধ করত না। ফলে শিক্ষা হয়ে উঠত শাসন-ভিত্তিক ও নিপীড়নমূলক।

কিন্তু আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় বিকাশমান শিশুর নানা চাহিদাগুলিকে ভাল করে পর্য্যবেক্ষণ করা হয় এবং শিক্ষার বিষয়, পদ্ধতি, শৃঙ্খলা এ সমস্তই সেই চাহিদাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ফলে শিশুর পাঠগ্রহণে স্বাভাবিক আগ্রহ দেখা দেয় এবং অতি সহজে ও স্বল্প আয়াসে শিশু পাঠ শিক্ষা করতে পারে।

মনোযোগের বিস্তার (Span of Attention)

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখেছি যে স্মৃতির বিস্তার সীমাবদ্ধ (পৃঃ ১৩৭ দ্রষ্টব্য)। সেই রকম মনোযোগের বিস্তারেরও একটা সীমা আছে। অর্থাৎ একবার মাত্র মনোযোগ দিয়ে যে ক'টি দ্রব্য ব্যক্তি নির্ভুল প্রত্যক্ষ পারে তার সংখ্যা সীমাবদ্ধ। একে মনোযোগের বিস্তার (Span of Attention) বা উপলব্ধির বিস্তার (Span of Apprehension) বলা হয়।

ট্যাকিস্‌টোস্কোপ (Tachistoscope) নামক যন্ত্রের সাহায্যে ব্যক্তির সামনে কতকগুলি বস্তুর ছবি (যেমন বিন্দু, রেখা, শব্দ, ফুল, ফল বা জন্তুর ছবি) মুহূর্ত্তের জন্য আলোকিত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই বস্তুগুলিকে ঐ অল্পসময়ের জন্য একবার দেখে ব্যক্তিকে বলতে হবে যে সে ক'টী বস্তু দেখেছে। আলোকনের সময়টা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয় যাতে ব্যক্তি একবারের বেশী দু'বার মনোযোগ দেবার সময় না পায়। আলোকিত বস্তুর সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে দেখতে হবে যে সর্ব্বোচ্চ কত সংখ্যার বস্তু সে এইভাবে একবার মনোযোগ দিয়ে নির্ভুলভাবে দেখতে পারে। দেখা গেছে যে সাধারণ মানুষ ৫।৬ টির বেশী বস্তু একসঙ্গে একবারে নির্ভুলভাবে দেখতে পারে না।

মনোযোগের বিচলন (Fluctuation of Attention)

মনোযোগের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এর পরম অস্থিরতা। এটি সর্ব্বজনীন অভিজ্ঞতা যে আমাদের মনোযোগ প্রতিনিয়তই এক বস্তু থেকে অপর বস্তুতে

সঞ্চালিত হচ্ছে। একটি বস্তুর উপর মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলে দেখা যাবে যে সে বস্তু থেকে বার বার মনোযোগ চলে যাচ্ছে এবং বার বার ফিরে আসছে। মনোযোগের এই আচরণের নাম দেওয়া হয়েছে বিচলন (fluctuation)। আবার কখনও কখনও দুই প্রতিদ্বন্দ্বী উদ্দীপকের মধ্যে মনোযোগ ঘোরাফেরা করে। যেমন পাশের ঘরে রেডিও বাজছে আর নিজের ঘরে একটি বইতে মন দেবার চেষ্টা করছি। দেখা যাবে যে মনোযোগ ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত রেডিও ও বইয়ের মধ্যে দুলতে থাকবে। একে মনোযোগের বিদোলন (oscillation) বলা যেতে পারে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মনোযোগের বিচলনের হার ৫।৬ সেকেণ্ড। অর্থাৎ একটা বিশেষ উদ্দীপকে ৫।৬ সেকেণ্ডের বেশী আমরা মনোযোগ রাখতে পারি না। স্বভাবতই আপত্তি উঠতে পারে যে সাধারণত আমরা একটি বস্তুতে এর চেয়ে অনেক বেশীক্ষণ মনোযোগ রেখে থাকি। যেমন, আমরা একঘণ্টা মনোযোগ দিয়ে একটা কাজ করতে পারি বা একটা বই পড়তে পারি। এর উত্তর হল যে আমরা যখন একটা বইয়ের পাতার উপর মন দিই, আসলে তখন কিন্তু একটি বিশেষ স্থানে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে না। সমস্ত পাতার মধ্যে এক স্থান থেকে অপর স্থানে আমাদের মনোযোগ বার বার সঞ্চালিত হয়, যদিও বই পড়াতেই সমস্ত ক্ষণ আমাদের মনোযোগ থাকে।

এইজন্য মনোযোগের বিচলনের পরীক্ষণ করা হয় ক্ষুদ্রতম উদ্দীপক নিয়ে। একটি ঘড়ি আমাদের কানের কাছ থেকে এমন দূরে রাখা হল যে যার চেয়ে দূরে নিয়ে গেলে তার টিক টিক আওয়াজটা আর শোনাই যাবে না। এখন যদি ঘড়ির টিক টিক আওয়াজটার প্রতি আমরা মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করি তবে দেখা যাবে যে কিছুক্ষণ শব্দটা শোনা যাচ্ছে আবার কিছুক্ষণ শোনা যাচ্ছে না। এর কারণ হল মনোযোগের বিচলন। অর্থাৎ ঘড়ির টিকটিক শব্দের উপর আমাদের মনোযোগ একবার থাকছে, আর একবার থাকছে না। আর একটি পরীক্ষণে দৃষ্ট বস্তুর উপর মনোযোগের বিচলন পরিমাপ করা হয়। এতে একটি সাদা চাকার উপর একটি মোটা কাল লাইন টানা থাকে। এই কাল লাইনটির মাঝে মাঝে আবার সাদা দাগ দেওয়া থাকে। এই চাকাটির নাম ম্যাসন ডিস্ক (Masson Disc)। এখন এই চাকাটি যদি একটি মটরের সাহায্যে জোরে ঘোরানো যায় তবে কাল লাইনটি অদৃশ্য হয়ে যাবে, তার পরিবর্তে দেখা যাবে কতকগুলি ক্ষীণ ধূসর রঙের বৃত্ত।

আর একটি যন্ত্রের উপর একটি গোলাকার ড্রাম ঘোরে এই ড্রামটির উপর

লাগান থাকে একটি ধূমায়িত (smoked) কাগজ। এই যন্ত্রটির নাম কিমোগ্রাফ (Kymograph)। অভীক্ষার্থীর হাতের কাছে থাকে একটি চাবি যে চাবির সঙ্গে একটি ষ্টাইলাসের (লোহার কলম) যোগ থাকে। চাবিটি টিপলে ষ্টাইলাসটি সচল হয়ে ওঠে এবং ঐ ধূমায়িত কাগজের উপর দাগ কেটে যায়।

এখন অভীক্ষার্থী যদি ঘূর্ণায়মান ম্যাসন ডিস্কের যে কোন একটি ধূসর বৃত্তের উপর মনোযোগ দেবার চেষ্টা করে তবে দেখা যাবে যে বৃত্তটি কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আবার কিছুক্ষণ পরে আবির্ভূত হচ্ছে। অর্থাৎ ধূসর বৃত্তটির উপর তার মনোযোগ কিছুক্ষণের জন্য থাকছে, আবার কিছুক্ষণ থাকছে না। এখন প্রয়োজনমত চাবিটি টিপে অভীক্ষার্থী বৃত্তটির আবির্ভাব ও অদৃশ্যভবনের একটা নিখুঁত রেখাচিত্র ঐ কিমোগ্রাফটির উপর এঁকে ফেলতে পারে। এই বৃত্তটির আবির্ভাব ও অদৃশ্যভবনের হার থেকেই ব্যক্তির মনোযোগের বিচলনের হিসাব করা হয়ে থাকে।

মনোযোগের বিচলনের এই সকল পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে এই ধরনের ক্ষুদ্রতম চাক্ষুষ উদ্দীপকে ৫।৬ সেকেণ্ডের বেশী ব্যক্তির মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে না।

মনোযোগের বিভাজন (Division of Attention)

অনেকের ধারণা মনোযোগকে ভাগ করে দুটি বা তার বেশী উদ্দীপকের উপর একই সময় প্রয়োগ করা সম্ভব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনোযোগ অবিভাজ্য। তবে সার্কাসে দেখা যায় যে খেলওয়াড়রা একই সঙ্গে হাত, পা, মুখ দিয়ে বিভিন্ন কাজ করছে। জুলিয়াস সিজার নাকি একসঙ্গে চারটি চিঠি আবৃত্তি করে যেতে এবং সেই সঙ্গে পঞ্চমটি নিজে লিখতে পারতেন। মাইকেল মধুসূদন একই সঙ্গে দু'তিন খানা বইয়ের পাণ্ডুলিপি মুখে মুখে রচনা করে যেতেন ইত্যাদি মনোযোগের বিভাজনের অনেক দৃষ্টান্ত কিন্তু পাওয়া যায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও বহু ক্ষেত্রে আমরা একাধিক কাজ একসঙ্গে সমাধান করে থাকি। প্রকৃতপক্ষে এগুলির দু'রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রথমত সার্কাসের খেলওয়াড়ের ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন কাজগুলি এমন একটা যান্ত্রিক স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে যার ফলে সেগুলি সম্পন্ন করতে তার আর মনোযোগ লাগে না। সে যদি চারটি কাজ একসঙ্গে করে থাকে তবে তার তিনটি কাজ যান্ত্রিক আর একটির জন্য হয়ত তার মনোযোগের প্রয়োজন হয়।

জুলিয়াস সিজার, মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতির ক্ষেত্রগুলি কিন্তু মনোযোগের দ্রুত বিদোলনের দৃষ্টান্ত। এঁরা মনোযোগকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছেন যে বিভিন্ন কাজগুলির মধ্যে মনোযোগকে তাঁরা প্রয়োজনমত সঞ্চালিত করে সব কাজগুলিই একসঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন।

মনোযোগের নিয়ন্ত্রণ (Control of Attention)

মনোযোগের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমরা যা জানলাম তা থেকে আমরা মনোযোগ নিয়ন্ত্রণের উপায় সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান তথ্য আহরণ করতে পারি। যাঁরা প্রায়ই মনোযোগের অভাব সম্বন্ধে অভিযোগ করেন তাঁরা নীচের উপায়গুলি অবলম্বন করলে উপকৃত হতে পারেন।

মনোযোগ নষ্ট করে দেয় এমন কতকগুলি বিকর্ষক (distractor) সব ক্ষেত্রেই থাকে। কারও কারও ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ বিকর্ষক থাকে, যেমন, বিশেষ কোনও সমস্যা, বা দুশ্চিন্তা, বিশেষ কোন কিছুর প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি। এই বিকর্ষকগুলিকে দূর করতে হবে সর্ব্বাগ্রে। প্রয়োজন হলে যে পরিবেশে বিকর্ষক থাকে সেই পরিবেশ থেকে দূরে সরে যেতে হবে। আর যদি বিকর্ষককে পরিবেশ থেকে দূর করা সম্ভব না হয় তবে সেই বিকর্ষককে সহ্য করার অভ্যাস তৈরী করতে হবে। যেমন, বাড়ীর পাশের কারখানায় হাতুড়ির আওয়াজ বা পাশের বাড়ীর কাঁদুনে ছেলের একঘেয়ে চীৎকার, এগুলিকে অগ্রাহ্য করার অভ্যাস করে নিতে হবে। তবে বিকর্ষকের সঙ্গে যুদ্ধ করার চেয়ে বিকর্ষককে এড়িয়ে যাওয়া ভাল, বিশেষ করে যদি বিকর্ষক শক্তিশালী হয়। কেননা শক্তিশালী বিকর্ষককে ঠেকিয়ে রাখতে হলে যথেষ্ট মানসিক শক্তির অপচয় ঘটে।

দুশ্চিন্তা ও অমীমাংসিত সমস্যা মনোযোগের বিকর্ষণের একটা বড় কারণ। এইজন্যই অল্পবয়স্কদের অপেক্ষা বয়স্কদের পক্ষে মনোযোগ দেওয়া শক্ত হয়ে ওঠে। মনোযোগ দিতে হলে এই ধরনের বিকর্ষণকারী সমস্যাগুলির একটা সাময়িক সমাধানও পূর্ব্বাহ্নে করে নিতে হবে।

অতৃপ্ত বাসনাও একটি বড় বিকর্ষক। যেমন, পড়তে বসলে ঘুরে বেড়ানো, গল্প করা, সিনেমায় যাওয়া প্রভৃতির বাসনাগুলি অতৃপ্ত থেকে যায়। ফলে মনোযোগের বিচলন ঘটে। অতএব পড়ায় মনোযোগ দিতে বসার আগে নিজের

মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিতে হবে। কোন্ বাসনাটির তৃপ্তি হওয়া আগে দরকার সেটা ঠিক করে নিয়েই তবে তাতে মনোযোগ দিতে হবে।

মনোযোগের সবচেয়ে বড় কথা হলো প্রেষণার (motive) বোধ। যে বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে তার প্রতি আন্তরিক আগ্রহ না থাকলে মনোযোগ আসতে পারে না। সাধারণত দেখা যায় যে ব্যক্তির সত্যকারের চাহিদার সঙ্গে মনোযোগের বস্তুর কোনও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকায় মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে বৃত্তিমূলক ব্যাপারে অনেক সময় ভুল নির্ব্বাচন হওয়ার ফলে মন দিয়ে কাজ করা সম্ভব হয় না। এর জন্য প্রথমত প্রয়োজন চাহিদা-অনুযায়ী বৃত্তির নির্ব্বাচন। আর দ্বিতীয়ত যদি ঘটনাচক্রে বা বাধ্য হয়েই কোন চাহিদা-বিরোধী বৃত্তির নির্ব্বাচন হয়ে থাকে তবে তাকে অপরিবর্ত্তনীয় বলে গ্রহণ করতে হবে এবং চাহিদার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে। তখন দেখা যাবে মনোযোগ দিতে অসুবিধা হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রেও দরকার মনের সঙ্গে বোঝাপড়া।

মনোযোগ দেবার আর একটা ভাল উপায় হল পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত কাজ করা। যার কাজের মধ্যে যত ভাল পরিকল্পনা এবং শৃঙ্খলা আছে তার পক্ষে মনোযোগ দেওয়া তত সহজ।

প্রশ্নাবলী

1. Show how attention, interest and effort are interrelated. Indicate how the findings of Psychology about these factors may be utilised to ensure efficient teaching. (B. T. 1954)

Ans. (পৃঃ ১৫১—পৃঃ ১৫২)

2. Explain the nature of attention. Is attention interest in action? Discuss. What are the educational implications? (B. T. 1956)

Ans. (পৃঃ ১৪২—পৃঃ ১৫৫)

3. What are interests? How are they related to attention? (B. T. 1958)

Ans. (পৃঃ ১৫১—পৃঃ ১৫৫)

4. Explain the nature of attention and discuss its relation to interest. What do you mean by "fluctuation of attention ? (B. T. 1956)

Ans. (পৃঃ ১৪৫+পৃঃ ১৫১—পৃঃ ১৫৭)

5. Define attention and determine the different types of attention. (B. T. 1957)

Ans. (পৃঃ ১৪৫—পৃঃ ১৫০)

6. What are the determiners of attention ? Discuss their educational significance.

Ans. (পৃঃ ১৪৬—পৃঃ ১৪৮)

7. Write notes on :

(a) Span of Attention (b) Volitional Attention (c) Non-volitional Attention. (B. A. 1954) (d) Mental Set.

8. Discuss a few methods by which attention can be controlled.

Ans. (পৃঃ ১৫৮—পৃঃ ১৫৯)

9. Explain the intimate connection between attention and interest. (B.A. 1958)

Ans. (পৃঃ ১৫১—পৃঃ ১৫৫)

10. Explain the nature and conditions of attention. (B. A. 1960)

Ans. (পৃঃ ১৪৫—পৃঃ ১৪৮)

11. Discuss the importance of attention and interest in memorisation. (B.A. 3-yr 1963)

Ans. (পৃঃ ১৫১—পৃঃ ১৫৫)

৭

স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System)

প্রাণীর প্রত্যেকটি আচরণই হল পারিবেশিক উদ্দীপনার উত্তরে দেওয়া তার সাড়া বা প্রতিক্রিয়া (response)। পরিবেশের বিভিন্ন শক্তিগুলি, যেগুলির নাম দিয়েছি আমরা উদ্দীপক (stimulus)—প্রাণীর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি গ্রহণেন্দ্রিয়গুলির (Receptor) মাধ্যমে প্রাণীর মধ্যে উদ্দীপনা পাঠায় এবং প্রাণী তার উত্তরে পেশী, গ্রন্থি, অন্ত্র ইত্যাদি কর্মেন্দ্রিয়ের (Effector) সাহায্যে আচরণ সম্পন্ন করে থাকে।

আভ্যন্তরীণ সমন্বয়ন

কিন্তু উদ্দীপকের প্রভাব ও প্রাণীর প্রতিক্রিয়া, এ দুয়ের মাঝখানে আর একটা স্তর আছে। আমরা তাকে বলতে পারি আভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের (Internal integration) স্তর। এই সমন্বয়নই প্রাণীর আচরণের প্রকৃতি নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অর্থাৎ যখন একটি আচরণ ঘটে থাকে তখন নীচের স্তরগুলি পর পর অনুষ্ঠিত হয়। যথা—

উদ্দীপকের ক্রিয়া—আভ্যন্তরীণ সমন্বয়ন—প্রাণীর প্রতিক্রিয়া

এই আভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের কাজটি সম্পন্ন করে যে যন্ত্রসমষ্টিটি তার নাম দেওয়া হয়েছে স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System)। কোন্ উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে, একাধিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কেমন করে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে স্থির রাখতে হবে, কেমন করে পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলিকে সংগঠিত করতে হবে ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পন্ন করতে প্রাণীকে সমর্থ করে তার স্নায়ুতন্ত্র। যে প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্র যত উন্নত তার আভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের কাজটাও তত ভাল হয়। এই জন্যই উন্নত স্নায়ুতন্ত্রের অধিকারী প্রাণীর আচরণ হয়ে ওঠে বিশেষধর্মী, সুসংহত ও উদ্দীপকের উপযোগী এবং তার সঙ্গতি-বিধানের উৎকর্ষও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়, যার ফলে তার জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার সম্ভাবনাও প্রচুর বেড়ে যায়।

যখন একটি উদ্দীপক প্রাণীর কোন গ্রহণেন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে তখন যে পথের মাধ্যমে তার গ্রহণেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় তাকে স্নায়ু (nerve) বলা হয়। এই স্নায়ুপথ বেয়ে অতি দ্রুতবেগে (প্রায় সেকেণ্ডে ৭৫ গজ) উদ্দীপনা গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে কর্মেন্দ্রিয়ে পৌছয় এবং তারই ফলে প্রাণীর আচরণ সংঘটিত হয়। কিন্তু গ্রহণেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে এই স্নায়ু সংযোগ সরাসরি ঘটে না। এই দুয়ের মাঝে সংযোগ-কেন্দ্ররূপে কাজ করে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড। অর্থাৎ সমস্ত স্নায়ুগুলিই মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড থেকে বেরিয়ে শরীরের সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। স্নায়বিক উদ্দীপনা গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে জন্মলাভ করে মস্তিষ্কে পৌছয় এবং সেখান থেকে উপযুক্ত কর্মেন্দ্রিয়ে পুনরায় প্রেরিত হয় ও তারই ফলে অভীষ্ট আচরণ সংঘটিত হয়। যেমন, আমাকে কেউ নাম ধরে ডাকল। আমি মাথাটা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালাম। এখানে প্রথমে আমার কানের মধ্যে শব্দতরঙ্গ প্রবেশ করল এবং স্নায়ুপথ বেয়ে তাই থেকে জাত উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পৌছল। তারপর মস্তিষ্ক থেকে নির্দ্দেশপূর্ণ উদ্দীপনা আবার স্নায়ুপথ বেয়ে পৌছল আমার ঘাড়ের মাংস-পেশীতে এবং তারই ফলে আমি মাথাটি ঘোরালাম। যে স্নায়ুগুলি গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে উদ্দীপনা মস্তিষ্কে বয়ে নিয়ে যায় সেগুলির নাম সংবেদক (sensory) বা অন্তর্মুখী (afferent) স্নায়ু এবং এবং যে স্নায়ুগুলি মস্তিষ্ক থেকে কর্মেন্দ্রিয়তে বার্ত্তা বয়ে নিয়ে যায় সেগুলিকে প্রচেষ্টক (motor) বা বহির্মুখী (efferent) স্নায়ু নাম দেওয়া হয়েছে।

স্নায়ুতন্ত্রের বিবর্ত্তন

প্রাথমিক অবস্থায় প্রাণীর স্নায়ুমণ্ডলী ছিল অত্যন্ত সরল। এককোষী প্রাণীদের কোনরূপ স্নায়ুমণ্ডলীই ছিল না। কোষের অভ্যন্তরস্থ প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চালন ঘটত বটে কিন্তু এই সঞ্চালন ছিল অত্যন্ত অসংহত ও সর্ব্বদিকে বিস্তৃত, কোন নির্দ্দিষ্ট দিকের অভিমুখী বা কোনও বিশেষ প্রতিক্রিয়ার প্রতি উদ্দিষ্ট ছিল না। অর্থাৎ সে সময় কোন বিশেষ উদ্দীপকের কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়া ছিল না। তারপর দেখা দিল পেশী এবং এগুলি ইন্দ্রিয়জাত উদ্দীপনার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠত। তখনও পর্য্যন্ত স্নায়ুতন্ত্রের আবির্ভাব হয়নি। এর পর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু দেখা দিল। এগুলি গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে পেশীতে সংযুক্ত থাকত এবং গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে সরাসরি উদ্দীপনা পেশীতে বহন করে নিয়ে যেত।

স্নায়ুতন্ত্রের এই প্রাথমিক স্তরে কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটি করে স্নায়ুজাল (nerve-net) থাকত। পেশীগুলি এই তন্তুজালের সঙ্গে সংযুক্ত থাকত এবং গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে উদ্দীপনা এসে পৌছত এই স্নায়ুজালে এবং তার ফলে দেহের পেশীগুলি সক্রিয় হয়ে উঠত। কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ কোন উদ্দীপনার বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেওয়া সম্ভব হত না, কেননা সকল উদ্দীপনাই স্নায়ুজালের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ত এবং দেহের সমস্ত পেশীগুলিকেই একসঙ্গে সক্রিয় করে তুলত।

কিন্তু উন্নত স্নায়ুতন্ত্রে এই ধরনের অনির্দ্দিষ্ট বা এলোমেলো প্রতিক্রিয়া হতে পারে না। সেখানে একটি বিশেষ উদ্দীপনাকে একটি নির্দ্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। একটা জেলিফিসের গায়ে গরম কিছু ঠেকলে তার সমস্ত শরীরটা সঙ্কুচিত হয়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের হাতে বা পায়ে গরম কিছু ঠেকলে হাত বা পাটাই সরিয়ে নেব, জেলিফিসের মত সমস্ত শরীর দিয়ে প্রতিক্রিয়া করব না। উন্নত স্নায়ুতন্ত্রের নানা বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই সুনির্দ্দিষ্ট ও উদ্দীপক-উপযোগী আচরণ করা সম্ভব হয়েছে।

সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও জটিলতম। এর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়নের ব্যবস্থা। এখানে গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে কর্ম্মেন্দ্রিয়ে উদ্দীপনা সরাসরি যায় না, মধ্যবর্ত্তী একটি সমন্বয়ন কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে সংযোগটা স্থাপিত হয়। এই সমন্বয়ন কেন্দ্রটিই হল মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড।

স্নায়ুতন্ত্রের গঠন

আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল সন্নিকর্ষমূলক (Synaptic) প্রক্রিয়া। এটি বুঝতে হলে স্নায়ুতন্ত্রের গঠনটি ভাল করে বোঝা দরকার।

স্নায়ুতন্ত্র বলতে বোঝায় ছোট বড় বহু স্নায়ুতন্তুর একটি সমষ্টি। স্নায়ুতন্তুগুলি কেন্দ্রীয় সমন্বয়নস্থল অর্থাৎ মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড থেকে বেরিয়ে শরীরের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটি স্নায়ুতন্তু আবার কতকগুলি অনুতন্তুর সমষ্টি এবং টেলিফোনের তারের মত উপরে একটি আবরকের দ্বারা ঢাকা।

স্নায়ুতন্ত্রের একক বলে যে বস্তুটিকে ধরা হয়েছে তার নাম নিউরন (Neuron)। ডোনাল্ডসনের হিসেবে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রে ১২ বিলিয়ন (১২ লক্ষ কোটি) নিউরন আছে এবং এদের পারস্পরিক সমন্বয়নের মাধ্যমেই দেহযন্ত্রের সমস্ত কাজ চলছে।

এক একটি নিউরন অতি সূক্ষ্ম আকৃতির এবং এর মধ্যে আছে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি।

কোষদেহ (Cell body) : নিউরনের মধ্যে আছে একটি কোষ যা থেকে নিউরনের কাজগুলি সম্পন্ন হয়। এটির মধ্যে থাকে প্রোটোপ্লাজম্ যেটি হল প্রাণীর জীবনীশক্তির বাহক একপ্রকার তরল পদার্থ।

স্নায়ুকেন্দ্র (Nucleus) : কোষদেহের কেন্দ্রে আছে স্নায়ুকেন্দ্র। প্রতিটি স্নায়ুকোষের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করে এই স্নায়ুকেন্দ্রটি।

স্নায়ুশাখা (Axon) : প্রত্যেকটি নিউরনের একটি করে শাখা আছে। এগুলি সময় সময় বেশ লম্বা হয়। এই শাখার মধ্য দিয়েই কোষদেহ থেকে উদ্দীপনা অন্য কোন নিউরনে বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ে বাহিত হয়।

স্নায়ুকেশ (Dendrite) : কোষদেহের একদিকে যেমন থাকে এক্সন তেমনই অপর দিকে থাকে স্নায়ুকেশ (Dendrite)। স্নায়ুকেশগুলি অন্য নিউরন বা গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে কোষদেহে পাঠিয়ে দেয়।

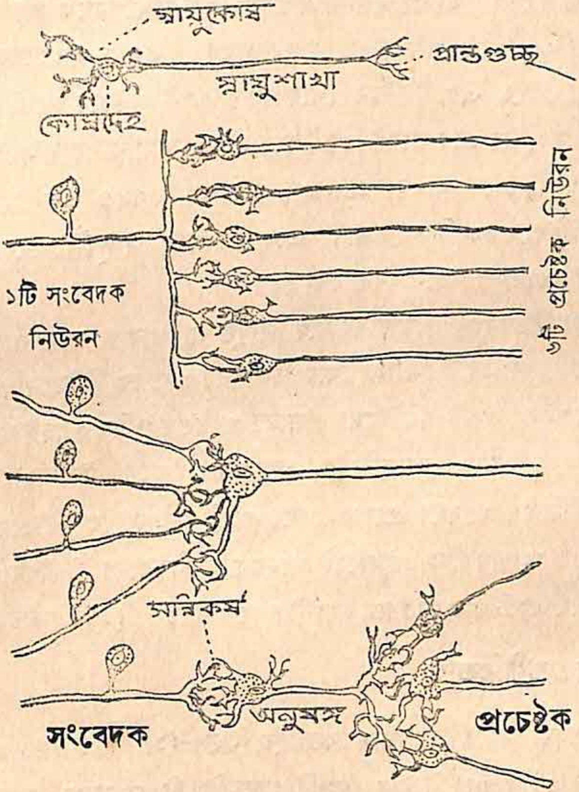
প্রান্তগুচ্ছ (End brush) : প্রত্যেকটি এক্সন বা ডেনড্রাইটের শেষপ্রান্তে আছে প্রান্তগুচ্ছ। এগুলির মধ্য দিয়ে উদ্দীপনা গৃহীত বা প্রেরিত হয়।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিউরনগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে এবং দেহের এক অংশ থেকে অপর অংশে উদ্দীপনা-সঞ্চালনের পথরূপে কাজ করে। একটি নিউরনের কোষদেহ থেকে উদ্দীপনা স্নায়ুশাখা (axon) বেয়ে প্রান্তগুচ্ছে আসে। সেখান থেকে তার সংলগ্ন আর একটি নিউরনের ডেনড্রাইটে উদ্দীপনা প্রবাহিত হয় এবং সেই নিউরনটির কোষদেহে গিয়ে পৌছয়। সেখান থেকে আবার সেই নিউরনটির এক্সন বেয়ে অপর আর একটি নিউরনে উদ্দীপনা সঞ্চালিত হয়। এই ভাবে এক নিউরন হতে আর এক নিউরনে উদ্দীপনা সঞ্চালিত হয়।

সন্নিকর্ষ (Synapse)

একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল এই যে যদিও এক নিউরন থেকে আর এক নিউরনে উদ্দীপনা চালিত হতে পারে, তবু তাদের মধ্যে কোন প্রকৃত যোগাযোগ নেই। একটি নিউরনের নির্গমন মুখ অর্থাৎ এক্সন এবং অপর একটি নিউরনের গ্রহণমুখ অর্থাৎ ডেনড্রাইট পাশাপাশি খুব নিকটবর্ত্তী হয়ে অবস্থান করে অথচ তারা পরস্পরকে স্পর্শ করে না। তার ফলে একটির এক্সন থেকে

অপরটির ডেনড্রাইটে যখন যেতে হয় তখন উদ্দীপনাকে মাঝের ফাঁকটুকু একপ্রকার লাফ দিয়ে পার হতে হয়। এই দুটি নিউরনের মাঝের যে অবস্থা তাকে সন্নিকর্ষ (Synapse) বলে এবং এই ধরনের স্নায়ুতন্ত্রগুলিকে সন্নিকর্ষমূলক স্নায়ুতন্ত্র বলা হয়।



[সর্ব্বপ্রথম ছবিটিতে একটি সাধারণ নিউরন দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয়টিতে দেখা যাচ্ছে কেমন করে একটা সংবেদক নিউরন থেকে উদ্দীপনা একাধিক প্রচেষ্টক নিউরনে সঞ্চালিত হতে পারে। তৃতীয়টিতে দেখা যাচ্ছে একাধিক সংবেদক নিউরন থেকে উদ্দীপনা একটি প্রচেষ্টক নিউরনে যাচ্ছে। সর্ব্বশেষটিতে মাঝখানে রয়েছে একটি অনুষঙ্গ নিউরন আর দু'পাশে একটি সংবেদক ও একটি প্রচেষ্টক নিউরন।]

এই ধরনের সন্নিকর্ষের বড় বৈশিষ্ট্য হল এই যে নিউরনগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকার ফলে উদ্দীপনার এক নিউরন থেকে অপর নিউরনে যাওয়া যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয় না। অর্থাৎ উদ্দীপনার কোন নিউরনে যাওয়া না

যাওয়াটা নির্ভর করছে এই সন্নিকর্ষের উপর। অনেক সময় কোন উদ্দীপনা সন্নিকর্ষে বাধা পেয়ে আর এগোতে নাও পারে। আবার কখনও কখনও অনেকগুলি নিউরন একত্র হয়ে কোন উদ্দীপনার সঞ্চালনকে সাহায্য করতে বা বাধা দিতেও পারে। আবার কখনও সন্নিকর্ষ একটি উদ্দীপনাকে তার পথ পরিবর্ত্তন করিয়ে আর এক পথে পরিচালিত করতে পারে। এছাড়া সন্নিকর্ষের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এক নিউরন থেকে আর একটি নিউরনে হয় উদ্দীপনা সম্পূর্ণ পরিবাহিত হবে, নয় একেবারেই কিছুই হবে না, মাঝামাঝি কোন সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ আংশিকভাবে বা হ্রাসপ্রাপ্তরূপে উদ্দীপনা কখনও এক নিউরন থেকে আর এক নিউরনে সঞ্চালিত হয় না। একে সন্নিকর্ষের "সম্পূর্ণ-বা-একেবারে না"-র (All-or-None) তত্ত্ব বলে বর্ণনা করা হয়।

তাছাড়া নিউরনগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকার ফলে আর একটি বড় সুবিধা হচ্ছে যে একটা নিউরন থেকে উদ্দীপনা একাধিক নিউরনে সঞ্চালিত হতে পারে। কেননা একটি নিউরনের এক্সনের প্রান্তগুচ্ছগুলির কাছেই রয়েছে আরও অনেকগুলি নিউরনের ডেনড্রাইটের প্রান্তগুচ্ছ। ফলে উদ্দীপনাটি নিউরনের স্নায়ুকেন্দ্রের নির্দ্দেশ অনুসারে প্রয়োজনবোধে একটি বা একাধিক নিউরনে পরিবাহিত হতে পারে। আবার ঠিক এইভাবেই অনেকগুলি নিউরনের উদ্দীপনা একই সঙ্গে একত্রিত হয়ে একটি মাত্র নিউরনে সঞ্চালিত হতে পারে। (১৬৫ পৃষ্ঠার চিত্র দ্রষ্টব্য)

নিউরনের শ্রেণীবিভাগ

নিউরনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা—(১) সংবেদক (sensory) বা অন্তর্মুখী (afferent) নিউরন, যেগুলি গ্রহণেন্দ্রিয় (receptor) থেকে উদ্দীপনা নিয়ে মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডে পৌঁছে দেয় ; (২) প্রচেষ্টক (motor) বা বহির্মুখী (efferent) নিউরন, যেগুলি মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড থেকে উদ্দীপনা বহন করে কর্মেন্দ্রিয়ে (effector) পৌঁছে দেয় এবং (৩) অনুষঙ্গ (association) বা সঙ্গতিসাধক (adjustor) নিউরন যেগুলি কেবলমাত্র মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডে পাওয়া যায় এবং যেগুলির একমাত্র কাজ হল সংবেদক এবং প্রচেষ্টক নিউরনগুলির মধ্যে সংযোগসাধন করা।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রাণীর আচরণের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের প্রক্রিয়াটি নিম্নবর্ণিত উপায়ে ঘটে। প্রথমে উদ্দীপক থেকে প্রসূত উদ্দীপনা গ্রহণেন্দ্রিয়ের মারফৎ

সংবেদক স্নায়ু বেয়ে গিয়ে পৌঁছয় মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডে, সেখানে সঙ্গতিসাধক বা অনুষঙ্গ নিউরনের মাধ্যমে উদ্দীপনা প্রচেষ্টক স্নায়ুতে সঞ্চালিত হয় এবং তার ফলে কর্মেন্দ্রিয় সক্রিয় হয়ে ওঠে।

মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডে যে সমন্বয়সাধনের কাজটি ঘটে সেটির উপরই আচরণের বৈচিত্র্য নির্ভর করছে। যেমন আমায় কেউ ডাকলে আমি তার দিকে তাকাব কি তাকাব না, কিं সাড়া দেব এ সবই নির্ভর করছে মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের সঙ্গতিসাধক নিউরনগুলি সংবেদক ও প্রচেষ্টক নিউরনগুলির মধ্যে কি ধরনের যোগাযোগ স্থাপন করে তার উপর।

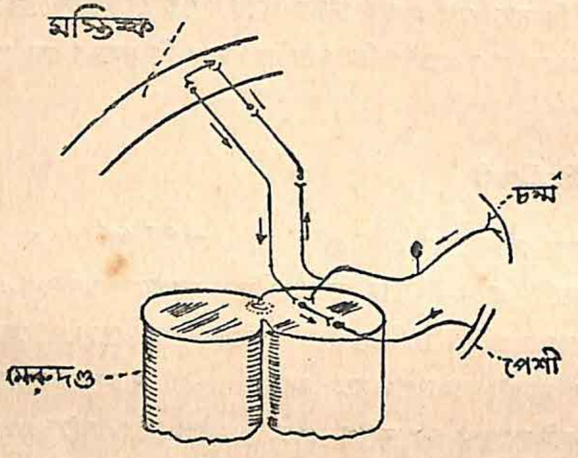
রিফ্লেক্স (Reflex)

কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়াটি পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত এবং একপ্রকার সুনির্দ্দিষ্ট করাই থাকে। তার ফলে বিশেষ একপ্রকার উদ্দীপনা এসে পৌঁছলে বিশেষ একধরনের প্রতিক্রিয়া নিজে নিজেই এসে দেখা দেবে। যেমন আগুনে হাত পড়লে হাতটা তৎক্ষণাৎ সরে আসবে। এই আচরণগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সমন্বয়ের কাজটি সরলতম এবং আগে থেকেই সম্পন্ন করা থাকে। এই ধরনের আচরণকে রিফ্লেক্স (Reflex) বলা হয়।

রিফ্লেক্স হল সহজাত আচরণের সরলতম রূপ। সময় সময় কোন বিশেষ জৈবিক প্রয়োজনের তাগাদায় কোন দৈহিক যন্ত্র আমাদের কোনরূপ প্রচেষ্টার অপেক্ষা না রেখেই সক্রিয় হয়ে উঠে এবং ঐ বিশেষ প্রয়োজনটি মেটাবার ব্যবস্থা করে নেয়। দেহের এই স্বতঃ সঙ্গতি-বিধানের প্রক্রিয়াকে রিফ্লেক্স বলে। যেমন চোখের মধ্যে কোন ধূলো বা বালি পড়ার উপক্রম হলে চোখের পাতা আপনা আপনি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায়। নাকের ঝিল্লিতে কিছু ঢুকলে হাঁচি হয়। শ্বাস-নালীতে খাদ্যকণা ঢুকলে বিষম লাগে। এই সব জৈবিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করতে আমাদের কোনরূপ প্রয়াস বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। এ কাজগুলি দেহযন্ত্র স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে সম্পাদন করে। হাই তোলা, বমি করা, হাসা, কাসা প্রভৃতিও রিফ্লেক্সের উদাহরণ। এ সবগুলিই কোন না কোন পারিবেশিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে বাঞ্ছিত সঙ্গতি-বিধানের উদ্দেশ্যে দেহের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রচেষ্টা। হাঁটুর ঠিক নীচে যদি শক্ত কিছু দিয়ে ঘা দেওয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পা-টি সবেগে ঝাঁকানি দিয়ে উঠবে। এর নাম 'হাঁটু-ঝাঁকানি' (Knee-jerk) রিফ্লেক্স। অধিকাংশ

গ্রন্থির রস-নিঃসরণও এক প্রকারের রিফ্লেক্স। যেমন জিভের লালাক্ষরণ, চোখের জল পড়া, ঘাম পড়া ইত্যাদি।

রিফ্লেক্সও অন্যান্য আচরণের মত পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর সঙ্গতিবিধানের প্রয়াস। তবে অন্যান্য আচরণের তুলনায় এটি অপেক্ষাকৃত অনেক সরল, দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য এবং এর আবির্ভাবের কারণ দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।



[এই ছবিতে উচ্চশ্রেণীর অর্থাৎ মস্তিষ্কের মাধ্যমে এবং নিম্নশ্রেণীর অর্থাৎ মেরুদণ্ডের মাধ্যমে—এই দু'শ্রেণীর সমন্বয়নের কাজ দেখান হয়েছে। মেরুদণ্ডের মাধ্যমে সমন্বয়নের পথটিকে রিফ্লেক্স আর্ক বলা হয়।]

রিফ্লেক্সের ক্ষেত্রে সমন্বয়নের কাজটি মস্তিষ্কে সংঘটিত হয় না। মেরুদণ্ডের মাধ্যমেই সংবেদক ও প্রচেষ্টক স্নায়ুপথগুলির মধ্যে সংযোগটা স্থাপিত হয়ে যায় এবং উদ্দীপকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আচরণটি অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। সংবেদক ও প্রচেষ্টক স্নায়ুপথের মধ্যে এই সহজতম ও সরলতম সমন্বয়-পথটির নাম রিফ্লেক্স আর্ক (Reflex Arc)। এই সংযোগের প্রকৃতিটি পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত থাকে বলেই রিফ্লেক্স আচরণের মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নেই এবং সেটি যান্ত্রিক ও সুনির্দ্দিষ্ট। সাধারণ ক্ষেত্রে রিফ্লেক্স আচরণে মস্তিষ্কের কোন হস্তক্ষেপ থাকে না বটে, কিন্তু কোন কোন রিফ্লেক্সের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে মস্তিষ্ক হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং আচরণের প্রকৃতিকেও পরিবর্ত্তিত করতে পারে। যেমন, আগুনে হাত পড়লে হাত সরিয়ে নেওয়া একটি রিফ্লেক্স আচরণ, কিন্তু মস্তিষ্ক ইচ্ছা করলে হাত সরিয়ে না নিতেও

পারে। কিন্তু খাদ্য দেখলে লালাক্ষরণ একটা রিফ্লেক্স, এবং মস্তিষ্কের সেখানে হস্তক্ষেপের কোন ক্ষমতা নেই।

স্নায়ুতন্ত্রের বিভাগ

যদিও আমাদের স্নায়ুতন্ত্রটি একটি সুসংবদ্ধ একক যন্ত্র রূপে কাজ করে তবু এর কার্য্যের প্রকৃতি অনুযায়ী এটির কয়েকটি বিভাগের উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথম হল কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central nervous system)। এতে আছে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড। সাধারণত রিফ্লেক্স জাতীয় সরল সমন্বয়নগুলি সংঘটিত হয় মেরুদণ্ডে এবং উচ্চস্তরের সমন্বয়নগুলি সাধিত হয় মস্তিষ্কে।

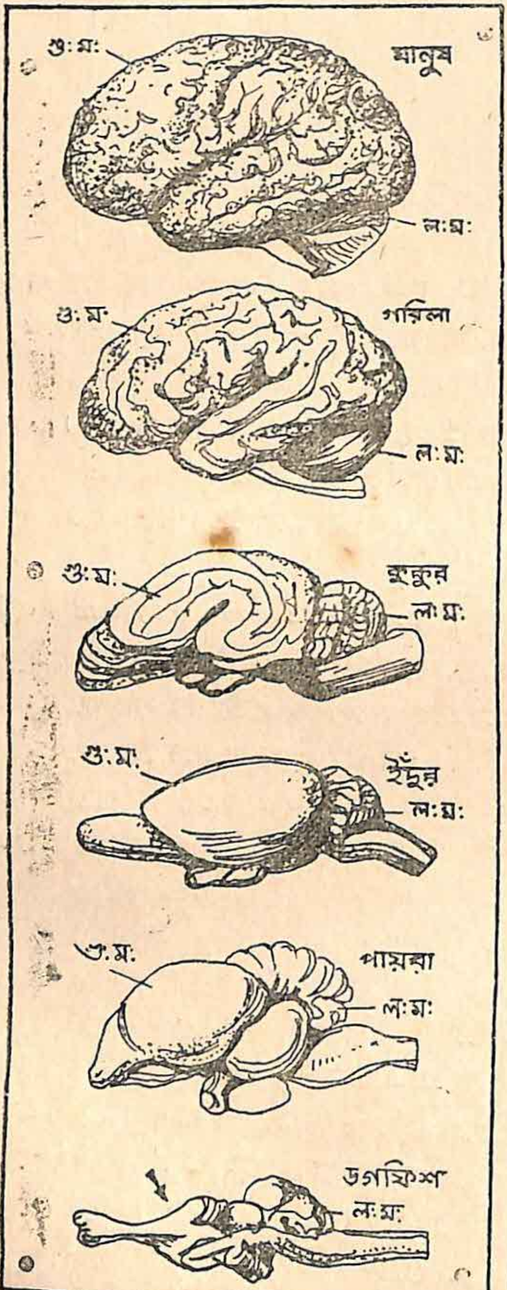
দ্বিতীয় হল প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral nervous system)। এর মধ্যে পড়ে সেই সকল স্নায়ু যেগুলি মেরুদণ্ড থেকে বেরিয়ে দেহের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। এগুলির মধ্যে ৩১ জোড়া তন্তু বেরিয়েছে মেরুদণ্ড থেকে এবং ১২ জোড়া মস্তিষ্ক থেকে।

তৃতীয় হল অটোনমিক স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic nervous system)। এটি মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে হৃদ্‌পিণ্ড, ফুসফুস, অন্ত্র ইত্যাদি দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি-গুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। প্রক্ষোভের জাগরণ ও সক্রিয়তার সময় অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলী যে বিশেষভাবে কার্য্যশীল হয়ে ওঠে তা আমরা প্রক্ষোভের আলোচনায় দেখেছি। অটোনমিক স্নায়ুতন্ত্রের আবার দুটি বিভাগ আছে, সিম্‌প্যাথেটিক ও প্যারাসিম্‌প্যাথেটিক। এদের প্রকৃতি ও কার্য্য সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের ৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মস্তিষ্ক (Brain)

আচরণের চরম নিয়ন্ত্রণ মস্তিষ্কের সমন্বয়-সাধক যন্ত্রপাতির উপর নির্ভরশীল। বিবর্ত্তন প্রক্রিয়ায় প্রাণীজীবনের উন্নতির একটা লক্ষণ হচ্ছে মস্তিষ্কের আকৃতি বৃদ্ধি। অবশ্য সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মানুষের মস্তিষ্ক যে সব চেয়ে বড় তা নয়। হাতী এবং তিমি মাছের মস্তিষ্ক মানুষের মস্তিষ্কের চেয়ে আকৃতিতে অনেক বড়। মানুষের মস্তিষ্ক ওজনে প্রায় ১২ সের, হাতীর ৬ সের এবং তিমির ৫ সের। কিন্তু দেহের ওজনের অনুপাতে মানুষের মস্তিষ্ক সবচেয়ে বড়। যেমন তিমি মাছের দেহ ও মস্তিষ্কের অনুপাত হল ১০০০০ : ১, হাতীর ৫০০ : ১ এবং মানুষের হল ৫০ : ১।

মাছ থেকে মানুষ : মস্তিষ্কের ক্রমবিবর্ত্তন



গুঃ মঃ = গুরুমস্তিষ্ক। লঃ মঃ = লঘুমস্তিষ্ক।
প্রাণী যত উন্নত হতে থাকে, গুরুমস্তিষ্কের আয়তন লঘুমস্তিকের তুলনায় ততই বড় হতে থাকে।

মস্তিষ্কের সঙ্গে মেরুদণ্ডের অনুপাতও প্রাণীর বুদ্ধির একটা বড় নির্ণায়ক। একটা ব্যাঙের মস্তিষ্ক তার মেরুদণ্ডের ওজনের সমান, বাঁদরের মস্তিষ্ক তার মেরুদণ্ডের ১৫ গুণ কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক তার মেরুদণ্ডের ৫৫ গুণ বড়।

শরীরের সমস্ত অঙ্গের মধ্যে মস্তিষ্কের কাজ সব চেয়ে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত গ্রহণেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্যান্য দেহাংশের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার কাজ করছে মস্তিষ্ক। ফলে প্রাণীর দেহ যত আকৃতিতে বড় হতে থাকে ততই মস্তিষ্কের উপর কাজের চাপ বাড়তে থাকে। এইজন্যই দেহের অনু-পাতে মস্তিষ্কের আকৃতির উপর প্রাণীর উন্নত কাজের ক্ষমতা নির্ভর করে।

মানুষেরও মস্তিষ্ক প্রথম প্রথম ছিল অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। কিন্তু যতই পরিস্থিতি জটিলতর হতে

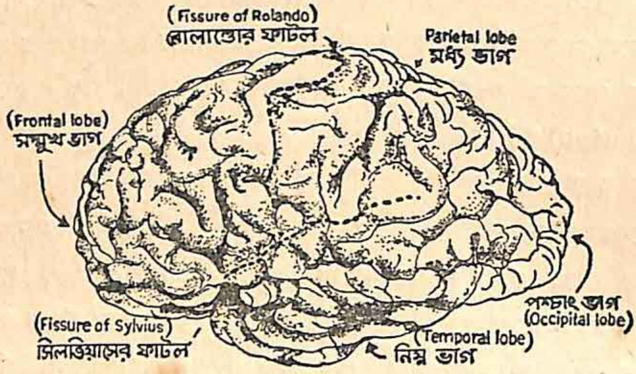
থাকে ততই মানুষকে বাধ্য হয়ে চিন্তন, বিচারকরণ, সমস্যা-সমাধান ইত্যাদি উন্নত ও জটিল ধরনের কাজ করতে হয় এবং ফলে ধীরে ধীরে তার মস্তিষ্ক আয়তনে বাড়তে থাকে। মস্তিষ্ক-আধারের (skull) সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে এই বৃদ্ধি হওয়ার ফলে সোজাসুজি মস্তিষ্কের আকৃতিটি বাড়তে পারে নি এবং তার ফলে নানা স্থানে তার গায়ে ভাঁজ খেয়ে গেছে। এইজন্যই আমাদের মস্তিষ্কটি এত ভাঁজে (convolution) পূর্ণ।

কিন্তু আকৃতিতে কেবল বাড়াটাই মস্তিষ্কের উৎকর্ষের লক্ষণ নয়। উচ্চ ও উন্নত ধরনের সমন্বয়ন করার ক্ষমতাও তার থাকা চাই। নিম্নশ্রেণীর অনেক প্রাণীর যথেষ্ট বড় মস্তিষ্ক থাকা সত্ত্বেও তাদের মস্তিষ্ক কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তরের পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট যান্ত্রিক সমন্বয়নের কাজগুলিই করতে পারে। ফলে তাদের মস্তিষ্ক আকৃতিতে বড় হলেও সেগুলির কার্য্যকারিতা খুব বেশী নয়, যেমন হাতী বা তিমি মাছের ক্ষেত্রে।

কিন্তু মানুষ প্রভৃতি উন্নত প্রাণীর ক্ষেত্রে উচ্চ ও জটিল ধরনের সঙ্গতিবিধানের কাজ করার উপযোগী মস্তিষ্ক আছে এবং তার জন্যই তারা অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান। মস্তিষ্কের যে অংশটুকু এই উন্নত সঙ্গতিবিধানের কাজের উপযোগী তাকে নতুন মস্তিষ্ক বলা হয়। এই অংশটুকুর নাম গুরু মস্তিষ্ক (cerebrum) এবং যে অংশটুকু প্রধানত দৈহিক সঙ্গতিবিধানের কাজই করে থাকে তাকে বলা হয় পুরোনো মস্তিষ্ক। এই অংশটুকুর নাম লঘু মস্তিষ্ক (cerebellum)। ক্রমবিবর্ত্তনের পর্য্যায়ে প্রাণী যত উন্নত হয় ততই তার গুরুমস্তিষ্কের আয়তন লঘুমস্তিষ্কের চেয়ে বড় হতে দেখা যায়। (পৃঃ ১৭০)

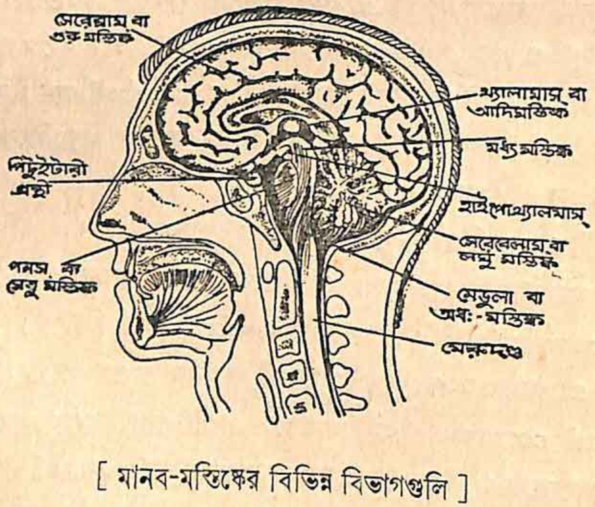
গুরুমস্তিষ্ক সম্পূর্ণ মস্তিষ্ক-সংগঠনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম অংশ। মস্তিষ্ক-আধারের সীমাবদ্ধ অপরিসর স্থানের মধ্যে গুরুমস্তিষ্কের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে এর গায়ে অসংখ্য ভাঁজ (convolution) এবং ফাটল (fissure) দেখা দিয়েছে। গুরুমস্তিষ্কের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ হল বহিঃপ্রদেশটি, যার নাম দেওয়া হয়েছে মস্তিষ্ক আস্তরণ (cerebral cortex)। এই আস্তরণে কোটি কোটি স্নায়ু আছে। এগুলি দেখতে ধূসর বর্ণের। উন্নত সমন্বয়নের ক্ষমতাসম্পন্ন সঙ্গতি-সাধক নিউরনগুলি থাকে এইখানেই। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর মস্তিষ্ক আস্তরণ এইজন্য বেশ সরল। মানুষের মস্তিষ্ক আস্তরণ অত্যন্ত জটিল, অসংখ্য-ভাঁজ সম্পন্ন এবং তার ফলেই তার পক্ষে নানা উচ্চশ্রেণীর সঙ্গতিবিধান করা সম্ভব হয়।

গুরুমস্তিষ্কের প্রধান দুটি ফাটলের নাম রোলাণ্ডো ফাটল (Fissure of Rolando) এবং সিলভিয়াস ফাটল (Fissure of Sylvius)। এ দুটি ফাটল



[মানব-মস্তিষ্কের ছবি]

সমগ্র গুরুমস্তিষ্কটিকে চারটি ভাগে (lobe) ভাগ করেছে। (১) সম্মুখ ভাগ (Frontal lobe) (২) মধ্য ভাগ (Parietal lobe), (৩) পশ্চাৎ ভাগ



[মানব-মস্তিষ্কের বিভিন্ন বিভাগগুলি]

(Occipital lobe) এবং (৪) নিম্ন ভাগ (Temporal lobe)। গুরুমস্তিষ্ক ও লঘুমস্তিষ্ক ছাড়া মস্তিষ্কের আরও কয়েকটি বিভাগ আছে, যথা :—

সেতু মস্তিষ্ক (Pons): এটি মস্তিষ্কের নিম্নাংশের একটা বর্দ্ধিত ভাগ। এই অংশটি গুরুমস্তিষ্ক ও লঘুমস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ ঘটায়। দৈহিক ভারসাম্য ও প্রচেষ্টামূলক সমন্বয়ন বহুলাংশে এই মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল।

অধঃমস্তিষ্ক (Medulla):—সেতু মস্তিষ্কের নীচে অধঃমস্তিষ্কের স্থান। শ্বাস-ক্রিয়া, রক্তচাপ প্রভৃতি শারীরিক প্রক্রিয়া এই অংশের উপর নির্ভরশীল। এর প্রধান কাজ হল মেরুদণ্ড ও উচ্চতর স্নায়ুকেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগ রাখা।

থ্যালামাস (Thalamus): এটি মস্তিষ্কের প্রাচীনতম অংশ। এর অবস্থান ঠিক মস্তিষ্কের উপরে। এটির কাজ অনেকটা স্বইচ্ বোর্ডের মত। সমস্ত সংবেদক উদ্দীপনাকে মস্তিষ্ক আস্তরণের যথোপযুক্ত স্থানে পরিচালিত করার কেন্দ্রস্থল হল এই থ্যালামাস।

হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus): এটির স্থান থ্যালামাসের নীচে সেতু-মস্তিষ্কের উপরে। আধুনিক পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে হাইপোথ্যালামাসটি প্রক্ষোভমূলক প্রক্রিয়া জাগরণের প্রধান কেন্দ্র।

গুরুমস্তিষ্ক, লঘুমস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের কাজ (Functions of Cerebrum, Cerebellum & Spinal Cord)

গুরুমস্তিষ্কটি কর্তকগুলি বিভাগে বিভক্ত। যেমন, সম্মুখভাগ (Frontal lobe), মধ্যভাগ (Parietal lobe) পশ্চাৎভাগ (Occipital lobe) এবং নিম্নভাগ (Temporal lobe).[১]

এর মধ্যে সম্মুখ বিভাগটি (Frontal lobe) মানুষের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা সবচেয়ে বেশী উন্নত। বিচারকরণ, যুক্তিধর্ম্মী চিন্তন, উদ্ভাবন, পরিকল্পন ইত্যাদি সমুন্নত মানসিক প্রক্রিয়াগুলি এই সম্মুখ ভাগ থেকে সৃষ্ট হয় বলে মনে করা হয়ে থাকে। ব্যথা প্রভৃতি কতকগুলি সংবেদন উপলব্ধি করার ক্ষমতাও এই অংশটি থেকে জন্মায় এবং যাকে আমরা প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি বলি সেগুলিও এই সম্মুখভাগের কোন অংশ থেকে উৎপন্ন হয়ে

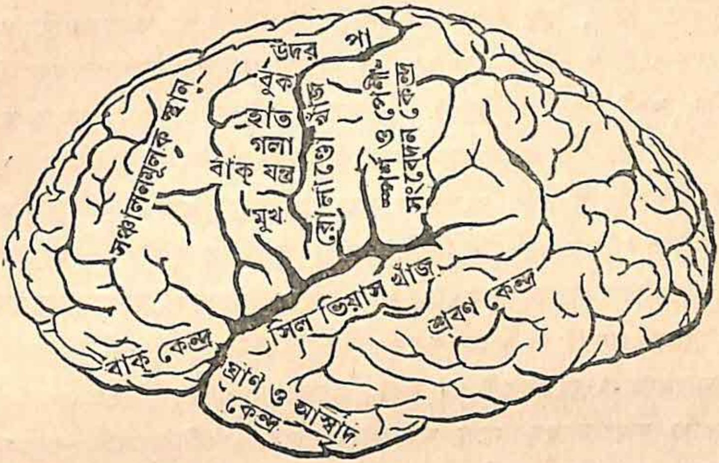
[১]পৃষ্ঠা ১৭২

থাকে বলে মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। গুরুমস্তিষ্ক ও থ্যালামাস নামক অংশটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে এবং দেখা গেছে যে এই দুয়ের মধ্যে সংযোগটা যদি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় তবে সংবেদনটি আনন্দের কি দুঃখের তা নির্ণয় করার ক্ষমতা ব্যক্তির থাকে না। তাছাড়া যদি সম্মুখ ভাগের সঙ্গে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায় তবে ব্যক্তির বিচার করা বা পরিকল্পনা করার ক্ষমতা থাকে না। মস্তিষ্কের সম্মুখভাগের শেষাংশটি প্রাণীর ইচ্ছাপ্রসূত দেহসঞ্চালনকে (voluntary movement) নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

গুরুমস্তিষ্কের মধ্যভাগ (Parietal lobe) থেকে জন্মায় অনির্দ্দিষ্ট ও সাধারণ প্রকৃতির সংবেদনগুলি। স্পর্শ, অবস্থিতির উপলব্ধি, ব্যথা, উত্তাপ প্রভৃতির সংবেদনগুলির উৎস হল এই মধ্যভাগটি।

গুরুমস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগটি (Occipital lobe) কেবলমাত্র চক্ষু ইন্দ্রিয়ের (চক্ষু) উদ্দীপক গ্রহণ ও তার সংব্যাখ্যানের কাজ করে থাকে অর্থাৎ এটি হল চাক্ষুষ সংবেদনের উৎসস্থল।

গুরুমস্তিষ্কের নিম্নভাগ (Temporal lobe) শ্রবণেন্দ্রিয়ের উদ্দীপক গ্রহণ ও সংব্যাখ্যানের কাজ করে থাকে। অর্থাৎ এটি হল শ্রবণমূলক সংবেদনের উৎসস্থল। বস্তুত মস্তিষ্কের সক্রিয়তার প্রকৃত উৎস হল মস্তিষ্কের উপরের ধূসরবর্ণের বহিঃপ্রদেশটি। একে মস্তিষ্কের আস্তরণ বা কর্টেক্স্ (cortex) বলা হয়। মস্তিষ্কের মধ্যভাগ পশ্চাৎভাগ ও নিম্নভাগের উপরের আস্তরণের একটা বড় অংশকে অনুষঙ্গ ক্ষেত্র (Association areas) নাম দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলিতে অসংখ্য অনুষঙ্গ বা সঙ্গতিসাধক নিউরন (Association neurons) আছে। মস্তিষ্ক আস্তরণের এই অংশেই বিভিন্নধর্মী সংবেদন গৃহীত, সংব্যাখ্যাত ও অতীতের বা বর্ত্তমানের অন্যান্য সংবেদনের সঙ্গে সমন্বিত করা হয়ে থাকে। চাক্ষুষ, শ্রবণমূলক, স্পর্শমূলক প্রভৃতি বিভিন্ন স্মৃতিরও বাসভূমি বোধ হয় এই অংশটিই। এই বিভিন্ন স্মৃতিগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে আমরা কথা বলা, পড়া, লেখা, হিসাব করা, বাঁ-ডান ঠিক করা, শরীরের বিভিন্ন অংশ দেখান, দিক মনে রাখা, পথ খুঁজে পাওয়া গান চিনতে পারা, বাজনা বাজানো, রঙের পার্থক্য নির্ণয় করা ইত্যাদি বিশেষধর্মী কাজগুলি করতে পারি।



পরীক্ষণের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ দেহের বিভিন্ন অংশকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে এবং আমাদের বিভিন্ন কাজও মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন মস্তিষ্কের সম্মুখভাগ আমাদের সমস্ত সঞ্চালনমূলক কাজ করে থাকে। আবার এই অংশেরই বিভিন্ন স্থান পা, উদর, বুক, হাত, গলা, বাক্‌যন্ত্র, মুখ প্রভৃতি দেহের বিভিন্ন অংশগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। মস্তিষ্কের মধ্যভাগটি হল স্পর্শ ও পেশীসংবেদন কেন্দ্র, নিম্নভাগটি ঘ্রাণ ও আস্বাদের কেন্দ্র, মধ্যভাগ শ্রবণ কেন্দ্র এবং সম্মুখভাগের নিম্নাংশ হল বাক্‌কেন্দ্র। গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন কর্ম্মক্ষমতার এই বাসকে মস্তিষ্কের আঞ্চলিকতা (Localisation of brain) বলা হয়ে থাকে। যদিও এটা পরীক্ষণ-প্রমাণিত সত্য যে বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য নির্দ্ধারিত তবু এই বিভিন্ন অংশগুলিকে একেবারে স্বতন্ত্র সত্তা বলে মনে করলে বিরাট ভুল হবে। মস্তিষ্কের প্রত্যেকটি অংশ পরস্পরের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রত্যেকটির কার্য্যের উপর অন্যান্য অংশগুলির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে এবং প্রয়োজন হলে একটি অংশের কার্য অপর অংশটিকে সম্পন্ন করতে দেখা গেছে। প্রসিদ্ধ শরীরতত্ত্ববিদ্ লাসলী (Lashley) মস্তিষ্কের এই সামগ্রিক আচরণকে সম্মিলিত কার্য্য (Mass Activity) নাম দিয়েছেন।

লঘুমস্তিষ্ককে (Cerebellum) ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বলা হয়। প্রাণীর বিভিন্ন গতির মধ্যে সমন্বয় আনা, সূক্ষ্ম দেহসঞ্চালনগুলি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার পেছনে আছে মস্তিষ্কের এই অংশটি। লঘুমস্তিষ্ক না থাকলে আমাদের চলাফেরা হয়ে উঠত শ্রীহীন, অপটু ও ঝাঁকুনিপূর্ণ। তাছাড়া আমাদের দেহসাম্য বজায় রাখায় লঘুমস্তিষ্কের প্রভাব প্রচুর। কানের মধ্যে যে ভেষ্টিবুলার জলপথ আমাদের দেহের অবস্থিতির সংবেদন গ্রহণ করে তার সঙ্গে লঘুমস্তিষ্কের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে এবং আমরা দাঁড়িয়ে আছি, কি ফিরে দাঁড়াচ্ছি, কি হেঁটে হচ্ছি ইত্যাদি ব্যাপারগুলি জানতে পারি লঘুমস্তিষ্কের সাহায্যেই। আমাদের ইচ্ছাজাত দেহসঞ্চালনের উপরও লঘুমস্তিষ্কের প্রচুর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে।

আমাদের মেরুদণ্ডের দুটি প্রধান কাজ আছে। প্রথমটি হল মস্তিষ্ক এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মধ্যবর্তী সংযোগস্থল রূপে কাজ করা। বস্তুত মস্তিষ্ক থেকে নির্গত স্নায়ু উদ্দীপনাগুলিকে শরীরের বিভিন্ন অংশে পাঠান এবং ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য দেহাংশ থেকে আগত স্নায়ুউদ্দীপনা-গুলিকে মস্তিষ্কে পরিচালিত করা এই মূল্যবান কাজগুলি সম্পন্ন হয় মেরুদণ্ডের মাধ্যমে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় থেকে জাত উদ্দীপনা মেরুদণ্ডের বিভিন্ন সংবেদক নিউরনের মাধ্যমে মস্তিষ্কে গিয়ে পৌছয় এবং সেখান থেকে মেরুদণ্ডের প্রচেষ্টক নিউরনের পথে দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পৌছয় এবং বিভিন্ন আচরণ সৃষ্টি করে।

মেরুদণ্ডের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল রিফ্লেক্সের কেন্দ্ররূপে কাজ করা। রিফ্লেক্সমূলক আচরণের সময় সংবেদক-স্নায়ু ও প্রচেষ্টক-স্নায়ুর মধ্যে সংযোগটি মস্তিষ্কে সংঘটিত হয় না, হয় মেরুদণ্ডে। যেমন গরম কিছুতে হাত পড়লে সঙ্গে সঙ্গে হাতটি সরে আসে। এই রিফ্লেক্স আচরণটির পেছনে মস্তিষ্কের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই এবং সেইজন্য এই কাজটি মেরুদণ্ডের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়ে থাকে।

এ ছাড়া আমাদের অবস্থিতির ধারণা, যেমন আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ-গুলির সঙ্গে বা পরিবেশের সঙ্গে অন্যান্য অংশগুলির বর্তমানে কি ধরনের অবস্থিতি-গত সম্পর্ক রয়েছে এর ধারণাও সৃষ্ট হয় মেরুদণ্ডের কতগুলির নিউরনের সাহায্যে। হাড় ভেঙে যাওয়ার ব্যথা, পেশী মুচড়ে যাওয়ার ব্যথা প্রভৃতি গভীর ব্যথার অনুভূতি এবং স্পর্শ, শৈত্য ইত্যাদির ধারণাও মেরুদণ্ডের স্নায়ুমণ্ডলীর মাধ্যমে সৃষ্ট হয়ে থাকে।

প্রশ্নাবলী

1. Give a short sketch of human nervous system.

Ans. (পৃঃ ১৬১—পৃঃ ১৭৪)

2. What is meant by internal integration? How is it achieved?

Ans. (পৃঃ ১৬১—পৃঃ ১৬২)

3. What is a neuron? Why is it called the unit of our nervous system? Describe its different parts.

Ans. (পৃঃ ১৬৩—পৃঃ ১৬৭)

4. What is a reflex? What role does it play in our process of adjustment? Describe the physiological aspects of a reflex. What is a reflex arc?

Ans. (পৃঃ ১৬৭—পৃঃ ১৬৯)

5. Write short notes on. (a) synapse (b) afferent nerves (c) efferent nerves (b) dendrite (e) axon (f) reflex.

সংবেদন (Sensation) ও প্রত্যক্ষণ (Perception)

জড়বস্তু এবং প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হল যে জড়বস্তু তাঁর বাইরের কোন বস্তুকে জানতে পারে না, কিন্তু প্রাণী তা পারে। এর জন্য প্রাণীর মধ্যে বিশেষ যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আছে যা অ-প্রাণীর মধ্যে নেই। এই বিশেষ যন্ত্রপাতির সাহায্যেই প্রাণী তার বাইরের উদ্দীপকটিকে স্নায়ু উদ্দীপনার রূপে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে এবং বাইরের জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে।

প্রাণীর জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দুটি স্তর দেখতে পাই। প্রথমত বাইরের উদ্দীপকের দ্বারা প্রেরিত উদ্দীপনার একটা স্নায়ুতন্ত্রের অনুভূতি এবং দ্বিতীয়ত সেই অনুভূতিটির প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা বা এক কথায় সেই অনুভূতিটির সংব্যাখ্যান। যেমন, ঘুম থেকে চোখ খুলে তাকাতেই এক ঝলক আলো চোখের মধ্যে দিয়ে অক্ষিপটে পড়ল এবং সেখান থেকে উদ্দীপনা অক্ষিমূলক স্নায়ু (Optic Nerve) বেয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ এক ধরনের অনুভূতি আমাদের মস্তিষ্কে লিপিবদ্ধ হল। এই অনুভূতিটি কিসের বা কি প্রকৃতির বা তার কি নাম ইত্যাদি সেই মুহূর্তে আমাদের মনে উদিত হল না। কিন্তু ঠিক পরমুহূর্তেই আমাদের জ্ঞান হল যে আমাদের অভিজ্ঞতাটি এক ঝলক আলোর এবং সেটা খুব উজ্জ্বল সাদা, ঈষৎ উষ্ণ এবং সূর্য্য থেকে উদ্ভূত ইত্যাদি। পরের এই পরবর্তী বোধগুলো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জ্ঞানটা পূর্ণ হল। এই প্রথম স্তরের অভিজ্ঞতাকে বলা হয় সংবেদন (sensation) এবং দ্বিতীয় স্তরের অভিজ্ঞতাকে বলা হয় প্রত্যক্ষণ (perception)।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সকল জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার মূলে আছে সংবেদন। সংবেদন হচ্ছে উদ্দীপকের প্রাথমিক বোধ। আর প্রত্যক্ষণ হচ্ছে সেই সংবেদনের সংব্যাখ্যাত রূপ। বিনা সংবেদনে প্রত্যক্ষণ হয় না, প্রত্যক্ষণ ছাড়া সংবেদন হতে পারে যদিও বাস্তবে কারও পক্ষে বিশুদ্ধ সংবেদন লাভ করা সম্ভব নয়। কেননা যে মুহূর্তে সংবেদনটি হবে সেই মুহূর্তেই তার একটা সংব্যাখ্যান মস্তিষ্ক তৈরী করে নেবে। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে একমাত্র সদ্যজাত শিশুর ক্ষেত্রেই নিছক সংবেদন হওয়া সম্ভবপর, কেননা তার সংবেদনের সংব্যাখ্যান করার মত মালমশলা তখনও তার মস্তিষ্কের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

সংবেদনকে প্রত্যক্ষণে নিয়ে যেতে সাহায্য করে অতীত অভিজ্ঞতা এবং ঐ

বস্তুটির সম্বন্ধে পূর্ব্বজ্ঞান। তাছাড়া পরিবেশের প্রভাবও প্রত্যক্ষণের স্বরূপ নির্ণয়ে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে থাকে। অতীত অভিজ্ঞতা, পূর্ব্বজ্ঞান, পারিবেশিক প্রভাব ইত্যাদি একযোগে আমাদের অর্থহীন সংবেদনকে অর্থময় করে তোলে। সংবেদন প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান নয় জ্ঞানের উপকরণ মাত্র, প্রত্যক্ষণে সেই উপকরণ পূর্ণাঙ্গ ও অর্থময় জ্ঞান হয়ে ওঠে।

সংবেদনের প্রকার ভেদ

সংবেদন জন্মায় উদ্দীপনা থেকে এবং উদ্দীপনা জন্ম নেয় আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সক্রিয়তা থেকে। অতএব যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে তত শ্রেণীর সংবেদন হয়ে থাকে। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা ধরা হয়েছে পাঁচটি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। আর এদের মাধ্যমে যে সকল সংবেদন আমরা পেয়ে থাকি সেগুলির নাম হল, চাক্ষুষ (Visual), শ্রাবণ (Auditory), স্পর্শন (Tactual), ঘ্রাণজ (Olfactory) এবং স্বাদজ (Gustatory)। কিন্তু প্রাচীন শিক্ষাবিদগণের মতে ইন্দ্রিয়বোধের সংখ্যা পাঁচটি হলেও এখন প্রমাণিত হয়েছে যে এগুলি ছাড়াও আমাদের আরও অনেকগুলি ইন্দ্রিয়বোধ আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল স্থিরতা বা ভারসাম্যের বোধ (Static sense) এবং পেশী সঞ্চালনের বোধ (Muscle sense or Kinesthesis)। স্পর্শের বোধকে আমরা এতদিন এক ধরনের সংবেদন বলে মনে করে এসেছি কিন্তু তার মধ্যেও চারিটি বিশেষ ও বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি পাওয়া যায়, যথা, ব্যথা, চাপ, শৈত্য এবং উষ্ণতা। এর পরেও আছে দেহযন্ত্রের কাজ থেকে উদ্ভূত একাধিক সংবেদন, যেগুলির নাম দেওয়া হয়েছে দেহজ সংবেদন (Organic sensation)। আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য আমাদের দেহের অভ্যন্তরের যন্ত্রপাতি পরিপাচনক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন, শ্বাসক্রিয়া প্রভৃতি যে সকল কাজ সম্পন্ন করে থাকে সেগুলি থেকে উদ্ভূত যে সব সংবেদন সেগুলিকেই দেহজ সংবেদন বলা যেতে পারে। ক্ষুধাবোধ তৃষ্ণাবোধ ইত্যাদি অনির্দ্দিষ্ট প্রকৃতির সংবেদনগুলি দেহজ সংবেদনের অন্তর্গত।

সংবেদনের ধর্ম্ম (Attributes of sensation)

উদ্দীপক এবং তজ্জাত সংবেদনের প্রকৃতির দিক দিয়ে সংবেদনের চার রকম ধর্ম্ম বা লক্ষণের কথা বলা যায়, যথা গুণ (quality), তীব্রতা (intensity), ব্যাপ্তি extensity) এবং স্থিতি (duration)।

আমাদের যে বস্তুটির সংবেদন হচ্ছে তাকেই সংবেদনের গুণ বলা হয়। যেমন চাক্ষুষ সংবেদনের গুণ হল যে রঙটি দেখছি সেটি, শ্রাবণ সংবেদনের গুণ হল যে ধ্বনিটি আমরা শুনছি, স্বাদজ সংবেদনের গুণ হল যে তিক্ততা বা মিষ্টতার আমরা আস্বাদ পাচ্ছি ইত্যাদি।

গুণের দিক দিয়ে সংবেদনগুলির মধ্যে দু'রকমের পার্থক্য হতে পারে। জাতিগত (generic) ও উপজাতিগত (specific)। চাক্ষুষ সংবেদন ও শ্রাবণ সংবেদনের মধ্যে পার্থক্যটা জাতিগত, কেননা এ দুটি বিভিন্নজাতির অন্তর্গত কিন্তু লাল রঙের সংবেদন ও নীল রঙের সংবেদনের মধ্যে পার্থক্যটা উপজাতিগত। কেননা এ দুটি সংবেদন একই জাতির অন্তর্গত কিন্তু বিভিন্ন উপজাতির অন্তর্ভুক্ত।

সংবেদনের তীব্রতা বলতে বোঝায় সংবেদনের পরিমাণ বা মাত্রা। উদ্দীপকের শক্তির উপর নির্ভর করছে সংবেদনের তীব্রতা। যেমন, একটি ২০০ বাতির আলোর সংবেদনের তীব্রতা ১০০ বাতির আলো থেকে জাত সংবেদনের তীব্রতার চেয়ে বেশী। তেমনই একটু জোরে চীৎকার করলে যে সংবেদন হবে তার তীব্রতা সাধারণ কণ্ঠস্বর থেকে জাত সংবেদনের তীব্রতার চেয়ে বেশী।

ব্যাপ্তি বলতে বোঝায় যে সংবেদন কতটা জায়গা জুড়ে আছে। যেমন হাতের উপর একটা পিন ঠেকালে যে সংবেদন হবে তার ব্যাপ্তি হাতের উপর একটা বই রাখলে যে সংবেদন হবে তার ব্যাপ্তির চেয়ে অনেক কম। এক বালতি জলে একটা আঙুল ডোবালে যে সংবেদন হবে তার চেয়ে বেশী ব্যাপক সংবেদন হবে সম্পূর্ণ হাতটা ডোবালে। তেমনই একটা পোষ্টকার্ডের চাক্ষুষ সংবেদন একটা খবরের কাগজের চাক্ষুষ সংবেদনের চেয়ে অনেক কম ব্যাপক, যদিও গুণের দিক দিয়ে দুটি সংবেদনই অভিন্ন।

কোন ব্যাপ্তিসম্পন্ন সংবেদনকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বহু ছোট ছোট বিভিন্নধর্মী সংবেদন নিয়ে সমগ্র সংবেদনটি গঠিত। এই ছোট ছোট সংবেদনগুলি সব দিক দিয়ে এক হলেও একটি বিশেষ দিক দিয়ে তারা পৃথক। এ বিশেষ দিকটি হল সংবেদনগুলির স্থানগত বৈশিষ্ট্য (local character or sign)। এর অর্থ হল এই যে যদিও সংবেদনগুলি একই ইন্দ্রিয় থেকে প্রসূত তবুও ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন অংশের উদ্দীপনা থেকে তাদের জন্ম বলে তাদের মধ্যে স্বতন্ত্রতা বা পার্থক্য থাকে। যেমন যদি পিঠের উপর কেউ হাত বুলোয় তবে আমরা চোখে না দেখেও বলতে পারি যে কখন পিঠের কোন্ জায়গায় হাত রাখা হয়েছে। যদিও হাত বুলোনোর

সংবেদনগুলি সব জায়গায় এক তবু তাদের স্থানগত বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্রতার জন্যই প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। স্পর্শজ এবং চাক্ষুষ সংবেদনের ক্ষেত্রেই স্থানগত পার্থক্যটা বিশেষভাবে জানা যায়। সংবেদনের এই ব্যাপ্তি থেকেই আমাদের স্থান সম্বন্ধে ধারণা জন্মেছে।

স্থিতি বলতে বোঝায় যে সংবেদন কতটা সময় ধরে স্থায়ী হয়েছে। কোন সংবেদন মুহূর্ত্তের জন্য ঘটতে পারে, কোনটি আবার কিছুকাল থাকতে পারে আবার কোনটি বহুক্ষণ থাকতে পারে। সংবেদনের এই স্থিতিমূলক ধর্ম্ম থেকেই আমাদের সময় সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মেছে।

স্থান ও কালের প্রত্যক্ষণ (Perception of Space and Time)

কেমন করে আমরা স্থান (Space) ও কাল (Time) প্রত্যক্ষ করি তা নিয়ে বহু জল্পনাকল্পনা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য দৃশ্যমান বস্তুর মত এ দুটি বস্তু প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। স্থান বলে প্রকৃতপক্ষে কোন অস্তিত্বসম্পন্ন বস্তু নেই। কোন বস্তুর অস্তিত্বের অভাবকেই স্থান বলা হয়। সাধারণত আমরা দু'ধরনের স্থানের কথা উল্লেখ করে থাকি, পূর্ণস্থান (filled space) এবং শূন্য স্থান (empty space)। পূর্ণস্থান প্রকৃতপক্ষে স্থান নয়, কেননা সেখানে অন্য বস্তু স্থানটি অধিকার করে বসে আছে। প্রকৃত স্থান হল শূন্যস্থান এবং সেটি যেহেতু অভাবাত্মক বস্তু, সেহেতু সেটি প্রত্যক্ষভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে পারে না। সময় বলেও তেমনই কোন দৃশ্যমান বস্তু নেই এবং কোন ইন্দ্রিয় দিয়েই সময়কে প্রত্যক্ষণ করা যায় না। কিন্তু তবু এ দুটি বস্তুর প্রত্যক্ষণ আমরা করে থাকি এবং সেটি সম্ভব হল কেমন করে?

স্থানের প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে দুশ্রেণীর মতবাদ প্রচলিত আছে, সৃজনমূলক (Genetic) এবং সহজননমূলক (Nativistic)। সৃজনমূলক মতবাদগুলি অনুযায়ী স্থানের সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা নিয়ে শিশু জন্মায় না। তার জন্মের পর পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সে স্থান সম্বন্ধে ধারণা অর্জ্জন করে। বিশেষ করে সংবেদনের ব্যাপ্তি থেকেই এই ধারণাটির সৃষ্টি হয়। সহজননমূলক মতবাদ অনুযায়ী শিশুর জন্মের সময় থেকেই তার মধ্যে অপরিণত অবস্থায় নিহিত থাকে স্থান সম্বন্ধীয় ধারণা এবং পরে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ফলে সেই অবিকশিত ধারণাটি পূর্ণতা লাভ করে।

স্থানের ধারণা অর্জ্জিতই হোক আর সহজাতই হোক, সংবেদনের ব্যাপ্তি যে সেটির বিকাশে প্রধানতম উপকরণ সে বিষয়ে সব মনোবিজ্ঞানীই একমত। যখন আমরা একটা লম্বা সরলরেখার দিকে তাকাই তখন আমাদের সেই সংবেদনটির মধ্যে আছে, অনেকগুলি সমকালীন এবং পাশাপাশি অবস্থিত বিন্দুর সংবেদন। এই সংবেদনগুলির বিভিন্ন স্থানগত বৈশিষ্ট্যের জন্য তাদের অবস্থিতির পার্থক্যটা আমরা জানতে পারি এবং এই জ্ঞান থেকেই স্থানের প্রসারণ বা বিস্তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা জন্মায়। আর একটি ধারণা আমাদের স্থানের প্রত্যক্ষণে সাহায্য করে। সেটি হল গতি বা অঙ্গসঞ্চালনের (movement) সংবেদন। আমাদের ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত গতি থেকে আমরা পূর্ণস্থানের ধারণা পেয়েছি এবং অব্যাহত গতি থেকে পেয়েছি শূন্যস্থানের ধারণা। তাছাড়া হাত-পা-নাড়া, চলাফেরা থেকে দূরত্ব ও দিক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছি।

সেইরকম সময়ের প্রত্যক্ষণও আমরা পেয়ে থাকি সংবেদনের স্থিতি থেকে। কোন সংবেদন অল্পক্ষণ থাকে, আবার কোন সংবেদন অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। সংবেদনের স্থিতির এই বিভিন্নতা থেকেই আমাদের সময় সম্বন্ধে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। যে সংবেদনটি কিছুক্ষণ আগে ছিল কিন্তু এখন নেই, সেই সংবেদনটি থেকে আমরা অতীতের ধারণা পেয়েছি। যে সংবেদনটি এখন এই মুহূর্ত্তে চলছে সেই সংবেদনটি আমাদের বর্ত্তমান সম্বন্ধে ধারণা দিয়েছে। সেই রকম যে সংবেদনটি বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের পরে ঘটবে সেই সংবেদনটি আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণার সৃষ্টি করছে।

দূরত্ব, গভীরতা ও ত্রি-আয়তনের প্রত্যক্ষণ (Perception of Distance, Depth & Three Dimension)

আমরা যখন কোন বস্তু দেখি তখন সেই বস্তুটি থেকে আলো আমাদের চোখে মধ্যে রেটিনা বা অক্ষিপটের উপর প্রতিফলিত হয়। ফলে সেখানে ঐ বস্তুটির একটি প্রতিকৃতির সৃষ্টি হয়। এখন এই প্রতিকৃতিটি বইয়ের পাতায় ছাপা ছবি বা সিনেমার পর্দ্দায় প্রতিফলিত ছবির মত দ্বি-আয়তনবিশিষ্ট, অর্থাৎ এর দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ আছে কিন্তু গভীরতা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা প্রকৃতপক্ষে তিনটি আয়তনই প্রত্যক্ষ করে থাকি। আমার সামনে রাখা মোটা অভিধানটির দৈর্ঘ্য,

প্রস্থ ও গভীরতা, এ তিনটি বৈশিষ্ট্যই আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, যদিও আমার অক্ষিপট দুটিতে ঐ বইটির যে ছবিটি সৃষ্টি হয়েছে সেটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাত্র এই দুটি আয়তনই আছে।

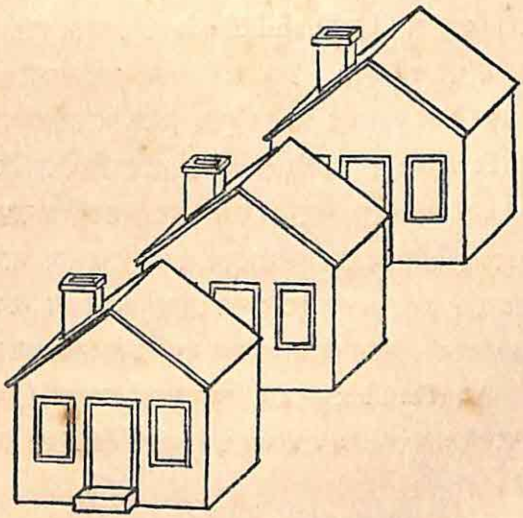
অতএব প্রশ্ন হল যে আমাদের অক্ষিপটে প্রতিফলিত ছবিগুলির যদি কোন গভীরতা না থেকে থাকে এবং সেগুলি যদি দ্বি-আয়তনবিশিষ্ট হয়ে থাকে তবে আমরা দূরত্ব, গভীরতা ও ত্রি-আয়তন কেমন করে দেখি ?

এর কারণগুলিকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি। একচক্ষুমূলক দর্শন (monocular) সম্বন্ধীয় ও দ্বিচক্ষুমূলক দর্শন (binocular) সম্বন্ধীয়।

একচক্ষুমূলক কারণ (Monocular Factors)

যখন আমরা একটি মাত্র চোখের ব্যবহার করি তখন নিম্নলিখিত কারণগুলি আমাদের গভীরতা এবং ত্রি-আয়তন দেখতে সাহায্য করে। এগুলি দ্বিচক্ষুমূলক দর্শনের ক্ষেত্রেও যে প্রযোজ্য হবে তা বলা বাহুল্য।

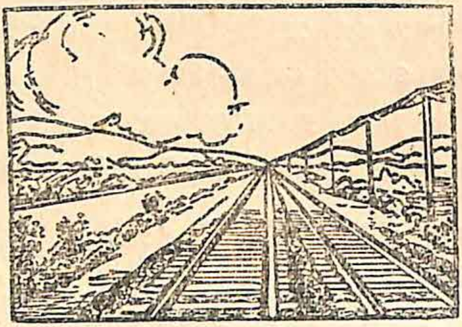
(ক) বস্তুর অন্তরালবর্তিতা (Interposition of objects) : একটি বস্তু আর একটি বস্তুকে আড়াল করলে যেটি সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে সেটি নিকটে এবং যেটি আংশিক দেখা যাচ্ছে সেটি দূরে অবস্থিত বলে ধরে নেওয়া হয়।



[বস্তুর অন্তরালবর্তিতা]

(খ) রেখামূলক চিত্রানুপাত (Linear Perspective) : দূরের বস্তু ছোট

ও সঙ্কুচিত দেখায়, কাছের বস্তু বড় দেখায়। নীচের রেল লাইনের ছবিটিতে কোন্ থামটি কাছে ও কোন্‌টি দূরে সহজেই বোঝা যাচ্ছে। রেল লাইনের বেলাতে রেখাগুলি ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হয়ে দূরত্বের ধারণা সৃষ্টি করছে।



(গ) বায়বীয় চিত্রানুপাত (Aerial Perspective): যে বস্তুটি দূরে থাকে সেটি নিকটবর্তী বস্তুর চেয়ে অস্পষ্ট ও ঝাপসা দেখায়। এর কারণ হল দূরত্ব যত বেশী হবে মধ্যবর্ত্তী হাওয়ার পরিমাণ তত বাড়বে এবং ফলে তত ধূলো, বাষ্প ইত্যাদির দ্বারা আমাদের দৃষ্টি ব্যাহত হবে।

(ঘ) আলো ও ছায়া (Light and Shade): যেখানে গর্ত্ত বা নীচু জায়গা থাকে সেখানে ছায়ার সৃষ্টি হয়। উঁচু এবং সমতল জায়গা আলোকিত দেখায়। ফলে আলো ছায়ার বিভিন্ন সমাবেশ স্থানটির দূরত্ব বুঝতে আমাদের সাহায্য করে।

(ঙ) লম্বন (Parallax): একটি চোখ বন্ধ রেখে যদি ধীরে ধীরে মাথাটাকে একপাশে সরানো যায় তবে দেখা যাবে যে সামনের বস্তুগুলিও সঙ্গে সঙ্গে নড়তে সুরু করছে। তবে যেগুলি কাছের বস্তু সেগুলি যেদিকে মাথা নাড়া হচ্ছে তার বিপরীত দিকে চলবে, আর যেগুলি দূরের বস্তু সেগুলি মাথা যে দিকে নাড়া হচ্ছে সেদিকেই চলতে থাকবে। দূরত্ব হেতু চোখের সঞ্চালনের সঙ্গে বস্তুর এই বৈষম্যপূর্ণ সঞ্চালনকে লম্বন (Parallax) বলে। আমরা সব সময়েই অল্পবিস্তর মাথা নাড়িয়ে থাকি, ফলে আমাদের সামনে অবস্থিত বস্তুগুলির দূরত্ব সম্বন্ধে মনে মনে ধারণা গড়ে ওঠে।

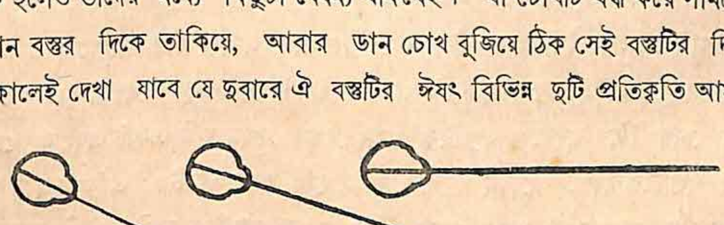
(চ) সঙ্গতিবিধান (Accommodation): দূরের জিনিষ দেখার সময় চোখের মধ্যবর্তী লেন্সটি (lens) সিলিয়ারি পেশীগুলির চাপে আরও সমতল হয়ে

ওঠে। আর কাছের জিনিস দেখার সময় লেন্সটি আরও গোলাকার হয়ে ওঠে। সিলিয়ারি পেশীর এই সক্রিয়তা থেকে আমাদের মস্তিষ্ক বস্তুটির দূরত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে নেয় বলে বিশ্বাস করা হয়।

দ্বিচক্ষুমূলক কারণ (Binocular Factors)

(ক) কেন্দ্রীভবন : যখন কোন বস্তুকে ভাল করে দেখতে হয় তখন বস্তুটিকে আমাদের দুটি চোখের ফোভিয়ার সমরেখায় আনতে হয়। ফলে চোখের গোলক দুটিকে ঘুরিয়ে এমন একটি অবস্থানে আনতে হয় যে বস্তুটি দুটি ফোভিয়ার কেন্দ্রে এসে দাঁড়ায়। কাছের বস্তু দেখার সময় চোখ দুটি ভেতরের দিকে সরে আসে এবং দূরের জিনিষ দেখার সময় চোখ দুটি প্রায় সমান্তরাল হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীভবনের ফলে চোখ দুটির মধ্যে যে পরিবর্ত্তন আসে তা থেকে মস্তিষ্ক দূরত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেয়।

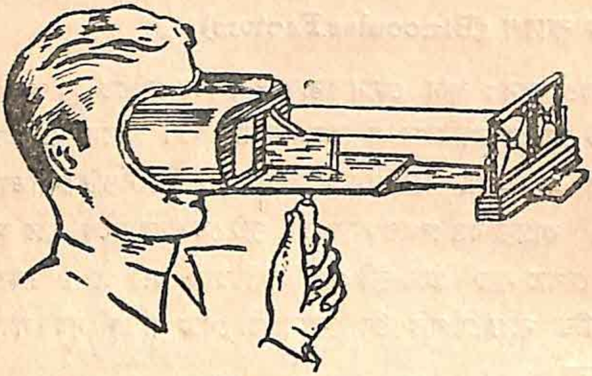
(খ) অক্ষিপটমূলক বৈষম্য (Retinal Disparity) : আমাদের চোখ দুটির মধ্যে অবস্থানগত কিছুটা পার্থক্য থাকার ফলে দুটি রেটিনায় কোন দৃষ্ট বস্তুর যে দুটি প্রতিকৃতির সৃষ্টি হয় সে দুটি প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ অভিন্ন হয় না। সে দুটি মোটামুটি এক হলেও তাদের মধ্যে কিছুটা বৈষম্য থাকবেই। বাঁ চোখটি বন্ধ করে সামনের কোন বস্তুর দিকে তাকিয়ে, আবার ডান চোখ বুজিয়ে ঠিক সেই বস্তুটির দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে দুবারে ঐ বস্তুটির ঈষৎ বিভিন্ন দুটি প্রতিকৃতি আমরা



[চোখের কেন্দ্রীভবনের বিভিন্ন অবস্থা]

দেখতে পাই। বিভিন্ন রেটিনায় প্রতিফলিত প্রতিকৃতির এই বৈষম্যের নাম অক্ষিপটমূলক বৈষম্য। প্রতিকৃতির এই বৈষম্যের ফলে আমাদের মস্তিষ্কে

কিছুটা বিভিন্ন দুই শ্রেণীর স্নায়ু-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং মস্তিষ্ক সেই দুই বিভিন্ন স্নায়ু-উদ্দীপনার মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে নেয় এবং ধরে নেয় যে বস্তুটি গভীরতাবিশিষ্ট বা ত্রি-আয়তন-সম্পন্ন হওয়ার ফলেই এই বৈষম্য দেখা দিয়েছে।



[ষ্টেরিও স্কোপ]

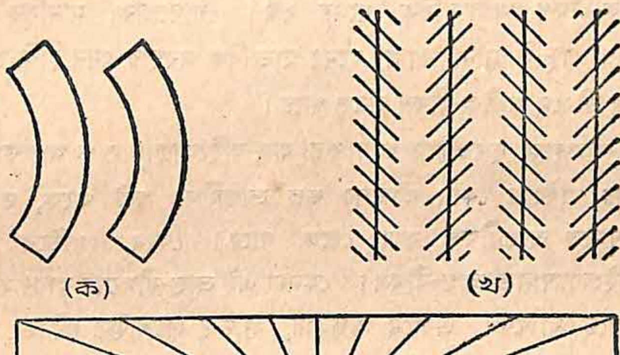
এ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে গভীরতা বা ত্রি-আয়তন মস্তিষ্ক প্রকৃত-পক্ষে সরাসরি প্রত্যক্ষ করে না, একই বস্তুর দুটি ঈষৎ বিভিন্ন দ্বি-আয়তনমূলক প্রত্যক্ষণ থেকে অনুমান করে নেয়।

অক্ষিপটমূলক বৈষম্যের ঘটনাটি ষ্টেরিওস্কোপ নামক যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণিত করা যায়। একই বস্তুর দুটি দ্বি-আয়তন-বিশিষ্ট সমতল ছবি নেওয়া হয়ে থাকে। ডান চোখ দিয়ে দেখলে বস্তুটিকে যেমন দেখায় তেমন ছবি একটি এবং বাঁ চোখ দিয়ে বস্তুটিকে দেখলে যেমন দেখায় তেমন ছবি আর একটি। এইবার ছবি দুটি পাশাপাশি রেখে এই যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে দেখলে বস্তুটিকে অবিকল ত্রি-আয়তন-সম্পন্ন বলে মনে হবে।

ভ্রান্তবীক্ষণ (Illusion) ও অলীকবীক্ষণ (Hallucination)

কখনও কখনও আমাদের প্রত্যক্ষণের বস্তুটি যেরূপ সেরূপ প্রত্যক্ষ না করে, তাকে অন্য কিছুরূপে আমরা প্রত্যক্ষণ করি। এই ধরনের প্রত্যক্ষণকে ভ্রান্ত-বীক্ষণ বলা হয়। যেমন, সন্ধ্যার অন্ধকারে দড়িকে সাপ বলে মনে করা, ব্ল্যাকআউটের রাত্রে অপরিচিত ব্যক্তিকে পুরোনো বন্ধু বলে মনে করা, অন্ধকারে ল্যাম্পপোষ্টকে ভূত বলে ভাবা ইত্যাদি। ভ্রান্ত-বীক্ষণ এক ধরনের প্রত্যক্ষণ, তবে ভুল প্রত্যক্ষণ।

কিন্তু অলীক-বীক্ষণ ঠিক প্রত্যক্ষণ নয়। পুরোপুরি কল্পনা-প্রসূত এবং নিজের মন-গড়া অবাস্তব কিছু দেখাকে অলীক-বীক্ষণ বলা হয়। ম্যাকবেথ যখন তার চোখের সামনে শূন্যে দোলায়মান রক্তময় ছুরিকা দেখেছিলেন বা কোন শোক-জর্জ্জরিত ব্যক্তি তার মৃত প্রিয়জনকে চোখের সামনে দেখতে পান বা তার সঙ্গে কথা বলেন, তখন বুঝতে হবে এগুলি অলীকবীক্ষণেরই দৃষ্টান্ত। ভ্রান্ত-বীক্ষণ ও অলীক-বীক্ষণ দুইই ভুল অভিজ্ঞতা, কিন্তু পার্থক্যের মধ্যে হল এই ভ্রান্তবীক্ষণ বাহ্যিক ও



[কয়েকটি চাক্ষুষ ভ্রান্তবীক্ষণের উদাহরণ]

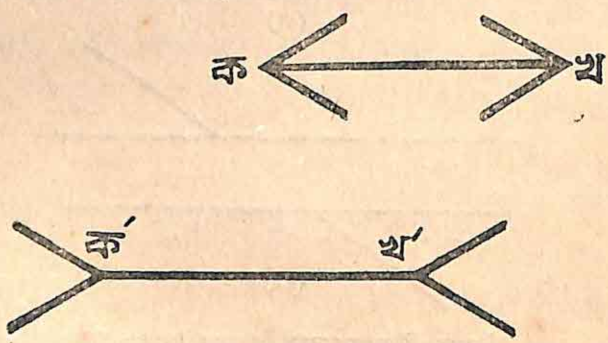
(ক) ভুণ্টের (Wundt) ভ্রান্তবীক্ষণ (খ) জোল্‌নারের (Zollner) ভ্রান্তবীক্ষণ। (গ) হেরিংএর (Hering) ভ্রান্তবীক্ষণ। (ঘ) পগেন্‌ডর্ফের (Poggendorf) ভ্রান্তবীক্ষণ।

বাস্তব উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু অলীক-বীক্ষণ পুরোপুরি ব্যক্তির মনোজাত অভিজ্ঞতা ও কোনরূপ বাস্তব বাহ্যিক উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল নয়। যেমন দড়ি না থাকলে তাকে সাপ মনে করা চলে না, ল্যাম্পপোষ্ট না থাকলে ভূত দেখা যায় না। কিন্তু অলীক-বীক্ষণে কোন বাহ্যিক উদ্দীপক থাকে না। প্রকৃতপক্ষে এটি ব্যক্তির মনের আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতারই বহির্জগতে প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়।

অলীক-বীক্ষণ অস্বাভাবিক মনের ধর্ম্ম। রোগশোক, মানসিক আঘাত, মনোবিকার প্রভৃতি নানা কারণে মনের স্বাভাবিক অবস্থার এমন হানি হতে পারে যে ব্যক্তির জীবনে অলীক-বীক্ষণ ঘটতে পারে।

ভ্রান্ত-বীক্ষণকে দু-শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, বহিঃকারণজাত ও অন্তঃকারণজাত। যখন বস্তুর বাইরের কোন কারণের জন্য ভ্রান্তবীক্ষণ ঘটে থাকে, তখন তাকে বহিঃকারণজাত ভ্রান্তবীক্ষণ বলা যেতে পারে। যেমন, দড়িকে সাপরূপে দেখা বহিঃকারণজাত ভ্রান্ত-বীক্ষণ। কেননা এই ভ্রান্ত-বীক্ষণের কারণ দড়ির মধ্যে নেই, আছে বাইরে। এখানে অন্ধকার, ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, তার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি কারণের জন্যই দড়িকে সাপ বলে ভুল হয়ে থাকে।

কিন্তু কোন কোন ভ্রান্ত-বীক্ষণের কারণ বস্তুর মধ্যেই নিহিত থাকে এবং ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিগত কোন কারণ এই ভ্রান্তবীক্ষণের পিছনে নেই। যেমন,



(মূলার-লায়ার ভ্রান্তবীক্ষণ)

উপরের ছবিটিতে ক' খ' রেখাটিকে কখ রেখাটির চেয়ে বড় দেখাচ্ছে, কিন্তু মেপে দেখলে দেখা যাবে যে দুটিই একই দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। এই ভ্রান্ত-বীক্ষণটি অন্তঃকারণ-

জাত এবং তার ফলে সকলেই এই ভুলটা দেখতে বাধ্য। এই ধরনের বহু জ্যামিতিক নক্সা আছে যেখানে ব্যক্তিমাত্রেই ভুল দেখবে। এই দৃষ্টান্তগুলিকে সর্ব্বজনীন ভ্রান্ত-বীক্ষণ বলা চলে। ১৮৭র পাতায় এইরূপ কতকগুলি চাক্ষুষ ভ্রান্তবীক্ষণের ছবি দেওয়া হল। এর সবগুলির ক্ষেত্রেই বস্তুর যা প্রকৃত স্বরূপ তা আমরা ঠিক দেখি না, দেখি অন্যরকম।

প্রশ্নাবলী

1. Mention the different classifications of sensation. Distinguish between organic and muscle sensation.

Ans. (পৃঃ ২০৭—পৃঃ ২০৯)

2. Distinguish between sensation and perception, Illusion and hallucination.

Ans. (পৃঃ ২০৬—পৃঃ ২০৭+পৃঃ ২১৫—পৃঃ ২১৭)

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান

(দ্বিতীয় খণ্ড)

শিখন প্রক্রিয়া (Learning Process)

প্রত্যেক প্রাণীকেই নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য পরিবেশের সদা পরিবর্ত্তনশীল বিভিন্ন শক্তিগুলির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। তার জন্যই তাকে সম্পন্ন করতে হয় নানাবিধ আচরণ। প্রকৃতি অবশ্য কতকগুলি প্রাথমিক আচরণ সম্পন্ন করার যোগ্যতা পূর্ব্ব থেকেই দিয়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠান এবং সেগুলির সাহায্যে সে কতকগুলি অতিপ্রয়োজনীয় এবং মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে নিতে পারে। এগুলিকে আমরা প্রবৃত্তিজাত আচরণ বলে বর্ণনা করেছি।

শিখনের ব্যাপকতা

কিন্তু প্রবৃত্তিজাত আচরণগুলির সংখ্যাও যেমন অল্প তেমনই পরিবেশের বৈচিত্র্যময় ও অসংখ্য শক্তিগুলির সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে খাপ খাওয়ানর পক্ষেও তারা নিতান্তই অপর্য্যাপ্ত। ফলে শীঘ্রই প্রকৃতিদত্ত এই সহজাত আচরণের ভাণ্ডার নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং প্রাণীকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নতুন আচরণ সম্পন্ন করার যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হয়। তখনই সুরু হয় প্রকৃত জীবনযুদ্ধ। যে প্রাণী পরিবেশের উপযোগী নতুন আচরণ সম্পন্ন করতে পারে সেই টিঁকে থাকে, আর যে পারে না সে সরে দাঁড়ায়। এই নতুন আচরণ আয়ত্ত করাকেই আমরা শেখা বা শিখন (learning) বলে থাকি।

শিখনের সুরু জন্ম থেকে, এমন কি শিশুর মাতৃগর্ভে থাকার সময় থেকেই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মাতৃগর্ভের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানর জন্য গর্ভস্থ শিশুকেও নতুন ও পরিবর্ত্তিত আচরণ সম্পন্ন করতে হয়

শিখনের স্থায়ীত্বও সারা জীবনব্যাপী, মৃত্যুর মুহূর্ত পর্য্যন্ত। যতই ক্রমবিবর্ত্তনের উন্নততর ধাপে যাওয়া যাবে ততই শিখন-প্রক্রিয়ার ব্যাপকতা দেখা যাবে। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রবৃত্তি-জাত আচরণের প্রভাব বেশী হলেও শিক্ষা-প্রসূত আচরণেরও দৃষ্টান্ত প্রচুর পাওয়া যায়। মানুষের ক্ষেত্রে শিখনের প্রভাব চরমতম। যে কোন মানুষের দৈনন্দিন আচরণের তালিকাটি পরীক্ষা করলে শিখনের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাবে। এই তালিকা থেকে যদি শিক্ষাজাত আচরণগুলি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায় তবে মৌলিক দেহগত আচরণগুলি এবং খাওয়া, ঘুমান, চলা-ফেরা প্রভৃতি কয়েকটি অতি সাধারণ প্রাথমিক সঙ্গতি-বিধানের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এই জন্য এককথায় বলা চলে যে শিখন-প্রক্রিয়া ও মানব অস্তিত্ব পরস্পর সমব্যাপী।

শিখনের স্বরূপ (Nature of Learning)

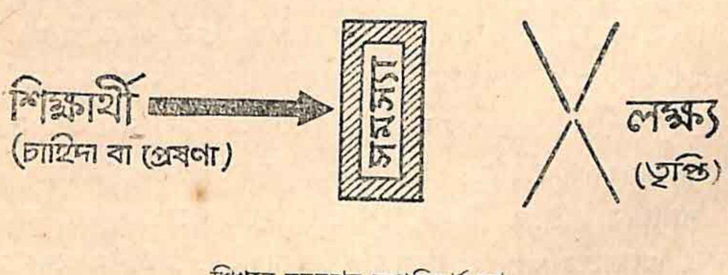
অতএব দেখা গেল, শিখনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল কোন নতুন আচরণ সম্পন্ন করার যোগ্যতা অর্জ্জন। যেমন একটি ছোট ছেলে হঠাৎ দুধের বাটিতে হাত দিতেই তার হাতটা পুড়ে গেল, সে ব্যথা পেল। পরে দেখা গেল সে আর কিছুতেই দুধের বাটিতে হাত দিচ্ছে না। এই যে তার পুরাতন আচরণের পরিবর্ত্তন এবং নতুন আচরণের সম্পাদন একেই শিখন বলা হয়। এই পুরাতন আচরণের পরিবর্ত্তে নতুন আচরণের সম্পাদনের পিছনে আছে নতুন একটি অভিজ্ঞতা, যেমন শিশুটির ক্ষেত্রে গরম দুধের বাটিতে হাত দেওয়ার অভিজ্ঞতা। অতএব শিখনের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা বলতে পারি যে কোন নতুন অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্জাত আচরণের পরিবর্ত্তন বা নতুন আচরণের সম্পাদনের নামই শিখন। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই আচরণের পরিবর্ত্তনের একটা বিশেষ গতিপথ আছে, যে গতিপথ প্রাণীর মধ্যে জাগরিত চাহিদা (needs) বা প্রেষণার (motive) তৃপ্তি এনে দেয়। যেমন আদিম মানুষ ক্ষুধার খাদ্য সংগ্রহ করতে জন্তু শিকার, মাছ ধরা, কৃষিকার্য প্রভৃতি একের পর এক নতুন আচরণ শিখেছিল। এই আচরণগুলি এমন একটি নির্দ্দিষ্ট গতিপথ ধরে এগিয়েছিল যার দ্বারা মানুষের খাদ্য সংগ্রহরূপ চাহিদা বা প্রেষণার তৃপ্তি হওয়া সম্ভব হয়েছিল। শিখনকে এই দিক দিয়ে ক্রমোন্নতির প্রক্রিয়াও বলা চলে। কেননা, যখন বর্ত্তমান আচরণটি পরিবেশের

পক্ষে অপর্য্যাপ্ত বা অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হয় তখনই সেই পুরাতন আচরণটিকে বাতিল করে নতুন আচরণ শেখার দরকার হয়। অতএব পুরাতন সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টার উৎকর্ষ-সাধনও শিখনের একটা লক্ষণ।

পুরাতন অনুপযোগী আচরণকে বাতিল করে নতুন উপযোগী আচরণ শিখতে হলে অভ্যাস (Practice) বা বার বার প্রচেষ্টার দরকার হয়। যেমন সাঁতার কাটতে, পড়া তৈরী করতে, টাইপ করতে ইত্যাদির ক্ষেত্রে একই কাজ বার বার করে করতে হয়। এইদিক দিয়ে শিখনকে "অভ্যাসের মাধ্যমে আচরণের বা কার্য্যের পরিবর্ত্তন" বলে বর্ণনা করা যায়। শিখনের এই সংজ্ঞা দিয়েছেন ম্যাক-গেয়ক (Mcgeoch)। অভ্যাসের সাহায্যে অনুপযোগী, অসংহত, অপ্রয়োজনীয়, ও অস্পষ্ট আচরণকে সুসংহত, উপযোগী ও কার্য্যকরী করে তোলা হয়। ‡

প্রত্যেক শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গেই একটা সমস্যামূলক পরিস্থিতি থাকা চাই এবং সেই সমস্যামূলক পরিস্থিতির চাপেই প্রাণীকে বর্ত্তমান আচরণের পরিবর্ত্তন করে নতুন আচরণের আশ্রয় নিতে হয়। সমস্যা শিখনের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ, বিনা সমস্যায় কোন কিছু শেখার কথা ওঠেই না এই দিক দিয়ে আমরা শিখনের তিনটি স্তর বা সোপানের উল্লেখ করতে পারি।

১। সমস্যার প্রত্যক্ষণ। ২। উপযোগী আচরণের আবিষ্কার।
৩। সেই আচরণের আয়ত্তীকরণ।



শিখনে সমস্যার অপরিহার্য্যতা

সমস্যামূলক পরিস্থিতি বলতে সেই অবস্থাকে বোঝায় যখন পুরাতন বা অভ্যস্ত আচরণের দ্বারা লক্ষ্যে পৌঁছন আর সম্ভব হয় না এবং তার ফলে পরিবেশের সঙ্গে

---

‡ Psychology of Human Learning—Mcgeoch

সঙ্গতি নষ্ট হয়ে যায়। তখন সেই পুরাতন আচরণকে বাতিল করে পরিবেশের উপযোগী নতুন আচরণের আবিষ্কার ও আয়ত্ত করার প্রয়োজন হয়। যতক্ষণ পুরাতন বা অভ্যস্ত আচরণেই সঙ্গতিবিধান সম্ভব হচ্ছে ততক্ষণ কোনরূপ সমস্যা নেই। কিন্তু যেই সেই আচরণ পরিবেশের পক্ষে অনুপযোগী হয়ে উঠছে তখনই নতুন আচরণের আশ্রয় নেওয়া বা শিখনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সমস্যা যতই জটিল হবে তার উপযোগী আচরণ আবিষ্কার করাও ততই দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ হবে। সমস্যা ও তার উপযোগী আচরণ আবিষ্কার করার দুরূহতার মানের দ্বারাই কোন শিখন-প্রক্রিয়াকে সরল বা জটিল বলে আমরা বর্ণনা করে থাকি।

শিখন (Learning) ও পরিণমন (Maturation)*

পরিণমন প্রক্রিয়ার উপর শিখন অনেকখানি নির্ভরশীল। পরিণমন বলতে বোঝায় সেই সকল পরিবর্তন যেগুলি ব্যক্তির মধ্যে আভ্যন্তরীণ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া থেকেই স্বাভাবিক ভাবে দেখা দেয়, কোনরূপ শিক্ষা বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। শিশু যে নিতান্ত অপরিণত অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে পূর্ণ বয়স্কের অবস্থায় এসে পৌছয় তার মূলে এই পরিণমন প্রক্রিয়া। দেখা গেছে যে বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হলেও সব শিশুই বিশেষ একটা সময়ে বিশেষ কতকগুলি কাজ করতে সমর্থ হয়। এই নতুন আচরণ করতে পারাটা কিন্তু কোনরূপ শিখন-জনিত নয়, কেননা এগুলির মূলে আছে স্বাভাবিক দৈহিক পরিণতি বা পরিণমন। শিখনের ক্ষেত্রে কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতির বা উদ্দীপকের সাহায্য লাগে। সাধারণত ১৫ মাসে শিশু স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চলা ফেরা করতে পারে। এখন কোন একটি শিশুকে বিশেষভাবে শেখানোর ফলে সে ১২ মাসেই হাঁটতে শিখল। কিন্তু যে শিশুকে কিছু শেখান হয় নি সে শিশুও ১৫ মাসের সময় ঐ বিশেষভাবে শেখান শিশুর সমানই হাঁটতে পারবে। এইটি হল পরিণমনের দৃষ্টান্ত।

সাধারণত ইন্দ্রিয়ের বিকশন, চলা-ফেরা, মুঠো করে কিছু ধরা, কথা বলা, লেখা, প্রক্ষোভের অনুভূতি, ইত্যাদি পরিণমনের উপর নির্ভরশীল বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই সকল কাজের মধ্যে শিখনের প্রভাবও যথেষ্ট থাকে। মানবশিশুর ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়াতে পরিণমন ও শিখন উভয়েরই অবদান যে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এটাই হল আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত।

---

* শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান—৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৩-৬২ দ্রষ্টব্য।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিণমনের গুরুত্ব অনেকখানি। শিশুর শিক্ষা এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যে তার পরিণমন-জনিত বৃদ্ধির সঙ্গে যেন তার পূর্ণ সংহতি থাকে। শিখন প্রক্রিয়া শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল এবং ফলে যদি এমন শিক্ষা দেওয়া হয় যা তার পরিণমন বা বৃদ্ধির আয়ত্তের বাইরে, তবে সে শিক্ষা যে কেবলমাত্র ব্যর্থই হবে তাই নয়, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে তা ক্ষতিকরও হবে।

শিখন (Learning) ও প্রেষণা (Motivation)

শিখনের অপরিহার্য্য অঙ্গ হল প্রেষণা। প্রেষণা ভিন্ন কোন প্রকার শিখন সম্ভব নয়। প্রেষণা বলতে বোঝায় প্রাণীর মধ্যে কোন একটি বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছানর আন্তরিক ইচ্ছা। এই ইচ্ছা বা প্রেষণা যথেষ্ট তীব্র হয়ে উঠলেই শিখন ঘটে। প্রেষণার কাজ তিন রকমের—

১। প্রেষণা প্রাণীকে শিখনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম্মটি করতে প্রবুদ্ধ করে; ২। সেই কর্ম্মতৎপরতাকে শিখন না হওয়া পর্য্যন্ত জাগিয়ে রাখে এবং ৩। প্রাণীর আচরণকে লক্ষ্যের পথে পরিচালিত করে।

কেবলমাত্র প্রেষণা থাকলেই যে আবার শিখন সম্ভব হয় তা নয়। প্রয়োজন আর একটি বস্তুর, সেটি হল উদ্‌বোধক (incentive)। উদ্‌বোধক বলতে সেই বস্তুকে বোঝায় যা প্রাণীর প্রেষণার তৃপ্তি আনতে পারে। যেমন ক্ষুধা হল প্রেষণা, খাদ্য হল উদ্‌বোধক। আত্মস্বীকৃতি একটা প্রেষণা এবং সামাজিক সাফল্য তার উদ্‌বোধক। এই দুই একত্র হলেই শিখন সম্ভবপর হয়। প্রেষণা-ছাড়া উদ্‌বোধক (ক্ষুধা-ছাড়া খাদ্য) বা উদ্‌বোধক-ছাড়া প্রেষণা (খাদ্য-ছাড়া ক্ষুধা)—এর কোনটিই সার্থক শিখন ঘটাতে পারে না। এইজন্যই বলা হয় যে প্রেষণা-উদ্‌বোধকের (Motive-Incentive) মিলিত পরিস্থিতিই শিখনের পক্ষে অপরিহার্য্য।

প্রেষণা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ এই দু-প্রকারের হতে পারে।

আভ্যন্তরীণ (Intrinsic) প্রেষণা

শিখনের বিষয়বস্তু যখন শিক্ষার্থীর নিকট অর্থপূর্ণ বলে মনে হয় তখন শিক্ষার্থী সেটি শেখার জন্য স্বাভাবিক প্রেষণা বোধ করে। সেই বস্তুটি শেখার জন্য সে

নিজে থেকেই প্রচেষ্টা করে এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই সে সেটা শেখে। একেই বলে আভ্যন্তরীণ প্রেষণা।

আভ্যন্তরীণ প্রেষণার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে শিক্ষণীয় বস্তুটিই একমাত্র উদ্‌বোধক এবং শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় বস্তুর জন্য চাহিদাও স্বাভাবিক।

বাহ্যিক (Extrinsic) প্রেষণা

কিন্তু নানা কারণেই দেখা যায় যে শিক্ষার্থীর এই আভ্যন্তরীণ প্রেষণার অভাব রয়েছে। অর্থাৎ তখন সে শিক্ষণীয় বস্তুটি শেখার জন্য কোন স্বাভাবিক চাহিদা বোধ করে না, ফলে তাকে শেখানোর জন্য নানারূপ বাহ্যিক উদ্‌বোধকের সাহায্য নিতে হয়। প্রচলিত কয়েকটি বাহ্যিক উদ্‌বোধকের বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

নিন্দা ও প্রশংসা—এই বাহ্যিক উদ্‌বোধকের সাহায্যে শিক্ষার্থীকে শিখতে প্ররোচিত করার পন্থা বহু প্রাচীন ও সর্ব্ব দেশে প্রচলিত। শিক্ষক ও অন্যান্য বয়ঃপ্রাপ্তদের প্রশংসা পাওয়া ও নিন্দা এড়ানোর জন্য শিক্ষার্থী নিজের ইচ্ছা না থাকলেও বাধ্য হয়ে শেখে।

শাস্তি ও পুরস্কার—এ উদ্‌বোধক দুটি নিন্দা ও প্রশংসারই মূর্ত্তরূপ। এদেরও ব্যবহার বহু প্রাচীন ও সর্ব্বজনীন। গবেষণায় দেখা গেছে যে শাস্তির চেয়ে প্রশংসা বেশী কার্য্যকরী।

প্রতিযোগিতা—অন্যান্য সঙ্গীদের প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেবার স্পৃহা শিক্ষার্থীর মধ্যে শিখনের প্রেষণা সৃষ্টি করে এবং বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই প্রতিযোগিতার মোহে শিক্ষার্থী শিখতে অনুপ্রাণিত হচ্ছে। এই উদ্‌বোধকটি কিন্তু স্বাস্থ্যকর সামাজিক পরিবেশ গঠনের বিরাট প্রতিবন্ধক এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে হিংসা, রাগ, ঘৃণা প্রভৃতি অবাঞ্ছনীয় মনোভাবের সৃষ্টি করে। সাফল্য সম্বন্ধে সচেতনতাও অনেক ক্ষেত্রে উদ্‌বোধকের কাজ করে থাকে। বহু গবেষণা থেকেও দেখা গেছে যে শিক্ষার্থী যতই নিজের সাফল্য সম্বন্ধে সচেতন হয় ততই তার শিক্ষায় আগ্রহ বেড়ে যায়।

সামাজিক সমর্থন, আত্মস্বীকৃতি, আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতির চাহিদা, নতুন কিছু সৃষ্টি করার আগ্রহ, জয় করার স্পৃহা এমন কি যৌন বা বাৎসল্য অনুভূতিও অনেক সময় শিখনের প্রেষণারূপে কাজ করে থাকে।

অসংখ্য গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে বাহ্যিক প্রেষণা সকল সময় কার্য্যকরী হয় না এবং তা থেকে প্রসূত শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও ক্রটীপূর্ণ হয়। বিশেষ করে নিন্দা-প্রশংসা, শাস্তি-পুরস্কার, প্রতিযোগিতা প্রভৃতি উদ্‌বোধকগুলি সন্তোষজনক শিখনের পক্ষে মোটেই সহায়ক নয়। একমাত্র আভ্যন্তরীণ প্রেষণা অর্থাৎ শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও শিক্ষণীয় বস্তুর প্রতি চাহিদাই শিখনকে সম্পূর্ণ ও সার্থক করে তুলতে পারে। এইজন্যই আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় সকল প্রকার বাহ্যিক উদ্‌বোধককে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং শিক্ষার্থীকে তার সত্যকারের আগ্রহ ও প্রেষণার সাহায্যে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

শিখন-প্রক্রিয়া ও শিক্ষা

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে শিখনের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শিশুর শিক্ষা শিখন-প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে শিখন-প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির সমাধান করতে হবে। বস্তুত শিখন-প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের একটা বৃহৎ অংশ গড়ে উঠেছে।

শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব (Theories of Learning)

শিখনের স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ না থাকলেও শিখন প্রক্রিয়াটি কি ভাবে সম্পন্ন হয় এ সম্বন্ধে একাধিক মতবাদ পাওয়া যায়। শিখন-প্রক্রিয়ার উপর কম করে ৯টি বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচলিত আছে। তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি আমরা এখানে আলোচনা করব।

থর্নডাইকের সংযোজনবাদ (Thorndike's Connectionism)

থর্নডাইকের মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ-স্থাপনই শিখন। যা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি জাগাতে পারে তাই হল উদ্দীপক আর কোন

ইন্দ্রিয়ানুভূতির উত্তরে আমরা যে সাড়া দিই তাই হল প্রতিক্রিয়া। এখন উদ্দীপকের আবেদন এবং তার উত্তরে সাড়া বা প্রতিক্রিয়া এই দুটির মধ্যে যখন নির্ভুল যোগসূত্র স্থাপিত হয় তখনই শিখন হয়। যেমন মনে করা যাক, আমার সামনে একটা বোর্ডে ৪টি সুইচ আছে আর আছে একটা বাল্ব। বলা হল ঐ ৪টি সুইচের মধ্যে বিশেষ একটি সুইচ টিপলে আলোটি জ্বলে উঠবে। আমি প্রথম সুইচটি টিপলাম আলো জ্বলল না; দ্বিতীয়টি টিপলাম তখনও জ্বলল না কিন্তু যেই তৃতীয়টি টিপলাম আলোটি জ্বলে উঠল। এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শিখন হল না, কেননা সেখানে উদ্দীপকের (আলো) সঙ্গে নির্ভুল প্রতিক্রিয়ার (৩য় সুইচটী টেপার) সংযোজন হয় নি। কিন্তু তৃতীয় বারে উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোজন নির্ভুল হয়েছে এবং সেইজন্য শিখনও সম্ভব হল।

উপরের উদাহরণটি শিখনের সরলতম ক্ষেত্র। একটি জটিল উদাহরণ নেওয়া যাক। মনে করা যাক একটি ছেলেকে একটা বীজগণিতের অঙ্ক করতে দেওয়া হয়েছে। অঙ্কটি বিশেষ একটি ফরমুলার প্রয়োগে করা যায়। ছাত্রটি তার জানা ফরমুলাগুলি একটির পর একটি প্রয়োগ করে যেতে যেতে ঠিক ফরমুলাটির প্রয়োগ করতেই অঙ্কটি হয়ে গেল। যতক্ষণ সে ঠিক ফরমুলার প্রয়োগ করেনি ততক্ষণ তার উদ্দীপক (অঙ্কটি) ও প্রতিক্রিয়ার (ফরমুলার প্রয়োগ) মধ্যে নির্ভুল সংযোজন হয় নি। যেই সে ঠিক ফরমুলাটির প্রয়োগ করতে পারল সঙ্গে সঙ্গে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোজনও ঠিক হল এবং তার শিখনও ঘটল।

অতএব দেখা যাচ্ছে যখনই উদ্দীপকের সঙ্গে ঠিক তার উপযোগী প্রতিক্রিয়াটি সংযুক্ত করা হবে তখনই শিখন সম্ভব হবে। এইজন্যই থর্নডাইকের মতে শিখন হল উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে বন্ধন বা সংযোগ (Stimulus-Response Bond) স্থাপন করা।

প্রচেষ্টা-ও-ভুলের (Trial-and-error) পদ্ধতি

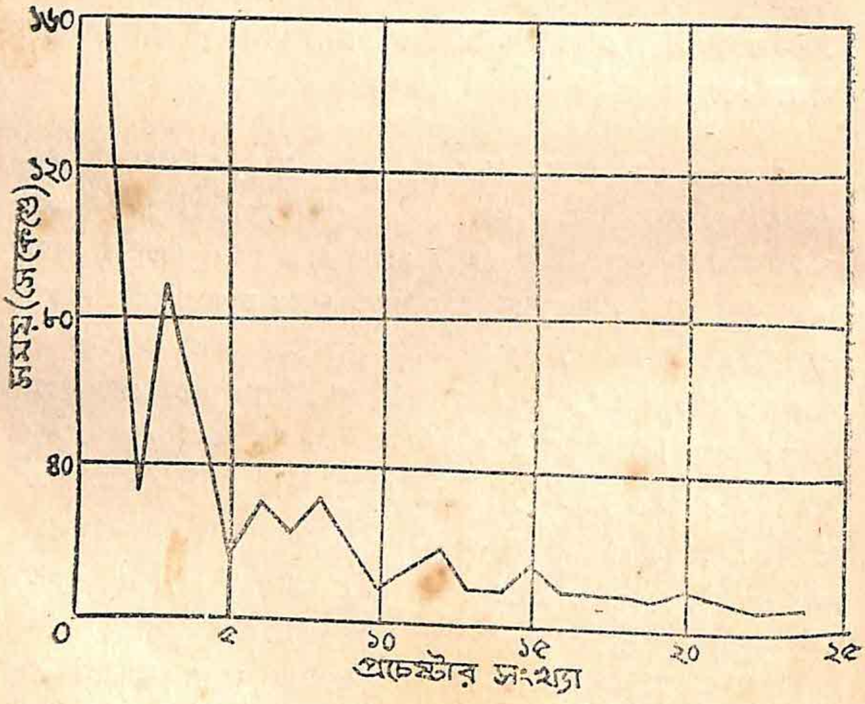
থর্নডাইক তাঁর উপরে বর্ণিত শিখনের সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করেই শিখনের পদ্ধতির নাম দিলেন প্রচেষ্টা-ও-ভুলের (trial-and-error)

পদ্ধতি। অর্থাৎ প্রাণী শেখে বার বার চেষ্টা ও ভুল করতে করতে। কোন কিছু শিখতে হলে উদ্দীপকের উপযোগী নির্ভুল প্রতিক্রিয়াটি অনেকগুলি ভুল প্রতিক্রিয়ার মধ্য থেকে প্রাণীকে খুঁজে বার করতে হয়। যেমন সুইচ টিপে আলো জ্বালার বেলায়একটার পর একটা সুইচ টিপে দেখতে হয়েছে কোন্ সুইচটিতে ঠিক আলো জ্বলে বা অঙ্ক কষার ক্ষেত্রে ছেলেটিকে পর পর ফরমুলাগুলি প্রয়োগ করে কোন্‌টি আসল ফরমুলা বার করতে হয়েছে। নির্ভুল প্রতিক্রিয়া সংখ্যায় একটি, অথচ ভুল প্রতিক্রিয়া সংখ্যায় অগণিত। এই অগণিত ভুল প্রতিক্রিয়ার মধ্য থেকে যেটি নির্ভুল প্রতিক্রিয়া সেটিকে খুঁজে বার করতে হলে বার বার তাকে চেষ্টা করতে হবে। বার বার তার ভুল হবে এবং এইভাবে ভুল করতে করতে যখনই সে নির্ভুল প্রতিক্রিয়াটি খুঁজে বার করতে পারবে তখনই তার শিখন সম্ভব হবে। সেই জন্য থর্নডাইকের মতে সব শেখাই হল প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখা।

প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শিখনের দৃষ্টান্ত হিসাবে থর্নডাইকের একটি প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের উল্লেখ করা যায়। একটি ক্ষুধার্ত্ত বিড়ালকে একটি খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে খাঁচার বাইরে খাবার রাখা হল। খাঁচাটার দরজায় এমন একটি ছিটকিনি লাগান ছিল যাতে আস্তে চাপ দিলেই দরজাটা খুলে যায়। বিড়ালটি খাঁচা থেকে বেরিয়ে খাবারের কাছে পৌছনর জন্য বার বার চেষ্টা করতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ বিশৃঙ্খলভাবে চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ ছিটকিনিটির উপর তার পা পড়ে যায় এবং দরজাটা খুলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালটি খাঁচা থেকে বেরিয়ে তার অভীষ্ট খাবারে গিয়ে পৌছয়। দ্বিতীয় দিনেও তাকে ঠিক ঐভাবে খাঁচায় বন্ধ করে রাখা হয় এবং বাইরে খাবার রেখে দেওয়া হয়। সেবারও বিড়ালটি ঐভাবে এলোমেলো চেষ্টা করতে করতে দরজা খুলে খাবারে গিয়ে পৌছয়। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে প্রথম দিনের তুলনায় ভুল প্রচেষ্টার সংখ্যা কম হয় এবং খাঁচা থেকে বেরোবার সময়ও কম লাগে। তৃতীয় দিনেও বিড়ালটিকে ঐভাবে খাঁচায় বন্ধ করে রাখা হয় এবং সেদিন তার খাঁচা থেকে বেরোতে দ্বিতীয় দিনের চেয়ে আরও কম সময় লাগে ও ভুল প্রচেষ্টা সংখ্যায় কম হয়। এইভাবে দেখা যায় যে যতই দিন যাচ্ছে ততই বিড়ালটির ভুল প্রচেষ্টার

সংখ্যা কম হয়ে আসছে এবং খাঁচা থেকে বেরোতে আগের দিনের চেয়ে সময় কম লাগছে। শেষকালে এমন এক দিন এল যখন বিড়ালটি আর একটিও ভুল প্রচেষ্টা করল না। খাঁচা বন্ধ করা মাত্রই সে দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে পারল। অর্থাৎ সেদিনই বিড়ালটির শিখন সমাপ্ত হল। এখানে বিড়ালটি বার বার প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে উদ্দীপকের সঙ্গে ঠিক প্রতিক্রিয়াটির সংযোজন করতে সমর্থ হল।

বিড়ালটির এই প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখার একটা আনুমানিক চিত্র নীচে দেওয়া হল।



থর্নডাইক শিখন-প্রক্রিয়া নিয়ে তাঁর দীর্ঘ গবেষণার উপরে ভিত্তি করে শিখনের কতকগুলি সূত্র উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর দেওয়া সূত্রের সংখ্যা আটটি—তিনটি মুখ্য সূত্র আর পাঁচটি গৌণসূত্র। তিনটি মুখ্য সূত্র

হল—১। প্রস্তুতির সূত্র। ২। অনুশীলনের সূত্র এবং ৩। ফললাভের সূত্র। সূত্রগুলির নীচে বর্ণনা দেওয়া হল।

শিখনের তিনটি মুখ্য সূত্র

১। প্রস্তুতির সূত্র (Law of Readiness)

শিখনের জন্য প্রয়োজন বিশেষ একটি উদ্দীপকের সঙ্গে তার উপযোগী প্রতিক্রিয়াটিকে সংযুক্ত করার জন্য শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি। যখন শিক্ষার্থীর এই প্রস্তুতি থাকে তখন শিখন সন্তোষ আনে, আর যখন শিক্ষার্থীর এই প্রস্তুতি থাকে না তখন শিখন বিরক্তির সৃষ্টি করে। এইজন্যই শিশু যখন কোন কাজ করতে উন্মুখ হয় তখন যদি তাকে বাধা দেওয়া হয় সে তাতে বিরক্ত হয়। আবার যে কাজ করতে তার মন চায় না সে কাজ জোর করে করাতে গেলেও তার বিরক্তি আসে। কিন্তু যে কাজ সে করার জন্য ব্যগ্র সে কাজে তাকে বাধা না দিলে সে আনন্দ পায়।

২। অনুশীলনের সূত্র (Law of Exercise)

একটি বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়াকে যদি বার বার সংযোজিত করা যায় তবে সে দুটির মধ্যে একটা সংযোগ বা বন্ধন সৃষ্ট হবে। আর বিপরীতক্রমে একটি উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়াটির মধ্যে যদি বেশ কিছুদিন সংযোজন না করা হয় তবে এ দুয়ের মধ্যে পূর্ব্বস্থাপিত সংযোগ বা বন্ধন ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসবে। এক কথায় অনুশীলন উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার বন্ধনকে দৃঢ় করে, অনুশীলনের অভাব তাকে শিথিল করে তোলে।

৩। ফলভোগের সূত্র (Law of Effect)

উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোজনের ফল শিক্ষার্থীর কাছে হয় সন্তোষজনক হবে, নয় বিরক্তিকর হবে। যদি সংযোগের ফল সন্তোষজনক হয় তবে সে সংযোগ

দৃঢ়বদ্ধ হবে আর সংযোগের ফল যদি বিরক্তিকর হয় তবে সে সংযোগ দুর্বল হয়ে যাবে। যেমন বিড়ালটির ভুল প্রচেষ্টাগুলির বেলায় উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সংযোজনের ফল তার কাছে বিরক্তিকর হয়েছিল কেননা সে তার অভীষ্ট খাদ্য পায় নি। সেজন্য ভুল প্রচেষ্টার একটিও সে ভবিষ্যতে শিখল না। কিন্তু দরজা-খোলা-রূপ নির্ভুল প্রচেষ্টাটির ফল তার কাছে সন্তোষজনক হয়েছিল। সেইজন্যই ঐ বিশেষ উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোজনটি তার কাছে স্থায়ী হয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ সে দরজা খুলতে পারার কৌশলটি স্থায়ীরূপে শিখল। থর্নডাইকের মতে এই ফলভোগের সূত্রটি শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিখনের পাঁচটি গৌণ সূত্র

১। একই উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে নানারূপ প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of multiple response to the same stimulus)

অনেকগুলি ভুল প্রতিক্রিয়ার মধ্য থেকে বিশেষ একটি নির্ভুল প্রতিক্রিয়াকে বেছে নেওয়াই হল শিখন। অতএব প্রাণীর একটি বিশেষ উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষমতা থাকা চাই। এই প্রতিক্রিয়ার বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য যত বাড়বে ততই তার শিখন সহজ হয়ে উঠবে।

২। মানসিক অবস্থা বা মনোভাবের সূত্র (Law of attitude, set or disposition)

শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মনোভাব বা মানসিক অবস্থার উপর তার শিখন নির্ভর করে এবং শিখনটি তৃপ্তিকর না বিরক্তিকর, তাও নির্দ্ধারিত হয় তারই দেহমনের তৎকালীন অবস্থার উপর।

৩। আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of partial activity)

কখন কখন উদ্দীপক বা শিখন-পরিস্থিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সমগ্র ও অভীষ্ট প্রতিক্রিয়াটির জন্ম দিতে পারে।

৪। **সুদৃশীকরণ বা উপমানের সূত্র** (Law of assimilation or analogy)

পূর্ব্ব-পরিচিত শিখন-পরিস্থিতির অনুরূপ কোন পরিস্থিতিতে পড়লে প্রাণী সাধারণত পূর্ব্বে সম্পাদিত প্রতিক্রিয়ারই অনুসরণ করে থাকে।

৫। **অনুষঙ্গ-মূলক সঞ্চালনের সূত্র** (Law of associative shifting)

যে উদ্দীপকের যে প্রতিক্রিয়া সেই উদ্দীপক থেকে অন্য আর একটি উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়াটি সঞ্চালিত হয়ে যেতে পারে। যেমন কোন কিছু খাবার সময় জিভে লালাক্ষরণ হওয়াটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু খাবার দেখলে বা নাম শুনলে জিভে যে জল আসে সেটা হল প্রতিক্রিয়ার সঞ্চালনের ফল। বিখ্যাত রুশ শরীর-তত্ত্ববিদ প্যাভ্‌লভ এই প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন অনুবর্ত্তিত প্রতিক্রিয়া (Conditioned Response) এবং তার উপর দীর্ঘ গবেষণা চালিয়ে তিনি বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেছেন। "অনুবর্ত্তিত প্রতিক্রিয়ার" পরিচ্ছেদে আমরা সেগুলির আলোচনা করব।

শিক্ষার ক্ষেত্রে থর্নডাইকের মতবাদ

থর্নডাইকের বর্ণিত শিখনের সূত্রগুলি থেকে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কতকগুলি অতি-মূল্যবান সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি।

প্রথমত, শিখন নির্ভর করছে শিক্ষণীয় বস্তুটি গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীর সর্ব্বাঙ্গীন প্রস্তুতির উপর। প্রস্তুতি বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভ-ঘটিত প্রভৃতি সমস্ত দিকগুলির একটা সামগ্রিক উন্মুখতা। যে শিখনের জন্য শিক্ষার্থী প্রস্তুত নয় সে শিখন ব্যর্থ হতে বাধ্য। প্রথম, যে বস্তুটি শিক্ষার্থী শিখতে চলেছে সেটি শেখার উপযোগী পূর্ব্বজ্ঞান তার আছে কিনা দেখতে হবে।

যে ছাত্রকে জ্যামিতির উপপাদ্য শেখান হচ্ছে দেখতে হবে সে কোণ, ত্রিভুজ ইত্যাদি কাকে বলে জানে কি না। দ্বিতীয় হল প্রক্ষোভঘটিত প্রস্তুতি। শিখনের পদ্ধতি, বিষয়বস্তু প্রভৃতির প্রতি ছাত্রের অনুকূল প্রক্ষোভ আছে কিনা দেখতে হবে।

দ্বিতীয়ত, ফল যেন শিক্ষার্থীর নিকট তৃপ্তিকর হয়। বিরক্তিকর শিখন স্থায়ী হয় না। একমাত্র সেই শিখনই স্থায়ী হয় যার ফল শিক্ষার্থীর কাছে তৃপ্তিকর বলে মনে হয়, অর্থাৎ যে শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থী স্বাভাবিক প্রেরণা বোধ করে। এইজন্য এমনভাবে শিখনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীকে সাফল্যের আনন্দের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে না হয়। শিক্ষণীয় বস্তুটি যদি সুদীর্ঘ হয় তবে সেটিকে একসঙ্গে শিখতে দিলে শিক্ষার্থীর পক্ষে সাফল্যের আনন্দ পাওয়াটা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে এবং ফলে তার প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হবে। সেইজন্য শিক্ষার বিষয়বস্তু দীর্ঘ হলে সেটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থী তার প্রচেষ্টার ফাঁকে ফাঁকে সাফল্যের আনন্দ পাবে এবং ফলে তার শিখন সুখকর ও সহজ হয়ে উঠবে।

তৃতীয়ত, অনুশীলনের উপর শিখন নির্ভরশীল। অতএব যাতে শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয়টি বার বার চর্চ্চা বা অভ্যাসের মাধ্যমে শেখে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। সেইজন্য বিষয়বস্তুটিকে নিয়ন্ত্রিত এবং সুবিভক্ত করে দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে পাঠ অনুশীলন করতে অযথা কোন অসুবিধা না হয়। মনে রাখতে হবে যে এই বার বার প্রচেষ্টা বা অনুশীলনের একটা বড় উপকরণ হল শিক্ষার্থীর শিখন সম্বন্ধে তৃপ্তিবোধ।

চতুর্থত, প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্য ও বিবিধতা শিখনকে ত্বরান্বিত করে তোলে। অতএব যাতে শিক্ষার্থী একঘেয়ে ও পুরাতন প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং যাতে সে নতুন ও বৈচিত্র্যময় প্রতিক্রিয়ার আবিষ্কার করতে পারে সেজন্য তাকে উৎসাহ দিতে হবে।

পঞ্চমত, শিখন-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক জানাটা শিক্ষার্থীর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে শিক্ষণীয় বস্তুটির কতকগুলি এমন গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকতে পারে যেগুলি সমগ্র পরিস্থিতিটিকেই নিয়ন্ত্রিত করে থাকে এবং যেগুলি সম্বন্ধে সচেতনতা সমস্যাটিকে সহজে সমাধান করতে সাহায্য করে। এগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞান থাকলে শিখন কার্য্য অনায়াসে

ও দ্রুত সম্পন্ন হয়ে যায়। অতএব শিক্ষার্থীকে শিখন-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির অন্তর্নিহিত সম্পর্ক অনুধাবন করতে শেখান দরকার।

থর্নডাইকের সংযোজনবাদের সমালোচনা

নানা মনোবিজ্ঞানী থর্নডাইকের সংযোজনবাদ এবং তাঁর শিখনের সূত্রগুলির তীব্র সমালোচনা করেছেন। অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীই থর্নডাইকের সূত্রগুলিকে শিখনের পর্য্যাপ্ত ব্যাখ্যা বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে সূত্রগুলি যদিও বাহ্যত প্রযোজ্য বলে মনে হয়, তবুও সেগুলিকে ভাল করে বিচার করলে তাদের অসম্পূর্ণতা ধরা পড়বেই। তাঁদের সমালোচনার প্রধান প্রধান বক্তব্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

প্রথমত থর্নডাইকের অনুশীলনের সূত্র অনুযায়ী কোন কিছু বার বার অভ্যাস বা চর্চ্চা করলে সে বস্তুটির শিখন স্থায়ী হয়। এ কথাটি আংশিকভাবে সত্য। কেননা কেবলমাত্র অভ্যাস বা চর্চ্চা করলেই স্থায়ী শিখন হতে পারে না। তার সঙ্গে আগ্রহ, মনোযোগ, পর্য্যবেক্ষণ দরকার। আর যেখানেই এই অত্যাবশ্যক বস্তুগুলির অভাব সেখানে নিছক অভ্যাস মোটেই কার্য্যকরী হয় না। এককথায় অনুশীলনের সাফল্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও অসংখ্য বস্তুর প্রভাব, যার একটার অভাবেই হাজার অনুশীলনেও শিখন সফল না হতে পারে। আবার অপর দিকে বিন্দুমাত্র অভ্যাস বা চর্চ্চা ছাড়াই বহু অভিজ্ঞতা স্থায়ী ভাবে আমাদের মনে ছাপ রেখে যায়, যেমন আনন্দ, শোক বা উত্তেজনাময় কোন ঘটনার অভিজ্ঞতা। বিশেষ করে যখন আমরা অর্থপূর্ণ কিছু শিখি তখন আমাদের কোনরূপ অনুশীলনের সাহায্যই লাগে না। অতএব দেখা যাচ্ছে অনুশীলন শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ নয়।

থর্নডাইকের সংযোজনবাদের স্বপক্ষে প্রায়ই শিখনের একটা শরীরতত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীতে স্নায়ুগুলির মধ্যে সংযোগ-স্থাপনই হচ্ছে শিখন। থর্নডাইক যাকে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোগ বলেন শরীরতত্ত্বের ব্যাখ্যায় সেটি হল দুটি নিউরনের মধ্যে সংযোগ-স্থাপন। এই দুটি নিউরনের সন্নিকর্ষ-স্থলে (Synapse) এই সংযোগ প্রক্রিয়াকে বাধা

দেবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। বার বার একই জিনিষ অনুশীলন করলে বাধা দূর হয়ে যায় এবং স্নায়ুমূলক সংযোজন স্থাপিত হয় অর্থাৎ শিখন সম্ভবপর হয়।

শিখনের এই শরীরতত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা আজকাল অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীই এই মানতে রাজী নন। ল্যাস্‌লে (Lashley), ফ্র্যানজ (Franz) ক্যামেরন (Cameron) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গবেষকগণ প্রমাণ করে দিয়েছেন যে স্নায়ুমূলক সংযোজনের মাধ্যমে শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

থর্নডাইকের ফললাভের সূত্রটিরও নানা রূপ সমালোচনা হয়েছে। এই সূত্র অনুযায়ী আচরণের ফল তৃপ্তিকর হলে সে আচরণের ফল দৃঢ়বদ্ধ হয়, আর আচরণের ফল বিরক্তিকর হলে সে আচরণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ওয়াটসন প্রমুখ আচরণবাদীরা (Behaviourists) এই সূত্রটির তীব্র বিরোধিতা করেছেন, যেহেতু এই সূত্রটি ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আচরণবাদীরা অবশ্য মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোন কিছুর ব্যাখ্যাই দিতে রাজী নন। তাঁরা প্রধানত অনুশীলন (Exercise) এবং আচরণের সাম্প্রতিকতার (Recency) সাহায্যেই শিখনের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন।

অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীরা ফললাভের সূত্রটির বিরোধিতা করেন আর এক কারণে। তাঁদের মতে সুখ বা দুঃখের অনুভূতি যদি একটি আচরণের শিখন বা বিলুপ্তির কারণ হয়ে থাকে, তবে সেই অনুভূতিটি নিশ্চয়ই ঐ আচরণ সম্পাদনের পূর্ব্বে ঘটবে। কেননা, কারণ সর্ব্বদাই কার্য্যের আগে থাকে। অথচ প্রকৃত ক্ষেত্রে আচরণটি ঘটছে আগে, তার পরে ঘটছে অনুভূতি। অতএব এখানে সুখ দুঃখের অনুভূতিকে শিখন হওয়া বা না হওয়ার কারণ বলা চলে না।

তাছাড়া দুঃখের অনুভূতি যে সব সময়ই আচরণের বিলোপ ঘটায় একথাও ঠিক নয়। বহু গবেষণা থেকে দেখা গেছে কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা খুব সহজেই এবং দীর্ঘদিন মনের মধ্যে সন্নিবদ্ধ থাকে। এই সকল আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে যে শিখন এবং সুখ-দুঃখের অনুভূতির মধ্যে যদিও সম্পর্ক আছে তবুও এই দুইয়ের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে থর্নডাইকের সূত্রগুলি কেবল ত্রুটিপূর্ণই নয় সেগুলিতে শিখন-প্রক্রিয়ার বহু বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। যেমন, শিখনের একটা বড় অঙ্গ হল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর সচেতনতা। কিন্তু থর্নডাইকের সূত্রগুলিতে তার কোন স্থান নেই। তাছাড়া শিখন প্রক্রিয়ায় প্রক্ষোভের প্রভাবও একটা বড় স্থান অধিকার করে থাকে, কিন্তু তারও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা থর্নডাইকের সূত্রগুলিতে পাওয়া যায় না।

থর্নডাইক নিজেও তাঁর সূত্রগুলির অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করেছিলেন এবং পরে তাঁর প্রদত্ত তিনটি সূত্রের সঙ্গে আর একটি সূত্র যোগ করে দিয়েছেন। এই সূত্রটির নাম অন্তর্ভুক্তির সূত্র (Law of Belongingness)। এই সূত্র অনুযায়ী শিখন সম্ভব হতে হলে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পারস্পরিক অন্তর্ভুক্তির একটা সম্বন্ধ থাকবে—অর্থাৎ দুটি ঘটনাই একটি বিশেষ সম্বন্ধের অন্তর্ভুক্ত হবে। থর্নডাইকের এই সূত্রটি কিন্তু বেশ অনির্দ্দিষ্ট ও অস্পষ্ট।

গেষ্টাল্ট (Gestalt) মনোবিজ্ঞানীরা থর্নডাইকের সংযোজনবাদ এবং তাঁর প্রচেষ্টা-এবং-ভুলের মাধ্যমে শেখার তত্ত্বটির তীব্র সমালোচনা করেছেন। থর্নডাইকের মতে শিখন হল একটি বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়ার মিলন ঘটানো। প্রাণী যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন সে সেই পরিস্থিতি থেকে একটির পর একটি উদ্দীপককে বেছে নেয় এবং একটির পর একটি প্রতিক্রিয়া দিয়ে তার সাড়া দেয়। এইভাবে সাড়া দিতে দিতে হঠাৎ ঠিক উদ্দীপকটির সঙ্গে ঠিক প্রতিক্রিয়াটির সংযোজন ঘটে যায় এবং তখনই শিখন সম্ভব হয়। একেই বলা হয় উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া সংযোগ (S-R Bond)।

গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা এই ব্যাখ্যাটিকে মনোবৈজ্ঞানিক আণবিকতা (atomism) বলে সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে সমস্যামূলক পরিস্থিতির অন্তর্গত উদ্দীপকগুলিকে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে একটি একটি পৃথক প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে সাড়া দিই না। আমরা সমগ্র পরিস্থিতিটিকে আমাদের সমগ্র প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিয়ে থাকি। এই সাড়া দেবার সময় আমরা পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করি এবং তাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি অনুযায়ী সেগুলিকে সংগঠন করে থাকি। সমস্যার এই আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ নিরূপণ এবং উদ্দীপকগুলির সংগঠনসাধনের মাধ্যমেই শিখন সম্ভব হয়।

শিখনেরগেষ্টাল্ট মতবাদ (Gestalt Theory of Learning)

গেষ্টাল্ট কথাটির অর্থ সমগ্র গঠন বা সম্পূর্ণ কাঠামো (Form or Structure)। এই মত অনুযায়ী আমাদের প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তু সর্ব্বদাই এমন একটা অবিচ্ছিন্ন সমগ্র সত্তা, যাকে বিশ্লেষণ করলে বা যার অংশগুলিকে পৃথকভাবে বিচার করলে আমরা সেই সমগ্র সত্তাটিকে পাই না। সমগ্র সত্তাটি কেবলমাত্র অংশগুলির যোগফল নয়, সব সময়েই তার উপরেও অতিরিক্ত কিছু। যেমন মনে করুন, আপনি একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছেন। এই দৃশ্যটির অন্তর্গত গাছপালা, ফুল, পাখী, পশুগুলিকে পর পর যোগ করে দিলেই আপনার অভিজ্ঞতার সেই সমগ্র সত্তাটিকে পাওয়া যাবে না। ওগুলি ত থাকবেই তার উপরেও থাকবে আরও কিছু। সমগ্র সত্তার এই অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যটি গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে বিভিন্ন অংশগুলির সংগঠন (organisation) থেকে দেখা দেয়।

অতএব কোন সমস্যার সমাধান করতে হলে ঐ সমস্যা-ঘটিত পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে যে সংগঠন, তার প্রকৃতি উপলব্ধি করতে হবে। থর্ নডাইক যে বলেছেন উদ্দীপকগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে পৃথক পৃথক প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিয়ে আমরা সমস্যার সমাধানে পৌঁছই এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। আসলে যা ঘটে তা ঠিক বিপরীত। আমরা সমগ্র সমস্যামূলক পরিস্থিতিটিকে আমাদের সমগ্র প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিই এবং এই সাড়া দেবার সময় পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে যে সংগঠন সাধন করি তারই ফলে সমাধান দেখা দেয় বা আমাদের শিখন সম্পন্ন হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে থর্ নডাইক-বর্ণিত প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখার প্রক্রিয়াটি আসলে অবাস্তব। প্রাণী কখনই বিচ্ছিন্ন অন্ধ প্রচেষ্টা এবং ভুলের মাধ্যমে শেখে না। তার প্রচেষ্টা সব সময়েই সমগ্র পরিস্থিতির উদ্দেশ্যে প্রসূত এবং সেগুলিকে এক একটি বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া বলে মনে করলে ভুল হবে। তার সমগ্র সত্তা দিয়ে সে প্রতিক্রিয়াটি সম্পাদন করে থাকে।

থর্ নডাইক খাঁচায় বন্ধ বিড়ালের শিখন নিয়ে যে পরীক্ষণ করেছিলেন তাতে পরিস্থিতিটি এমন ছিল যে বিড়ালের পক্ষে সমস্যার সমগ্র রূপটি উপলব্ধি করা

সম্ভব ছিল না। ফলে অন্ধ উদ্দেশ্যহীন প্রচেষ্টা করা ছাড়া তার আর অন্য কোন উপায় ছিল না। কিন্তু যদি পরিস্থিতিটি প্রাণীর কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে তবে সে কখনই অন্ধ, যান্ত্রিক বা উদ্দেশ্যবিহীন চেষ্টা করবে না।

প্রসিদ্ধ গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানী কোহলার (Kohler) শিম্পাঞ্জীর শিখন নিয়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষণ করেন এবং তিনি প্রমাণ করেছেন যে যান্ত্রিক বা অন্ধ পদ্ধতিতে প্রাণীরা কখনই কিছু শেখে না। তাঁর বহু পরীক্ষণের মধ্যে একটির বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

একটি শিম্পাঞ্জীকে বড় একটা খাঁচায় পুরে খাঁচার বাইরে কিছু কলা রাখা হল। খাঁচার মধ্যে রাখা হল দুটো লম্বা বাঁশের টুকরো। কলাগুলি খাঁচা থেকে এতটা দূরে ছিল যে কেবলমাত্র হাত বাড়িয়ে বা যে কোন একটি বাঁশের টুকরো দিয়ে তার নাগাল পাওয়া যায় না। কিন্তু বাঁশের একটি টুকরোর সঙ্গে যদি আর একটি টুকরো জুড়ে দেওয়া যায় তবে তা থেকে যে লম্বা বাঁশটি পাওয়া যাবে তা দিয়ে কলাগুলির নাগাল সহজেই পাওয়া যাবে। বাঁশের টুকরো দুটিও এমনভাবে কাটা হয়েছিল যে একটি আর একটির মধ্যে সহজেই ঢুকে যায়। প্রথমে শিম্পাঞ্জীটি হাত বাড়িয়ে এবং বাঁশের টুকরো দুটির সাহায্যে নানাভাবে কলাগুলির নাগাল পাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সেভাবে তার উদ্দেশ্যসিদ্ধি হল না। তখন সে বাঁশের টুকরো দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো এবং এইভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটা টুকরোর মধ্যে আর একটি টুকরো ঢুকে গিয়ে টুকরো দুটি একটা লম্বা বাঁশে পরিণত হল। মুহূর্তের মধ্যে শিম্পাঞ্জীটির মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। সে আর তখন বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ বা অবান্তর চেষ্টা না করে সেই বাঁশের সাহায্যে কলাগুলি হস্তগত করল।

সমস্যাটির সমাধানের এই যে হঠাৎ উপলব্ধি, কোহলার এর নাম দিয়েছেন অন্তর্দৃষ্টি (Insight)। তাঁর মতে সমস্যার সমাধান বা শিখন অনেকটা বিদ্যুৎ-চমকানোর মত প্রাণীর মনকে হঠাৎ আলোকিত করে দেয় এবং প্রাণীর সেই সমাধান আয়ত্ত করতে বিন্দুমাত্র সময় লাগে না এবং পরে সে সহজে তা ভোলেও না। ভুল প্রচেষ্টা বা অন্ধ প্রতিক্রিয়া যে একেবারে ঘটে না, তা নয়। কিন্তু কোহলারের মতে তা থেকে সত্যকারের শিখন ঘটে না। শিখন ঘটে একমাত্র অন্তর্দৃষ্টির আবির্ভাবে। আর যখনই প্রাণী শিখন-

পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারে এবং তাদের সমষ্টিগত প্রকৃতি অনুযায়ী সংগঠন করে উঠতে পারে তখনই দেখা দেয় অন্তর্দৃষ্টি।

গেষ্টাল্ট মতবাদ অনুযায়ী শিখনের প্রক্রিয়াগুলি বিশ্লেষণ করলে যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা পাই সেগুলিকে তাদের পরম্পরা অনুযায়ী নীচের কয়েকটি সোপানে ভাগ করা যায়। প্রথম শিক্ষার্থী, সমস্যাটিকে সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষণ করে। দ্বিতীয়, সমগ্র সমস্যাটির উদ্দেশ্যে সে সমগ্রভাবে প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করে। তৃতীয়, সমস্যাটির অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সংগঠন সাধন করে বা পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করে। এই পর্য্যায়ে শিক্ষার্থী নিজে, তার লক্ষ্য, এবং তাদের অন্তর্বর্ত্তী বাধা—এ তিনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। চতুর্থ, সমস্যা বা বিষয়টির অন্তর্নিহিত মৌলিক তত্ত্ব বা সূত্রগুলি শিক্ষার্থী সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে আহরণ করে। এই ধাপেই শিখনের সমাধান বিদ্যুৎচমকের মত দেখা দেয় এবং একেই গেষ্টাল্টবিদেরা অন্তর্দৃষ্টি বলে বর্ণনা করেছেন। গেষ্টাল্টবিদেরা শিখন প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রত্যক্ষণ, সম্বন্ধনির্ণয়ন, সংগঠন, সামান্যীকরণ, ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলির উপরই জোর দিয়ে থাকেন।

শিক্ষায় গেষ্টাল্ট তত্ত্বের প্রয়োগ

গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের দেওয়া শিখনের এই নতুন ব্যাখ্যা আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষ করে বিদ্যালয়ে শিক্ষা পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণে আজকাল গেষ্টাল্ট-মতবাদেরই ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। শিক্ষায় গেষ্টাল্ট মতবাদের প্রয়োগের কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হল।

প্রথমত স্কুল কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থায় এতদিন প্রচলিত বিশ্লেষক পদ্ধতির স্থানে সংশ্লেষক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। আগে শিক্ষার্থীকে তার শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটি প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে দেওয়ার প্রথা ছিল। এতে শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুটির সমগ্র রূপটি দেখতে পেত না এবং তার ফলে তার প্রচেষ্টা হত সম্পূর্ণ শিক্ষক-পরিচালিত, অতএব অন্ধ এবং যান্ত্রিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে শিক্ষার্থীকে বীজগণিতের সম্পূর্ণ একটা সমস্যার সমাধান করতে না দিয়ে প্রথমেই

বিচ্ছিন্ন ফরমূলাগুলি তাকে শেখান হয়। ফরমূলাগুলি যেহেতু সমগ্র সমস্যাটির কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশ ছাড়া কিছুই নয়, সেহেতু সেগুলি শিক্ষার্থীর কাছে অর্থহীন এবং অবাস্তব। আধুনিক সংশ্লেষক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সামনে আগে সমগ্র সমস্যাটি তুলে ধরা হয় এবং তার পর সেই সমস্যা-সমাধানের কালে প্রয়োজনীয় ফরমূলাগুলি শেখান হয়ে থাকে। আগে বিশ্লেষণ থেকে যাওয়া হত সংশ্লেষণে আজকাল সংশ্লেষণ থেকে যাওয়া হয় বিশ্লেষণে, তারপর আবার সংশ্লেষণে। অর্থাৎ সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, পুনঃসংশ্লেষণ—এই হল আধুনিক শিক্ষণের অনুক্রম। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিতে ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, গণিত—এ সবই শেখানর সময় প্রথমে পাঠ্যবস্তুটির একটা সমগ্র রূপ শিক্ষার্থীর সামনে ধরা হয় এবং পরে সেটিকে বিশ্লেষণ করা হয়।

দ্বিতীয়ত, গেষ্টাল্ট মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষা আসে অন্তর্দৃষ্টি থেকে এবং অন্তর্দৃষ্টি দেখা দেয় সমস্যার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্বন্ধের উপলব্ধি থেকে। অতএব শিক্ষার্থীর এই সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষমতা যাতে ভালভাবে বিকশিত হয় সেটি দেখা দরকার। আমরা বুদ্ধির আলোচনায় দেখেছি যে সম্বন্ধ-নির্ণয়ের ক্ষমতা বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল এবং বুদ্ধির ক্ষমতা একরকম অপরিবর্তনীয় বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। তবুও শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষণীয় বস্তুর বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্বন্ধ অনুসন্ধানের অভ্যাস সৃষ্টি করে এবং তাকে সম্বন্ধ-নির্ণয়ের কৌশল আয়ত্ত-করণে সাহায্য করে শিক্ষক তার শিখনকে সহজ ও দ্রুত করে তুলতে পারেন।

তৃতীয়ত, অন্ধ বা যান্ত্রিক প্রচেষ্টা থেকে শিখন হয় না। শিখন অন্তর্দৃষ্টি থেকে সঞ্জাত এক ধরনের মানসিক উপলব্ধি বিশেষ। অতএব শিক্ষার্থী যাতে অনর্থক অন্ধ বা যান্ত্রিক প্রচেষ্টা করে তার উদ্যম ও সময় নষ্ট না করে সেদিকে শিক্ষকের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

চতুর্থত, শিখনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতনতা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। অতএব শিখনের পরিস্থিতি যেন শিক্ষার্থীর কাছে পূর্ণভাবে উন্মুক্ত থাকে আর তার লক্ষ্য সম্বন্ধেও ধারণা যেন তার কাছে পরিষ্কার থাকে।

পঞ্চমত, শিখন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি যেন শিক্ষার্থীর বোধশক্তি ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে সুষমভাবে সংহতিবদ্ধ থাকে। শিখনের সাফল্য নির্ভর করে সমস্যার বিভিন্ন অংশগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ উপলব্ধির উপর। অতএব শিখনের প্রক্রিয়াটি

এমন গতিতে এগোবে যাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে এই সম্বন্ধগুলি বোঝা এবং অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান পাওয়া সহজ হয়ে ওঠে।

সর্ব্বশেষে আসে শিক্ষার্থীর অনুভূতিমূলক ও জ্ঞানমূলক প্রস্তুতি। প্রথম, শিক্ষার্থী যেন শিক্ষণীয় বস্তুটি গ্রহণের জন্য জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রস্তুত থাকে অর্থাৎ শিক্ষণীয় বস্তুটি শেখার মত যথেষ্ট পূর্ব্বজ্ঞান যেন তার মধ্যে থাকে। দ্বিতীয়, অনুভূতি বা প্রক্ষোভের দিক দিয়েও সে যেন শিক্ষাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে। প্রতিকূল প্রক্ষোভের দ্বারা শিখন বিলম্বিত বা অবরুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া সামগ্রিক। অতএব তার দেহমনের সর্ব্বাঙ্গীন প্রস্তুতি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

অনুবর্ত্তিত প্রতিক্রিয়া মতবাদ
(Conditioned Response Theory)

অনুবর্ত্তিত প্রতিক্রিয়া মতবাদটি সম্পূর্ণ শরীরতত্ত্বমূলক ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিখ্যাত রুশ শরীরতত্ত্ববিদ্ প্যাভলভকে এই মতবাদের স্রষ্টা বলা চলে, যদিও এ তত্ত্বটি মনোবিজ্ঞানীদের নিকট বহুদিন ধরেই পরিচিত এবং নানারূপে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর আলোচনায় পাওয়া যায়। থর্নডাইকের "অনুষঙ্গ-মূলক সঞ্চালনের" সূত্রটি মূলতঃ এই তত্ত্বটির সঙ্গে অভিন্ন।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই কতকগুলি বিশেষ উদ্দীপককে কতকগুলি বিশেষ প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দেবার ক্ষমতা থাকে। এই উদ্দীপকগুলিকে আমরা স্বাভাবিক উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়াগুলিকে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে বর্ণনা করতে পারি। যেমন ক্ষুধার্ত্ত কুকুরের ক্ষেত্রে খাবার দেখলে লালাক্ষরণ, ছোট শিশুর ক্ষেত্রে উচ্চশব্দ শুনলে ভয় পাওয়া, যে কোন মানুষের ক্ষেত্রেই বাধা পেলে রেগে যাওয়া ইত্যাদি। এই প্রতিক্রিয়াগুলি সহজাত এবং অর্জ্জিত বা শিক্ষাপ্রসূত নয়। এখন যদি ঐ ধরনের একটা স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গে বা ঠিক আগে বা ঠিক পরে একটি কৃত্রিম উদ্দীপককে বার বার উপস্থাপিত করা হয় তবে ঐ স্বাভাবিক উদ্দীপকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি দ্বিতীয় উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ তখন স্বাভাবিক উদ্দীপকটি ছাড়াই ঐ কৃত্রিম

উদ্দীপকটি ঐ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি ঘটাতে সমর্থ হবে। মনে করা যাক, স্বাভাবিক উদ্দীপক (উ-১) এর উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া (প্র-১) পাওয়া যায়। এখন একটি কৃত্রিম উদ্দীপক (উ-২),—যার প্রতিক্রিয়া হল কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া (প্র-২) যদি বার বার স্বাভাবিক উদ্দীপক (উ-১)-এর সঙ্গে উপস্থাপিত করা যায় তবে দেখা যাবে যে স্বাভাবিক উদ্দীপক (উ-১) ছাড়াই কৃত্রিম উদ্দীপক



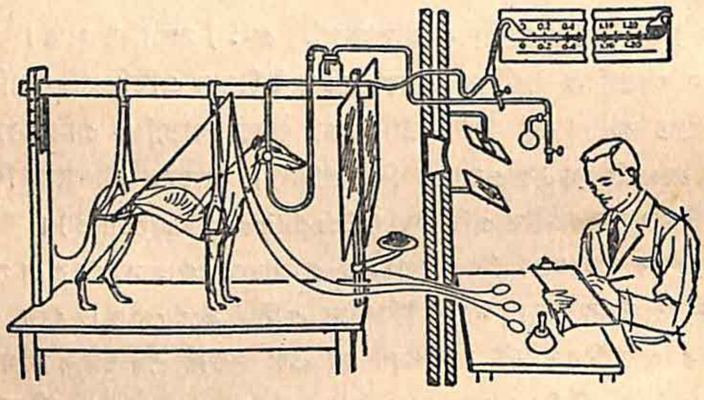
(উ-২) এর উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি (প্র-১) সম্পাদিত হচ্ছে। অর্থাৎ এখানে স্বাভাবিক উদ্দীপক থেকে কৃত্রিম উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়াটি সঞ্চালিত বা অনুবর্ত্তিত হল। এই কৃত্রিম উদ্দীপকের উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দেওয়াই হল এক প্রকারের শিখনপ্রক্রিয়া। প্যাভলভ এই ধরনের শিখনের নাম দিয়েছেন অনুবর্ত্তিত প্রতিক্রিয়া (Conditioned Response)।

কুকুরের লালাক্ষরণ নিয়ে প্যাভলভ প্রতিক্রিয়া-সঞ্চালনের উপর যে গবেষণা চালান, তা তাঁকে মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ করে গেছে। খাদ্য দেখলে কুকুরের স্বাভাবিকভাবেই লালাক্ষরণ হয় এবং ঘণ্টার শব্দ শুনলে চঞ্চলতা বা অস্থিরতা রূপ প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে দেখা দেয়। এখন যদি কুকুরটিকে খাদ্য দেবার সঙ্গে ঘণ্টা বাজান হয় তাহলে দেখা যাবে যে কিছুকাল পরে খাদ্য না দিয়ে



কেবলমাত্র ঘণ্টা বাজালেই লালাক্ষরণ হতে সুরু করেছে। এখানে লালাক্ষরণ-রূপ

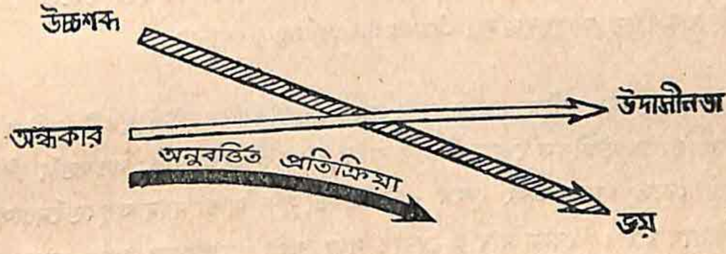
স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি ঘণ্টা-বাজান-রূপ কৃত্রিম উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেল। প্রতিক্রিয়াটির এই স্বাভাবিক উদ্দীপক থেকে কৃত্রিম উদ্দীপকেসঞ্চালিত হওয়াকে "অনুবর্ত্তন" (conditioning) বলা হয় এবং প্রাণীটিকে "অনুবর্ত্তিত" (conditioned) বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীরা এই অনুবর্ত্তিত প্রতিক্রিয়া তত্ত্বের দ্বারাই সকল প্রকার শিখন-প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে আমাদের অভ্যাস, পছন্দ, অপছন্দ, মনোভাব, ভয়, ঘৃণা প্রভৃতি সবই অনুবর্ত্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জন্মলাভ করে থাকে। শিশুর অতি সরল প্রক্ষোভের কাঠামোটি পরিণত অবস্থায় যে অতি-জটিল প্রক্ষোভের সংগঠনে পরিণত হয় তার মূলেও আছে এই প্রক্রিয়া।



কুকুরের অনুবর্ত্তনের পরীক্ষণ (প্যাভলভ)

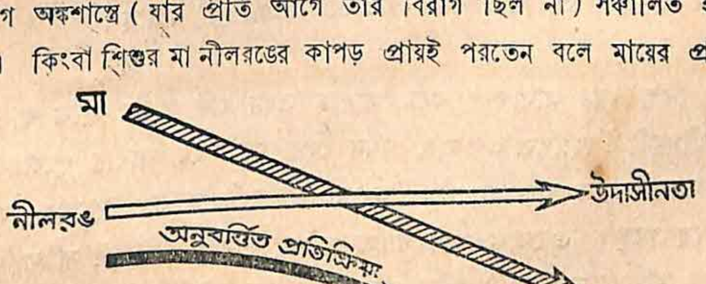
আচরণবাদী ওয়াটসনের পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে নবজাতকের ভয় জাগাতে পারে মাত্র দুটি উদ্দীপক—উচ্চশব্দ এবং হঠাৎ পড়ে যাওয়া। কিন্তু সে যখন বড় হয় তখন তার ভয় কেবল ঐ দুটি উদ্দীপকে সীমাবদ্ধ থাকে না—নানা বিভিন্ন উদ্দীপকে সংযুক্ত হয়ে যায়। তার এই প্রক্ষোভের জটিলতা সংঘটিত হয় অনুবর্ত্তন বা কণ্ডিসানিংয়ের জন্য। যেমন, লোমওয়ালা কুকুর

দেখলে ছোট শিশু প্রথমে ভয় পায় না অথচ উচ্চশব্দ শুনলে সে স্বাভাবিকভাবেই ভয় পায়। এইবার তাকে একটা লোমওয়ালা কুকুরের পুতুল দেবার সময় খুব জোরে শব্দ করা হতে লাগল। শিশুটি যতবারই কুকুরটি নিতে হাত বাড়ায় ততবারই জোরে শব্দ করা হয় আর সেই শব্দ শুনে সে ভয় পেয়ে যায়। শেষ কালে দেখা গেল যে লোমওয়ালা কুকুর দেখলেই এবং শব্দ করা না হলেও শিশুটি ভয় পেতে সুরু করছে। অন্ধকারকেও ছোট শিশু প্রথম প্রথম ভয় করে না, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে শব্দ শুনে ভয় পেতে পেতে শিশু



অন্ধকারকেই পরে ভয় করতে সুরু করে। ভয়ের প্রতিক্রিয়াটি তার উচ্চ-শব্দরূপ স্বাভাবিক উদ্দীপককে ছেড়ে অন্যান্য কৃত্রিম উদ্দীপক যেমন, লোমওয়ালা কুকুর অন্ধকার প্রভৃতিতে অনুবর্ত্তিত হয়ে যায়।

শিশুর ঘৃণা, বিরক্তি, পছন্দ-অপছন্দ এগুলিও এইভাবে অনুবর্ত্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়। যেমন, অঙ্ক শিক্ষার পদ্ধতি যদি বিরক্তিকর হয় তবে পদ্ধতির প্রতি বিরাগ অঙ্কশাস্ত্রে (যার প্রতি আগে তার বিরাগ ছিল না) সঞ্চালিত হয়ে যায়। কিংবা শিশুর মা নীলরঙের কাপড় প্রায়ই পরতেন বলে মায়ের প্রতি



শিশুর আনন্দবোধ নীলরঙে সঞ্চালিত হয়ে যায় এবং দেখা যায় যে বড় হয়ে সে নীল রঙ পছন্দ করতে সুরু করেছে।

অপানুবর্ত্তন (Deconditioning) এবং পুনরুপস্থাপনের সূত্র (Law of Reinforcement)

কোন প্রক্রিয়ার অনুবর্ত্তন যদি একবার প্রতিষ্ঠিত হয় তবে পরে নানা কারণে সেই অনুবর্ত্তন লোপ পেতে পারে। অর্থাৎ তখন কৃত্রিম উদ্দীপকের উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটী আর প্রকাশ পায় না, যেমন কুকুরের ক্ষেত্রে ঘণ্টার শব্দে লালাক্ষরণ হওয়া রূপ অনুবর্ত্তনটী পরে কোন কারণে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই ঘটনাটিকে অপানুবর্ত্তন (deconditioning) বলা হয়।

অনুবর্ত্তনের পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে স্বাভাবিক উদ্দীপকটী যদি দীর্ঘকাল কৃত্রিম উদ্দীপক থেকে বিচ্যুত অবস্থায় থাকে তবে ক্রমশঃ অনুবর্ত্তন শিথিল হয়ে যেতে থাকে এবং শেষে এমন একটা সময় আসে যখন অনুবর্ত্তনের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে। যেমন খাবার দেবার সময় ঘণ্টা বাজানোর ফলে দেখা গেল যে খাবার ছাড়াই কেবলমাত্র ঘণ্টা বাজালেই কুকুরটির লালাক্ষরণ হয়। অর্থাৎ লালাক্ষরণ প্রতিক্রিয়াটি ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে অনুবর্ত্তিত হয়ে গেছে। কিন্তু যদি বিনা খাবারে কেবলমাত্র ঘণ্টা বাজিয়ে যাওয়া যায় তবে দেখা যাবে লালাক্ষরণের পরিমাণ ক্রমশঃ কমে আসছে এবং শেষ পর্যন্ত এমন একটা সময় এসেছে যখন ঘণ্টা বাজালে আর লালাক্ষরণ হয় না। অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াটীর অনুবর্ত্তন লুপ্ত হয়েছে বা তার অপানুবর্ত্তন (deconditioning) ঘটেছে।

কিন্তু যখন লালাক্ষরণ কমে আসছে তখন যদি মাঝে মাঝে স্বাভাবিক উদ্দীপকটী উপস্থাপিত করা যায়, তখন দেখা যাবে যে আবার পূর্ব্বের মতই লালাক্ষরণ হতে সুরু হয়েছে। অর্থাৎ অনুবর্ত্তন আবার পূর্ব্বের অবস্থায় ফিরে গেছে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে অনুবর্ত্তন প্রতিক্রিয়াটী সক্রিয় থাকার সময় যদি কৃত্রিম উদ্দীপকটীর সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্দীপকটীকে মাঝে মাঝে দেওয়া যায় তবে অনুবর্ত্তনের দৃঢ়তা বজায় থাকে এবং অপানুবর্ত্তন ঘটে না। অনুবর্ত্তন বজায় রাখবার জন্য স্বাভাবিক উদ্দীপকটীর এই মাঝে মাঝে উপস্থাপনের প্যাভলভ নাম দিয়েছেন পুনরুপস্থাপন (Reinforcement)

প্রক্রিয়া। বস্তুতঃ থর্নডাইকের ফললাভের সূত্র (Law of Effect) এবং প্যাভলভের পুনরুপস্থাপনের সূত্র (Law of Reinforcement) এ দুটি মূলতঃ অভিন্ন। শিখনের স্থায়িত্ব যে প্রাণীর তৃপ্তিবোধের উপর নির্ভর করছে এই মূলকথাই উভয় সূত্রের বক্তব্য।

শিক্ষায় অনুবর্ত্তন-প্রক্রিয়া (Conditioning in Education)

শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুবর্ত্তন প্রক্রিয়ার প্রভাব যে কত গভীর তা আমরা সহজে ধারণা করতে পারব না। শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলির ক্রমবিকাশে অনুবর্ত্তনের অবদান যেমন ব্যাপক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, শিশুর ভাষা শিক্ষায় অনুবর্ত্তন প্রক্রিয়ার প্রভাব প্রচুর। বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন নাম শিশু শেখে অনুবর্ত্তন প্রক্রিয়ারই মাধ্যমে। প্রথম প্রথম শিশু অর্থহীন কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করে। কিন্তু ক্রমশঃ সে দেখে যে বিশেষ বিশেষ শব্দ করলে বিশেষ বিশেষ বস্তু তার কাছে এগিয়ে আসে, যেমন মা-ম্-ম্ বললে মা তার কাছে আসেন, জ-জ বললে তাকে জল দেওয়া হয়। তখন স্বাভাবিকভাবেই একটি বিশেষ বস্তুর সঙ্গে একটি বিশেষ শব্দ তার কাছে অনুবর্ত্তিত হয়ে যায়। পরে ঐ বস্তুটী দেখলে বা বোঝাতে গেলে ঐ নামটি তার মনে হয় বা সে উচ্চারণ করে। শিশু এইভাবে সমস্ত বস্তুর নামকরণ করতে শেখে এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই শিশু বিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতি অন্যান্য শব্দের অর্থও শিক্ষা করে থাকে।

শিশুর বহু আচরণ অনুবর্ত্তন প্রক্রিয়ার ফল। যে সকল অভ্যাস আমরা আমাদের অজ্ঞাতে আহরণ করি সেগুলির অধিকাংশই যে অনুবর্ত্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, যেমন সকালে ঘুম থেকে ওঠা, বিশেষ সময়ে খাওয়া বা পড়তে বসা বা শুতে যাওয়া ইত্যাদি। তা ছাড়া সামাজিক আদব কায়দা, শিষ্টাচার প্রভৃতি সমস্তই অনুবর্ত্তনের ফলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শিখে থাকে। প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে অনুবর্ত্তনের প্রভাব সব চেয়ে বেশী। কোন কিছুর প্রতি পছন্দ, অপছন্দ, ভয়, ঘৃণা, আনন্দ, অনুরাগ প্রভৃতি বহু ক্ষেত্রে অনুবর্ত্তনের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে থাকে। স্কুলের বহু ছেলেমেয়েদের কাছে গণিত এবং ইংরাজী

বিশেষ বিরাগ এবং ভীতির বিষয় হয়ে দাঁড়াতে দেখা যায়। এই প্রতিকূল মনোভাব কিন্তু অস্বাভাবিক এবং নিছক অনুবর্ত্তনের ফল। প্রথম যখন শিশু বিষয় দুটি শিখতে যায় তখন তার বস্তুটির প্রতি যথেষ্টই আগ্রহ থাকে। কিন্তু শিক্ষকের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষণ-পদ্ধতি বা অতিরিক্ত শাসন বা শাস্তিদান প্রভৃতি থেকে যে স্বাভাবিক বিরাগ এবং ভীতি জন্মায়, তা কিছুকাল পরে ঐ বিষয়টির প্রতি অনুবর্ত্তিত হয়ে যায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোভাব অনুকূল বা প্রতিকূল হওয়াটা নির্ভর করছে অনুবর্ত্তন-প্রক্রিয়ার উপর। সুতরাং যাতে শিক্ষণ-পদ্ধতির ত্রুটি বা অপ্রাসঙ্গিক কোন কারণ থেকে সঞ্জাত প্রতিকূল প্রক্ষোভ শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষক বা স্কুল প্রভৃতির প্রতি মনোভাবের সঙ্গে বিজড়িত না হয়ে যায় সেদিকে শিক্ষকমাত্রেরই সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। স্কুলে সংঘটিত কোন অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য সমস্ত স্কুলটারই উপর শিশুর বিরাগের সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে।

মন্দ অভ্যাসও অনেক সময় অনুবর্ত্তন থেকে সৃষ্ট হতে পারে। অসতর্কতা, অমনোযোগ, বানান ভুল প্রভৃতির ক্ষেত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তাদের মূলেও অনুবর্ত্তন-প্রক্রিয়ার কাজ আছে। আমরা নিজেরাই সময় সময় অজ্ঞতাবশতঃ শিশুর মধ্যে অবাঞ্ছিত অনুবর্ত্তন সৃষ্টি করে থাকি। যেমন শিক্ষার্থী পরীক্ষার খাতায় কোন ভুল করলে লাল কালিতে দাগ দিয়ে থাকি। আমাদের উদ্দেশ্য ঐ ভুলটির প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কিন্তু লাল রঙের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ভীতি (এও অবশ্য আর একটি অনুবর্ত্তনের ফল)। ফলে অনুবর্ত্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ ভুলগুলি শিশুর কাছে ভীতির বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং সে নিজের অজ্ঞাতেই ঐ ভুলগুলিকে শোধরাবার চেষ্টা না করে এড়িয়ে যায়। যাতে শিশুর মধ্যে এই শ্রেণীর অবাঞ্ছিত অনুবর্ত্তনের সৃষ্টি না হয় সেদিকে সচেতন থাকা শিক্ষকের কর্ত্তব্য। আবার পরিবেশের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের দ্বারা শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঞ্ছিত অনুবর্ত্তনও সৃষ্টি করতে পারেন। সমাজ-জীবনের রীতি-নীতি, ভদ্রতা, লৌকিকতা, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, উদার মনোভাব, মনোযোগের অভ্যাস, মিথ্যার প্রতি ঘৃণা, সহযোগিতা, বন্ধুপ্রীতি,

দল-বিশ্বস্ততা প্রভৃতি নানা বাঞ্ছিত গুণ নিয়ন্ত্রিত বা স্বেচ্ছাসৃষ্ট অনুবর্ত্তনের মাধ্যমে শিশুকে শেখান যেতে পারে।

শিখনের বিভিন্ন তত্ত্বের সমন্বয়ন

যে তিনটি প্রধান শিখন তত্ত্বের আলোচনা আমরা করলাম সেগুলির প্রত্যেকটিরই সমর্থকগণ দাবী করেন যে তাঁদের সমর্থিত পদ্ধতিটির মাধ্যমেই একমাত্র শিখন সংগঠিত হয়ে থাকে। যেমন থর্নডাইকের মতে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমেই সব শিখন হয়। গেষ্টাণ্টবিদদের মতে একমাত্র অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমেই সব শিখন হয় আবার আচরণবাদীরা বলেন যে সকল শিখনই অনুবর্ত্তন প্রক্রিয়ার ফল। প্রকৃতপক্ষে আলোচিত এই তিনটি পদ্ধতিতেই শিখন সংঘটিত হয়ে থাকে। তবে কখন কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ পদ্ধতিটি অনুসৃত হয় তা নির্ভর করে—প্রথমত, শিখনের বস্তুটির স্বরূপের উপর, দ্বিতীয়ত, শিখন-পরিস্থিতির প্রকৃতির উপর এবং সবশেষে শিখনকারীর মানসিক ক্ষমতার উপর।

অতি-প্রাথমিক, অজটিল এবং সহজ শিখন কাজগুলি প্রাণী শেখে অনুবর্ত্তনের মাধ্যমে। শিখন-পদ্ধতি হিসাবে অনুবর্ত্তন যান্ত্রিক, স্বতঃপ্রসূত এবং প্রাণীর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। অনুবর্ত্তনে প্রাণী তার অজ্ঞাতসারে শিখে থাকে।

যে সকল ক্ষেত্রে শিখন-পরিস্থিতি বদ্ধ ও অনির্দ্দিষ্ট এবং শিখনের লক্ষ্য পরিষ্কার-ভাবে উপলব্ধি করা যায় না সে সকল ক্ষেত্রে প্রাণী প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শিখে থাকে। কিন্তু যদি শিখন-পরিস্থিতি উন্মুক্ত হয় এবং লক্ষ্যটি পূর্ণভাবে জানা থাকে তখন প্রাণী শেখে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে। অবশ্য প্রাণী প্রায় সকল প্রকার কৌশলই (Skill) আয়ত্ত করে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে। যেমন টাইপ করা, মটরগাড়ী চালান, সাঁতার কাটা, কোন শিল্পকাজ করা প্রভৃতি কৌশলগুলি আয়ত্ত করতে বার বার প্রচেষ্টা করতে হয় এবং বার বার ভুল করার মধ্যে দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত শিখন সম্পন্ন হয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখা এবং অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে শেখা এদু'টি পদ্ধতির মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য খুবই অল্প। তাঁরা বলেন যে প্রথম ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের প্রক্রিয়াটি মূর্ত্ত,

প্রকাশ্য এবং বাহ্যিক আচরণে অভিব্যক্ত কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঐ প্রচেষ্টা-ও-ভুলের প্রক্রিয়াটিই সংঘটিত হয়, তবে তা থাকে অমূর্ত্ত, অপ্রকাশ্য এবং মানসিক স্তরে সীমাবদ্ধ।

প্রাণীর মানসিক ক্ষমতার উপর শিখনের পদ্ধতি অনেকখানি নির্ভর করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে কাজটি অন্ত র্দৃষ্টির সাহায্যে সম্পন্ন করবে, অপেক্ষাকৃত অল্প-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি সেই একই কাজ প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে সম্পন্ন করবে। কোন মানুষ পথে যেতে যেতে যদি সম্মুখে কোন বাধা দেখে তবে সে সেটা ঘুরে পার হয়ে যাবে কিন্তু মনুষ্যেতর প্রাণী সেই ক্ষেত্রে বার কয়েক সেই বাধায় ধাক্কা খেয়ে তবে কিছুক্ষণ পরে সেই বাধাটা ঘুরে যেতে পারবে। এখানে মানুষের উন্নত বিচারশক্তি থাকার জন্য তাকে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতির সাহায্য নিতে হল না, কিন্তু মনুষ্যেতর জীবের সেই উচ্চ মানসিক ক্ষমতা না থাকার জন্য তাকে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মধ্যে দিয়ে শিখতে হল।

ওয়াসবার্নের সমন্বয়ন

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ওয়াসবার্ন (Washburn) শিখনের এ তিনটি বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে যদি শিখন প্রক্রিয়াটিকে তার উদ্ভব বা সৃষ্টির দিক থেকে বিচার করা যায় তাহলে আমরা পরম্পরাসম্পন্ন বা আনুক্রমিক কতকগুলি ঘটনা বা সোপান দেখতে পাব। সেগুলি এইরূপ—

১। সম্পর্কস্থাপন (Orientation)
২। পরিবেশ পরীক্ষণ (Exploration)
৩। সম্প্রসারণ (Elaboration)
৪। পরিস্ফুটন (Articulation)
৫। সরলীকরণ (Simplification)
৬। যান্ত্রিকীকরণ (Automatisation)
৭। পুনঃ সম্পর্কস্থাপন (Reorientation)

সম্পর্কস্থাপন বলতে বোঝায় সমস্যাটির স্বরূপ পর্য্যবেক্ষণ করা। এইটি শিখন প্রক্রিয়ার প্রথম সোপান। তার পরের সোপানে ব্যক্তি সমস্যাটির সমাধানের জন্য তার সম্ভাব্য পন্থা ও উপায়গুলি পরীক্ষণ করে। তৃতীয় সোপানে সমস্যা সম্বন্ধে সে নিজের জ্ঞানকে সম্প্রসারিত করে এবং তার সমাধানের পদ্ধতিকে উন্নত করে তোলে। চতুর্থ বা পরিস্ফুটনের স্তরে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছবার

উপায়টীকে আরও সুনির্দ্দিষ্ট এবং সুশৃঙ্খলভাবে গঠিত করে। সরলীকরণের স্তরে অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে বাদ দেওয়া হয়। যান্ত্রিকীকরণের স্তরে সমস্যা সমাধানের উপযোগী আচরণটিকে বার বার সম্পন্ন করে সেটিকে যান্ত্রিকস্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। শেষ স্তরে নতুন শেখা আচরণ ও অভিজ্ঞতা থেকে ব্যক্তি সাধারণ সূত্র বা তত্ব সামান্যীকরণ (generalisation) প্রক্রিয়ার সাহায্যে আহরণ করে। এইভাবেই তার শিখন শেষ হয়।

এখন ওয়াসবার্নের মতে যে সব মনোবিজ্ঞানীরা উপরের প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে এই সামান্যীকরণ বা সম্পর্কগঠন (orientation) কাজটির উপর জোর দেন তাঁরাই বলেন যে সব শিখনই সম্পন্ন হয় অন্তদৃষ্টির মাধ্যমে। আর যে সব মনোবিজ্ঞানী পরিবেশ পরীক্ষণ, সম্প্রসারণ, পরিস্ফুটন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার উপর জোর দেন তাঁরা শিখনকে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি বলে বর্ণনা করে থাকেন। আর যাঁরা সরলীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণ প্রক্রিয়ার উপর জোর দেন তাঁরা শিখনকে নিছক অনুবর্ত্তন প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করেন।

শিখনের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব
(Two-Factor Theory of Learning)

প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতি এবং অন্তর্দৃষ্টির পদ্ধতি—এ দু'শ্রেণীর শিখন মূলগত অভিন্ন বলে অনেক মনোবিজ্ঞানী শিখনের কেবলমাত্র দুটি মৌলিক শ্রেণী বিভাগকে স্বীকার করে থাকেন। যেমন মাওরার (Mowrer) সমস্ত শিখনকে দু শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—(১) অনুবর্ত্তন (Conditioning) বা উদ্দীপকের প্রতিস্থাপন (Stimulus substitution) এবং (২) সমস্যাসমাধান (Problem solving) বা প্রতিক্রিয়ার প্রতিস্থাপন (Response substitution)। অনুবর্ত্তনের ক্ষেত্রে একই প্রতিক্রিয়ার উদ্দীপক পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। যেমন লালাক্ষরণ রূপ প্রতিক্রিয়ার প্রথমে উদ্দীপক ছিল 'খাদ্য', পরে অনুবর্ত্তনের ফলে হল 'ঘণ্টাধ্বনি'। সেইজন্য অনুবর্ত্তনকে উদ্দীপকের প্রতিস্থাপন বা উদ্দীপকের বদলে যাওয়া বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

"সমস্যা সমাধান" নামক শিখন বলতে মাওরার প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি এবং অন্তর্দৃষ্টির পদ্ধতি উভয়কেই বুঝিয়েছেন। এ দুধরনের শিখনের ক্ষেত্রেই উদ্দীপক এক থাকে, কিন্তু প্রতিক্রিয়া বদলে যায়। যেমন, বিড়ালটি বা শিম্পাঞ্জী উভয়ের ক্ষেত্রেই 'খাদ্যই' ছিল একমাত্র উদ্দীপক। কিন্তু এই উদ্দীপকের উত্তরে তারা বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করেছিল। সেজন্য এই শ্রেণীর শিখনকে প্রতিক্রিয়ার উপস্থাপন বা প্রতিক্রিয়া বদলে যাওয়া বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ধরনের শিখনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল যে এর মধ্যে একটা সমস্যার উপস্থিতি এবং প্রাণীর সে সম্বন্ধে সচেতনতা থাকে।

মাওরারের মতে অভ্যাস, জ্ঞান, ভাষার বোধ, অঙ্গমূলক কৌশল ইত্যাদি ইচ্ছামূলক কাজগুলি 'সমস্যা-সমাধান'-রূপ শিখনের পর্য্যায়ে পড়ে। এই কাজগুলি সাধারণত আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে সম্পন্ন করে থাকি।

অনুবর্ত্তন-ধর্ম্মী শিখনের পর্য্যায়ে পড়ে সমস্ত প্রক্ষোভমূলক শিখন যেমন ভালবাসা রাগ, ভয়, উদ্বিগ্নতা ইত্যাদি। তাছাড়া আগ্রহ, পছন্দ, অপছন্দ, মনোভাব ইত্যাদিও আহরিত হয় অনুবর্ত্তনের সাহায্যে।

অনুবর্ত্তন-ধর্ম্মী শিখনকে ব্যাখ্যা করতে প্রয়োজন হয় সান্নিধ্যের (Contiguity) সূত্রটির, তেমনই সমস্যা-সমাধান মূলক শিখনকে ব্যাখ্যা করতে ফললাভের সূত্রটি (Law of effect) অপরিহার্য্য।

টাটল্-এর শিখনের শ্রেণীবিভাগ

টাটল (Tuttle) নামে আর একজন মনোবিজ্ঞানীও শিখনকে দু' শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা, (১) জ্ঞানমূলক (Intellectual) শিখন—এতে পড়ে কৌশল শিক্ষা, তথ্য মুখস্থ করা, বিচার করা ইত্যাদি এবং (২) প্রক্ষোভমূলক (Emotionl) শিখন—এতে পড়ে মনোভাব, কাজের প্রেষণা, আগ্রহ, নৈতিকবোধ, সৌন্দর্য্যবোধ, রুচি ইত্যাদি। টাটলের এই বিভাজনটি মাওরারের বিভাজনেরই অনুরূপ।

কার্য্যকরী শিখনের সর্ত্তাবলী

(Conditions of effective learning)

শিখনের সংজ্ঞা এবং স্বরূপ আলোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সমস্ত শিখন প্রচেষ্টাই সব সময় কার্য্যকরী হয় না। শিখনের কার্য্যকারিতা নানা বিভিন্ন সর্ত্তের উপর নির্ভর করে। মনোবিজ্ঞানীরা যে যে সর্ত্তগুলি কার্য্যকরী বা সার্থক শিখনের পক্ষে অপরিহার্য্য বলে মনে করেন তার একটা তালিকা নীচে দেওয়া হল।

১। **প্রস্তুতি ঃ** এর মধ্যে পড়ে যে স্তর বা মানের শিক্ষা শিক্ষার্থী গ্রহণ করছে তার জন্য পর্য্যাপ্ত মানসিক পরিণতি, উপযোগী অন্যান্য ক্ষমতা এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞতা।

২। **প্রেষণা** প্রেসণাই শিখনের প্রচেষ্টাকে জাগায়, তাকে সক্রিয় রাখে, তার গতিপথ নির্দ্দিষ্ট করে দেয় এবং তার তীব্রতার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রেষণা শিখনমাত্রেরই অপরিহার্য্য সর্ত্ত। অবশ্য এর সঙ্গে থাকা চাই শিক্ষার্থীর নিজের সাফল্য বা ফল সম্বন্ধে সচেতনতা। প্রেষণা ও ফল সম্বন্ধে সচেতনতা এই দুই একসঙ্গে মিলে শিখন প্রচেষ্টার প্রকৃতি ও পরিমাণকে নির্দ্ধারিত করে।

৩। **শিক্ষার পরিচালন ঃ** যাতে শিক্ষার্থী তার লক্ষ্যকে চিনতে পারে, তাতে মনোযোগ দিতে পারে এবং তাতে পৌছনর চেষ্টা করতে পারে। তাছাড়া লক্ষ্যে পৌছনর জন্য সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ প্রচেষ্টা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া এবং শিক্ষার্থীর অগ্রগতি অনুযায়ী তার প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করাও শিক্ষক পরিচালনার অন্তর্গত।

৪। **কার্য্যকরী সমাধান-প্রচেষ্টা রচনার সুবিধা ঃ** অতীত অভিজ্ঞতা থেকে সর্ব্বজনীন বা মৌলিক তত্ত্বটি সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে আহরণ করে বর্ত্তমান সমস্যার উপযোগী প্রচেষ্টার উদ্ভাবন করা এ পর্য্যায়ের অন্তর্গত।

৫। **অনুশীলন (Practice) বা বারবার প্রচেষ্টা ঃ** সমস্যার বিশ্লেষণ, বিভেদীকরণ, অধিকতর কার্য্যকরী প্রতিক্রিয়ার উদ্ভাবন ও সমন্বয়নের জন্য লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট সুনিয়ন্ত্রিত প্রচেষ্টা বার বার সম্পন্ন করা।

৬। **ফলের প্রত্যক্ষণ (Perception of effect)ঃ** প্রতিটি প্রচেষ্টার ফল প্রত্যক্ষণ করা এবং পূর্ব্বগামী প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে অনুগামী প্রচেষ্টার ত্রুটি সংশোধন করা।

৭। **শিখন সঞ্চালনের ব্যবস্থাঃ** লব্ধ সিদ্ধান্তগুলিকে সম্প্রসারিত করা এবং সেগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করার মাধ্যমে শিখন সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা।

৮। **শিক্ষাদানের (Training) ব্যবস্থাঃ** সমস্যার অর্থ ও স্বরূপ, শিখনের তত্ত্ব, পদ্ধতির তুলনামূলক উপকারিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখা।

৯। **মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উপযোগী মানসিক অবস্থাঃ** আত্মবিশ্বাস, দুশ্চিন্তা ও উদ্বিগ্নতার অভাব ইত্যাদি। মানসিক ব্যাধি, দুশ্চিন্তা, বিকৃত মনোভাব ইত্যাদি সার্থক শিক্ষার পরিপন্থী।

শিখন-সর্ত্তাবলীর শিক্ষায় গুরুত্ব

বলা বাহুল্য উপরে বর্ণিত সার্থক শিখনের সর্ত্ত কটি যে শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা কেবল শিক্ষা দিয়েই শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। সে শিক্ষা সত্যই শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে কার্য্যকরী হল কিনা তা দেখা একান্ত কর্তব্য। একটা উদাহরণের সাহায্যে শিখনের এই সর্ত্তাবলীর বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের উপকারিতা বোঝান যায়।

ধরা যাক, 'সিন্ধুসভ্যতার বিকাশ' পড়ানো হচ্ছে। এখানে শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি বলতে বোঝাবে মানব সভ্যতার ধারণা এবং সভ্যতার বিভিন্ন উপাদানের অর্থ ও মূল্য হৃদয়ঙ্গম করার উপযোগী মানসিক পরিণতি শিক্ষার্থীর হয়েছে কিনা এবং ঐ বিষয়টি গ্রহণ করার মত মানসিক ও প্রাক্ষোভিক প্রস্তুতি তার আছে কিনা। এই প্রস্তুতি থাকলেই তবে শিখনের কাজ এগোতে পারে। পরের ধাপে দেখতে হবে যে শিক্ষার্থী ঐটি শেখার জন্য যথেষ্ট প্রেষণা বা আগ্রহ অনুভব করছে কিনা। মানুষ হিসাবে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের বিবরণ জানার ইচ্ছা স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা দেবে।

তার পরের সর্ত্তটি হল শিক্ষক-পরিচালন। কি ভাবে, কোন্ পথ এবং কোন্ কোন্ উপাদান সংগঠনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে জানতে পারবে সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে নির্দ্দেশদান একান্ত আবশ্যক। শিক্ষকের পরিচালনার

সাহায্যে শিক্ষার্থী তার সমস্যা সমাধানের উপযোগী প্রচেষ্টা করতে সমর্থ হবে। সিন্ধুসভ্যতার অবস্থিতি, সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন তথ্য, তাদের ব্যবহৃত নানা উপকরণ থেকে শিক্ষার্থী সে যুগের অধিবাসীদের সামাজিক, ধর্মীয় ও কৃষ্টিমূলক দিকগুলির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হবে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীর বার বার প্রচেষ্টার প্রয়োজন। একই জিনিষ বার বার দেখতে হবে, পরীক্ষা করতে হবে, মৌলিক-তত্ত্বগুলির অনুশীলন করতে হবে এবং বারবার প্রচেষ্টার সাহায্যে তাদের প্রাসঙ্গিক ও মৌলিক স্থত্রগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। এই প্রচেষ্টা ও অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার্থী দেখবে যে অনেক নতুন নতুন তথ্যের সঙ্গে সে পরিচিত হচ্ছে এবং অনেক নতুন নতুন জিনিষ সে শিখছে। এর ফলে তার প্রচেষ্টার ফলের সঙ্গে সে পরিচিত হতে পারবে। যত সে নতুন জিনিষ জানবে ও শিখবে ততই তার আরও বেশী করে জানার ও শেখার আগ্রহ হবে। তার লব্ধ সিদ্ধান্তগুলির শিখন-সঞ্চালন তিন প্রকারের হতে পারে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োগ, নতুন শেখা ধারণাগুলি সামান্যস্থত্রে রূপান্তরিত করা এবং বর্ত্তমান শিখনকে পরবর্ত্তী ক্ষেত্রে সঞ্চালিত করা।

শিখনের সার্থকতা সব শেষ নির্ভর করবে শিক্ষার্থীর মানসিক ও প্রাক্ষোভিক স্থস্থতা, আত্মবিশ্বাস এবং স্বাস্থ্যকর মনোভাবের উপর।

মুখস্থকরণের (Memorising) প্রকৃষ্ট পদ্ধতি

মুখস্থ করা (Memorising) শিখন প্রক্রিয়ারই একটি প্রকারভেদ। শব্দ, বাক্য, প্রভৃতি ভাষামূলক বস্তুর শিখনকে মুখস্থ করা বলে। শিক্ষার ক্ষেত্রে মুখস্থ প্রক্রিয়ার বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে এবং কি কি পদ্ধতিতে মুখস্থ করলে অল্পায়াসে ও অল্প সময় মুখস্থ করা যায় সে সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা ব্যাপক পরীক্ষণ চালিয়ে নানা মূল্যবান্ তথ্যের সন্ধান করেছেন।

অবশ্য মুখস্থকরণও একপ্রকারের শিখন। ফলে উপরের সার্থক শিখনের সর্ত্তগুলিও মুখস্থ করণের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। তবে দেখা গেছে যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে মুখস্থ করণে আয়াস ও সময় দুইই কম লাগে। যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করলে কোন শিক্ষণীয় বস্তু মুখস্থ করতে শ্রম ও সময়ের সাশ্রয় হয় সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

সমগ্র পদ্ধতি এবং অংশ পদ্ধতি
(Whole Method & Part Method)

শিক্ষণীয় বস্তুটি মুখস্থ করার সময় প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত বার বার পড়ে মুখস্থ করা যায়। আবার ঐটিকে কয়েকটি ছোট ছোট অংশে ভাগ করে সেগুলিকে আলাদা আলাদা মুখস্থ করে পরে একসঙ্গে জুড়ে সমস্ত বস্তুটি আয়ত্ত করা যায়। প্রথমটিকে বলা হয় সমগ্র পদ্ধতি (Whole Method) এবং দ্বিতীয়টিকে অংশ পদ্ধতি (Part Method)। পরীক্ষণের ফলে দেখা গেছে যে উভয় পদ্ধতিরই কার্য্যকারিতা আছে এবং শিক্ষণীয় বস্তুটির প্রকৃতি ও দৈর্ঘ্যের উপর পদ্ধতির নির্ব্বাচন নির্ভর করে।

সাধারণভাবে বলা চলে যে যখন বিষয়বস্তুটি অর্থপূর্ণ হয় এবং তার অংশগুলির মধ্যে সম্পর্কগত সংহতি থাকে তখন সমগ্র পদ্ধতিই ভাল। গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিখনের মূল বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষণীয় বস্তুটির অন্তর্নিহিত সম্পর্কগুলি উপলব্ধি করা। অতএব যদি বস্তুটি সমগ্রভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা না হয় তাহলে তার পক্ষে সেটা শেখা শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। স্কুল কলেজের আধুনিক শিক্ষণে সমগ্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, তবে সেখানে সমগ্র পদ্ধতিতে সুরু করে অংশ পদ্ধতিতে শেষ করা হয়। অর্থাৎ প্রথমে বিষয়টির একটা সমগ্র রূপ শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরার পর সেটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে বিশদ আলোচনা করা হয়।

কিন্তু যদি শিখনের বিষয়টি অর্থহীন পারস্পরিক সম্পর্কশূন্য ও বিচ্ছিন্ন বস্তু হয় তবে সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগ করা চলে না। তখন সেটিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে আয়ত্ত করা ছাড়া উপায় থাকে না। যেমন, যদি অর্থহীন কতকগুলি শব্দের একটা তালিকা মুখস্থ করতে হয় তবে অংশ পদ্ধতি গ্রহণ করতেই হয়, যেমন টাইপ করতে শেখা, কোন কৌশল আয়ত্ত করা, হাতের লেখা ভাল করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতিই বিশেষ ফলপ্রদ।

দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে সমগ্র পদ্ধতি তখনই অনুসরণ করা যাবে যখন বিষয়বস্তুটির দৈর্ঘ্য মোটামুটি আয়ত্তাধীন হবে। কিন্তু যদি বস্তুটি অত্যন্ত দীর্ঘ হয় তখন কেবলমাত্র সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগে সেটি শেখা একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আবার দীর্ঘ বিষয়ের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অংশ পদ্ধতির উপর নির্ভর না করে

সমগ্র ও অংশ এই উভয় পদ্ধতির সম্মিলিত একটি পদ্ধতির অনুসরণ করার নির্দ্দেশই আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা দিয়ে থাকেন। এই পদ্ধতিটির নাম দেওয়া হয়েছে মধ্যগ পদ্ধতি (Mediating Method)।

মধ্যগ পদ্ধতি (Mediating Method)

বিষয়বস্তু যখন অত্যন্ত দীর্ঘ হয় তখন সমগ্র পদ্ধতি অপ্রযোজ্য। আবার অংশ পদ্ধতিতে অর্থ এবং আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের উপলব্ধি হয় না বলে শিখন হয়ে দাঁড়ায় স্বল্পস্থায়ী, যান্ত্রিক ও শ্রমসাপেক্ষ। সেইজন্য এ দু'এর মাঝামাঝি একটা পদ্ধতি নেওয়া হয়ে থাকে। এই মধ্যগ পদ্ধতিতে প্রথমে সমগ্র পদ্ধতি দিয়ে সুরু করা হয় এবং পরে অংশ পদ্ধতিতে যাওয়া হয়। বিষয়-বস্তুটি অতিদীর্ঘ হলে দেখা গেছে যে সমগ্র পদ্ধতির অনুসরণে বস্তুটির প্রথম এবং শেষের দিকটা ভাল করে শেখা হয় কিন্তু মাঝামাঝি স্থানগুলো অবহেলিত থেকে যায়। সেইজন্য মধ্যগ পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুটির অন্তর্গত যে যে অংশগুলি অধিক দুরূহ বা সম্পূর্ণ নতুন বলে মনে হবে সেগুলিকে আলাদা বেছে নিয়ে বিশেষভাবে তৈরী করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিটি মূলত সমগ্র পদ্ধতিরই একটি প্রকারভেদ, তবে এখানে বস্তুটির বিশেষ বিশেষ অংশের জন্য অংশ পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। দীর্ঘ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বিশেষভাবে কার্য্যকরী।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সমগ্র পদ্ধতি ভাল, ভাষাবর্জ্জিত এবং অর্থহীন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতি প্রযোজ্য এবং অতিদীর্ঘ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে মধ্যগ পদ্ধতি অনুসরণীয়।

আবৃত্তি পদ্ধতি (Recitation Method)

বিষয়বস্তুটি যতক্ষণ না সম্পূর্ণ আয়ত্ত হচ্ছে ততক্ষণ সেটি বার বার পড়ে শেখাকে পঠন পদ্ধতি (Reading Method) বলা হয়। আর কিছুক্ষণ পড়ার পর বই বন্ধ করে আবৃত্তি করে দেখা কেমন তৈরী হয়েছে এবং দরকার পড়লে বই খুলে নিজের ভুলগুলো নিজেই সংশোধন করে নেওয়া এবং এইভাবে সমগ্র বস্তুটি শেখাকে আবৃত্তি পদ্ধতি (Recitation Method) বলা হয়। সাধারণ পঠন-পদ্ধতি অপেক্ষা আবৃত্তি পদ্ধতি নানা কারণে অনেক বেশী কার্য্যকরী। এতে সময়

ও শ্রম দুই-ই কম লাগে। আবৃত্তি পদ্ধতির উৎকর্ষের কারণ হল, (ক) কোথায় কোথায় শিখন দুর্ব্বল হচ্ছে তা জানা যায় এবং সেগুলির উপর বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া যায়। (খ) ভুল শেখাগুলি দৃঢ়বদ্ধ হবার আগেই সংশোধন করা যায়। (গ) নিজের অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাওয়া যায়। ফলে শিখনে উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়ে। (ঘ) আবৃত্তির মাধ্যমে শেখার ফলে বস্তুটির শিখন ও প্রয়োগ দুইই একসঙ্গে হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে প্রয়োগের সময় কোনরূপ অসুবিধা হয় না।

পরীক্ষণের ফলে দেখা গেছে যে অর্থপূর্ণ এবং অর্থহীন উভয় প্রকার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেই আবৃত্তি পদ্ধতি সাধারণ পঠন পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক কার্য্যকরী।

স-বিরতি পদ্ধতি (Distributed or Spaced Method)

শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে শিক্ষণীয় বস্তুটি আয়ত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত একটানা পড়ে মাঝে কোনরূপ বিরতি না দিয়ে শিখতে পারে। একে অবিরাম পদ্ধতি (Undistributed or Massed Method) বলা হয়। আবার কিছুক্ষণ একটানা পড়ে তারপর কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে, আবার কিছুক্ষণ পড়ে, আবার কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে এইভাবে শিখে বস্তুটি আয়ত্ত করা চলতে পারে। এই পদ্ধতিকে স-বিরতি পদ্ধতি (Distributed or Spaced Method) বলা হয়ে থাকে।

বহু পরীক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে স-বিরতি পদ্ধতি অবিরাম পদ্ধতির চেয়ে অনেক ভাল। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক একটি কবিতা একটানা পড়ে অর্থাৎ অবিরাম পদ্ধতিতে মুখস্থ করতে ১ ঘণ্টা লাগলো। এখন যদি ঐ কবিতাটি ১৫ মিনিট পড়ে ৫ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবার ১৫ মিনিট পড়ে ৫ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে, এইভাবে এগোনো যায় তবে দেখা যাবে যে মোট পড়ার সময় ১ ঘণ্টার চেয়ে কম লেগেছে এবং পরিশ্রমও কম হয়েছে।

স-বিরতি পদ্ধতির উৎকর্ষের কারণ হল যে এই পদ্ধতিতে শিখন কার্য্যের মাঝে মাঝে বিরতি থাকার জন্য পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধ* কম হয়, ফলে সংরক্ষণ দ্রুত ও স্থায়ী হয়। কিন্তু অবিরাম পদ্ধতিতে শিখনের মাঝে কোনরূপ ছেদ না থাকার জন্য পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধ ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে এবং দ্রুত সংরক্ষণে বাধার সৃষ্টি করে।

---

* প্রথম খণ্ড পৃঃ ১৪৪

অতি-শিখন (Overlearning)

সংরক্ষণকে স্থায়ী করতে হলে অর্থাৎ শিক্ষণীয় বস্তুটি যদি বহুদিন মনে রাখার দরকার পড়ে তবে অতি-শিখন আবশ্যক। বস্তুটি আয়ত্ত হয়ে যাবার পরও যদি সেটি শিখে যাওয়া যায় তবে অতি-শিখন ঘটে। অতি-শিখন করা বস্তু সহজে ভোলা যায় না এবং বহুদিন পরেও মনে পড়ে।

অন্তর্দৃষ্টিমূলক পদ্ধতি (Insigntful Method)

এই পদ্ধতিটি গেষ্টাল্ট মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষণীয় বস্তুটির অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ এবং তার সামগ্রিক রূপটি যদি উপলব্ধি করা যায় তাহলে শিখন দ্রুত সংঘটিত হয়। এই পদ্ধতিটিকে গেষ্টাল্ট মতবাদ অনুযায়ী অন্তর্দৃষ্টিমূলক পদ্ধতি বলা যায়। আর যদি যান্ত্রিক পন্থায় উদ্দেশ্যবিহীন প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শেখার চেষ্টা করা হয় তবে শিখন আয়াসবহুল ও বিলম্বিত হয়। যেমন, শিম্পাজীটি অন্তর্দৃষ্টিমূলক পন্থায় শেখার চেষ্টা করায় তার শিখন দ্রুত ও স্থায়ী হল। কিন্তু বিড়ালটির শিখন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংঘটিত হওয়ায় তার শিখন বিলম্বিত ও শ্রমসাপেক্ষ হয়েছিল।*

ছন্দ ও সুরের মাধ্যমে শিখন

ছন্দ ও সুরের মাধ্যমে শিখন দ্রুত ও স্থায়ী হয়। এইজন্য গদ্যের চেয়ে কবিতা দ্রুত ও সহজে মুখস্থ হয়। এমন কি অর্থহীন বস্তুও সুর বা ছন্দের মধ্য দিয়ে সহজে ও তাড়াতাড়ি শেখা যায়। যেমন, সুর করে নামতা মুখস্থ করার প্রথা প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত। শিশু-বিদ্যালয়ে কবিতার মধ্য দিয়ে বর্ণ-পরিচয় শেখানর প্রথাও একপ্রকার সর্ব্বজনীন।

স্মৃতি-সহায়ক কৌশলাদি (Mnemonic Devices)

সময় সময় কোন প্রতীক, চিহ্ন, শব্দ বা সংখ্যার সাহায্যে বিশেষ একটি বিষয়বস্তু মনে রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে। এগুলিকে স্মৃতি-সহায়ক কৌশল

* দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ৯ ও ১৯

(Mnemonic Devices) বলা হয়। যখন আমাদের কোন সংখ্যার লম্বা সারি মনে রাখতে হয় তখন আমরা সংখ্যাগুলির মধ্যে নানা রকম কৃত্রিম সম্বন্ধের কল্পনা করে থাকি। সময় সময় শব্দ, অক্ষর সংখ্যা প্রভৃতির মধ্যে অনুষঙ্গ (association) তৈরী করে নিয়ে সেগুলি মনে রাখার চেষ্টা করি। ইতিহাসের তারিখ, বাড়ীর নম্বর এ সকল মনে রাখার জন্যও আমরা প্রায়ই এই রকম কৌশলের সাহায্য নিয়ে থাকি।

এই ধরনের কৌশলগুলি সময় সময় স্মৃতির সহায়ক হলেও প্রায়ই এত জটিল ও কষ্টকল্পিত হয়ে ওঠে যে স্মৃতির সাহায্য করা দূরে থাকুক, এগুলি সহজ ও স্বাভাবিক সংরক্ষণের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশ্নাবলী

1. Enunciate and discuss Thorndike's laws of learning and indicate their application in the classroom.

(B. T. 1951, 59)

Ans. (পৃঃ ১১—পৃঃ ১৭)

2. Describe the processes involved in human learning indicating the relative importance of

(a) Trial and error and (b) Insight. (B. T. 1951, 53, 57)

Ans. (পৃঃ ৭—পৃঃ ২৫)

3. Give some account of Thorndike's discussion of the learning process. Illustrate the effects of his theory on school practice.

(B. T. 1952)

Ans. (পৃঃ ৭—পৃঃ ১৭)

4. Discuss critically Thorndike's laws of learning. Show how they are inadequate to account for the experience of insight enjoyed when the new thing to be learnt falls into place as part of a pattern of meaningful material.

(B. T. 1953)

Ans. (পৃঃ ৭—পৃঃ ২২)

5. Write an essay on "Learning" and discuss critically the importance of the law of effect in acquiring it.

(B. T. 1955)

Ans. (পৃঃ ১—পৃঃ ১৭)

6. Analyse a concrete case of learning and discuss critically the importance of the law of effect in acquiring it.
(B. T. 1955)

Ans. (পৃঃ ৭—পৃঃ ১৭)

7. Determine the favourable conditions that influence the rate and accuracy of learning. (B. T. 1956)

Ans. (পৃঃ ৩৩—পৃঃ ৩৫)

8. Write an essay on the method of human learning.
(B. A. 1954)

Ans. (পৃঃ ৭—পৃঃ ৩২)

9. Distinguish between spaced and massed repetition and discuss their relative importance in memorising.
(B. A. 1957)

Ans. (পৃঃ ৩৮)

10. How do children learn? What is the difference between animal learning and human learning? Which of the various theories of learning would you support?
(B. T. 1961)

Ans. (পৃঃ ৭—পৃঃ ৩২)

11. Write short notes on :—
  (a) Conditioned Response (B.T. 52, 54, 57, 61, B.A. 54)
  (b) Learning by trial-and-error (B.T. 1954)
  (c) Over-learning (B.T. 52, 59)
  (d) Insight (B.T. 55)

12. Discuss Thorndike's major laws of learning and show how they can be utilised in helping pupils to learn school subjects.
(B. A.3-YR. 1963)

Ans. (পৃঃ ১১—পৃঃ ১৫)

3. How do children learn? Critically consider Thorndikes major laws of learning. (B. T. 1963)

Ans. (পৃঃ ৭—১৭)

দুই

শিখনের সঞ্চালন (Transfer of Training)

শিখন সঞ্চালনের তত্ত্বটি বহু প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষার ক্ষেত্রে অতিগুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে এসেছে এবং মধ্যযুগ পর্য্যন্ত সকল দেশেই এই তত্ত্বটি পাঠক্রম নির্দ্ধারণে প্রধানতম শক্তিরূপে বিবেচিত হয়ে এসেছে। কিন্তু শিখন-সঞ্চালন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার আগে আমাদের আরও দু'টী প্রাচীন মতবাদ সম্বন্ধে জানতে হবে। সে দুটি হল—মানসিক শক্তি মতবাদ (Faculty Psychology) এবং মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্ব (Theory of Formal Discipline)। এ দুটি মতবাদই আধুনিক মনোবিজ্ঞানে পরিত্যক্ত হয়েছে।

মানসিক শক্তি মতবাদ (Faculty Psychology)

এই মতবাদ অনুযায়ী আমাদের মন কতকগুলি শক্তির সমষ্টি, যেমন স্মৃতি, বিচার করণ, অনুমান, ইচ্ছা, কল্পন ইত্যাদি। এগুলির প্রত্যেকটি মনের মধ্যে পৃথক ও স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে থাকে। চর্চ্চার দ্বারা এগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী করে তোলা যায় এবং চর্চ্চার অভাবে এগুলি দুর্ব্বল হয়ে পড়ে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে শক্তিবাদ পরিত্যক্ত হবার কারণ হল যে যেগুলিকে এই মতবাদে শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে তার অনেকগুলিই সত্যকারের শক্তি নয়। আর তা ছাড়া মনের ঐ ধরনের পরিষ্কার সুনির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র কোন শক্তি নেই। মনের যে সকল শক্তি আছে সেগুলির অধিকাংশই বিশেষধর্ম্মী। আধুনিক ফ্যাকালটি মনোবিজ্ঞানীরা অনেকটা প্রাচীন শক্তিবাদীদের মতই মনের অনেকগুলো ফ্যাক্টর বা উপাদানের কল্পনা করলেও তাদের ব্যাখ্যার সঙ্গে প্রাচীনপন্থীদের মৌলিক প্রভেদ বর্ত্তমান।

মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্ব (Theory of Formal Discipline)

এই শক্তিবাদ থেকেই জন্মলাভ করেছিল 'মানসিক শৃঙ্খলা' নামক আর একটি তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী স্মৃতি, মনোযোগ, বিচার-করণ, প্রত্যক্ষণ প্রভৃতি মনের শক্তিগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের পাঠের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন, গণিতের চর্চ্চায় বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ে, তর্কবিদ্যা পড়লে বিচার শক্তি বাড়ে, ব্যাকরণ পড়লে স্মৃতিশক্তি বাড়ে, সাহিত্য চর্চ্চা করলে সৌন্দর্য্যবোধ পুষ্ট হয় ইত্যাদি। প্লেটো থেকে সুরু করে উনবিংশ শতকের অনেক শিক্ষাবিদই মনে

করতেন যে বহু পাঠ্য বিষয়ের এই রকম মনের বিশেষ বিশেষ শক্তিকে উন্নত করার ক্ষমতা আছে এবং এই যুক্তিতেই আবহমানকাল ধরে বহু অপ্রয়োজনীয় বিষয় পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার প্রথা প্রচলিত হয়ে এসেছে। কিন্তু শক্তিবাদের অসারতা প্রমাণিত হওয়া থেকেই মানসিক শৃঙ্খলার সূত্রটিও পরিত্যক্ত হয়েছে।*

শিখন সঞ্চালনের তত্ত্ব (Transfer of Training)

মানসিক শৃঙ্খলার সহগামীরূপে শিখন সঞ্চালনের মতবাদটি দেখা দেয়। এই মতবাদের বক্তব্য হল এই যে পূর্ব্ববর্ত্তী শিখন পরিস্থিতি থেকে পরবর্ত্তী শিখন পরিস্থিতিতে শিখন সঞ্চালিত হয়ে থাকে। যেমন, মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্ব অনুযায়ী তর্কবিদ্যার চর্চ্চায় বিচারশক্তি বৃদ্ধি পায়। তর্কবিদ্যার অনুশীলন করে শিক্ষার্থীর বিচারশক্তির যে উন্নতি হয় সেটি পরবর্ত্তী শিখন পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয়, অর্থাৎ পরবর্ত্তী সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর বিচারশক্তির উৎকর্ষ দেখাতে পারবে। মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বটি সরাসরি পরিত্যক্ত হলেও শিখন সঞ্চালনের তত্ত্বটি কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়নি। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য বিশ্বাস করতেন যে শিখন সঞ্চালনটি একটি সর্ব্বজনীন ঘটনা, কিন্তু বর্ত্তমানে ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে জানা গেছে যে শিখন সঞ্চালন সর্ব্বজনীন নয়, অর্থাৎ সব ক্ষেত্রে সব সময়েই শিখনের সঞ্চালন ঘটে না। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সর্ত্তাধীনে এক পরিস্থিতি থেকে অপর পরিস্থিতিতে শিখনের সঞ্চালন ঘটে থাকে।

শিখন সঞ্চালনের উপর গবেষণা

শিখন সঞ্চালন নিয়ে প্রথম পরীক্ষণ চালান প্রসিদ্ধ আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস্। তিনি প্রথমে ভিক্টর হিউগোর 'স্যাটির' থেকে ১৫৮ লাইন মুখস্থ করে নিজের মুখস্থ করার ক্ষমতার একটা মান নির্দ্ধারিত করেন। তারপর তিনি প্রতিদিন ২০ মিনিট করে মিলটনের 'প্যারাডাইস লষ্ট' থেকে শিখে ৩৮ দিন ধরে তার মুখস্থ ক্ষমতার চর্চ্চা করেন। তারপর তিনি আবার 'স্যাটির'এর পরের ১৫৮ লাইন মুখস্থ করে দেখেন যে তাঁর মুখস্থ ক্ষমতার কোন উন্নতি হয়েছে কিনা।

* পৃঃ ১১৯ (প্রথম খণ্ড)

কিন্তু দেখা গেল যে এই পরের ১৫৮ লাইন মুখস্থ করতে তাঁর প্রথম বারের চেয়ে বেশী সময় লেগেছে। জেম্‌স্‌ আরও চারজন ভদ্রলোককে ঐ একই পরীক্ষণ করার নির্দ্দেশ দেন এবং তাঁরাও ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এই থেকে প্রমাণিত হয় যে শিখন সঞ্চালন তত্ত্বটি সম্পূর্ণ ভুল এবং এক ক্ষেত্র থেকে অপর ক্ষেত্রে শিখন সঞ্চালিত হয় না।

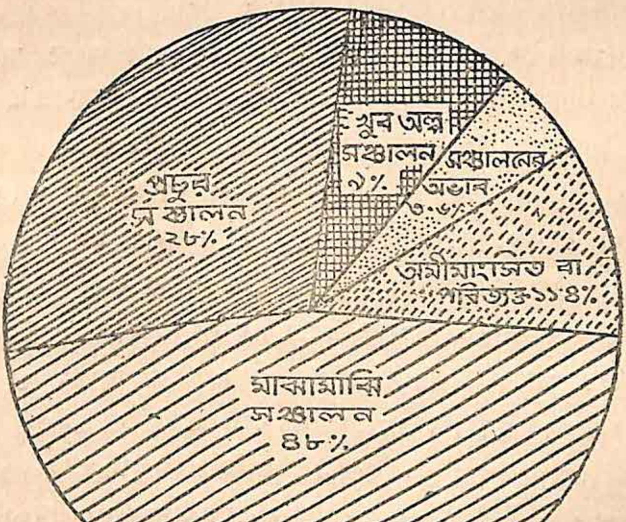
কিন্তু জেমসের পরবর্ত্তী মনোবিজ্ঞানীরা শিখন সঞ্চালনের তত্ত্বটি একেবারে বাতিল করে দেন নি। প্রায় ২০০ র উপর পরীক্ষণ এর উপর সম্পাদিত হয়েছে এবং তা থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির, এমন কি পরস্পরবিরোধী বহু তথ্য আমাদের হস্তগত হয়েছে। এই সকল তথ্য পর্য্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে শিখনের সঞ্চালন প্রকৃতি ও পরিমাণের দিক দিয়ে নানা রকমের হতে পারে। পরিমাণের দিক দিয়ে সঞ্চালন হতে পারে প্রচুর, মাঝামাঝি বা অল্প, প্রকৃতির দিক দিয়ে সঞ্চালন হতে পারে অস্তিমূলক (positive), নাস্তিমূলক (negative) বা অনির্দ্দিষ্ট (indefinite)। শিখন সঞ্চালনের পরীক্ষাগুলি করা হয় এইভাবে। প্রথমে এক ব্যক্তিকে একটি বস্তু শিখতে বলা হয়। ঐটি শেখা হয়ে গেলে তাকে দ্বিতীয় একটি বস্তু শিখতে বলা হয়। যদি দেখা যায় যে প্রথম বস্তুটির শিখন দ্বিতীয় বস্তুটির শিখনকে সাহায্য করে বা সহজ করে তোলে, তবে বুঝতে হবে শিখনের অস্তিমূলক (positive) সঞ্চালন হয়েছে। আর যদি প্রথম বস্তুটির শিখন দ্বিতীয় বস্তুর শেখায় বাধার সৃষ্টি করে তবে বুঝতে হবে নাস্তিমূলক (negative) সঞ্চালন হয়েছে। আর যদি তা সাহায্য বা বাধা দুয়েরএকটাও সৃষ্টি না করে তবে বলতে হবে অনির্দ্দিষ্ট (indefinite) সঞ্চালন ঘটেছে বা সঞ্চালন ঘটেনি।

১৮৯০ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত শিখন-সঞ্চালনের উপর যে পরীক্ষণগুলি চালান হয় সেগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী ওরাটা (Orata) তৈরী করেন (৪৫ পৃঃ চিত্র দ্রষ্টব্য)। তা থেকে জানা যায় যে এই পরীক্ষণগুলির মধ্যে প্রচুর সঞ্চালন হয়েছে শতকরা ২৮টি ক্ষেত্রে, মাঝামাঝি সঞ্চালন হয়েছে শতকরা ৪৮টি ক্ষেত্রে, খুব অল্প সঞ্চালন হয়েছে শতকরা ৯টি ক্ষেত্রে, নাস্তিবাচক সঞ্চালন বা সঞ্চালনের অভাব ঘটেছে শতকরা ৩·৬টি ক্ষেত্রে এবং বাকী শতকরা ১১·৪টি ক্ষেত্র সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা সম্ভব হয়নি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে পরীক্ষণের

ফলাফল থেকে বিচার করলে অস্তিবাচক শিখন সঞ্চালন যে হয় সেটা স্বীকার করতেই হবে, যদিও প্রকৃতি ও পরিমাণের দিক দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঞ্চালনের মধ্যে প্রচুর বৈষম্য থাকতে পারে।

স্কুলপাঠ্যবিষয়ে সঞ্চালন

স্কুল-পাঠ্য বিষয়গুলিতে কি পরিমাণ সঞ্চালন হয় এ নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। স্কুলের পাঠক্রমে অনেক বিষয়বস্তু পূর্ব্বে অন্তর্ভুক্ত করা হত যেগুলির স্বপক্ষে বড় যুক্তি ছিল যে সেগুলি শিখন সঞ্চালনের মাধ্যমরূপে কাজ করার ক্ষমতা রাখে। স্কুল-পাঠ্য বিষয়গুলির উপর গবেষণা থেকে লব্ধ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নীচে দেওয়া হল।



ওরাটা কর্ত্তৃক প্রদত্ত শিখন-সঞ্চালনের পরীক্ষণগুলির চিত্র-বিবরণী (পৃঃ ৪৪)

পূর্ব্বে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ব্যাকরণ পাঠের একটা বিরাট মূল্য দেওয়া হত এবং দাবী করা হত যে মানসিক শৃঙ্খলাদানে ব্যাকরণের প্রচুর ক্ষমতা আছে।

ব্রিগসের (Briggs) শিখন সঞ্চালনের উপর পরীক্ষণ থেকে দেখা যায় যে একমাত্র সাদৃশ্য ও বৈষম্য ধরতে পারার ক্ষমতা ছাড়া আর কোন গুণই ব্যাকরণ পাঠ থেকে সঞ্চালিত হয় না।

গণিতের শিক্ষা থেকে গাণিতিক বিচারকরণের ক্ষমতা সঞ্চালিত হয় এই ছিল এতদিনের প্রচলিত ধারণা। উইঞ্চের (Winch) পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে গাণিতিক বিচার করণের ক্ষমতা কেবল গণিত-শিক্ষার উপর নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সঞ্চালন অনির্দ্দিষ্ট প্রকৃতির।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে মানসিক শক্তির বৃদ্ধির উপর স্কুল-বিষয় অধ্যয়নের কোনরূপ প্রভাব আছে কিনা এ নিয়েও প্রচুর পরীক্ষণ হয়েছে। দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তির বৃদ্ধিতে স্কুল-পাঠ্য বিষয়গুলির বিশেষ কোন প্রভাব নেই, সত্যকারের যার প্রভাব আছে সেটি হল বুদ্ধি।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতির ক্ষেত্রে অবশ্য অস্তিবাচক সঞ্চালনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে এই সঞ্চালন কেবলমাত্র ঐ বিশেষ বিষয়টির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে, অন্য ক্ষেত্রে সঞ্চালিত হয় না। থর্নডাইক (Thorndike) স্কুলে ল্যাটিন শিক্ষার কোনরূপ সঞ্চালন-মূল্য আছে কিনা তার উপর ব্যাপক পরীক্ষণ চালান। তাঁর পরীক্ষার ফল থেকে দেখা গেছে যে শিখন সঞ্চালনের দিক দিয়ে ল্যাটিন শিক্ষার যথার্থই দাম আছে। যে সব শিক্ষার্থী ল্যাটিন শিখেছে তারা, যে সব শিক্ষার্থী ল্যাটিন শেখেনি তাদের চেয়ে অনেক বিষয়ে উন্নত হয়, যেমন তারা ল্যাটিন ভাষা-প্রসূত ইংরাজী শব্দগুলি তাড়াতাড়ি শেখে, পঠনেও বেশী পারদর্শিতা দেখায়, ইংরাজী বানানও ভাল পারে ইত্যাদি। তবে এই সঞ্চালন প্রথম দু' এক বৎসর থাকে। পরে দেখা যায় যে ল্যাটিন-শেখা ও ল্যাটিন-না-শেখা উভয় প্রকার শিক্ষার্থীই প্রায় সব বিষয়েই সমান পারদর্শিতা দেখায়। এ পরীক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতিতে বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি সংস্কৃতি ভিত্তিক ভাষাগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত শিক্ষারও উল্লেখযোগ্য সঞ্চালন মূল্য থাকবে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে শিখন সঞ্চালন সত্যই ঘটে থাকে। তবে এ থেকে এ সিদ্ধান্ত যেন না করা হয় যে মানসিক শৃঙ্খলার সূত্রটিও তাহলে সত্য। কেননা শিখন-সঞ্চালন বাস্তবিক ঘটলেও দেখা

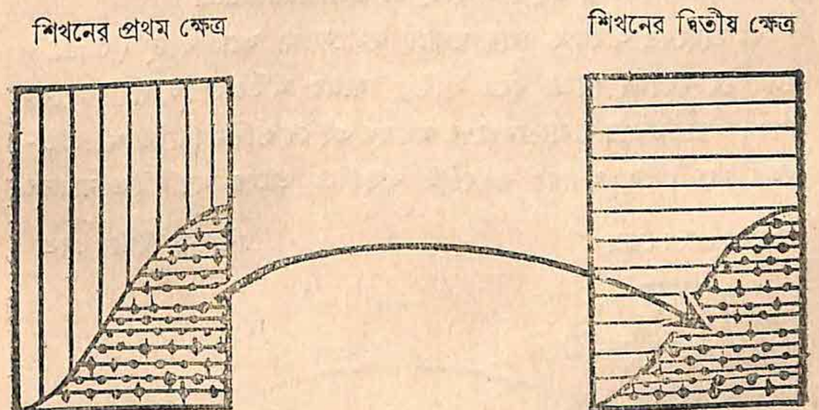
গেছে যে সঞ্চালনের পরিমাণ প্রায় ০% থেকে সুরু করে ৯২·৯% পর্য্যন্ত হতে পারে। আবার কখনও নাস্তিমূলক সঞ্চালনও হয়ে থাকে। অতএব মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বটিকে একটি সর্ব্বজনীন ঘটনারূপে গ্রহণ করা যায় না, যদিও শিখন সঞ্চালনকে বাস্তব ঘটনারূপে গ্রহণ করতে কোন বাধা নেই।

সঞ্চালনের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতবাদ

শিখন-সঞ্চালন কেন ঘটে এ নিয়ে প্রচুর পরীক্ষণ চালান হয়েছে এবং সঞ্চালনের ব্যাখ্যারূপে আমরা একাধিক মতবাদের সন্ধান পাই সেগুলি হল—

১। অভিন্ন উপাদানের তত্ত্ব (Theory of Identical Element)

এই তত্ত্বটি থর্নডাইকের দেওয়া। তাঁর মতে একটি মানসিক প্রক্রিয়া আর একটি মানসিক প্রক্রিয়াকে ততটুকু প্রভাবিত করতে পারে যতটুকু অভিন্ন উপাদান এ দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকে। অর্থাৎ পূর্ব্বগামী শিখন পরিস্থিতি এবং অনুগামী শিখন পরিস্থিতি এ দুয়ের মধ্যে যে যে ব্যাপার বা অংশ অভিন্ন সেই সেই ব্যাপার বা অংশটুকুই পূর্ব্বগামী পরিস্থিতি থেকে অনুগামী পরিস্থিতিতে



থর্নডাইকের "অভিন্ন উপাদানের তত্ত্বের" চিত্ররূপ : কেবলমাত্র অভিন্ন অংশটুকুরই সঞ্চালন হয়েছে।

সঞ্চালন ঘটাবে। তিনি এই সঞ্চালনের একটা শরীরতত্ত্বমূলক ব্যাখা দেন। তার মতে একই ও অভিন্ন স্নায়ুঘটিত সংযোজন দুটি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই সংঘটিত

হওয়ার ফলে সঞ্চালন ঘটে থাকে। থর্নডাইকের এই অভিন্ন উপাদান তত্ত্বের অনেক সমর্থক আবার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, মনোভাব, এমন কি উদ্দেশ্যের অভিন্নতাকেও সঞ্চালনের কারণ বলে বর্ণনা করেছেন।

অভিজ্ঞ উপাদানের সঞ্চালনের একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মনে করা যাক একটি ছেলে নীচের গুণ অঙ্কটি প্রথমে করল।

৩৪৮৯৩৭৭৫৪ × ৪২৬৯৭

তারপর তাকে নীচের অঙ্কটি করতে দেওয়া হল

৭৬০৯৩৭৩১৪ × ৯০৬৯৫

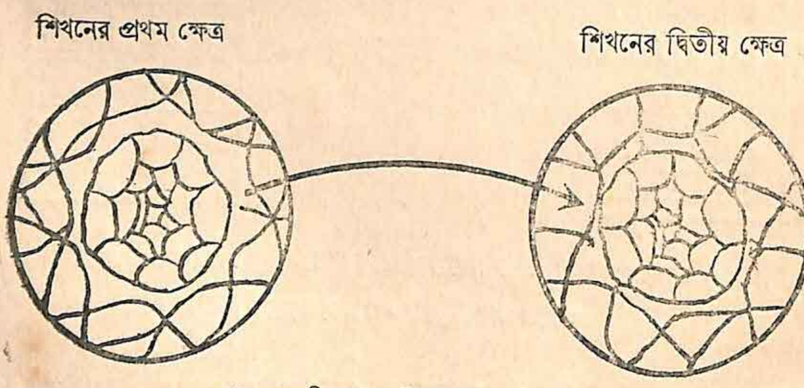
এখন এই দুটি অঙ্কের পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে এ দুই অঙ্কেই নীচের অংশটি অভিন্ন আছে। যথা—

৯৩৭ × ৬৯

ফলে প্রথম অঙ্কটি করার পর দ্বিতীয় অঙ্কটি করার সময় তার ঐ অংশটির ক্ষেত্রে সঞ্চালন হবে। অর্থাৎ দ্বিতীয়বারে ঐ অংশটি করার সময় তা তার পূর্ব্বের শিখন সাহায্য করবে।

২। সামান্যীকরণের তত্ত্ব (Theory of Generalisation)

থর্নডাইকের অভিন্ন উপাদান তত্ত্বটির সমালোচনা করে জাড্ (Judd) বলেন যে সঞ্চালন নির্ভর করে ব্যক্তির নিজের অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের উপর। অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের অর্থ হল এই যে ব্যক্তির বিভিন্ন অভিজ্ঞতা-গুলির মধ্য থেকে অবান্তর লক্ষণগুলি বাদ দিয়ে তাদের অন্তর্নিহিত সাধারণ



জাডের "সামান্যীতত্ত্বের চিত্ররূপ : মূলগত সামান্য সূত্রগুলির সঞ্চালন হয়েছে।

বৈশিষ্ট্যগুলি পৃথক করে নিয়ে তাদের সম্বন্ধে একটা সামান্য ধারণা তৈরী করা তাঁর মতে যে যত তার অভিজ্ঞতা থেকে এইরকম সামান্য ধারণা বা সূত্র তৈরী করতে পারে তার ক্ষেত্রে তত বেশী সঞ্চালন হয়ে থাকে।

জাড তাঁর এই মতবাদের সমর্থনে একটি পরীক্ষণের উল্লেখ করেন। এই পরীক্ষণে দু'দল ছেলেকে (একটি নিয়ন্ত্রিত দল, আর একটি পরীক্ষণমূলক দল*) জলের ১২ ইঞ্চি নীচে রাখা একটা লক্ষ্যের প্রতি বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে বলা হল। জলের নীচে কোন বস্তু রাখলে আলোর প্রতিসরণের (refraction) জন্য বস্তুটি ঠিক যে জায়গায় অবস্থিত সেখানে দেখা যায় না। এই প্রতিসরণের রহস্যটুকু জানা না থাকার জন্য ঐ দু'দল ছেলেই ঐ লক্ষ্যভেদে একই প্রকারের ভুল করল। এর পর পরীক্ষণমূলক দলটিকে আলাদা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রতিসরণের রহস্যটি তাদের কাছে বর্ণনা করা হল। নিয়ন্ত্রিত দলটিকে এ সম্বন্ধে কিছুই বলা হল না। তারপর এই দু'দলকেই আবার ঐ ভাবে জলের ৪ ইঞ্চি তলায় রাখা একটি লক্ষ্য ঐ ভাবে ভেদ করতে বলা হল। দেখা গেল যে পরীক্ষণমূলক দলটি, অর্থাৎ যারা প্রতিসরণের রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছে, তারা প্রথম বার অপেক্ষা লক্ষ্যভেদে অনেক কম ভুল করল, অথচ নিয়ন্ত্রিত দলটি অর্থাৎ যারা প্রতিসরণ সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তারা আগের বারের মতই ভুল করল। এর অর্থ হল প্রথম দলটির ক্ষেত্রে প্রচুর সঞ্চালন হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় দলটির ক্ষেত্রে কোনরূপ সঞ্চালনই হয়নি। জাডের মতে এই প্রথম দলটির সাফল্যের মূল কারণ হল যে প্রতিসরণের মূলনীতিটা জানা থাকার জন্য তারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে প্রতিসরণ সম্বন্ধে একটা সামান্য ধারণা তৈরী করতে পেরেছিল,কিন্তু ঐ দ্বিতীয় দলটি তা তৈরী করার কোন সুযোগ পায়নি। এই পরীক্ষায় থর্নডাইকের অভিন্ন উপাদানের তত্ত্বটিও অসার বলে প্রমাণিত হচ্ছে। কেননা এখানে দু'দল ছেলের ক্ষেত্রেই প্রথমবার লক্ষ্যভেদ ও দ্বিতীয়বার লক্ষ্যভেদ এই দুই পরিস্থিতির মধ্যে উপাদানের প্রচুর অভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও প্রথম দলটির ক্ষেত্রে কোনরূপ সঞ্চালন হয়নি, অথচ দ্বিতীয় দলটির ক্ষেত্রে প্রচুর সঞ্চালন হয়েছে। অতএব দ্বিতীয় দলটির ক্ষেত্রে সঞ্চালনের কারণ উপাদানের অভিন্নতা নয়, ছেলেদের অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণই বাস্তবিক কারণ।

---

* পৃঃ ৩০ (১ম খণ্ড)

৩। গেষ্টাল্ট মতবাদ (Gestalt Theory)

গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা তাঁদের সমগ্রতা তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে শিখন সঞ্চালনের একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এই মতবাদ ❋ অনুযায়ী আমাদের অভিজ্ঞতার কোন বিষয়বস্তু তার অংশগুলির নিছক সমষ্টির উপরেও আরও কিছু এবং তার বিচ্ছিন্ন অংশগুলির মধ্যে খুঁজলে তাকে পাওয়া যাবে না। কোন কিছু শেখা মানে হল অন্তর্দৃষ্টির (insight) সাহায্যে তার এই সমগ্র রূপটিকে উপলব্ধি করা এবং এইভাবে শেখাই স্থায়ী সত্যকারের শিখন এবং এই শিখনেরই বস্তুরই স্বাভাবিক এবং স্থায়ী সঞ্চালন ঘটে থাকে। শিম্পাঞ্জীর শিখনের পরীক্ষণে দেখা গিয়েছিল যে ছুটি বাঁশ একসঙ্গে জুড়ে কলার ছড়ার নাগাল পাওয়া রূপ কৌশলটি সে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শিখেছিল এবং সেইজন্য এই শিখনটি একবার আয়ত্ত হবার পর তা স্থায়ী ভাবে তার মধ্যে সঞ্চালিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে যখনই তাকে ঐরূপ শিখন পরিস্থিতিতে ফেলা হয়েছিল তখনই ঐ কৌশলটি অবলম্বন করতে তার একটু দেরী বা দ্বিধা হয়নি। গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের এই ব্যাখ্যাটি বলতে গেলে থর্নডাইকের অভিন্ন উপাদানের ঠিক বিপরীত। থর্নডাইকের মতে সঞ্চালন ঘটাতে গেলে বিষয়বস্তুটির অভ্যন্তরস্থ অংশগুলির সঙ্গে পূর্ব্বে শেখা বিষয়ের অংশগুলির অভিন্নতা খুঁজে বার করতে হবে। আর গেষ্টাল্টবাদীদের মতে সঞ্চালন ঘটাতে গেলে বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে তার সমগ্র রূপটির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। এমন কি তাঁদের মতে সমগ্রকে উপলব্ধি করতে হলে অংশ থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিতে হবে, কেননা অংশের প্রতি মনোযোগ সমগ্র উপলব্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু জাডের সামান্যীকরণ মতবাদের সঙ্গে এই মতবাদটির প্রচুর মৌলিক পার্থক্য আছে।

বিভিন্ন তত্ত্বের সমালোচনা

থর্নডাইকের অভিন্ন উপাদানের মতবাদটী তাঁর শিখনের সাধারণ সূত্রের ভিত্তিতেই গড়া। তাঁর সংব্যাখ্যানে শিখন হল স্নায়ুমণ্ডলীতে নতুন সংযোজন সৃষ্টি করা, আর তখনই সঞ্চালন হয় যখন একই স্নায়ু-সংযোজন ছুটি বিভিন্ন শিখন

❋ পৃঃ ১৮

পরিস্থিতিতে সংঘটিত হয়। অর্থাৎ ল্যাটিন শেখার পর যদি ইংরাজী শব্দ শিখতে সুবিধা হয় তবে বুঝতে হবে যে ল্যাটিন শেখার সময় মস্তিষ্কে যে ধরনের স্নায়ু-সংযোজন হয়েছিল ঠিক সেই ধরনের স্নায়ু-সংযোজনই ইংরাজী শেখার সময় পুনরাবৃত্ত হল। অতএব থর্নডাইকের মতে শিখনের সঞ্চালন একই অভিজ্ঞতার বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

থর্নডাইকের তত্ত্বের বিরুদ্ধে বলা চলে যে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে স্নায়ু-সংযোজনের সাহায্যে শিখনের ব্যাখ্যা পর্য্যাপ্ত নয়, অতএব সঞ্চালনের ব্যাখ্যাও একই কারণে অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, জাডের পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে অভিন্ন উপাদানের তত্ত্বটিই সব সময়ই সঞ্চালনের কারণ নয় কেননা তাঁর পরীক্ষণে উপাদান অভিন্ন থাকা সত্ত্বেও সঞ্চালন ঘটে নি। তৃতীয়ত, পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রে উপাদানের অভিন্নতা সঞ্চালনের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।

তবে একথা স্বীকার্য্য যে কোন কোন শিখনের ক্ষেত্রে অভিন্ন উপাদানের জন্ম সঞ্চালন হয়ে থাকে। বিশেষ করে অভ্যাস গঠন, দৈহিক প্রক্রিয়া, ভাষা-শিক্ষা, শিশুর প্রাথমিক অভিজ্ঞতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অভিন্ন উপাদানই সঞ্চালন ঘটানোর কারণ হয়ে থাকে কিন্তু অমূর্ত্ত বা ধারণামূলক শিখনের ক্ষেত্রে উপাদানের অভিন্নতার জন্য সঞ্চালন হয় না। সেখানে জাডের সামান্যীকরণ বা গেষ্টাল্ট-বাদীদের সমগ্রতা মতবাদের দ্বারা সঞ্চালনের ব্যাখ্যা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

জাডের অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের তত্ত্ব অনুযায়ী সঞ্চালনের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর কোন মূল্য নেই, সমস্ত নির্ভর করছে শিখনের পদ্ধতির উপর। বুদ্ধির যথাযথ প্রয়োগ, বিজ্ঞানসম্মত পন্থার অনুসরণ, অভিজ্ঞতা থেকে অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক অংশগুলি বাদ দিয়ে সাধারণ ও প্রাসঙ্গিক অংশ-গুলিকে পৃথকীকরণ ইত্যাদি পদ্ধতির উপর নির্ভর করছে অভীষ্ট সঞ্চালনের সংগঠন। এই পদ্ধতিগুলির সুষ্ঠু সম্পাদন আবার মনোযোগ, পর্য্যবেক্ষণ, বিচারকরণ প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উন্নত সম্পাদনের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। অতএব দেখা যাচ্ছে যে সুষ্ঠু সঞ্চালন ঘটাতে গেলে বিজ্ঞানসম্মত শিখন পদ্ধতি অনুসরণ এবং বুদ্ধির প্রয়োগ, পর্য্যবেক্ষণ, চিন্তন, বিচারকরণ প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উৎকর্ষসাধন বিশেষ প্রয়োজন।

গেষ্টাল্ট মতবাদটিও জাডের মতবাদের সমধর্মী। তবে জাডের তত্ত্বে কেবল-

মাত্র পদ্ধতির উপরই জোর দেওয়া হয়েছে, বিষয়বস্তুর গঠন বা প্রকৃতির উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু গেষ্টাল্টবাদে বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি দুইয়ের উপর সমান জোর দেওয়া হয়েছে। বিষয়বস্তুটির সামগ্রিক উপলব্ধি সঞ্চালনের পক্ষে অপরিহার্য্য, অতএব সুষ্ঠু শিখনের প্রথম শর্ত হল সমগ্র সমস্যাটির উপস্থাপন। বিষয়বস্তুটিকে যদি আংশিক উপস্থাপিত করা যায় তবে শিখন সন্তোষজনক হবে না, সঞ্চালনও নয়। দ্বিতীয়ত শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা হবে সমগ্রমুখী, অংশগত নয়। বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের উপলব্ধি এবং একটি অবিচ্ছিন্ন সামগ্রিক সত্তার জ্ঞানই হল অন্তর্দৃষ্টি জাগরণের একমাত্র উপায়। অতএব সম্বন্ধমূলক চিন্তন ও বিষয়বস্তুটির সামগ্রিক সত্তার উপলব্ধি এই দুটিই হল সঞ্চালন ঘটানোর প্রধানতম পন্থা।

শিখন-সঞ্চালন ও শিক্ষক

মার্সেল এক জায়গায় বলেছেন যে আমরা শিখন সঞ্চালনকে কিভাবে নিই তার উপরে নির্ভর করছে আমাদের শিক্ষার প্রতি মনোভাব। কথাটি খুবই সত্য। যদি শিক্ষক মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বে বিশ্বাসী হন তবে তিনি ধরে নেবেন যে মনের বিভিন্ন শক্তিগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠের দ্বারা উন্নত করা যায় এবং সকল ক্ষেত্রেই সঞ্চালন স্বাভাবিক ভাবে হয়ে থাকে। তাঁর কাছে শিখন পদ্ধতির ভাল মন্দের কোন দাম নেই, কেননা মনের উৎকর্ষ নির্ভর করছে বিশেষ বিশেষ বিষয় শিক্ষার উপর এবং তিনি একমাত্র মানসিক উৎকর্ষসাধনের যুক্তিতেই কতকগুলি বিষয়কে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে মত দেবেন।

কিন্তু যদি মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বটির উপর শিক্ষকের বিশ্বাস না থাকে, তাহলে তিনি যেমন শিক্ষণ-পদ্ধতিকে যতটা সম্ভব কার্য্যকরী করে তোলার চেষ্টা করবেন তেমনই আবার চেষ্টা করবেন শিক্ষণীয় বিষয়গুলি থেকে শিক্ষার্থীরা যাতে সর্ব্বাধিক উপকার লাভ করে তার জন্য। অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিষয়ের কি কি ক্ষেত্রে কি ধরনের সঞ্চালন হয় সে সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে শিক্ষার্থীর সর্ব্বাঙ্গীন উপকারে যথাযথভাবে নিয়োগ করাটাই তাঁর কাজ হয়ে দাঁড়াবে।

মনোবিজ্ঞানের গবেষণার উপর নির্ভর করলে আধুনিক শিক্ষকের মানসিক

শৃঙ্খলার তত্ত্বটি গ্রহণ না করাই উচিত। যদিও শিখন-সঞ্চালনের বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে কোন কোন পাঠ্যবিষয়ের মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উৎকর্ষ সাধন করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু এই উৎকর্ষ সাধনের ক্ষমতা এতই অনির্দ্দিষ্ট, বিশেষধর্ম্মী এবং সংকীর্ণ যে মানসিক শৃঙ্খলার ক্ষমতাকে একটা সাধারণ সূত্র বলে ধরা খুবই ভুল হবে।

তবে শিখন-সঞ্চালনকে একটি বাস্তব প্রক্রিয়া এবং শিক্ষাপদ্ধতির সহায়ক উপকরণরূপে গ্রহণ করা খুবই চলতে পারে। সুবিবেচনার সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করলে শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষক পাঠ্যবিষয়টির সর্ব্বাধিক সঞ্চালন ঘটাতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষক কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করবেন তার কিছু নির্দ্দেশ নীচে দেওয়া হল।

প্রথম, কোন্ কোন্ বিষয় থেকে কি ধরনের সঞ্চালন হয় সে সম্বন্ধে শিক্ষকের নির্দ্দিষ্ট ও নিখুঁত জ্ঞান থাকা দরকার। প্রাচীনকাল থেকেই সঞ্চালন সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রমাত্মক ধারণা থেকে গেছে। আধুনিক শিক্ষকের সঞ্চালনের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষণ-ভিত্তিক হবে। এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্র-পরিচালিত ব্যাপক গবেষণা এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে শিক্ষকদের অবহিত করার ব্যবস্থা।

দ্বিতীয়, পাঠ্যবিষয়টির সংগঠন সুপরিকল্পিত হওয়া চাই। সঞ্চালন ঘটাতে গেলে পাঠ্যবিষয়টির মধ্যে অন্তর্নিহিত সুসংহত ও অঙ্গগত ঐক্য থাকবে যার ফলে শিক্ষার্থীর পক্ষে ঐ বিষয়টির মূলগত ধারণা বা তত্ত্বগুলি অনুধাবন করতে কষ্ট হবে না। গেষ্টাল্টবাদীদের ভাষায় পাঠ্যবিষয়টির সম্পূর্ণ রূপটা শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরতে হবে।

তৃতীয়, শিক্ষার্থীরা যাতে পাঠ্যবিষয়ের বাহ্যিক, অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক অংশগুলিকে বাদ দিতে শেখে এবং তাদের মধ্যে নিহিত প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে খুঁজে বার করতে পারে, শিক্ষকের তা দেখা দরকার। বস্তুত সঞ্চালন নির্ভর করছে পাঠ্যবিষয়টির মূলগত অতিপ্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি আবিষ্কার করার উপর। এরই নাম দেওয়া হয়েছে সামান্যীকরণ। অবশ্য কেবলমাত্র মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিই জানলে হবে না, সেগুলির মধ্যে কি সম্বন্ধ তা জানাও সার্থক সঞ্চালনের পক্ষে অপরিহার্য্য। এজন্য গেষ্টাল্টবাদীরা সম্বন্ধমূলক চিন্তনকেই শিখন সঞ্চালনের একমাত্র মাধ্যম বলে বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ, বিষয়টির এই মূলগত তত্ত্বগুলি অনুধাবন করার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক প্রক্রিয়াগুলির অভ্যাস দরকার। যেমন, মনোযোগ দেবার অভ্যাস, পর্য্যবেক্ষণ করা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ, সাদৃশ্য ও পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা অর্জ্জন, বিচার-করণের নিয়মাবলী জানা, প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক চিনতে পারা ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি যাতে শিক্ষার্থী ঠিকমত সম্পন্ন করতে পারে শিক্ষকের তা দেখা এবং এগুলি সম্বন্ধে উপযুক্ত সুপরিচালনা দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রশ্নাবলী

1. Write an essay on—Transfer of Training. (BT. 1952, 59)
   Ans. (পৃঃ ৪৫—পৃঃ ৫৪)
2. Discuss the latest experimental findings on the Transfer of Training. What are their educational implications.? (B. T. 1953)
   Ans. (পৃঃ ৪৫—পৃঃ ৫৪)
3. What do you understand by Transfer of Training? Indicate the steps you would take to secure the maximum transfer from school subjects to life situations. (B.T. 1954, 1957)
   Ans. (পৃঃ ৪৫—পৃঃ ৫৪)
4. Discuss, citing experimental evidences, the problems of Transfer of Training. (B.A. Hons. 1959)
   Ans. (পৃঃ ৪৫—পৃঃ ৫৪)

ব্যক্তি ও বংশধারা

ব্যক্তির আচরণের স্থরু তার জন্মের প্রথম মুহূর্ত্ত থেকেই। জন্ম বলতে যেদিন শিশু প্রথম ভূমিষ্ঠ হয় সেদিনকেই সাধারণত বোঝায়, কিন্তু সত্যকারের জন্ম হয় তার অনেক আগে, প্রায় ৯ মাস আগে, যেদিন প্রথম মাতৃগর্ভে প্রাণের সূচনা হয় পিতৃবীজ ও মাতৃকোষের মিলনে। সেই দিনই সত্যকারের যাত্রা স্থরু হয় এই পৃথিবীর একটি নতুন মানুষের।

কোষ-বিভাজন (Cell-Division)

পিতৃবীজ মাতৃকোষের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে এই দুটি কোষ মিলে একটি কোষে পরিণত হয়। এই একটি কোষ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুটি কোষে পরিণত হয়। এই দুটি কোষের প্রত্যেকটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে ৪টি কোষে, ৪টি কোষ আবার ৮টি কোষে, ৮টি কোষ আবার ১৬টি কোষে —এইভাবে কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়ার সাহায্যে শীঘ্রই একটির স্থানে অসংখ্য কোষের সৃষ্টি হয়। এই সময় কোষসমষ্টি ধীরে ধীরে একটি নল বেয়ে মাতৃজরায়ুতে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই কোষবৃদ্ধি চলতে থাকে। প্রথম প্রথম এই কোষগুলির মধ্যে বাহিক কোনও পার্থক্য থাকে না, কিন্তু প্রায় দু'সপ্তাহের পর থেকে কোষগুলি ক্রমশ বিভিন্ন কার্য্যের জন্য বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে উঠতে থাকে এবং প্রায় ৩ মাসের পর থেকে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকৃতি ধারণ করতে থাকে। প্রায় পুরোপুরি ৯ মাস এভাবে কোষ বিভাজনের ফলে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু পৃথিবীর আলো দেখতে পায়।

প্রাণীসৃষ্টির সমস্ত রহস্য নিহিত এই কোষ নামক অদ্ভুত বস্তুটির ভিতর। প্রাণের মৌলিক উপাদান এবং ক্রমবিকাশের প্রয়াস, দেহমনোগত বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য, এ সবই বীজাকারে লুকিয়ে থাকে এই কোষের ভিতর। অতএব শিশু ভূমিষ্ঠ হবার অনেক আগেই তার ভাগ্যের অনেকখানি নির্দ্ধারিত হয়ে যায় পিতৃকোষ এবং মাতৃকোষের মিলনে। কেমন করে সেটি হয় তা একটু জানা দরকার।

কোষ (Cell) ও ক্রোমোজোম Chromosome)

প্রত্যেকটি কোষের আকৃতি অনেকটা গোলাকার। তার চারধারে পাতলা চামড়ার মত একটা দেওয়াল থাকে। কোষের মধ্যে থাকে কোষকেন্দ্র। কেন্দ্রের

চারপাশে থাকে এক ধরনের হালকা জলীয় পদার্থ। কোষের কেন্দ্রটি হল কোষের প্রাণস্বরূপ। পিতৃবীজ এবং মাতৃকোষ এই দুইটিই এক একটি এই ধরনের কোষ। পিতৃকোষের আকার অনেকটা কীটের মত। এই উভয়কোষের কেন্দ্রে সূতোর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ থাকে। এগুলির নাম ক্রোমোজোম বা কোষতন্তু। বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত প্রাণীর মাতৃপিতৃকোষের কোষতন্তুর সংখ্যা বিভিন্ন। মানুষের ক্ষেত্রে এই কোষতন্তুর সংখ্যা হল ২৩টি।* যখন মাতৃপিতৃকোষের মিলন ঘটে তখন নতুন যে সম্মিলিত কোষটি তৈরী হয় তার কোষতন্তুর সংখ্যা হয় ২৩ জোড়া বা মোট ৪৬টি। প্রত্যেক জোড়া ক্রোমোজোমের একটি আসে পিতার কোষ থেকে আর একটি আসে মাতার কোষ থেকে। যখন এই আদিম কোষটি দ্বিধাবিভক্ত হয় তখন নতুন কোষ দুটির প্রত্যেকটির মধ্যে থাকে ২৩টি এইরকম ক্রোমোজোম। এই নতুন কোষ দুটি আবার যখন বিভক্ত হয়ে ৪টি কোষে পরিণত হয়, তখন সেই নতুন কোষগুলির মধ্যেও থাকে ২৩ জোড়া করে ৪৬টি এই রকম ক্রোমোজোম। এইভাবে পরে যতগুলি কোষ দিয়ে মানবদেহ সৃষ্টি হয় তার প্রত্যেকটিতে থাকে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম বা কোষতন্তু। যদি মানবদেহের প্রত্যেকটির কোষে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে তবে পিতৃবীজে বা মাতৃকোষে কেমন করে কেবল ২৩টি করে ক্রোমোজোম থাকলো—এ প্রশ্নের উত্তর হল এই যে পিতৃবীজ বা মাতৃকোষ তৈরী হবার সময় ক্রোমোজোমগুলি স্বাভাবিকভাবে বিভক্ত হয়ে যায় না, অর্থাৎ সেখানে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের সমষ্টি থেকে একাধিক ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের সমষ্টি-সম্পন্ন কোষ তৈরী হয় না। সে ক্ষেত্রে একটি ২৩ জোড়ার সমষ্টি ভেঙ্গে দুটি ২৩টি করে ক্রোমোজোমের সমষ্টিসম্পন্ন কোষ উৎপন্ন হয়। এই অস্বাভাবিকতা ঘটে কেবলমাত্র পিতৃবীজ এবং মাতৃকোষের ক্ষেত্রেই। এইজন্যই পিতৃবীজ বা মাতৃকোষে কেবল ২৩টি করে ক্রোমোজোম থাকে। কিন্তু অন্য যে কোন কোষে থাকে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম।

---

* এতদিন বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল মানুষের কোষতত্ত্ব সংখ্যায় ২৪ জোড়া বা ৪৮টি কিন্তু সম্প্রতি পরীক্ষণে প্রমাণিত হয়েছে যে এগুলি ২৩ জোড়া বা ৪৬টি।

জীন (Gene)

মানবশরীরে যেখানে যত কোষ আছে সব কোষেরই মধ্যে (অবশ্য বীজ-কোষগুলি ছাড়া) ২৩ জোড়া বা ৪৬টি করে ক্রোমোজোম থাকে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যদি এই এক জোড়া ক্রোমোজোম পরীক্ষা করা যায় তবে দেখা যাবে যে এর প্রত্যেকটি ক্রোমোজোম দেখতে বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন গঠনের কতকগুলি পুঁথির মত বস্তু দিয়ে গাঁথা ভাঁজ খাওয়া একটা মালার মত। এই গোলাকার বস্তুগুলি আসলে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের জটিল সমষ্টি মাত্র। এগুলির নাম জীন (Gene)। এই জীনই হল প্রাণীর বংশধারার (Heredity) একক। যদিও জীন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু এখনও জানা যায়নি, তবে এটুকু জানা গেছে যে এই জীনের ক্ষমতা অসীম। মানুষের দৈহিক, মানসিক, চারিত্রিক সব রকম বৈশিষ্ট্যের মূলেই আছে জীনের ক্রিয়া। জীন সব সময় জোড়ায় কাজ করে। তার একটা আসে মাতৃকোষ থেকে আর একটা আসে পিতৃকোষ থেকে। এইরকম কোন না কোন জোড়া জীন মানুষের দৈহিক বা আচরণগত বৈশিষ্ট্যের মূলে থাকে। যদিও প্রত্যেক জোড়া জীনের একটি আসে পিতার ক্রোমোজোম থেকে, আর একটি আসে মাতার ক্রোমোজোম থেকে তবুও সময় সময় তারা, প্রকৃতিতে অভিন্ন হয়। তখন তাদের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। যদি দুটি জীনের প্রত্যেকটিই নীলচক্ষুর উৎপাদনের ক্ষমতা ধারণ করে, তবে তাদের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলে নবজাতকের চোখ নীল হবে। কিন্তু সময় সময় জীনগুলি বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট হতে পারে, তখন সাধারণত দুটি জীনের একটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং অপরটি নিষ্ক্রিয় থেকে যায়। যেটি সক্রিয় হয় তার বৈশিষ্ট্যই নবজাতকের মধ্যে দেখা যায়। এই জীনটিকে সক্রিয় জীন (Dominant Gene) বলা যেতে পারে। অপর জীনটি এই ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় হয়ে অবস্থান করে। এই জীনটিকে নিষ্ক্রিয় জীন (Recessive Gene) বলা হয়। যেমন দুটি জীনের যদি একটি নীলচক্ষু উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়, এবং অপর পক্ষে দ্বিতীয় জীনটি যদি কটাচক্ষু উৎপাদনের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়, তবে দ্বিতীয় জীনটি সক্রিয় হবে অর্থাৎ নবজাতকের চক্ষু হবে কটা রঙের। এই ক্ষেত্রে নীলচক্ষুর জীনটি নিষ্ক্রিয় বলে তার কোন প্রভাব নবজাতকে দেখা যাবে না।

অতএব দেখা যাচ্ছে মানবের দৈহিক সংগঠন, মানসিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, আচরণের স্বাতন্ত্র্য এ সবই নির্দ্ধারিত হয় ক্রোমোজোম এবং জীনের জোড়-বাঁধার

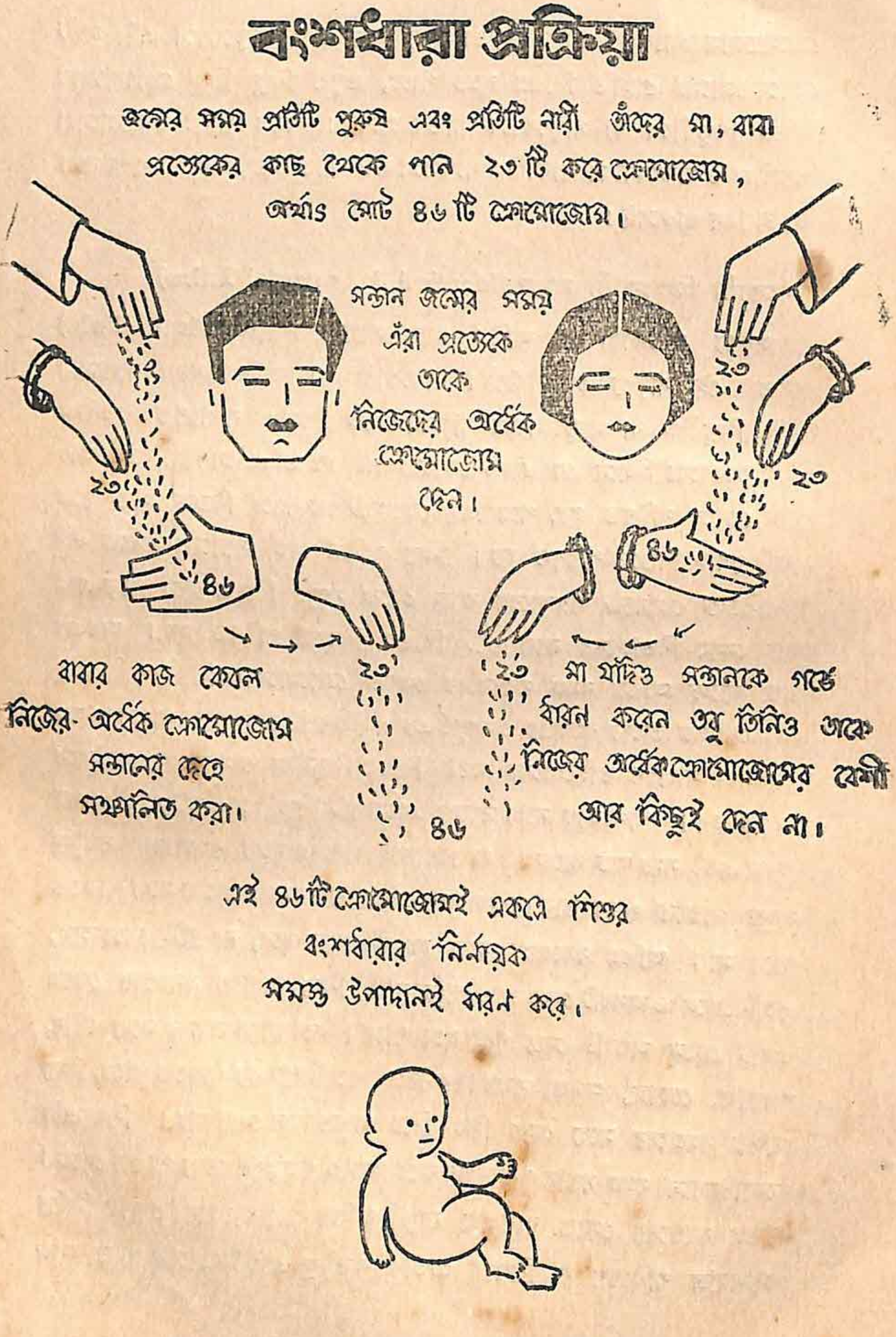
বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতির উপর। সাধারণভাবে মানুষের ক্রোমোজোম এবং জীনগুলি মোটামুটি একই রকমের বলে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে দেহগত ও আচরণগত মিল এত বেশী পাওয়া যায়। কিন্তু প্রত্যেকটি মানবের জন্মকোষের অন্তর্গত ক্রোমোজোম এবং জীনের সম্মেলন একান্তভাবে নিজস্ব, যা সে তার পিতামাতার কাছ থেকে তার জন্মের সময় উত্তরাধিকারসূত্রে পায়। এই পাওয়ার মধ্যে আকস্মিকতার কাজ অনেকখানি। প্রথমত যে পিতৃবীজ এবং মাতৃকোষের সম্মিলনে একটি বিশেষ শিশু জন্মায় সেই কোষ দুটির অন্তর্গত ক্রোমোজোম এবং জীনের সংগঠনটা যে কি হবে তা আকস্মিকতার উপরই পুরোপুরি নির্ভর করে। দ্বিতীয়ত এই দুটি জনককোষের মিলনের সময় কোন্ ক্রোমোজোমের সঙ্গে কোন্ ক্রোমোজোম জোড় বাঁধবে এবং তারপরে আবার প্রত্যেকটি ক্রোমোজোম-জোড়ার মধ্যে কোন্ জীনের সঙ্গে কোন্ জীন জোড় বাঁধবে, এই দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও নির্দ্ধারিত হবে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে। এই জোড়বাঁধা প্রক্রিয়াটি যে কোনও ভাবে ঘটতে পারে। ফলে দু'টি জনককোষের মিলনে উৎপন্ন নতুন কোষটি বিভিন্নতার দিক দিয়ে গণনাতীত সংখ্যক হতে পারে। এইজন্যই জন্মগত উত্তরাধিকারের দিক দিয়ে দুটি বিভিন্ন পিতামাতার সন্তান একেবারে অভিন্ন হবে এটা কল্পনা করা অসম্ভব না হলেও বাস্তবে এক কোটিতেও একটি ঘটার সম্ভাবনা নেই। তবে এই অসম্ভব বস্তুটি সম্ভব হতে পারে একই পিতামাতার সন্তানদের ক্ষেত্রে—যাদের বলে অভিন্ন যমজ তাদের বেলায়।

পিতামাতার সঙ্গে সন্তানদের বা একই পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে যে নানারকম সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় তাও ঐ ক্রোমোজোম বা জীনের মিলের জন্য। পিতামাতার সঙ্গে সন্তানসন্ততির কিছু না কিছু সাদৃশ্য থাকবেই কেনন সন্তানসন্ততি যে ৪৬টি ক্রোমোজোম পিতামাতার কাছ থেকে পায়, সেগুলির মধ্যে ২৩টি পিতার নিজস্ব, ২৩টি মাতার নিজস্ব। পিতা আবার তাঁর পিতামাতার কাছ থেকে ২৩টি ক্রোমাজোম পেয়েছিলেন এবং তা থেকে তিনি ২৩টি ক্রোমোজোম দিয়েছেন তাঁর সন্তানকে। অতএব পিতামহ-পিতামহীর কিছু ক্রোমোজোম তাদের পৌত্রপৌত্রীর মধ্যে সরাসরি চলে আসে। সেইজন্যই পিতামহ-পিতামহীর সঙ্গে পৌত্রপৌত্রীর মিল থাকতেও পারে। ভাইবোনেদের মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায় তাও একই কারণে। পিতৃবীজে এবং মাতৃকোষে পিতা এবং মাতার মোট ক্রোমোজোমের (অর্থাৎ ৪৬টির) অর্দ্ধেক অর্থাৎ ২৩টি

ক্রেমোজোম থাকে। যদিও বিভিন্ন পিতৃবীজে এবং মাতৃকোষে এই ৪৬টি ক্রোমোজোমের প্রকৃতি বিভিন্ন হতে পারে, তবুও কিছু কিছু ক্রোমোজোম বিভিন্ন পিতৃবীজে বা মাতৃকোষে অভিন্ন হবেই। ফলে যদিও ভাইবোনেরা পিতৃবীজ ও মাতৃকোষের আকস্মিক সম্মেলনে জন্ম লাভ করে, তবুও তাদের মধ্যে কিছুটা মিল থাকবেই।

সমকোষী ভিন্নকোষী যমজ (Identical & Fraternal Twins)

অবশ্য সমকোষী বা অভিন্ন যমজ সন্তানদের (Identical Twin) ক্ষেত্রে এই সাদৃশ্য চরমে উঠে। সমকোষী বা অভিন্ন যমজ সন্তানেরা একই পিতৃবীজ বা মাতৃকোষের সম্মিলন থেকে উদ্ভূত। সাধারণত পিতৃবীজ ও মাতৃকোষের মিলনে যে একটি কোষের সৃষ্টি হয় তা প্রথমে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দু'টি কোষে পরিণত হয়, পরে এই কোষদুটি ক্রমান্বয়ে বিভক্ত হতে হতে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয়। কিন্তু অভিন্ন যমজ সন্তানের ক্ষেত্রে এই দ্বিধাবিভক্ত কোষদুটি পরস্পরের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং পরে কোষ বিভাজনের ফলে দু'টি বিভিন্ন শিশুতে পরিণত হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে অভিন্ন যমজ সন্তানদের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমগুলি সম্পূর্ণ একই এবং সেইজন্য তাদের বংশধারাও সম্পূর্ণ এক। কিন্তু ভিন্নকোষী বা সাধারণ যমজ সন্তানেরা সাধারণ ভাইবোনের মতই বিভিন্ন পিতৃবীজ ও মাতৃকোষের মিলনে উৎপন্ন হয়। পার্থক্যের মধ্যে তাদের ক্ষেত্রে দুটি পিতৃবীজ ও দুটি মাতৃকোষের মিলন একই সময় ঘটে থাকে। সাধারণ ভাইবোনদের মধ্যে বংশধারার যতটুকু সাদৃশ্য থাকতে পারে তার বেশী সাদৃশ্য এই শ্রেণীর যমজ সন্তানের মধ্যে থাকতে পারে না। অভিন্ন যমজের ক্ষেত্রে হয় দুটি ছেলে হবে, নয় দুটিই মেয়ে হবে, একটি ছেলে ও অপরটি মেয়ে হতে পারে না। কিন্তু সাধারণ যমজদের ক্ষেত্রে একটি ছেলে অপরটি মেয়ে খুবই হতে পারে। তা ছাড়া তাদের মধ্যে শরীর, আকৃতি, চেহারা, ক্ষমতা সমস্ত দিক দিয়েই যথেষ্ট পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু অভিন্ন যমজদের মধ্যে এসব দিক দিয়ে অদ্ভুত মিল দেখা যায়। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে যমজ সন্তান পর্য্যবেক্ষণ করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। অভিন্ন যমজদের ক্ষেত্রে বংশধারা সম্পুর্ণ অভিন্ন বলে আচরণের প্রকৃতি নির্ণয়ে কেবলমাত্র পরিবেশ বা শিক্ষার প্রভাব কতটুকু এবং কিভাবেই বা তা কাজ


বংশধারা প্রক্রিয়া
জন্মের সময় প্রতিটি পুরুষ এবং প্রতিটি নারী তাঁদের মা, বাবা প্রত্যেকের কাছ থেকে পান ২৩টি করে ক্রোমোজোম, অর্থাৎ মোট ৪৬টি ক্রোমোজোম।
সন্তান জন্মের সময় এঁরা প্রত্যেকে তাকে নিজেদের অর্ধেক ক্রোমোজোম দেন।
২৩
২৩
৪৬
২৩
২৩
৪৬
বাবার কাজ কেবল নিজের অর্ধেক ক্রোমোজোম সন্তানের দেহে সঞ্চালিত করা।
২৩
৪৬
২৩
মা যদিও সন্তানকে গর্ভে ধারন করেন তবু তিনিও তাকে নিজের অর্ধেক ক্রোমোজোমের বেশী আর কিছুই দেন না।
এই ৪৬টি ক্রোমোজোমই একত্রে শিশুর বংশধারার নির্ণায়ক সমস্ত উপাদানই ধারন করে।

করে তা জানা সম্ভব হয়। কেননা জন্মের সময় অভিন্ন যমজ জন্মগত উত্তরাধিকারের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ এক হওয়ায় পরে তাদের মধ্যে যেটকু বৈসাদৃশ্য দেখা যায় তা অবশ্যই পুরোপুরি শিক্ষাপ্রসূত। কিন্তু ভাইবোনদের মধ্যে কিংবা সাধারণ যমজদের মধ্যে বংশধারা অভিন্ন নয় বলে তাদের মধ্যে পার্থক্য বংশধারা প্রসূতও হতে পারে আবার শিক্ষাপ্রসূতও হতে পারে। সেইজন্য তাদের ক্ষেত্রে পিতার প্রভাব এবং বংশধারার প্রভাব এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

বংশধারার স্বরূপ (Nature of Heredity)

বংশধারা বলতে সেই সকল বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় যা শিশু তার জন্মের মুহূর্তে তার পিতামাতার কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে এবং তার অন্যান্য পূর্ব্বপুরুষদের কাছ থেকে পরোক্ষভাবে পেয়ে থাকে।

বংশধারা হল সহজাত বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ এগুলি শিশু সঙ্গে নিয়ে জন্মায়। শিশু জন্মাবার পরের মুহূর্ত্ত থেকেই নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করতে সুরু করে। শিশু তার চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সেই সকল বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করে। সেগুলি শিক্ষার দান এবং সেগুলি থেকে বংশধারাকে স্বতন্ত্র মনে করে বিচার করতে হবে।

সাধারণত প্রচলিত ভাষণে আমরা বংশধারা বলতে কেবলমাত্র পিতামাতার সঙ্গে শিশুর যেটুকু সাদৃশ্য আছে সেইটুকুকেই বুঝে থাকি। কিন্তু সাদৃশ্য যেমন বংশধারার অন্তর্গত তেমনই বৈসাদৃশ্যগুলিও তার বংশধারার একটা অঙ্গ। কেননা পিতামাতার সঙ্গে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য সবই শিশু তার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ক্রোমোজোম এবং জীনের কাছে থেকে পেয়ে থাকে।

সাধারণভাবে বংশধারাকে আমরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি, যেমন, ১। দেহগত (Physical) ২। মানসিক (Mental) এবং ৩। মনঃপ্রকৃতিগত (Temperamental)। দেহগত বংশধারা বলতে বোঝায় ব্যক্তির আকৃতি, গঠন, গায়ের রঙ ইত্যাদি। এই শ্রেণীরই অন্তর্গত হল ব্যক্তির গ্রন্থিগত (glandular) বৈশিষ্ট্যগুলি। শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থির (gland) কার্য্যধারার ওপর দেহের বৃদ্ধি মনের প্রকৃতি অতিনিবিড়ভাবে নির্ভর করে।

মানসিক বংশধারার মধ্যে পড়ে নানা বৈশিষ্ট্য। প্রথম প্রক্ষোভগত সংগঠন

এবং প্রবৃত্তি। দ্বিতীয়, চিন্তন (thinking), কল্পন (imagining), ইচ্ছন (willing) প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়া সম্পাদনের সামর্থ্য এবং তৃতীয় হল বিভিন্ন প্রকৃতির মানসিক শক্তি। এই মানসিক শক্তিকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়, সাধারণ শক্তি বা বুদ্ধি এবং বিশেষ শক্তি। বিশেষ শক্তি বলতে বোঝায় বিশেষ কোন ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখানোর ক্ষমতা, যেমন, গাণিতিক শক্তি, ভাষামূলক শক্তি, যন্ত্রঘটিত শক্তি ইত্যাদি। মনঃপ্রকৃতি (temperament) বলতে বোঝায মনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য—যাকে আমরা চলতি কথায় মুড বা মেজাজ বলে থাকি। দেখা গেছে মনের মৌলিক কাঠামোটির স্বরূপের দিক দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর পার্থক্য আছে এবং এই পার্থক্যের অনেকখানি সহজাত। অলপোর্ট মনঃপ্রকৃতিকে মনের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া বলে বর্ণনা করেছেন।

পরিবেশ (Environment)

পরিবেশ কথাটির শব্দগত অর্থ হল ব্যক্তির চতুষ্পার্শ্ব। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানে আমরা আরও ব্যাপক অর্থে পরিবেশকে নিয়েছি। পরিবেশের গণ্ডী ব্যক্তির চতুষ্পার্শ্বটুকুর বাইরে আরও অনেকদূর বিস্তৃত হতে পারে। শিক্ষাবিজ্ঞানে পরিবেশ বলতে বোঝায় সেই সকল শক্তিকে যেগুলি ব্যক্তির উপর কোন না কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং ব্যক্তির আচরণকে বদলাতে সক্ষম হয়। এই সংব্যাখ্যান অনুযায়ী প্রত্নতত্ত্ববিদদের সত্যকার পরিবেশ হাজার হাজার বছর আগের মিশর বা ব্যাবিলনের কোনও বিস্মৃত প্রভাতে নিহিত থাকতে পারে আবার তেমনই কোন জ্যোতির্বিদের পরিবেশ দু'পাঁচশো আলোকবর্ষ দূরের কোন অজ্ঞাতনামা নীহারিকাকে ঘিরে গড়ে উঠতে পারে। এককথায় পরিবেশ হল সেই শক্তি বা শক্তির সমষ্টি যা ব্যক্তির আচরণের উপর প্রত্যক্ষভাবে পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ।

শিশু জন্মাবার মুহূর্ত থেকেই পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়ে এবং পরিবেশের বিভিন্ন শক্তি তার উপরে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে সুরু করে দেয়। শিশুকে সেই পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়, নতুবা তার অস্তিত্বই বজায় রাখা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। শিশুর এই প্রচেষ্টাকেই সঙ্গতিবিধান (adjustment) বলা হয়। আর এই সঙ্গতিবিধান করতে গিয়ে শিশুর মধ্যে যে আচরণের পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাকেই বলা হয় শিক্ষা। অতএব পরিবেশের কাজ এবং শিক্ষাকে আমরা অভিন্ন বলে ধরে নিতে পারি।

পরিবেশ বড়, না বংশধারা

এখন একটা জটিল বিতর্ক বহুদিন ধরেই শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীদের শিরঃপীড়ার কারণ ঘটিয়ে এসেছে। সে বিতর্কটি হল, বংশধারা বড় না পরিবেশ বড়? এ নিয়ে বহু গবেষণাও হয়েছে। আমরা এবার সেগুলির আলোচনা করব।

বংশধারাবাদী (Hereditarian)

একদল শিক্ষাবিদ বলেন যে বংশধারাই সব, পরিবেশের কোন মূল্যই নেই। শিশু যে বংশধারা নিয়ে জন্মাবে সেই বংশধারাই পুরোপুরি তার ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি নির্ণয় করবে, তা তার পরিবেশ যেমনই হোক না কেন। অর্থাৎ পরিবেশ ভাল হওয়া বা মন্দ হওয়াটার কোন গুরুত্ব নেই এবং তা ব্যক্তির বংশধারার মধ্যে কোন পরিবর্ত্তনই আনতে পারে না। এঁদের আমরা বংশধারাবাদী (Hereditarian) বলে বর্ণনা করতে পারি। বাংলা প্রবাদ "গাধা পিটিয়ে মানুষ হয় না" বা ইংরাজী প্রবাদ "শূয়োরের কান থেকে সিল্কের থলি তৈরী হয় না" ইত্যাদি উক্তিগুলি এই বংশধারাবাদেরই সমর্থক। বংশধারাবাদীদের সংব্যাখ্যানে শিক্ষার গুরুত্ব খুবই কম। তাঁরা যখন বংশধারাকে অপরিবর্ত্তনীয় ও অমোঘ বলে ধরে নিয়েছেন তখন শিক্ষার প্রভাব সেখানে অত্যন্তই অল্প। তাঁদের মতে শিক্ষা শিশুর মধ্যে সত্যকারের কোন পরিবর্ত্তন ঘটাতে পারে না।

পরিবেশবাদী (Environmentalist)

তেমনই আর একদল শিক্ষাবিদ আছেন যাঁরা বংশধারার কোন মূল্য দিতে চান না। তাঁদের কাছে পরিবেশই সব। উপযুক্ত পরিবেশের নিয়ন্ত্রণে শিশুর ব্যক্তিসত্তাকে খুশীমত গড়ে তোলা যায়, তা তার বংশধারা যাই থাকুক না কেন। এঁদের আমরা পরিবেশবাদী (Environmentalist) বলতে পারি। প্রসিদ্ধ আচরণবাদী ওয়াটসন একজন চরম পরিবেশবাদী। তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে তাঁকে যদি একটি স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান শিশু দেওয়া যায় এবং যদি তিনি নিজের ইচ্ছামত পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তবে তিনি সেই শিশুটিকে তাঁর খুশীমত যে কোন শ্রেণীর মানুষরূপে গড়ে তুলতে পারেন—যেমন ডাক্তার, আইনজীবী, শিল্পী, ব্যবসাদার এমন কি ভিক্ষুক বা চোর রূপেও। শিশুটির পূর্ব্বপুরুষদের প্রতিভা, প্রবণতা, সামর্থ্য, বৃত্তি জাতি ইত্যাদি যাই হোক না কেন, তাতে কিছু এসে যাবে না।

বংশধরাবাদীদের কাছে যেমন শিক্ষার মূল্য বিশেষ নেই, পরিবেশবাদীদের

কাছে কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। পরিবেশবাদীরা বংশধারার বিশেষ কোন মূল্য দেন না। তাঁদের কাছে শিক্ষাই সব, অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারিণী—অঘটন-ঘটন-পটীয়সী।

পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ

বংশধারাবাদী এবং পরিবেশবাদীদের সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী দুটি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসতে হলে আমাদের এ সংক্রান্ত পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণগুলির সঙ্গে প্রথমে পরিচিত হতে হবে। এই বিতর্ককে ভিত্তি করে নানা শ্রেণীর গবেষণা বহুদিন হতেই চলে আসছে।

কুলপঞ্জী পর্য্যবেক্ষণ

বংশধারাবাদীদের মধ্যে প্রথমে ফ্রান্সিস গ্যাল্টনের (Francis Galton) নাম করতে হয়। তিনি ডারউইন প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষীদের কুলপঞ্জী পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং তা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে মানুষের ব্যক্তিসত্তা নির্দ্ধারিত হয় তার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা। কার্ল পিয়ার্সন (Karl Pearson) গ্যাল্টনের কুল-পঞ্জী পর্য্যবেক্ষণের কাজটি আরও চালিয়ে নিয়ে যান এবং মোটামুটিভাবে গ্যাল্টনের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করেন। নিম্নশ্রেণীর লোকদের কুলপঞ্জী পর্যবেক্ষণ সুরু করেন ডাগডেল (Dugdale)। তাঁর প্রসিদ্ধ ইয়ুক্স্ (Jukes) পরিবারের পর্য্যবেক্ষণ বংশধারাবাদেরই স্বপক্ষে যায়। কুখ্যাত অপরাধী ইয়ুকসের পরিবারে নিম্নমনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির আধিক্য দেখে ডাগডেল সিদ্ধান্ত করেন যে ব্যক্তিসত্তা গঠনে বংশধারার প্রভাবই সব চেয়ে বেশী। গডার্ডের (Goddard) কালিকাক (Kallikak) পরিবারের পর্য্যবেক্ষণও বংশধারাবাদীদের স্বপক্ষে উল্লেখ করা উচিত। গত আমেরিকা বিপ্লবের সময় এক ব্যক্তি দুটি বিভিন্ন প্রকৃতির নারীর সংস্পর্শে আসে। তাদের মধ্যে একজন উন্নত-বুদ্ধি এবং উচ্চবংশজাত। অপরটি স্বল্পবুদ্ধি এবং সমাজের নিম্নস্তর থেকে প্রসূত। কালক্রমে এই দুটি নারীকে অবলম্বন করে দুটি বিভিন্ন বংশ-শাখা গড়ে ওঠে। দেখা যায় যে উন্নতবুদ্ধি মেয়েটির বংশে উন্নতস্তরের ছেলেমেয়েই বেশী জন্মেছে এবং স্বল্পবুদ্ধি মেয়েটির বংশের ছেলেমেয়েরা অধিকাংশই নিম্নস্তরের মানুষরূপে জন্মেছে। এ ছাড়া গডার্ড আরও ৩২৭টি স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তির পরিবারের ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং দেখেন যে এই পরিবারগুলির মধ্যে শতকরা ৫৪টি ক্ষেত্রে বুদ্ধিস্বল্পতা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া।

পরিবেশের প্রভাব (Effect of Environment)

শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে পরিবেশের প্রভাব কি প্রকৃতির এবং কতটুকু তা নির্ণয়ের জন্য নানাপ্রকার পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ করা হয়েছে। জন্মের মুহূর্ত থেকে বিভিন্ন পরিবেশের শক্তিগুলি কিভাবে শিশুর বংশধারাকে প্রভাবিত করে সে সম্বন্ধে নানা মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

গর্ভস্থিত অবস্থায় পরিবেশের প্রভাব

শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে পরিবেশ যে একটি অনপনেয় শক্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পৃথিবীর আলো দেখার আগে প্রতি শিশুকে দশমাসের মত সময় মাতৃগর্ভে কাটাতে হয়। এই সময় শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ অনেকগুলি পারিবেশিক শক্তির ওপর নির্ভর করে। সেগুলির মধ্যে নীচের কয়েকটি ব্যাপার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১) মায়ের বয়স (২) মায়ের পূর্ব্বের গর্ভসংখ্যা (৩) মায়ের ব্যাধি ও অসুস্থতা (৪) মায়ের পুষ্টি (৫) সংক্রামক ব্যাধি (৬) ওষুধের ব্যবহার (৭) বিশেষ ধরনের শারীরিক ঘটনা এবং (৮) মায়ের প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতা।

বহু পরীক্ষণ থেকে এটা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে এই পারিবেশিক কারণগুলি গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধিপ্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। শিশুর শারীরিক গঠন, ওজন, উচ্চতা, বিভিন্ন প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এমন কি প্রক্ষোভমূলক এবং মানসিক সংগঠনও এই শক্তিগুলির উপরে বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

যমজ পর্য্যবেক্ষণ (Twin Study)

ব্যক্তির উপর বংশধারার ও পরিবেশের তুলনামূলক প্রভাব নির্ণয়ের জন্য যমজ-সন্তান পর্য্যবেক্ষণ পদ্ধতি খুবই সহায়ক। যমজ সন্তান দু' শ্রেণীর হতে পারে—সমকোষী বা অভিন্ন যমজ এবং ভিন্নকোষী যমজ। সমকোষী যমজ বলতে বোঝায় যে দুটি শিশুই এক এবং অভিন্ন মাতৃ-পিতৃকোষ থেকে জন্মেছে এবং ভিন্নকোষী যমজ বলতে বোঝায় যে দুটি সন্তান দুটি বিভিন্ন কোষ থেকে জন্মলাভ করেছে। সমকোষী যমজের ক্ষেত্রে বংশধারা একেবারে অভিন্ন। এখন যদি দুটি সমকোষী

যমজ শিশুকে তাদের জন্মের পর থেকে দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ করা হয় এবং তাদের পর্য্যবেক্ষণ করে যদি দেখা যায় যে তাদের পরিবেশের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটেনি তবে বুঝতে হবে যে বংশধারাই সব, পরিবেশ কিছু নয়। কিন্তু যদি দেখা যায় যে বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা গেছে তবে বুঝতে হবে পরিবেশের প্রভাবই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

ভিন্নকোষী যমজের জন্মাবার হার প্রতি হাজারে দশ থেকে বারো। আর সমকোষী যমজ সন্তানের জন্মের হার প্রতি হাজারে তিন থেকে চার। যেহেতু সমকোষী যমজেরা জীনের একই সমাবেশ থেকে জন্মলাভ করেছে সেহেতু তাদের বংশধারা অভিন্ন। বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়েছে এমন সমকোষী যমজের দৃষ্টান্ত খুবই কম। থর্নডাইক, মেরীম্যান, নিউম্যান, ফ্রীম্যান, হল্‌জিন্‌গার প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা এই ধরনের যমজ সন্তান নিয়ে অনেকগুলি পরীক্ষণ চালান। নিউম্যান, ফ্রীম্যান ও হল্‌জিন্‌গার কর্তৃক ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত টুইনস্ (Twins) নামক বহুখ্যাত যমজ পর্য্যবেক্ষণের বিবরণীতে এই ধরনের ১৯টি যমজের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এর পরেও নিউম্যান এবং মুলার আরও ১০টি ক্ষেত্রের উল্লেখ করেন যেখানে সমকোষী যমজ সন্তানেরা ঘটনাবৈচিত্র্যে দুটি বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়েছে। স্থইসিন্‌গার (Schwesinger) এই সমস্ত পরীক্ষণের ফলাফলগুলির একটি সারাংশ তৈরী করেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যমজ সন্তান দুটি বিভিন্ন পরিবারে মানুষ হলেও তাদের পরিবেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈষম্য থাকে না। তার ফলে তাদের দৈহিক আকৃতি, উচ্চতা, ওজন প্রভৃতি প্রায় একরকমেরই হয়। কিন্তু যেখানে পরিবেশের মধ্যে সত্যকারের বৈষম্য থাকে সেখানে সব দিক দিয়েই কিছু না কিছু পার্থক্য দেখা যায়। অনেকক্ষেত্রে দেখা গেছে যমজ সন্তানদের একজন আর একজনের চেয়ে উচ্চতায় এবং ওজনে কম বা বেশী হয়েছে। তাছাড়া আস্বাদনের ক্ষমতা, রোগপ্রবণতা ইত্যাদির দিক দিয়েও সমকোষী যমজদের মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যায়। সমস্ত পর্য্যবেক্ষকদের মতেই উচ্চতা, আকার, মাথার আকৃতি, মনোবিকারমূলক প্রবণতা ইত্যাদির ওপর পরিবেশের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে কাজ করে থাকে।

মোটামুটিভাবে একইরকম পরিবেশে যমজ সন্তানেরা মানুষ হলে তাদের মধ্যে অদ্ভুত রকমের মিল দেখা যায়। নীচের ক্ষেত্রটি তার একটি উদাহরণ।

নিউম্যান এডুইন (Edwin) ও ফ্রেড (Fred) নামে দুটি যমজ সন্তানের সন্ধান পান। এরা খুব অল্প বয়সেই পরস্পরের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং দুটি ভিন্ন পরিবারে মানুষ হয়। এদের যখন বয়স ২৬ তখন নিউম্যান তাদের আবিষ্কার করেন। তাদের পরীক্ষা করে তিনি তাদের দুজনের মধ্যে অদ্ভুত মিল দেখতে পান। চোখের ও চুলের রঙ, দাড়ি গোঁফ, গায়ের রঙ, কানের গঠন, সাধারণ আকৃতি ইত্যাদির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোনরকম বৈষম্য ছিল না। উচ্চতা, ওজনও দুজনের প্রায় একই রকম ছিল। তাদের দুজনেরই বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত কাজে আগ্রহ জন্মেছিল এবং দুজনেই তাদের নিজের নিজের সহরে কোন টেলিফোন কোম্পানীর মেরামতী শাখায় কাজ করত। দুজনেই বিয়ে করেছিল একই বয়সের এবং একই প্রকৃতির দুটি মেয়েকে এবং একই বছরে। প্রত্যেকেরই একটি করে ছেলে জন্মেছিল এবং প্রত্যেকেই একটি করে ফক্স টেরিয়ার কুকুর পুষেছিল এবং মজার কথা তার নামও তারা একই দিয়েছিল—ট্রিক্সি।

এই পর্য্যবেক্ষণ থেকে মানুষের উপর বংশধারার প্রভাবই বিশেষভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে যদিও ফ্রেড ও এডুইন দুটি বিভিন্ন সহরে ও বিভিন্ন পরিবারে মানুষ হয়েছিল, তাদের পরিবেশ বলতে গেলে একপ্রকার অভিন্নই ছিল। সেজন্য এক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাবজনিত কোন বৈচিত্র্য দেখা যায় নি। কিন্তু যখনই সত্যকারের বিভিন্ন পরিবেশে যমজ সন্তানেরা মানুষ হয় তখনই তাদের উপর পরিবেশজনিত পার্থক্য বেশ ভালভাবেই দেখা গেছে। নীচের যমজসন্তানের ক্ষেত্রটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গ্ল্যাডিস্ (Gladys) এবং হেলেন (Helen) নামে দুটি সমকোষী যমজ ঘটনাচক্রে ১৮ মাস বয়সে পৃথক হয়ে যায়। হেলেনের পালিতা মাতা নিজে শিক্ষিতা না হলেও হেলেনকে স্কুলে কলেজে পড়িয়ে বি-এ পাশ করান। হেলেন পাশ করে শিক্ষকতার কাজ নেয় এবং এক শিক্ষিত আসবাবব্যবসায়ীকে বিয়ে করে ঘর সংসার করে। লেখাপড়া শিখে হেলেনের মধ্যে বেশ মার্জ্জিত ভাব দেখা দেয়। লোকের সঙ্গে সামাজিক আচরণে তার মধ্যে কোন আড়ষ্টতা ছিল না এবং নারীসুলভ আকর্ষণও তার মধ্যে যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু গ্ল্যাডিসের ক্ষেত্রে কিন্তু এর বিপরীত ঘটে। অতি শৈশবেই তার

লেখাপড়া শেষ হয়ে যায়। ক্যানাডার নির্জ্জন রকি অঞ্চলে সে মানুষ হয় এবং বিভিন্ন মিল ও কারখানায় জীবিকার জন্য কাজ করে বেড়াতে হয়। হেলেনের স্বাস্থ্য মোটের উপর সব সময়ই ভাল ছিল। কিন্তু গ্ল্যাডিস ছিল ক্ষীণস্বাস্থ্য ও প্রায়ই রোগে ভুগত। ৩৫ বছর বয়সে যখন তাদের আবিষ্কার করা হল তখন দেখা গেল তাদের মধ্যে নানা দিক দিয়ে বিরাট বৈষম্য। উচ্চতা, ওজন, চুলের রঙ্ ইত্যাদির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ না থাকলেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়ে তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখা গেল। মুখের ভাব, চেহারার বাঁধুনি, নারীসুলভ সৌন্দর্য্য ইত্যাদির দিক হেলেন গ্ল্যাডিসের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। তাছাড়া হেলেন ছিল আত্মবিশ্বাসী, মার্জ্জিতা মাধুর্য্যময়ী এবং আচরণে আক্রমণধর্ম্মী। গ্ল্যাডিস কিন্তু ছিল দুর্ব্বলচেতা, অস্থিরচিত্ত এবং সৌন্দর্য্যহীনা।

মানসিক শক্তি এবং বিদ্যাবত্তার অভীক্ষার দিক দিয়ে হেলেন, গ্ল্যাডিসের চেয়ে অনেক উন্নত বলে প্রমাণিত হল। হেলেনের বুদ্ধ্যঙ্ক হল ১১৬ আর গ্ল্যাডিসের বুদ্ধ্যঙ্ক হল ৯২—মোট ২৪ পয়েণ্টের তফাৎ। হাতের লেখার ধাঁচের দিক দিয়ে দুজনের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা গেল। হেলেনের হাতের লেখা বেশ পরিণত কিন্তু গ্ল্যাডিসের ১৪।১৫ বছর মেয়েদের মত কাঁচা। ব্যক্তিসত্তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে যে এই দুই যমজের মধ্যে প্রচুর বৈষম্য দেখা দিয়েছিল তা আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে সত্যকারের বিভিন্ন পরিবেশে সমকোষী যমজেরা মানুষ হলে তাদের মধ্যে শারীরিক বৈশিষ্ট্য আচরণ, অভ্যাস, ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ, মানসিক শক্তি ইত্যাদি সবদিক দিয়েই বেশ উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যেতে পারে। হেলেন এবং গ্ল্যাডিসের মধ্যে যে ২৪ পয়েণ্টের পার্থক্য দেখা গেছে তা গুরুত্বের দিক দিয়ে মোটেই কম নয়। এর দ্বারা বংশধারার উপর পরিবেশের প্রভাব যে সত্যই কার্য্যকরী তা নিসংশয়ে প্রমাণিত হয়।

বংশধারা ও বুদ্ধি (Heredity and Intelligence)

বুদ্ধির দিক দিয়ে শিশুর ব্যক্তিসত্তানির্ণয়ে বংশধারার প্রভাব বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধির উপর পরিবেশের ক্ষমতা তেমন উল্লেখযোগ্য নয় বলেই অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীদের ধারণা। সমকোষী ও ভিন্নকোষী যমজ সন্তান এক পিতামাতার

সন্তান, এক গোষ্ঠীগত ভাইবোন প্রভৃতিদের উপর প্রদত্ত বুদ্ধির অভীক্ষার ফলের মধ্যে তুলনা করে দেখা গেছে যে বংশধারার সমতা যত বেশী, বুদ্ধির অভীক্ষার ফলও তত কাছাকাছি। আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান শাস্ত্রের ভাষায় এই বিভিন্ন দলের মধ্যে সহপরিবর্ত্তনের (Correlation) মানের তালিকা নিম্নরূপ।

সমকোষী যমজ	·৯০
ভিন্নকোষী যমজ	·৭৫
এক পিতামাতার সন্তান	·৫০
এক গোষ্ঠীগত ভাইবোন	·২৫
সম্বন্ধহীন ছেলেমেয়ে	·০০

উপরের পরিসংখ্যান থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে যে বংশধারার দিক দিয়ে ব্যক্তিদের মতে সম্পর্ক যত বেশী থাকে তাদের বুদ্ধির ক্ষমতার মধ্যেও তত বেশী মিল থাকে।

এ ছাড়া শিশুর বুদ্ধির সঙ্গে তার পিতামাতার বৃত্তি এবং সামাজিক অবস্থানেরও একটা নিকট সম্বন্ধ পাওয়া গেছে। দেখা গেছে, যে সকল ব্যক্তিরা উন্নত শ্রেণীর বৃত্তি অনুসরণ করেন তাঁদের ছেলেমেয়েরা উন্নতবুদ্ধির হয় আর যাঁরা নিম্নশ্রেণীর ব্যবসায় বা কেরানিগিরি, মিস্ত্রিগিরি, ইত্যাদি সাধারণ পেশা অনুসরণ করেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বুদ্ধির স্বল্পতা দেখা যায়। বুদ্ধির উপর যে বংশধারার যথেষ্ট প্রভাব আছে তা এই থেকে প্রমাণিত হচ্ছে।

বুদ্ধি ও পরিবেশ (Intelligence & Environment)

বুদ্ধির উপর বংশধারার প্রভাবকে সর্ব্বাধিক ধরে নিলেও এমন অনেক ক্ষেত্র পাওয়া গেছে যেখানে পরিবেশের পরিবর্ত্তনে বুদ্ধির মধ্যেও পরিবর্ত্তন ঘটেছে। নিউম্যান, ফ্রিম্যান প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের পর্য্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশের বৈষম্যের জন্য সমকোষী যমজদের মধ্যেও ১০ থেকে ২০ পয়েন্ট পর্য্যন্ত বুদ্ধ্যঙ্কের পার্থক্য দেখা গেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ৩০ পয়েন্টেরও পার্থক্য পাওয়া গেছে। হেলেন ও গ্লাডিসের ক্ষেত্রে বুদ্ধ্যঙ্কের তফাৎ ছিল ২৪ পয়েন্টের।

এই থেকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেন যে বুদ্ধির বিকাশে বংশ-

ধারার প্রভাব অনস্বীকার্য্য হলেও পরিবেশেরও যথেষ্ট হস্তক্ষেপ আছে। ১৯৩৭ সালে নিউম্যান, ফ্রিম্যান হলজিন্‌গার একই পরিবেশে পালিত ৫০টি ভিন্নকোষী যমজ এবং ৫০টি সমকোষী যমজ এবং ভিন্ন পরিবেশে পালিত ১৯টি সমকোষী যমজ পর্য্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্ত করেন যে বুদ্ধির বিকাশে কোন কোন ক্ষেত্রে বংশ-ধারার প্রভাবই বড় আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাবই বড়। যেমন উদাহরণস্বরূপ, খুব ভাল পরিবেশে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও দেখা গেল যে একটি ছেলের বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০'এর বেশী উঠল না। বুঝতে হবে যে এখানে বংশধারা পরিবেশ অপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী। আবার একটি ১০০ বুদ্ধ্যঙ্ক সম্পন্ন ছেলে ভাল পরিবেশের সাহায্য পাওয়ায় ১২০ বা ১৩০ বুদ্ধ্যঙ্কে উঠে গেল। এখানে বুঝতে হবে যে পরিবেশের প্রভাব বংশধারাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্ত্তিত করেছে।

বুদ্ধির উপর পরিবেশের প্রভাব নিয়ে মতভেদের কারণ থাকলেও ব্যক্তিসত্তার অন্যান্য দিকগুলির উপর যে পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা একরকম একমত। এ্যাভিরনের (Aveyron) বন্যবালক, ভারতের বনে প্রাপ্ত নেকড়েবাঘ-পালিত মানবশিশুদের ক্ষেত্রগুলি পর্য্যবেক্ষণ করলেই আমরা পরিবেশের প্রভাবের অসীম গুরুত্বের প্রমাণ পাই। সাধারণ মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন এই শিশুগুলি কেবলমাত্র উপযুক্ত পরিবেশের অভাবেই অ-মানুষরূপে বড় হয়ে উঠেছিল। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে সকল প্রকার মানসিক ক্ষমতাই উপযুক্ত সংস্কৃতিমূলক পরিবেশের সাহায্য ছাড়া পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে না।

যে সকল ছেলেমেয়েরা উন্নত পরিবেশের সাহায্য পায় না—যেমন ইংলণ্ডের ক্যানালবোটের ছেলেমেয়েরা, জিপ্সী ছেলেমেয়েরা বা সুদূর পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা—তাদের পর্য্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে সাধারণ সহরের ছেলে-মেয়েদের চেয়ে তারা অনেক দিক দিয়ে বেশ পশ্চাদ্‌পদ।

আয়োয়া (Iowa) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানটি শিশুদের নার্সারী স্কুলে যোগদানের প্রভাব নিয়ে যে দীর্ঘ গবেষণা চালান, তা থেকে মোটামুটি এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, যে সকল ছেলেমেয়ে নার্সারী স্কুলের সুনিয়ন্ত্রিত ও উন্নত পরিবেশের সাহায্য পায় তারা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের চেয়ে মানসিক শক্তির দিক দিয়ে বেশ উন্নত হয়ে ওঠে। পরিবেশের ক্ষমতা সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্মিডিটের (Schmidt)

আর একটি পরীক্ষণ পরিবেশের অসীম ক্ষমতা প্রমাণিত করে। স্বল্পবুদ্ধি বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল এমন ২৫৪টি ছেলেমেয়েকে উন্নত এবং সুপরিকল্পিত পরিবেশে রেখে দেখা গেল যে তিন বছরের মধ্যে তাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে। লেখাপড়ার দিক দিয়ে তারা ত অদ্ভুত উন্নতি করলই, এমন কি তিন বছর পরে বুদ্ধির অভীক্ষায় মাত্র ৭'২% ছেলেমেয়ে স্বল্পবুদ্ধি বলে প্রমাণিত হল। এ থেকে যদিও প্রমাণিত হচ্ছে না যে পরিবেশই তাদের বুদ্ধির উন্নতির একমাত্র কারণ, তবুও এটা অনস্বীকার্য্য যে বুদ্ধিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করতে এবং অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়াকে সুপরিণত করতে পরিবেশ যথেষ্টই সাহায্য করে।

শিক্ষায় বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব

বংশধারা ও পরিবেশ নিয়ে এই সকল গবেষণা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে উভয়েরই অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ। এ দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টি বড় এবং কোন্‌টি ছোট, এ বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন ও অর্থহীন। কেননা, যেমন কেবলমাত্র বংশধারা শিশুর ব্যক্তিসত্তাকে গড়ে তুলতে পারে না, তেমনই কেবলমাত্র পরিবেশও শিশুর পূর্ণ বিকাশ-সাধন করতে পারে না।

ব্যক্তিসত্তা হল এ দু'য়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফল। বংশধারা যোগায় কাঁচামাল আর পরিবেশ তাই দিয়ে গড়ে তোলে ব্যক্তিসত্তার পরিণত রূপ।

আবার কেবলমাত্র বংশধারা ও পরিবেশের নিছক যোগফল বা সমষ্টিকেই ব্যক্তিসত্তা বলে ধরে নিলে ভুল হবে। অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তাকে বিশ্লেষণ করলে কেবল খানিকটা বংশধারা খানিকটা পরিবেশের ফল পাওয়া যাবে যে তাও নয়। এ দুয়ের পারস্পরিক সংঘর্ষে দুইই বদলে যায় এবং তাদের মধ্যে থেকে তৃতীয় একটি সত্তার আবির্ভাব হয়। তারই নাম ব্যক্তিসত্তা।

শিশুর শিক্ষায় বংশধারার প্রভাবের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে শিক্ষার্থীর বংশধারাই তার শিক্ষার গতি ও সীমারেখা নিয়ন্ত্রিত করে দেবে। কি ভাবে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হবে, কি স্তরের শিক্ষা দেওয়া হবে এবং কোথায় সেই শিক্ষার সীমারেখা টানা হবে এ সকল মূল্যবান তথ্যগুলি নির্দ্ধারিত করে দেবে বশংধারা।

শিক্ষায় শিক্ষার্থীর দৈহিক বংশধারার প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

সাধারণভাবে দৈহিক আকৃতি, গঠন ইত্যাদি শিশুর শিক্ষাকে তেমন প্রভাবান্বিত করে না। তবে একথা সত্য যে যদি শিশুর কোনও শারীরিক খুঁত বা অসম্পূর্ণতা থাকে তবে তা শিশুর শিক্ষার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অ্যাড্‌লারের (Adler) পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শারীরিক ত্রুটিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রচুর নিম্নতাবোধ (sense of inferiority) জন্মায় এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গী মানসিক সংগঠন এবং আচরণ বৈশিষ্ট্য তার দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

মানসিক বংশধারা কিন্তু শিশুর শিক্ষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। বিশেষ করে বুদ্ধির প্রভাব শিশুর শিক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেখা গেছে যে স্কুলকলেজের সাফল্য অনেকখানি (·৬০ সহপরিবর্ত্তনের মান) নির্ভর করে বুদ্ধির উপর। অতএব শিশু কি পরিমাণ বুদ্ধির অধিকারী তার উপর তার শিক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে নির্ভরশীল এবং পরিবেশের চাপে বুদ্ধির বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না বলেই সাধারণত মনোবিজ্ঞানীরা ধরে নেন। এই ব্যাপারটা বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্ত্তনশীলতা নামে পরিচিত। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক মোটামুটিভাবে অপরিবর্ত্তিতই থাকে। অবশ্য কতকগুলি আধুনিক পরীক্ষণে এই সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরোধিতা করা হয়েছে। দেখা গেছে যে উপযুক্ত পরিবেশের নিয়ন্ত্রণে বুদ্ধ্যঙ্কের পরিবর্ত্তনও ঘটান যায়। তবে এই তত্ত্বটি এখনও পুরোপুরি সমর্থিত হয়নি। বুদ্ধি বা সাধারণ ক্ষমতা ছাড়াও আরও বিশেষধর্ম্মী শক্তি শিশু উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে এবং সেগুলি শিশুর শিক্ষাকে রীতিমত প্রভাবান্বিত করে থাকে। ভাষামূলক শক্তি, যন্ত্রঘটিত শক্তি, গাণিতিক শক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন বিশেষ শক্তিগুলি শিশুর শিক্ষার প্রকৃতি ও কার্য্যকারিতাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

এই সকল তথ্য থেকে আমরা মোটামুটিভাবে ধরে নিতে পারি যে শিশুর মানসিক ক্ষমতা সহজাত ও একরকম অপরিবর্ত্তনীয়। অতএব শিশুর শিক্ষা এই দিক দিয়ে অনেকখানি বংশধারার উপর নির্ভরশীল।

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর মনঃপ্রকৃতিরও বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে। এই মনঃপ্রকৃতি শিশুর মনের মৌলিক সংগঠনের স্বরূপ নির্দ্ধারিত করে দেয় এবং তার ব্যক্তিসত্তার কাঠামো গড়ে তোলে। শিশুর মানসিক সংগঠনের সঙ্গে শিক্ষা অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। মনঃপ্রকৃতি বা মনের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়ার স্বরূপের উপর শিক্ষার সফলতা অনেকটা নির্ভর করে এবং মনঃপ্রকৃতি আবার নির্ভর করে শিশুর বংশধারা বা উত্তরাধিকারের উপর।

কিন্তু তা বলে এ ভাবলেও ভুল হবে যে ব্যক্তিসত্তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বংশধারার দ্বারা। আগেই বলেছি যে বংশধারা শিক্ষার গতিপথ এবং সীমারেখা নির্দ্ধারিত করে দেয় কিন্তু শিক্ষার মূল অবয়ব গড়ে ওঠে পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। পরিবেশই বংশধারাকে রূপময় করে তোলে। হাতুড়ির ঘায়ে যেমন আকৃতিহীন লোহার তাল বিশেষ একটা রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তেমনই পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার চাপে গঠনহীন রূপহীন বংশধারা সাবয়ব হয়ে ওঠে। অতএব শিশুর শিক্ষা এক দিক দিয়ে যেমন বংশধারার উপর নির্ভরশীল তেমনই আবার নির্ভরশীল পরিবেশের বিভিন্নধর্ম্মী প্রতিক্রিয়ার উপর।

বংশধারা ও শিক্ষকের কর্ত্তব্য

এ থেকে আমরা আর একটি অতিমূল্যবান সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছি। শিশুর শিক্ষা এবং ব্যক্তিসত্তা গঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব হল অসীম। পরিবেশের নিয়ন্ত্রণের উপর যখন শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুগঠন এতখানি নির্ভর করছে তখন শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য যে প্রচুর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শিক্ষক শিশুর বংশধারার প্রকৃতি বদলাতে পারেন না বা তার সঙ্গে কিছুটা যোগ করেও দিতে পারেন না, এ কথা সত্য কিন্তু বংশধারাকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করাটা অনেকখানি শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। বংশধারার পূর্ণবিকাশ নির্ভর করে পরিবেশের উপর। উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই বংশধারা স্বাভাবিক ও সহজ পথে এগোতে পারে, তার বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ পেতে পারে এবং পূর্ণ পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছতে পারে। বংশধারা থাকে অবিকশিত সম্ভাবনা-বৈচিত্র্যের রূপে শিশুর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায়। একমাত্র উপযোগী পারিবেশিক শক্তি-গুলিই সেই সুপ্ত সম্ভাবনাগুলিকে জাগাতে এবং পূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারে।

শিক্ষার্থীর বংশধারার সুষ্ঠু ও পূর্ণ বিকাশের জন্য সুবিবেচক শিক্ষকের কি কি করা উচিত তার একটা বিবরণী নীচে দেওয়া হল।

১। আধুনিক ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপর শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মানসিক শক্তি অনুযায়ী শ্রেণী বিভাজন করা এবং তাদের সামর্থ্যের উপযোগী করে শিক্ষা-প্রক্রিয়াটির পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করা।

২। শিক্ষণ পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান-সম্মত করে তোলা এবং যাতে শিক্ষার্থী সার্থক ও কার্য্যকরী শিখন লাভ করতে পারে তা দেখা।

৩। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর চাহিদা, রুচি ও সামর্থ্য পর্য্যবেক্ষণ করা এবং সেই মত শিক্ষার বিষয়বস্তুকে বহুমুখী করে তোলা।

৪। শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে শিশুদের মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসা করা।

৫। স্কুলে স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশ গড়ে তোলা। ক্লাসঘরগুলি যথেষ্ট প্রশস্ত এবং আলো-বাতাসময় করা। খেলাধূলা ও অন্যান্য সহ-পাঠক্রমিক কার্য্যাবলীর প্রচুর ব্যবস্থা রাখা।

৬। শিখন-সহায়ক আধুনিক উপকরণগুলির বহুল ব্যবহার করা। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত বিজ্ঞান-সম্মত করে তোলা।

৭। শিক্ষার্থীর দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য-পরীক্ষণ করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা এবং স্বাস্থ্য-রক্ষার আইন-কানুন সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদিগকে অবহিত করা।

৮। শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিমাপ করা। যে সকল শিক্ষার্থী পশ্চাদ্‌পদ তাদের অসাফল্যের কারণ নির্ণয় করা এবং সেগুলি দূরীকরণের জন্য উপযুক্ত নির্দ্দেশ দেওয়া।

৯। সু-পরিচালনা ও সুমন্ত্রণার সাহায্যে শিক্ষার্থীকে তার পক্ষে উপযোগী কর্ম্মসূচী অনুসরণ করতে সাহায্য করা।

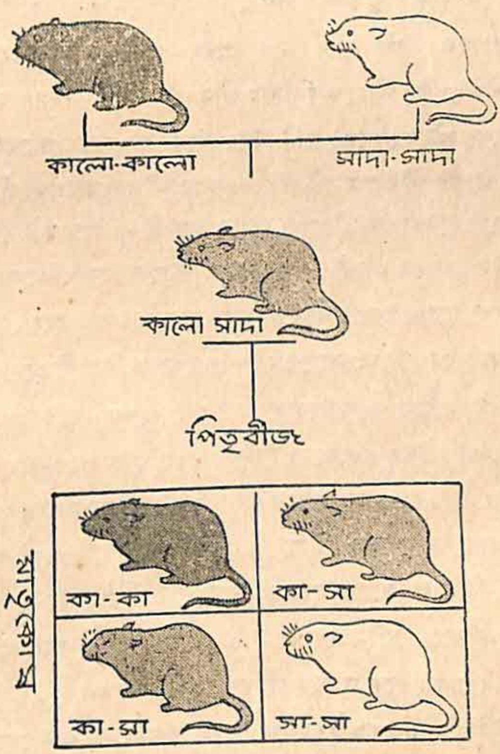
বংশধারার তত্ত্ব

কেমন করে বংশধারা পিতামাতার কাছ থেকে তার সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চালিত হয় তার মোটামুটি একটা চিত্র আমরা পেয়েছি। প্রকৃতির এই সৃজন রহস্য সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বহুদিনই অত্যন্ত স্বল্প ছিল। এ সম্বন্ধে প্রথম আলোকপাত করেন গ্রেগরি মেন্‌ডেল নামে একজন অষ্ট্রীয়াবাসী ধর্ম্মযাজক। ১৮৬৬ সালে তিনি শুঁটি, মৌমাছি প্রভৃতির বংশবিস্তার নিয়ে যে পরীক্ষণ চালান তার উপরেই আধুনিক কালের বংশধারা সম্বন্ধে প্রচলিত তত্ত্বগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য

সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে মেণ্ডেলের তত্ত্বের প্রচুর পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হলেও মেণ্ডেলের আবিষ্কৃত মৌলিক সূত্রগুলি অপরিবর্ত্তিতই আছে।

মেণ্ডেলবাদ (Mendelism)

মেণ্ডেলবাদের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল বংশধারা-এককের (Heredity



[মেণ্ডেলবাদের চিত্ররূপ। পৃঃ ৭৫-৭৬ দ্রষ্টব্য]

units) পরিকল্পনা। অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলির পিছনে বিশেষ বিশেষ সুনির্দ্দিষ্ট বংশধারা-এককের কাজ আছে এ কথা প্রথম মেণ্ডেলই বলেন। এটিকে বৈশিষ্ট্য-এককের সূত্র (Law of Unit Character) বলে বর্ণনা করা যায়। এই বৈশিষ্ট্য বা বংশধারার এককগুলির আধার হল জনন-কোষগুলির মধ্যস্থিত ক্রোমোজোমগুলি বা আরও নিখুঁতভাবে বলতে গেলে,

ক্রোমোজোমের মধ্যস্থিত জীনগুলি। যেমন শিশুর কটা চোখ হওয়ার পেছনে আছে বাবা মার কাছ থেকে পাওয়া কটা চোখের জীনটি। সেই রকম শিশুর স্বল্প-বুদ্ধি হওয়ার পেছনে আছে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া স্বল্পবুদ্ধির জীনের প্রভাব।

মেণ্ডেলবাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এর সক্রিয়-নিষ্ক্রিয় (Dominant Recessive) একক বা জীনের পরিকল্পনা। অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া একক বা জীনটি সক্রিয়ও হতে পারে আবার নিষ্ক্রিয়ও হতে পারে। সক্রিয় হলে তার বৈশিষ্ট্যটি নবজাতকে প্রকাশ পাবে, আর নিষ্ক্রিয় হলে তার কোনরূপ প্রভাবই নবজাতকে দেখা যাবে না। প্রথম শ্রেণীর জীনকে সক্রিয় জীন বলা হয়, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জীনকে নিষ্ক্রিয় জীন বলা হয়। যেমন, যদি কটা চোখের জীন নীল চোখের জীনের সঙ্গে জোট্ বাঁধে তবে শিশু কটা চোখের অধিকারী হয়। কেননা কটা-চোখের জীন হল সক্রিয় জীন আর নীল চোখের জীন হল নিষ্ক্রিয় জীন। তার ফলে নবজাতক নীলচোখের অধিকারী না হয়ে কটা চোখের অধিকারী হবে। তবে নীল চোখের জীনটি শিশুর মধ্যে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলেও তার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে এবং তার পরবর্তী বংশধরে সক্রিয় জীন হয়ে দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির পরবর্তী বংশধরেরা নীল চোখের অধিকারী হয়ে জন্মাতে পারে।

জীনের এই সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেও বিশেষ একটি নিয়ম দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, কাল ইঁদুর এবং সাদা ইঁদুরের সমস্ত বাচ্চা হবে কাল রঙের। এখানে কাল রঙের জীন এবং সাদা রঙের জীন এ দু'য়ের মধ্যে কাল রঙের জীন সক্রিয় এবং সাদা রঙের জীন হল নিষ্ক্রিয়। সেইজন্য সব বাচ্চাই হল কাল রঙের। কিন্তু বাচ্চাগুলি কাল রঙের হলেও তারা হল মিশ্র জীন-সম্পন্ন অর্থাৎ তাদের বীজকোষে কাল রঙের জীন এবং সাদা রঙের জীন দুই-ই পাশাপাশি রইল, যদিও কাল রঙের জীন প্রবল বলে তাদের গায়ের রঙ কাল হল।

এখন এই মিশ্রজীনসম্পন্ন ইঁদুরদের থেকে যে বাচ্চা হবে তাদের মধ্যেও $\frac{3}{4}$ অংশ হবে কাল ইঁদুর আর $\frac{1}{4}$ অংশ হবে সাদা ইঁদুর। আবার $\frac{3}{4}$ কাল ইঁদুরদের মধ্যে $\frac{1}{4}$ হবে কেবল কাল রঙের জীন সম্পন্ন এবং তাদের বাচ্চারা সবই কাল হবে। বাকী $\frac{2}{4}$ কাল ইঁদুর হবে সঙ্করজাতীয় বা মিশ্র জীনসম্পন্ন অর্থাৎ তাদের বাচ্চাদের মধ্যেও ঠিক ঐ রকম ৩ : ১ অনুপাতে কাল ও সাদা বাচ্চা জন্মাবে। $\frac{1}{4}$ অংশ সাদা ইঁদুরদের বাচ্চারা কেবল সাদাই হবে।

মোটামুটি মেণ্ডেলবাদের বৈশিষ্ট্যগুলি উপরে বর্ণিত হল। মেণ্ডেলের

পর বহু প্রাণীতত্ত্ববিদ বংশধারার প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করছেন। তাঁদের আবিষ্কৃত তথ্য থেকে জানা গেছে যে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রত্যাশিত বংশধারার মধ্যেও প্রচুর পরিবর্ত্তনও সংঘটিত হতে পারে।

সাধারণত জীনের প্রকৃতি অনুযায়ী সন্তানসন্ততির বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়ে হয়ে থাকে। কিন্তু দুটি কারণে এই প্রত্যাশিত উত্তরাধিকারের মধ্যে পরিবর্ত্তন দেখা দিতে পারে। প্রথমটি হল জীনের সংবিকৃতি (Mutation) এবং দ্বিতীয় হল পরিবেশের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন।

সংবিকৃতি (Mutation)

কখনও কখনও জীনের মধ্যে আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখা দেয় যার ফলে সন্তান-সন্ততির উত্তরাধিকারের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। একে জীনের সংবিকৃতি বলা হয়। এখন এই ধরনের জীনের সংবিকৃতির জন্য প্রাণীর মধ্যে যে পরিবর্ত্তন দেখা দেয় তা অস্বাভাবিক প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং যদি এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনটি পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি-বিধান করে টিকে থাকতে না পারে তা হলে ঐ বিকৃতিসম্পন্ন প্রাণী তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না এবং বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু যদি প্রাণী তার এই বিকৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে এবং বংশসৃষ্টি করে যেতে পারে তবে এই বিকৃতি তার বংশধরদের মধ্যে সঞ্চালিত হয় এবং ঐ সংবিকৃতি-সম্পন্ন প্রাণী স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে বেঁচে থাকে। কাল ভেড়া, অস্বাভাবিকভাবে শ্বেতবর্ণ প্রাণী, মানুষের ক্ষেত্রে ছ'-আঙ্গুল-ওয়ালা হাত বা পা ইত্যাদি হল এমন বিকৃতির উদাহরণ যেগুলি প্রাণীর মধ্যে ঘটা সত্ত্বেও ঐ প্রাণী বেঁচে থাকতে পেরেছে। আবার প্রাণী বিবর্ত্তনের ইতিহাসে দেখা যায় যে এমন অনেক সংবিকৃতি প্রাণীর মধ্যে ঘটেছে যা পরিবেশের সঙ্গে সংঘাতে অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং ঐ সংবিকৃতিসম্পন্ন প্রাণীই স্বল্পকাল অবস্থানের পর বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এক্স-রের সাহায্যে অনেক প্রাণীর মধ্যে পরীক্ষণমূলকভাবে বিকৃতির সৃষ্টি করা গেছে।

পারিবেশিক পরিবর্ত্তন

কোন কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে পরিবেশের উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তনও জীনের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার মধ্যে পরিবর্ত্তন এনে দেয়। ফলের মাছি নিয়ে মরগ্যান যে পরীক্ষণ

করেন তাতে দেখা গেছে যে যদি অপেক্ষাকৃত কম তাপে মাছিগুলোর জন্ম দেওয়া যায় তবে তাদের অতিরিক্ত পা'এর আবির্ভাব হয়। কোন কোন স্যালাম্যাণ্ডারের কান্‌কো সারা জীবন থেকে যায় এবং তারা জলেই বাস করে। কিন্তু তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্ত্তনে ঐ কান্‌কোগুলো অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ঐ জাতীয় স্যালাম্যাণ্ডারেরা তখন ডাঙ্গায় উঠে আসে এবং সেখানেই বাস করতে থাকে। তাদের বাচ্চাদের যদি ঐ পরিবেশে রেখে দেওয়া যায় তবে তারা বহু বংশ ধরে ডাঙ্গার প্রাণী হয়েই বাস করে।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the question whether nature or nurture, inherited endowment or environment influence, has the more potent effect on determining a child's development. (B. T. 1953)

Ans. (পৃঃ ৬১—পৃঃ ৭৪)

2. "Development is neither an unfolding of heredity without influence from the environment nor a process of being passively moulded by the environment."—Discuss. (B.T. 1957)

Ans. (পৃঃ ৬১—পৃঃ ৭৪)

3. Write an essay on the influence of heredity and environment on the mental development of children. (B.T. 1958)

Ans. (পৃঃ ৬৮—পৃঃ ৭১)

4. Discuss the part played by heredity and environment in their distinctive functions. (B.T. 1959)

Ans. (পৃঃ ৬১—পৃঃ ৭৪)

5. Discuss the relative influence of heredity and environment on the educational attainment of children. (B.A. 1957, 1958)

Ans. (পৃঃ ৬৮—পৃঃ ৭৪)

6. What do you understand by nature and nurture ? Develop the idea that nature is a great factor which moulds human lives in various ways. (B.A. 1960)

Ans. (পৃঃ ৫৮—পৃঃ ৭৪)

7. What do you mean by heredity and environment ? Discuss their relative influence on the development of a child. (B.A. 1961)

Ans. (পৃঃ ৫৮—পৃঃ ৭৪)

8. Examine the relative influence of heredity and education on the development and training of a child. (B. A. 1963)

Ars. (পৃঃ ৬১—৭৪)

9. Estimate the importance of heredity and environment on the education of the child. (B. T. 1962)

Ans. (পৃঃ ৬১—পৃঃ ৭৪)

চার

প্রক্ষোভের স্বরূপ (Nature of Emotion)

রাগ, হিংসা, আনন্দ, ভয় প্রভৃতি শব্দের দ্বারা আমরা মনের যে অবস্থাকে বুঝিয়ে থাকি তাকেই প্রক্ষোভ (emotion) বলে। প্রক্ষোভের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিক্ষুব্ধ বা উত্তেজিত হওয়া। যে কোন প্রক্ষোভঘটিত পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তার তিনটি দিক দেখতে পাই। (১) বাহিক আচরণ (২) আভ্যন্তরীণ আচরণ বা প্রতিক্রিয়া এবং (৩) প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি বা সচেতনতা।

কোন প্রক্ষোভের প্রভাবাধীন হলে প্রাণীমাত্রেই কতকগুলি বাহিক আচরণ করে থাকে। যেমন ভয় পেলে মানুষ পালায়, রাগ করলে হাত-পা ছোঁড়ে বা আক্রমণ করে ইত্যাদি। এই আচরণগুলির একটা লক্ষণ হল যে এগুলি সাধারণভাবে সংহতিনাশক অর্থাৎ প্রাণী যখন প্রক্ষোভের বশবর্ত্তী হয়ে কোন আচরণ করে তখন তার আচরণধারার মধ্যে সাধারণ অবস্থায় যে সংহতি থাকে তা নষ্ট হয়ে যায়।

শরীরতত্ত্বের দিক দিয়ে প্রক্ষোভ কতকগুলি দৈহিক পরিবর্ত্তনের সমষ্টি মাত্র। এই দৈহিক পরিবর্ত্তন অবশ্য নানা রকমের হতে পারে যেমন রক্তচলাচলঘটিত, গ্রন্থিঘটিত, স্নায়ুঘটিত, পেশীঘটিত ইত্যাদি। সাধারণভাষণে আমরা যেমন বিভিন্ন প্রক্ষোভমূলক অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য করে থাকি, দৈহিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কিন্তু তেমন কোন সুনির্দ্দিষ্ট পার্থক্য নেই। বরং শারীরিক প্রতিক্রিয়ার একটি সাধারণ অবস্থা আছে যেটা সকল রকম প্রক্ষোভের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। তবে প্রক্ষোভের বিভিন্নতা অনুযায়ী কেবলমাত্র মাত্রা এবং বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে ক্ষেত্রবিশেষে বদলে যায়। এই দৈহিক প্রতিক্রিয়াটিকে সংহতিনাশক বলে বর্ণনা করা যায় কেননা দেহের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলি এর দ্বারা বেশ ব্যাহত হয়। তবে প্রথম প্রথম সংহতিনাশক হলেও পরবর্ত্তী আচরণের মধ্যে প্রক্ষোভ যথেষ্ট সংহতি এনে থাকে এবং এই প্রক্ষোভই আমাদের কাজের পেছনে প্রেষণা বা শক্তি জুগিয়ে থাকে।

প্রত্যেক প্রক্ষোভের সঙ্গে থাকে প্রক্ষোভ সম্বন্ধে প্রাণীর সচেতনতাবোধ। এই সচেতনতার কেন্দ্রে থাকে অনুভূতি, যেটা হয় সুখকর, নয় দুঃখকর হয়ে থাকে। সাধারণত প্রক্ষোভ জাগলে এই অনুভূতি তীব্রভাবে দেখা দেয়।

প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ

প্রক্ষোভমূলক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ করলে আমরা প্রক্ষোভ জাগরণের একাধিক কারণের সন্ধান পাই।

পারিবেশিক উত্তেজনা ব্যক্তির মধ্যে বহু প্রক্ষোভের সৃষ্টি করে থাকে। দেখা গেছে যে উচ্চশব্দ, আলোর ঝল্‌কানি, হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা প্রভৃতি আকস্মিক, অস্বাভাবিক ও অতি-তীব্র পারিবেশিক শক্তিগুলি শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভ জাগাতে পারে। এইগুলিকে সেইজন্য প্রক্ষোভের সহজাত উদ্দীপক-হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু এগুলি শৈশবেই বিশেষভাবে কার্য্যকরী থাকে। শিশু যত বড় হতে থাকে ততই নতুন নতুন শেখা বস্তুগুলি তার প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ হয়ে ওঠে, যেমন, অন্ধকার, উঁচু, খোলা বা বন্ধ জায়গা, রুক্ষদর্শন মানুষ, পশু ইত্যাদি। পরিণতবয়সে প্রক্ষোভের কারণগুলি অধিকাংশই সামাজিক প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং অপর ব্যক্তির সামান্য কথা, মন্তব্য, আচরণ বা ইঙ্গিতই আমাদের প্রক্ষোভ জাগানর পক্ষে যথেষ্ট হয়ে ওঠে।

পারিবেশিক উত্তেজনার চেয়ে প্রক্ষোভ-জাগরণের আরও শক্তিশালী কারণরূপে কাজ করে পারিবেশিক উত্তেজক সম্বন্ধে সচেতনতা এবং সে সম্বন্ধে চিন্তা। যেমন একজনের মন্তব্য বা আচরণ আমাদের মনে প্রক্ষোভ জাগাতে যতটা না পারুক, তার চেয়ে অনেক বেশী পারে সে সম্বন্ধে আমাদের মানসিক জল্পনা কল্পনা। অনেক সময়ে এই মানসিক আলোড়ন থেকে ধীরে ধীরে প্রক্ষোভ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ সৃষ্টি প্রায় এইভাবেই হয়ে থাকে। অবশ্য এই ধরনের প্রক্ষোভসৃষ্টির পেছনে থাকে মনের একটা প্রক্ষোভমূলক সংগঠন যেটা অতীতের সমশ্রেণীর অভিজ্ঞতা থেকেই তৈরী হয়ে থাকে।

গ্রন্থিজনিত উত্তেজনাকেও প্রক্ষোভসৃষ্টির একটা কারণ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। এই গ্রন্থিজনিত উত্তেজনা অবশ্য সংঘটিত হয় প্রক্ষোভ-জাগরণের ফলেই। কিন্তু একবার গ্রন্থিগুলি উত্তেজিত হয়ে উঠলে সেগুলি প্রক্ষোভকে তীব্রতর করতে

সাহায্য করে। অর্থাৎ গ্রন্থিজাত উত্তেজনা একাধারে প্রক্ষোভ-জাগরণের ফল এবং কারণও। এন্ডোক্রিন নামক গ্রন্থিগুলি থেকে যে সব রস নির্গত হয় সেগুলি যে প্রক্ষোভের জাগরণ এবং পরিবর্দ্ধনের অপরিহার্য্য তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া

প্রাণীর উপর প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া তীব্রতা ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে নানা শ্রেণীর হতে পারে। সামান্য উত্তেজনা-বোধ থেকে সুরু করে পরিপূর্ণভাবে আত্মসংযমের বিলোপ পর্য্যন্ত প্রক্ষোভের ফলরূপে দেখা দিতে পারে। এই প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি অবশ্য নির্ভর করে প্রক্ষোভের মাত্রার উপর এবং প্রক্ষোভ যখন তীব্রতম হয়ে ওঠে তখন এমন হতে পারে যে প্রাণী সম্পূর্ণভাবে নিজের আচরণের উপর কর্ত্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে এবং পরিস্থিতির সঙ্গে কোন রকমেই খাপ খাওয়াতে পারে না, যেমন খরগোসের বাচ্চা যখন বাঘের সামনে বা হরিণ যখন অজগর সাপের সামনে পড়ে তখন তারা এত ভয় পেয়ে যায় যে তারা স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে, ছুটে পালাতে পারে না।

শরীরতত্ত্বমূলক প্রতিক্রিয়া

প্রক্ষোভের সময় নানারকম অন্তর্দৈহিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যেমন রক্তের চাপ, নাড়ীর স্পন্দন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, গ্রন্থিরস নিঃসরণ, পরিপাচনক্রিয়া (digestive function) প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে প্রচুর পরিবর্ত্তন ঘটে। এগুলি মাপার জন্য নানারূপ জটিল ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন নাড়ীর স্পন্দন মাপার যন্ত্রের নাম স্ফিগ্‌মোগ্রাফ (Sphygmograph), রক্তের চাপ মাপার যন্ত্রের নাম স্ফিগ্‌মমানোমিটার (Sphygmomanometer), নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পরিমাপের যন্ত্রের নাম নিউমোগ্রাফ (Pneumograph) ইত্যাদি।

পরিপাচন ক্রিয়ার উপর প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া বেশ উল্লেখযোগ্য। ক্যাননের (Cannon) পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে প্রক্ষোভের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীর কাজ ও পরিপাচন-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

গ্রন্থিরস (Hormone) নিঃসরণ প্রক্ষোভ জাগরণের একটি অপরিহার্য্য বৈশিষ্ট্য। অ্যাড্রেনালিন (Adrenalin) নামক গ্রন্থিরসটি রাগ, উত্তেজনা প্রভৃতি প্রক্ষোভের সময় নির্গত হয় এবং শরীরের উত্তেজনাকর কাজ করার ক্ষমতা যোগায়।

প্রক্ষোভের সময় হৃদ্‌পিণ্ড, মস্তিষ্ক প্রভৃতি স্থানে রক্তপ্রবাহের মধ্যে বেশ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। রাগ, উত্তেজনা প্রভৃতির ক্ষেত্রে যেমন রক্তপ্রবাহের গতি বেড়ে যায় তেমনই আনন্দ, তৃপ্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে রক্তের চাপ কমে আসে।

সাইকোগ্যালভানোমিটার (Psychogalvanometer) নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে প্রক্ষোভের তীব্রতা এবং উত্তেজনার স্বরূপ মাপা হয়ে থাকে। প্রাণী-দেহ মৃদু বিদ্যুৎপ্রবাহ কতটা সহ্য করতে পারে তা এই যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায়। দেখা গেছে যে প্রক্ষোভের বিভিন্নতা অনুযায়ী প্রাণীর সাইকোগ্যালভানো প্রতিক্রিয়া (Psychogalvanic Response or P. G. R.) ভিন্ন হয়ে থাকে। আজকাল প্রক্ষোভ পরিমাপনে সাইকোগ্যালভানো প্রতিক্রিয়ার ব্যাপক সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে।

মস্তিষ্ক তরঙ্গেও (Brain waves) প্রক্ষোভ জাগরণের সময় প্রচুর পরিবর্ত্তন দেখা যায়। সাধারণ অবস্থায় মস্তিষ্কে আলফা তরঙ্গের আবর্ত্তন প্রতি সেকেণ্ডে ৮ থেকে ১২ বার হয়, কিন্তু প্রক্ষোভের সময় মস্তিষ্ক-তরঙ্গের আবর্ত্তনের হার সেকেণ্ডে ৮ বারের নীচে নেমে যায়।

সামাজিক প্রতিক্রিয়া

প্রক্ষোভজাত প্রতিক্রিয়ার উপর সামাজিক প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভয় পেয়ে ছুটে পালান, আনন্দিত হলে জোরে চীৎকার করা, রাগ করলে আক্রমণ করা ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াগুলি স্বাভাবিক হলেও সামাজিক অনুশাসনের চাপে এগুলি নানা রূপান্তর গ্রহণ করে। লোক-নিন্দা, সমালোচনা সমাজের তিরস্কার, নিন্দা প্রভৃতির ভয়ে আমরা আমাদের প্রক্ষোভমূলক আচরণগুলিকে প্রায়ই পরিবর্ত্তিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকি এবং পরিবেশের উপযোগী সঙ্গতিবিধানের চেষ্টা করি। এই থেকেই জন্মলাভ করেছে মানুষের আচরণ-বৈচিত্র্য। প্রক্ষোভমূলক পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সঙ্গতিবিধানের জন্য মানুষ নানা বিচিত্র আচরণধারার সাহায্য নিয়ে থাকে।

অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলী (Autonomic Nervous System)

প্রক্ষোভঘটিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যে দৈহিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তার পেছনে আছে বিশেষ একটি স্নায়ুমণ্ডলীর কাজ। এর নাম অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলী। এই স্নায়ুমণ্ডলীটি মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড থেকে বার হয়ে শরীরের নানা গ্রন্থি, হৃদ্যন্ত্র, পাকস্থলীর মাংসপেশী, দেহচর্ম্ম প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে স্নায়বিক উত্তেজনা এই স্নায়ুমণ্ডলী বেয়ে গ্রন্থি, হৃদ্যন্ত্র প্রভৃতিতে পৌছয় এবং ঐগুলিকে সক্রিয় করে তোলে। অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলীর আবার দুটি ভাগ আছে সিম্প্যাথেটিক (Sympathetic) এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক (Parasympathetic)। এই দুটি ভাগের কাজ কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্মী। সিম্প্যাথেটিক বিভাগটি সাধারণত দেহাংশগুলিকে উত্তেজিত করে তোলে এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক বিভাগটি সেগুলিকে প্রশমিত করে। যেমন, সিম্প্যাথেটিক বিভাগটির সক্রিয়তার ফলে হৃদ্স্পন্দন বাড়ে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়, কিড্‌নীতে সঞ্চিত শর্করা মুক্ত হয়ে রক্তে প্রবেশ করে, রক্তসঞ্চালনের গতি বৃদ্ধি পায় এবং নানা উত্তেজনামূলক পরিবর্ত্তন ঘটে। প্যারাসিমপ্যাথেটিক বিভাগটি সক্রিয় হলে হৃদ্স্পন্দনের বেগ কমে আসা, শরীরের উত্তাপ স্বল্প হওয়া, রক্ত প্রবাহ মন্থরিত হওয়া ইত্যাদি প্রশমনমূলক পরিবর্ত্তনগুলি শরীরের মধ্যে দেখা দেয়। যে সকল গ্রন্থিরস শরীরের উত্তেজনামূলক কাজের পক্ষে সহায়ক সেগুলি সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনায় নির্গত হয়ে থাকে। যেমন অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি হতে যে রস বার হয় তার নাম অ্যাড্রেনালিন। এই অ্যাড্রেনালিন ব্যক্তিকে উত্তেজনামূলক কাজ করার উদ্যম ও সামর্থ্য জুগিয়ে থাকে। তেমনই যে সকল গ্রন্থিরস শরীরের শান্ত অবস্থার পক্ষে সহায়ক সেগুলি প্যারাসিম্প্যাথেটিকের সক্রিয়তার সময় নিঃসৃত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে যদিও সিম্প্যাথেটিক বিভাগের সক্রিয়তা উত্তেজনাধর্ম্মী এবং প্যারাসিম্প্যাথেটিক বিভাগের সক্রিয়তা প্রশমনধর্ম্মী তবুও কোন কোন ক্ষেত্রে সিম্প্যাথেটিক বিভাগকেও প্রশমন বা অবদমনের কাজ করতে দেখা গেছে। যেমন, পাকস্থলীর কাজগুলি সিম্প্যাথেটিক বিভাগের সক্রিয়তায় দ্রুতগতি-সম্পন্ন হয়ে ওঠে।

দৈহিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে প্রক্ষোভকে দু শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম, ঈপ্সামূলক (appetitive) বা বৃদ্ধিমূলক (vegetative) প্রতিক্রিয়া। এই

পর্য্যায়ে পড়ে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌন উত্তেজনা প্রভৃতি ঘটিত প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া। আর দ্বিতীয়, আকস্মিক (emergency) বা প্রস্তুতিমূলক (preparatory) প্রতিক্রিয়া। এই পর্য্যায়ে পড়ে রাগ, ভয় প্রভৃতি জনিত প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া। যখন এক শ্রেণীর প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া কাজ করে তখন অপর শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াগুলি নিরুদ্ধ থাকে। প্রথম শ্রেণীর প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্যারাসিম্প্যাথেটিক বিভাগটি সক্রিয় থাকে এবং ব্যক্তির মধ্যে একটা তৃপ্তি ও প্রশান্তির ভাব দেখা দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সিম্প্যাথেটিক বিভাগটি ক্রিয়াশীল হয় এবং ব্যক্তির মধ্যে বৰ্দ্ধিত মাত্রায় উত্তেজনা ও সক্রিয়তা দেখা দেয়। পলায়ন বা আক্রমণ উভয় প্রকার পরিস্থিতির জন্যই সে প্রস্তুত হয়ে ওঠে। এইজন্য এই শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াকে আকস্মিক বা প্রস্তুতিমূলক বলা হয়ে থাকে।

প্রাক্ষোভিক উত্তেজনার ক্ষেত্রে পাকস্থলীতে পরিপাচন-ক্রিয়া যে বন্ধ হয়ে যায় সেটা একটা পরীক্ষণ-প্রমাণিত সত্য। পশুর আহারের সময় তাকে ক্রুদ্ধ বা ভয়গ্রস্ত করে দেখা গেছে যে সে সময় তার পাকস্থলীর কাজ সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে গেছে।

সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুবিভাগের সক্রিয়তার সঙ্গে অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি-রসের নিঃসরণের নিকট যোগাযোগ আছে। বস্তুত রাগ, ভয় প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে সকল শারীরিক উত্তেজনা দেখা দেয় সেগুলি প্রধানত এই অ্যাড্রেনালিন নামক গ্রন্থি-রসের নিঃসরণেরই প্রভাব। ক্যাননের (Cannon) ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে এই তথ্যটি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রক্ষোভের বিভিন্ন তত্ত্ব (Theories of Emotion)

প্রক্ষোভের প্রকৃতি ও কার্য্য নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক জল্পনা হয়েছে এবং এ সম্বন্ধে একাধিক তত্ত্বও আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। তার কয়েকটির বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

ম্যাক্‌ডুগালের প্রবৃত্তি-প্রক্ষোভ তত্ত্ব (McDougal's Theory of Instinct-Emotion)

ম্যাক্‌ডুগাল প্রক্ষোভকে প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থলীয় প্রেষণামূলক শক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেকটি সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে থাকে একটি করে প্রক্ষোভ

যেটা জাগলে তবে ঐ বিশেষ প্রবৃত্তিটি কার্য্যকরী হয়ে ওঠে। তিনি মোট ১৭টি প্রবৃত্তি এবং তাদের সহগামী ১৭টি প্রক্ষোভের একটা তালিকা দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই বিশদ আলোচনা করেছি। (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪২ দ্রষ্টব্য)

জেমস্-ল্যাংগ তত্ত্ব (James-Lange Theory)

প্রসিদ্ধ আমেরিকান দার্শনিক-মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেম্‌স ১৮৮৪ সালে এবং ড্যানিস্ শরীরতত্ত্ববিদ ল্যাংগ (Lange) ১৮৮৫ সালে প্রক্ষোভ সম্বন্ধে একটি নতুন সংব্যাখ্যান দেন। এইটিই বর্ত্তমানে জেম্‌স-ল্যাংগ তত্ত্ব নামে পরিচিত।

জেমস-ল্যাংগ তত্ত্বটিতে প্রক্ষোভের একটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সাধারণ লৌকিক বিচারে প্রক্ষোভের সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করা হয় এই নতুন তত্ত্বটিতে ঠিক তার বিপরীত একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রক্ষোভ-ঘটিত অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তিনটি স্তর বা সোপান পাই। যথা, (১) প্রক্ষোভ জাগাতে সমর্থ এমন উদ্দীপক বা পরিস্থিতি, (২) প্রক্ষোভের অনুভূতি যেমন রাগ হওয়া বা আনন্দ হওয়া এবং (৩) শারীরিক প্রতিক্রিয়া এবং বাহ্যিক আচরণাদি যেমন রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাওয়া, হৃদ্‌স্পন্দন বেড়ে যাওয়া, হাত-পা ছোঁড়া ইত্যাদি।

প্রক্ষোভের লৌকিক সংব্যাখ্যান অনুয়ায়ী প্রথমে আসে উদ্দীপক বা পরিস্থিতি তার পর মনে জাগে ঐ প্রক্ষোভের অনুভূতি এবং সব শেষে আসে দৈহিক প্রতিক্রিয়া। যেমন, প্রথমে ব্যক্তিটি বাঘ দেখল (উদ্দীপক), তারপর তার মনে ভয় জাগল (প্রক্ষোভের অনুভূতি) এবং সবশেষে তার হৃদ্‌স্পন্দনের বৃদ্ধি, রোমহর্ষণ ইত্যাদি শারীরিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল এবং সে দৌড়ে পালাল (দৈহিক প্রতিক্রিয়া)। অর্থাৎ লৌকিক সংব্যাখ্যানে প্রক্ষোভ-অভিজ্ঞতার প্রক্রিয়ার অনুক্রম হল—

উদ্দীপক বা পরিস্থিতি→প্রক্ষোভের অনুভূতি→শারীরিক প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু জেম্‌স-ল্যাংগের মতে ঐ সোপানগুলো একটু অন্য রকম। তাঁদের ব্যাখ্যায় প্রথমে আসে উদ্দীপক, তার পরে দেখা দেয় শারীরিক প্রতিক্রিয়া এবং

সবশেষে আসে প্রক্ষোভের অনুভূতি। অর্থাৎ জেম্স-ল্যাংগের ব্যাখ্যায় প্রক্ষোভ-অভিজ্ঞতার প্রক্রিয়াটির অনুক্রম হল—

উদ্দীপক বা পরিস্থিতি→শারীরিক প্রতিক্রিয়া→প্রক্ষোভের অনুভূতি।

জেম্স-ল্যাংগের ভাষায় আমরা ভয় পেয়ে পালাই না। পালাই বলে ভয় পাই। রেগে গিয়ে যে আক্রমণ করি, তা নয়। আক্রমণ করি বলেই রেগে যাই। দুঃখ অনুভব করি বলে যে কাঁদি তা নয়, কাঁদি বলেই দুঃখ পাই। অর্থাৎ জেম্স-ল্যাংগের মতে প্রক্ষোভের অনুভূতি শারীরিক প্রতিক্রিয়ার কারণ নয়, ফল। উপযুক্ত উদ্দীপক দেখা দিলে মস্তিষ্কে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, সেই স্নায়বিক উত্তেজনা অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলী বেয়ে শরীরের নানা জায়গায় গিয়ে পৌছয়। ফলে গ্রন্থি, রক্তবহানলী, মাংসপেশী প্রভৃতিতে নানা শারীরিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই প্রতিক্রিয়াগুলি দেখা দেওয়ার ফলে আবার স্নায়বিক উত্তেজনা স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে পৌছয় এবং তার ফলে আমরা রাগ, দুঃখ, আনন্দ ইত্যাদি প্রক্ষোভগুলি অনুভব করি। এককথায় এই তত্ত্ব অনুযায়ী শারীরিক প্রতিক্রিয়ারই সমষ্টিগত রূপকে আমরা প্রক্ষোভ নাম দিয়ে থাকি। অর্থাৎ প্রক্ষোভ শারীরিক প্রতিক্রিয়ার অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

জেম্স তাঁর দেওয়া প্রক্ষোভের এই অভিনব ব্যাখ্যার সমর্থনে কতকগুলি যুক্তির উল্লেখ করেন, যেমন—

(ক) কোন বিশেষ প্রক্ষোভ সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় যদি আমাদের চেতনা থেকে সকল প্রকার দৈহিক অনুভূতিকে বাদ দেওয়া যায় তবে দেখা যাবে যে প্রক্ষোভের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। যা আছে সেটা কেবল মাত্র এক ধরনের উত্তেজনাবিহীন নিরপেক্ষ জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা, তাকে কোনমতেই প্রক্ষোভ বলা চলতে পারে না। জেম্সের মতে দেহসম্পর্ক-বিহীন প্রক্ষোভ বলে কোন বস্তু নেই।

(খ) মানসিক বিকৃতিগ্রস্ত রুগীদের ক্ষেত্রে বাইরের কোন কারণ ছাড়াই প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়ে থাকে, যেমন হিষ্টেরিয়া বা ম্যানিয়া রোগের ক্ষেত্রে রাগ, আনন্দ, দুঃখ প্রভৃতি প্রক্ষোভ কোন বাহ্যিক কারণ ছাড়াই ব্যক্তির মনে জাগতে

দেখা গেছে। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে কেবলমাত্র দৈহিক অবস্থা থেকেই প্রক্ষোভ জন্মাতে পারে।

(গ) শারীরিক প্রতিক্রিয়া বা বাহ্যিক অভিব্যক্তির মাত্রা বাড়ালে প্রক্ষোভের তীব্রতাও বাড়ে। রাগের সময় চেঁচামেচি যত করা যায় তত রাগ বেড়ে যায়, ভয়ের সময় পালালে ভয় আরও বেশী হয়। অভিনয়ের সময় নিছক অভিব্যক্তির সাহায্যেই অভিনেতারা প্রক্ষোভের সৃষ্টি করতে পারেন।

(ঘ) তেমনই প্রক্ষোভকে অভিব্যক্ত হতে না দিলেই প্রক্ষোভ লোপ পায়। রাগের সময় রাগকে অভিব্যক্ত হতে না দেওয়াই রাগ থামানোর প্রকৃষ্ট উপায়।

জেম্‌স্‌-ল্যাংগ তত্ত্ব অনুযায়ী শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মানসিক সচেতনতার নামই প্রক্ষোভ। বিশেষ বিশেষ উদ্দীপক বা পরিস্থিতিতে যে দৈহিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তার সম্বন্ধে মনের মধ্যে অনুভূতি থেকেই প্রক্ষোভ জাগে। অতএব এই তত্ত্ব অনুযায়ী শারীরিক উত্তেজনা ও প্রক্ষোভ একই ঘটনার নামান্তর মাত্র।

সমালোচনা

এই তত্ত্বটির অভিনবত্ব মনোবিজ্ঞানের জগতে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং প্রক্ষোভের উপর বহু আধুনিক গবেষণার জনক হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য আধুনিক পরীক্ষণগুলি থেকে যে সব সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে সেগুলি জেম্‌স্‌-ল্যাংগের তত্ত্বটির পুরোপুরি স্বপক্ষে যায় না।

আমরা দেখেছি যে প্রক্ষোভঘটিত শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলির পেছনে আছে অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলীর কাজ। এই স্নায়ুমণ্ডলী বেয়ে উত্তেজনা শরীরের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন গ্রন্থি, মাংসপেশী প্রভৃতিতে পৌঁছয় বলেই শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলি দেখা দেয়।

এখন এই অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলী এবং মস্তিষ্কের মধ্যে যে সংযোগ সেটিকে যদি কোনরূপে ছিন্ন করে দেওয়া যায় বা কোন আকস্মিক ঘটনায় যদি সেটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে শরীরের অভ্যন্তরস্থ মাংসপেশী, গ্রন্থি ইত্যাদিগুলি আর সক্রিয় হয়ে উঠবে না এবং তার ফলে প্রক্ষোভঘটিত কোন শারীরিক প্রতিক্রিয়াও আর ঘটতে পারবে না। সুতরাং জেম্‌স্‌-ল্যাংগের তত্ত্বটি যদি সত্য হয় তাহলে

কোন প্রাণীর অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলী যদি বিচ্ছিন্ন করা যায় তাহলে তার প্রক্ষোভের অনুভূতি আর জাগবে না, কেননা এই তত্ত্ব অনুযায়ী শারীরিক প্রতিক্রিয়া থেকেই প্রক্ষোভ জেগে থাকে এবং অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলী বিচ্ছিন্ন হলে শারীরিক প্রতিক্রিয়া হবার কোন সম্ভাবনা আর থাকে না। কিন্তু বহু পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলী বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রাণীর মধ্যে প্রক্ষোভের অনুভূতি হয়েছে।

সেরিংটন (Sherrington) একটি কুকুরের শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রপাতির সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের যোগাযোগ ছিন্ন করে দেন। ফলে কুকুরটির ক্ষেত্রে কোনরূপ দৈহিক উত্তেজনা জন্মানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কুকুরটিকে স্পষ্টই ভয়, রাগ ইত্যাদির চিহ্ন প্রকাশ করতে দেখা গেল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রক্ষোভের বাহ্যিক প্রকাশ অন্তর্দৈহিক যন্ত্রাদির সক্রিয়তার উপর নির্ভর করে না। এই পরীক্ষণটি আংশিকভাবে জেম্‌স্‌-ল্যাংগের তত্ত্বের বিরুদ্ধে যায়। কিন্তু যেহেতু এ থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে কুকুরটির মনে সত্যই ভয়, রাগ ইত্যাদি প্রক্ষোভগুলি জেগেছিল সেহেতু পুরোপুরি জেম্‌স্‌-ল্যাংগের তত্ত্বটিকে অপ্রমাণিত করতেও এ পরীক্ষণটি পারছে না।

ক্যানন (Cannon) একটি বিড়ালের সিম্‌প্যাথেটিক স্নায়ুমণ্ডলীটি কেটে দেন এবং তার ফলে তার অন্তর্দৈহিক যন্ত্রপাতিগুলির সক্রিয়তা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রেও দেখা গেল যে কুকুর দেখলে বিড়ালটির মধ্যে আগে যেমন রাগের লক্ষণগুলি প্রকাশ পেত পরেও ঠিক তেমনই প্রকাশ পাচ্ছে।

মানুষের ক্ষেত্রেও প্রায় একই ধরনের সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে। একটি চল্লিশ-বৎসর বয়স্কা মহিলা একবার ঘোড়া থেকে পড়ে যান এবং ফলে তাঁর সিম্‌পাথেটিক স্নায়ুমণ্ডলী ও মস্তিষ্কের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রেও দেখা গেল যে মহিলাটি দুঃখ, আনন্দ, বিরাগ ইত্যাদি প্রক্ষোভগুলি ঠিকই পূর্ব্বের মতই অনুভব করছেন।

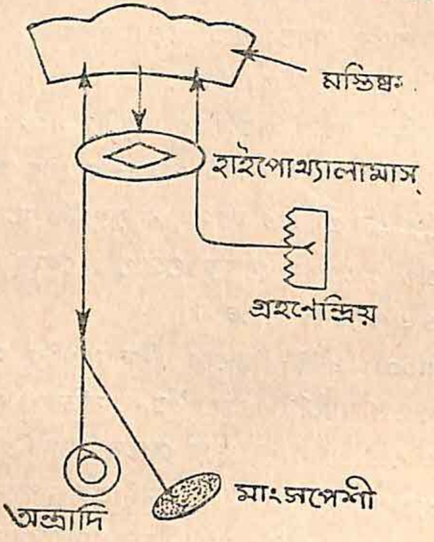
উপরের পরীক্ষণগুলি থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে শারীরিক প্রতিক্রিয়া এবং মানসিক অনুভূতি এ দুটি এক বস্তু নয় এবং প্রথম থেকে দ্বিতীয়টি প্রসূতও নয়।

আর একটি পরীক্ষণও জেম্‌স্‌-ল্যাংগের তত্ত্বটির অসম্পূর্ণতা প্রকাশ করে। কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় শারীরিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে দেখা হল যে সত্যকারের প্রক্ষোভ জাগে কিনা। ব্যক্তির শরীরে এ্যাড্রেনালিন (Adrenalin) প্রবেশ করিয়ে

দিয়ে দৈহিক উত্তেজনার সৃষ্টি করা হল কিন্তু দেখা গেল যে সে উত্তেজনা থেকে ভয়, রাগ প্রভৃতি কোন প্রক্ষোভ সত্যকারের মনে অনুভূত হয় না। অতএব শারীরিক উত্তেজনা প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ নয়।

ক্যানন-বার্ড (Cannon-Bard) তত্ত্ব

প্রক্ষোভের উপর আধুনিককালে যে তত্ত্বটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে সেটি হল ক্যানন-বার্ডের থ্যালামাস-মূলক তত্ত্ব। এই তত্ত্বটিতে জেম্‌স্‌-ল্যাংগের মৌলিক



[প্রক্ষোভের উপর ক্যানন-বার্ড তত্ত্বের চিত্ররূপ]

বক্তব্যটিরই বিরোধিতা করা হয়েছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উত্তেজনা গিয়ে পৌঁছয় শরীরের অভ্যন্তরস্থ থ্যালামাস নামক একটি স্থানে। থ্যালামাসটি, আরও নিখুঁতভাবে বলতে গেলে থ্যালামাসের অঙ্গ হাইপো-থ্যালামাসটি, স্নায়বিক উত্তেজনার সমন্বয়নের ক্ষেত্র বিশেষ। এখান থেকে উত্তেজনার কিছুটা চলে যায় মস্তিষ্কে এবং সেখানে গিয়ে প্রক্ষোভমূলক অনুভূতির প্রকৃতি নির্ণয় করে। অর্থাৎ রাগ, না আনন্দ, না ভয় কোন্ ধরনের প্রক্ষোভ ব্যক্তি অনুভব করবে তা নির্দ্ধারিত করে দেয়। আবার কিছুটা উত্তেজনা থ্যালামাস থেকে নেমে আসে শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রপাতি, মাংসপেশী, গ্রন্থি

প্রভৃতিতে এবং সেখানে নানাপ্রকার শারীরিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এই তত্ত্বটি ক্যানন এবং বার্ড যুগ্মভাবে প্রকাশ করেন বলে এর নাম ক্যানন-বার্ড তত্ত্ব। একথা অবশ্য প্রমাণিত হয়েছে যে প্রক্ষোভ থেকে যে শারীরিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা থেকে সঞ্জাত উত্তেজনা আবার স্নায়ুপথ বেয়ে মস্তিষ্কে পৌছয় এবং সেখানে জাগরিত প্রক্ষোভের অনুভূতিকে তীব্রতর করে তোলে। অতএব শারীরিক উত্তেজনা প্রক্ষোভকে জাগাতে না পারলেও তাকে যে তীব্র বা বর্দ্ধিত করতে সাহায্য করে একথা আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন।

প্রক্ষোভের উৎপত্তি ও বিকাশ *

প্রাথমিক প্রক্ষোভের স্বরূপ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। সংখ্যা ও তীব্রতা উভয় দিক দিয়েই পরিণত ব্যক্তির প্রক্ষোভ নবজাত শিশুর চেয়ে যে অনেক বেশী এটি সর্ব্বজনীন অভিজ্ঞতা। অতএব নবজাতক জন্মের সময় কতকগুলি এবং কি প্রকৃতির প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মায় এবং কেমন করে সেই প্রাথমিক প্রক্ষোভ ধীরে ধীরে জটিল ও বহুমুখী হয় তা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে।

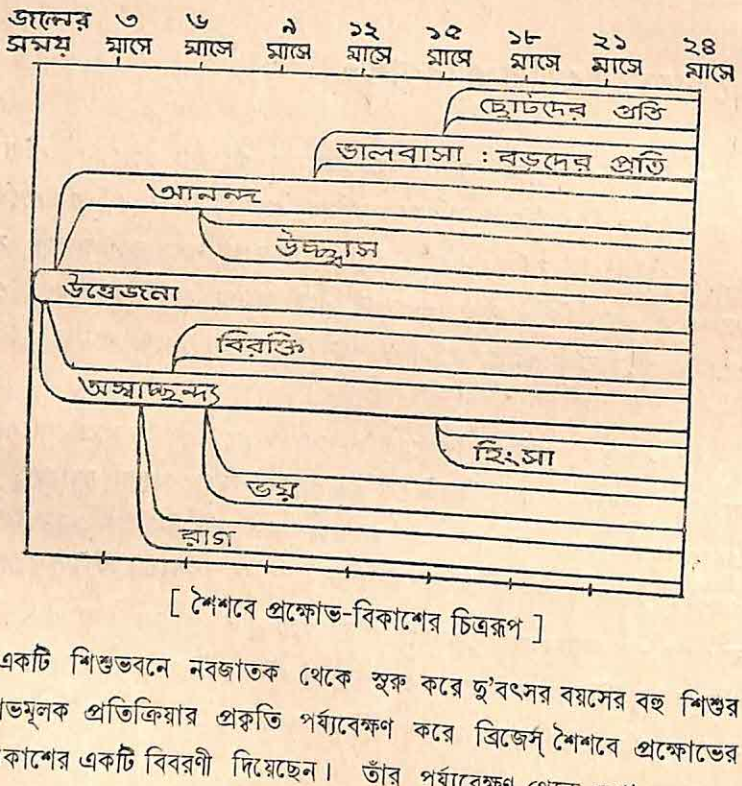
১৯২০ সালে ওয়াটসন শিশুদের পর্য্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে নবজাতক জন্মের সময় মাত্র তিনটি মৌলিক প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মায় যথা ভয়, রাগ এবং আনন্দ। ভয় আবার জাগাতে পারে মাত্র দুটি উদ্দীপক, যেমন উচ্চশব্দ এবং হঠাৎ পড়ে যাওয়া। রাগ জাগাতে পারে যে উদ্দীপকটি সেটি হল দৈহিক বাধাদান এবং আনন্দ জাগাতে পারে আদর করা, হাত বুলানো ইত্যাদি। কিন্তু পরে সার্মান (Sherman) প্রমাণ করেছেন যে এই তিনটি প্রক্ষোভের অভিব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয় না যদি না আগে থেকেই উদ্দীপকের স্বরূপটা আমাদের জানা থাকে।

অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার একটি মাত্র প্রাথমিক প্রক্ষোভের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন। আরউইন (Irwin) এই মৌলিক প্রক্ষোভের নাম দিয়েছেন সামগ্রিক সক্রিয়তা (mass activity)। ব্রিজেসের (Bridges) মতে

---

* শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান : ৩য় খণ্ড পৃঃ ২১—২৮ দ্রষ্টব্য

শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভটির নাম দেওয়া যায় উত্তেজনা (excitement)। একথা অবশ্য সত্য যে ছোট শিশুর প্রক্ষোভমূলক আচরণগুলির মধ্যে পার্থক্য করা খুবই শক্ত এবং দেখা গেছে যে যদি উদ্দীপকের প্রকৃত স্বরূপ না জানা থাকে তবে কেবলমাত্র শিশুর প্রতিক্রিয়া দেখে বিভিন্ন দর্শক কারণ হিসাবে বিভিন্ন প্রক্ষোভের উল্লেখ করে থাকেন। সেইজন্য বলা চলে যে নবজাতকের প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার কোন বিশেষ রূপ বা নির্দ্দিষ্ট ধারা নেই এবং সেটা রাগ, কি আনন্দ, কি ভয় থেকে উৎপন্ন একথা আচরণ দেখে বলা শক্ত।



[শৈশবে প্রক্ষোভ-বিকাশের চিত্ররূপ]

একটি শিশুভবনে নবজাতক থেকে সুরু করে দু'বৎসর বয়সের বহু শিশুর প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করে ব্রিজেস্ শৈশবে প্রক্ষোভের ক্রমবিকাশের একটি বিবরণী দিয়েছেন। তাঁর পর্য্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে নবজাতকের মধ্যে জন্মের সময় প্রক্ষোভ বলতে সাধারণ উত্তেজনা ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু দু' তিন মাসে তার মধ্যে আনন্দ এবং অস্বাচ্ছন্দ্য পরিষ্কার রূপে দেখা দেয়। তার পরের তিন মাসে অস্বাচ্ছন্দ্য বিশেষায়িত হয়ে রূপ নেয় রাগ, বিরক্তি এবং ভয়ের এবং ১২ মাসের সময় আনন্দ বিশেষায়িত হয়ে উচ্ছ্বাস এবং ভালবাসায় পরিণত হয়। হিংসা এবং ছোটদের প্রতি ভালবাসা

জাগে ১৫ মাসের সময়। যদিও বয়স অনুযায়ী এই বিভাগকে সর্ব্বজনীন বলে ধরে নেওয়া যায় না তবুও এই বিবরণী থেকে প্রক্ষোভের ক্রমবিকাশের একটা ধারণা পাওয়া যায়।

প্রাথমিক (Primary) ও মিশ্র (Secondary) প্রক্ষোভ

ম্যাক্‌ডুগাল প্রক্ষোভকে প্রাথমিক ও মিশ্র এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির মধ্যে একটি বিশেষ প্রক্ষোভ আছে। মানুষের ক্ষেত্রে এই সহজাত প্রবৃত্তির সংখ্যা সতেরটি। অতএব এই সতেরটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রগত প্রক্ষোভগুলিকেই তিনি প্রাথমিক (Primary) বলে বর্ণনা করেছেন।

এই প্রক্ষোভগুলি আবার একে অপরের সঙ্গে মিশে নতুন প্রক্ষোভের সৃষ্টি করতে পারে। এই নতুন প্রক্ষোভগুলির তিনি নাম দিয়েছেন মিশ্র (Secondary) প্রক্ষোভ। যেমন, ম্যাক্‌ডুগালের মতে কৃতজ্ঞতা হল মমতা এবং হীনমন্যতার মিশ্রণ, প্রশংসা হল বিস্ময় ও হীনমন্যতার মিশ্রণ, ঘৃণা হল ক্রোধ, বিরক্তি ও ভয়ের মিশ্রণ, লজ্জা হল হীনমন্যতা ও আত্মগরিমার মিলিত রূপ ইত্যাদি। এই ভাবে ম্যাক্‌ডুগাল মানবমনের সমস্ত জটিল প্রক্ষোভেরই একটা বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

জটিল প্রক্ষোভগুলির মধ্যে যে একাধিক মৌলিক প্রক্ষোভের প্রভাব পাওয়া যায় সে বিষয়ে সন্দেহ না থাকলেও ম্যাক্‌ডুগালের মত এত পরিষ্কার ও সহজভাবে সেগুলিকে যে বিশ্লেষণ করা যায় একথাটা আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন না। তাছাড়া প্রাথমিক প্রক্ষোভ বলতে ম্যাক্‌ডুগাল যা বোঝাতে চান সেই ধরনের একেবারে অমিশ্র প্রক্ষোভ বলে কিছু আছে কিনা সন্দেহ। বস্তুত পরিণত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সব প্রক্ষোভই অল্পবিস্তর মিশ্রধর্ম্মী।

প্রক্ষোভ ও শিক্ষা (Emotion & Education)

শিক্ষার উপর প্রক্ষোভের প্রভাব অত্যন্ত অধিক। যদিও প্রকৃতির দিক দিয়ে প্রক্ষোভ ও শিক্ষা বিপরীতধর্ম্মী, অর্থাৎ প্রক্ষোভ অনুভূতিমূলক ও

শিক্ষা জ্ঞানমূলক তবুও দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। প্রক্ষোভের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল যে প্রক্ষোভই আমাদের কাজের পিছনে প্রেষণা বা শক্তি জোগায়। ম্যাকৃডুগালের সংব্যাখ্যানে আমাদের সকল কাজের পেছনে আছে প্রবৃত্তির সক্রিয়তা এবং প্রতিটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রে আছে একটি ইচ্ছামূলক ও অনুভূতিমূলক শক্তি, যাকে আমরা সাধারণত প্রক্ষোভ বলে থাকি।

এখন শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রক্ষোভই অনুকূল নয়। এমন কতকগুলি প্রক্ষোভ আছে যেগুলি নিঃসংশয়ে শিখন প্রক্রিয়ার প্রতিকূল অর্থাৎ সেগুলি জাগলে শিখন প্রক্রিয়াটি ব্যাহত হবেই, যেমন, রাগ, ভয়, বিরক্তি, দুঃখ, হীনমন্যতা ইত্যাদি। আবার তেমনই কতকগুলি প্রক্ষোভ আছে যেগুলি শিখনকে সাহায্য করে থাকে, যেমন আনন্দ, বিস্ময়, কৌতূহল, সৃজনীস্পৃহা, আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ইত্যাদি। অবশ্য সময় সময় হীনমন্যতা, রাগ, ভয় প্রভৃতিও কিছু পরিমাণে শিখন-প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে থাকে, তবে সেগুলি স্বাভাবিক পন্থায় নয় মোটের এবং উপর ঐগুলির অমঙ্গলকর প্রভাব মঙ্গলকর প্রভাবের চেয়ে বেশী।

দ্বিতীয়ত, প্রক্ষোভ অনুকূলই হোক আর প্রতিকূলই হোক যদি অতি তীব্র হয়ে ওঠে তবে শিখনপ্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। প্রক্ষোভের প্রেষণা-শক্তি ততক্ষণ কার্য্যদায়ক থাকে যতক্ষণ প্রক্ষোভ মাত্রা ছাড়িয়ে যায় না। প্রক্ষোভ অতি তীব্র হলে দৈহিক ও মানসিক সাম্য উভয়ই নষ্ট হয়ে যায় এবং সহজে ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে কাজ করা ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় না। বিস্মরণের একটা বড় কারণ হল প্রাক্ষোভিক প্রতিরোধ। আনন্দ, ভয়, বিরক্তি প্রভৃতি যে কোন প্রক্ষোভই যখন অতি তীব্র হয়ে ওঠে তখন মনে করা, মনোযোগ দেওয়া, সুশৃঙ্খল চিন্তা করা ইত্যাদি মানসিক কাজগুলি ব্যক্তির পক্ষে সম্পাদন করা এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ এই প্রক্রিয়াগুলি শিখনের পক্ষে অপরিহার্য্য।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার সুসম্পাদনের জন্য প্রয়োজন (১) যাতে শিক্ষার্থীর মনে অনুকূল প্রক্ষোভ জাগে তা দেখা, (২) যাতে প্রতিকূল প্রক্ষোভ শিশুর শিক্ষা প্রচেষ্টায় বাধার সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে যত্ন নেওয়া এবং (৩) যাতে প্রক্ষোভ কখনই মাত্রা ছাড়িয়ে না যায় সে দিকে দৃষ্টি রাখা।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the nature and characteristics of emotional development of children. (B. T. 1952, 1953)

Ans. (পৃঃ ৯১—পৃঃ ৯৪ + ৩য় খণ্ড : পৃঃ ২১—পৃঃ ২৮)

2. Show how emotions are important in education. How would you ensure a proper emotional development in children ? What emotion would you culture ? (B. T. 1954)

Ans. (পৃঃ ৯১—৯৪ + ৩য় খণ্ড পৃঃ ২১—পৃঃ ২৮)

3. What is an emotion ? What are considered to be the primary emotions of children ? (B. A. 1954)

Ans. (পৃঃ ৯১—পৃঃ ৯৩)

4. Write notes on—James-Lange Theory. (B.A. 1957, B.T. 1959)

Ans. (পৃঃ ৮৬—পৃঃ ৯০)

পাঁচ

কয়েকটি প্রক্ষোভের বর্ণনা

মানব আচরণের উপর প্রক্ষোভের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। মানুষ যুক্তিধর্ম্মী বলে গর্ব্ববোধ করলেও তার অধিকাংশ আচরণের পিছনেই কিন্তু আছে নিছক প্রক্ষোভের নিয়ন্ত্রণ। অতএব শিক্ষার্থীর আচরণকে ভালভাবে বুঝতে হলে বিভিন্ন প্রক্ষোভের প্রকৃতি ও কার্য্য সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। নীচে কয়েকটি প্রধান প্রধান প্রক্ষোভের বর্ণনা দেওয়া হল।

রাগ (Anger)

বৈচিত্র্য ও তীব্রতার দিক দিয়ে রাগ নানা শ্রেণীর হতে পারে। সামান্য বিরক্ত হওয়া থেকে স্থরু করে রেগে আগুন হয়ে যাওয়া সবই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। হিংসার ক্ষেত্রে এই রাগই ভয়ের সঙ্গে, কখন কখনও বা দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। ঘৃণায় থাকে রাগ এবং ভয়।

অতি শৈশবে শিশুর রাগ হয় প্রধানত যখন তার কাজে বা ইচ্ছায় কেউ বাধা দেয়। কিন্তু পরে বড় হলে তার ইচ্ছা, পরিকল্পনা, সম্মান, কার্য্যাবলী প্রভৃতিতে সত্যকার বাধাদান ছাড়াও, বাধাদানের আশঙ্কাও রাগের সৃষ্টি করে। রাগ মানেই হচ্ছে একপ্রকারের মানসিক দুর্ব্বলতা। ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে আশঙ্কা এবং তার প্রকৃত যোগ্যতা—এ দুয়ের মধ্যে যত বেশী পার্থক্য বা অসমতা দেখা দেবে তত বেশী তার রাগের কারণ ঘটবে।

শৈশবে রাগের প্রকাশ থাকে সর্ব্বদৈহিক। সমস্ত দেহ দিয়েই শিশু প্রথম প্রথম রাগ প্রকাশ করে কিন্তু সে যত বড় হয় ততই তার রাগের অভিব্যক্তিগুলি বিশেষধর্ম্মী ও সুনির্দ্দিষ্ট হয়ে ওঠে। পরিণত ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাগের প্রকাশ নিছক রক্তচক্ষুতে বা ভ্রূকুঞ্চনে পর্য্যবসিত হতে পারে।

ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই ক্রোধের প্রকাশ ক্ষতিকর।

রাগের সময় অ্যাড্রেনালিনের নিঃসরণ, দৈহিক যন্ত্রপাতির অস্বাভাবিক কর্ম্ম-তৎপরতা বৃদ্ধি, অতিরিক্ত শর্করার নিঃসরণ এবং পরিপাচনক্রিয়ার স্থগিত-ভবন ইত্যাদি দেহের সাম্যভাবকে নষ্ট করে দেয়। তেমনই মনের সমতা ও স্বাস্থ্যের উপরও রাগের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর।

মনোবিজ্ঞানীরা শিশুর কোন্ বয়সে কি কি কারণে রাগ জন্মায় তার একটা বিবরণী দিয়েছেন। শিশুর ইচ্ছা, প্রচেষ্টা বা কর্ম্মপ্রয়াসের উপর যখনই কোনরকম বাধা বা প্রতিরোধ আরোপিত হয় তখনই তার মধ্যে রাগ দেখা দেয়। প্রথম শৈশবে রাগ দৈহিক কারণেই সীমাবদ্ধ থাকে। শরীরের সঞ্চালনে বাধা, শারীরিক অস্বস্তি, স্নান, খাওয়া, পোষাক পরা ইত্যাদি সাধারণ কাজে অসামর্থ্য বোধ প্রভৃতি কারণই খুব শৈশবে শিশুর রাগের সৃষ্টি করে থাকে। যেমন ঠিকমত মুখে খাবার তুলতে না পারলে বা পোষাক না পরতে পারলে তার মধ্যে রাগ দেখা দেয়।

তাছাড়া নিজের অক্ষমতা বা অসুবিধা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না বলে শিশুর রাগ আরও বেড়ে যায়। শিশু যদি বোঝে যে তার উপর যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হচ্ছেনা তাহলেও সে রেগে যায়।

আর একটু বড় হলে নানা মানসিক ও প্রাক্ষোভিক কারণে শিশুর রাগ হতে সুরু হয়। নিজের কোন সম্পত্তি বা অধিকারের সামগ্রীতে যদি কেউ হস্তক্ষেপ করে তাহলে সে রেগে যায়। সমবয়সীদের সঙ্গে খেলনা নিয়ে এ সময়ে প্রায় মারামারি লেগে থাকে। যদি তাকে কোন কাজ করতে বাধ্য করা হয় বা তার কোনও কাজ বা খেলায় বাধার সৃষ্টি করা হয় তাহলেও রাগ দেখা দিয়ে থাকে। শিশুকে বকাবকি করলে বা শাস্তি দিলে তার রাগ হয়। নিজে যদি কোন ভুল করে ফেলে বা যদি কোন খেলনা বা বস্তু ঠিকমত ব্যবহার করতে না পারে তাহলেও সে রেগে ওঠে। ছেলেমেয়েদের রাগমাত্রেরই একটা সর্ব্বজনীন বৈশিষ্ট্য হল যে যখন সে কোন না কোন রকম বাধ্যতামূলক চাপ অনুভব করে তখনই সে রেগে যায়। যেমন কোন কাজ করতে বা না করতে সে বাধ্য হচ্ছে, কোন ইচ্ছাকে দমন করতে বাধ্য হচ্ছে, কোন অসুবিধা অনুভব করতে বাধ্য হচ্ছে ইত্যাদির ক্ষেত্রে রাগ জন্মায়।

পরিণত ছেলেমেয়েদের মধ্যে রাগ সৃষ্টির প্রধান কারণগুলি হল, ইচ্ছার দমন, কাজে বাধাদান, আচরণের দোষ ধরা, সমালোচনা করা, বিরক্ত করা, বক্তৃতা দেওয়া, বা লম্বা উপদেশ দেওয়া, অপ্রীতিকর তুলনা করা ইত্যাদি। তাছাড়া

অবহেলিত হওয়া, ভর্ৎসিত হওয়া, অপরের হাস্য বা বিদ্রূপের পাত্র হওয়া, অন্যায় ভাবে শাসিত হওয়ার বোধ জন্মান, অন্যান্য ছেলেমেয়েদের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়া প্রভৃতি ঘটনাগুলিও পরিণত বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে রাগসৃষ্টির প্রবল কারণরূপে কাজ করে থাকে। পরে যখন তার আগ্রহ ক্রমশ বাড়ী ছেড়ে বাইরের সমাজে সঞ্চালিত হয় তখন বহির্জগতের নানা প্রতিবন্ধক, অসুবিধা তাকে প্রতিপদে বিরক্ত করে তুলতে থাকে।

প্রাপ্তযৌবনে এই প্রতিবন্ধকের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং ছেলেমেয়েদের রাগও সেইভাবে বেড়ে চলে। এই বয়সে রাগের একটা সাধারণ কারণ হল তাদের মনে এই ধারণা জন্মায় যে তারা অন্যায়ভাবে শাসিত বা ভর্ৎসিত হচ্ছে। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের নিজেদের ঈপ্সীত লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌছনর ক্ষমতা —এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধানই হল এই বয়সে রাগের আর একটি বড় কারণ। এ ব্যবধান যত বাড়তে থাকে তত রাগের তীব্রতা বাড়ে।

আরও পরিণত বয়সে ব্যর্থতা ও আশাভঙ্গ রাগের প্রধান উদ্দীপকরূপে কাজ করে থাকে। এই ব্যর্থতা বা আশাভঙ্গ নানা কারণে ঘটতে পারে। ব্যক্তির নিজের সুখ সুবিধা, প্রিয়জনের আনন্দ ও উন্নতি, সামাজিক স্বীকৃতি, অর্থ, মান প্রতিপত্তির কামনা মানুষের নানা প্রয়োজনের তরঙ্গ বহির্জগতের রূঢ় বাস্তবের শৈলে ধাক্কা লেগে ফিরে আসে আর ব্যক্তির মধ্যে রাগের সৃষ্টি হয়।

রাগের প্রকাশও শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হতে থাকে। প্রথম প্রথম নিছক শারীরিক অভিব্যক্তিতেই রাগ সীমাবদ্ধ থাকে, তারপর যত শিশু বাইরের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয় ততই সে তার রাগের বহিপ্র্রকাশকে সঙ্কুচিত করতে বাধ্য হয়। তার ফলে রাগের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্ত্তিত হয়ে নানা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। চীৎকার, কান্না, হাত পা ছোঁড়া প্রভৃতি শৈশবের আচরণগুলি সংযত হয়ে মার্জ্জিত ও সমাজসম্মত আকার নেয়।

তবে সময় সময় রাগের উপকারিতাও থাকে। রাগ ব্যক্তির আলস্য, উদাসীনতা ও নিরুৎসাহ প্রভৃতি দূর করে দিয়ে তাকে কাজে প্রবৃত্ত করতে পারে। কখনও কখনও শিশুর রাগ দেখে পিতামাতা বা শিক্ষক নিজেদের ব্যবহারের ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হতে পারেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাগ ব্যক্তির এবং তার পরিবেশের আর সকলের পক্ষে অমঙ্গলকরই হয়ে থাকে।

বারবার রাগ হতে হতে শেষে রাগ অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন

শিশুর পক্ষে রাগকে সংযত করা দুরূহ হয়ে ওঠে। এইজন্য শিশুর রাগের কারণটি আগে থেকে দূর করা এবং যাতে শিশুর রাগ অভ্যাসে পরিণত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন।

অবশ্য সব সময় শিশুর রাগকে দমন করা উচিত নয়। যেখানে ব্যর্থতা থেকে রাগ হয় সেখানে ব্যর্থতা দূর করার কোন ব্যবস্থা না করে কেবলমাত্র রাগ দমন করলে শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ ব্যাহতই হয়। সেজন্য শিশুর রাগকে অসামাজিক পথে প্রকাশিত হতে না দিয়ে সমাজসম্মত পথে যাতে প্রকাশ পায় তার ব্যবস্থা করাই হল সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায়।

শিশুর রাগের কারণগুলি যাতে না থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রথম দরকার। অনর্থক তার আচরণ বা ইচ্ছায় বাধা সৃষ্টি না করা উচিত। যে সকল কাজ শিক্ষার্থীর কাছে রুচিকর নয় সেগুলি তাকে করতে না দেওয়াই ভাল। দুরূহ কাজ, একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি, অনর্থক অবরোধ, অসম্ভব দাবী ইত্যাদি যতদূর সম্ভব বর্জন করা উচিত। শিশুকে হুকুম করা বা তার অসাফল্য নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা একেবারে বর্জনীয়। তাছাড়া জোর করে বা শাস্তির ভয় দেখিয়ে শিশুর কাছ থেকে কাজ আদায় করার প্রথাটিও অতি ক্ষতিকর।

শিক্ষার্থীর রাগের চিকিৎসা করতে গিয়ে নিজে রেগে যাওয়াটা সব চেয়ে ক্ষতিকর। যথেষ্ট বিচক্ষণতার সঙ্গে ও শান্তভাবে শিক্ষার্থীর রাগের কারণ নির্ণয় করা এবং সহানুভূতি ও বিবেচনার সঙ্গে তার মীমাংসা করাই পিতামাতা ও শিক্ষকের কর্ত্তব্য।

ভয় (Fear)

রাগের মত ভয়ও মাত্রা ও প্রকাশের দিক দিয়ে নানা প্রকারের হতে পারে। সামান্য আশঙ্কা বোধ করা থেকে সুরু করে ভয়ে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যেতেও পারে। শিশুর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে উচ্চ শব্দ বা হঠাৎ পড়ে যাওয়া এ দুটি কারণই একমাত্র ভয় জাগাতে পারে। কিন্তু পরিণত মানুষের ক্ষেত্রে ভয় জাগাতে সক্ষম এমন উদ্দীপক সংখ্যায় যেমন প্রচুর, প্রকৃতিতেও তেমনই বহুবিধ।

বিভিন্ন পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখা গেছে যে শিশুর ভয় জাগার উৎস তিন রকমের। প্রথম, কতকগুলি ভয় শিক্ষাপ্রসূত বা অভিজ্ঞতাপ্রসূত। স্বাভাবিক ভয়ের কারণগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে অনেক ক্ষেত্রে অবান্তর বিষয়েতেও ভয় সংযুক্ত হয়ে যায়। যেমন উচ্চশব্দ বা অন্ধকারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার ফলে শিশু অনেক নির্দোষ বস্তুকেও ভয় করতে শেখে। দ্বিতীয়, ভীত ব্যক্তিকে অনুকরণ করে শিশু অনেক ক্ষেত্রে নতুন বস্তুকে ভয় করতে শেখে। যেমন, ভূমিকম্প, ঝড়বৃষ্টি ইত্যাদিকে শিশু ভয় করতে শেখে তার মা-বাবা, বড় ভাই বোনদের ভীতিমূলক আচরণ দেখে। তৃতীয় ভয়ের উৎস হল অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা। যেমন ডাক্তার, দাঁতের ডাক্তার, হাসপাতাল, বড় বড় জন্তু, অমার্জ্জিত রুক্ষ মানুষ ইত্যাদির সংস্পর্শে এসে শিশু ঐ সব বস্তুকে ভয় করতে শেখে। অপ্রীতিকর স্বপ্ন থেকেও ঐ ধরনের ভয় জেগে থাকে।

ভয়ের উদ্দীপক যতই বিভিন্ন হোক না কেন, এক কথায় বলা চলে যে যখনই প্রাণীর সঙ্গতিবিধানের সামর্থ্যের চেয়ে উদ্দীপকের চাহিদা আকস্মিক ভাবে বেড়ে যায় তখনই প্রাণীর মধ্যে ভয় জাগে। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের অক্ষমতা সম্বন্ধে প্রাণীর সচেতনতার নামই ভয়। শৈশবে এই অক্ষমতা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়মূলক বা দৈহিক সঙ্গতিবিধানে সীমাবদ্ধ থাকে, পরে শিশু যত বড় হয় ততই তার ভয় দৈহিক সঙ্গতিবিধানের গণ্ডী ছেড়ে সামাজিক সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে সঞ্চালিত হয়। ভয় দুশ্রেণীর। কারণজাত (rational) ও অকারণ (irrational)। অনেক ভয় সত্যকারের কারণ থেকে জন্মায়, আবার অনেক ভয় মিথ্যা বা অবাস্তব কোন ধারণা বা বিশ্বাস থেকে তৈরী হয়ে থাকে। তবে কারণজাতই হোক আর অকারণই হোক, ভয় মাত্রেই শিশুর অভিজ্ঞতা থেকে জন্মায়।

ওয়াটসন ব্যাপক পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে ভয় হচ্ছে একটি সহজাত প্রক্ষোভ এবং মাত্র দুটি উদ্দীপক নবজাতকের মধ্যে ভয় জাগাতে সমর্থ। প্রথমটি হল উচ্চশব্দ, দ্বিতীয়টি হল হঠাৎ ভারসাম্য হারান। নবজাতক এই দুটি কারণ ছাড়া অন্য কিছুতে ভয় পায় না। তবে যত সে বড় হয় তার ভয় এই দুটি উদ্দীপক থেকে আরও অন্যান্য উদ্দীপকে অনুবর্ত্তন প্রক্রিয়ার (Conditioning) মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়ে যায়।

প্রথম প্রথম শিশুর ভয় নিছক মূর্ত্তবস্তু এবং তার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু তিন চার বছর বয়স থেকেই কাল্পনিক এবং দূরবর্ত্তী নানা উদ্দীপকে

তার ভয় বিস্তৃত হয়ে যায়। এই সময় শিশুর ভয়মূলক উদ্দীপকের সংখ্যা অগণিত হয়ে ওঠে। আর একটু বড় হলে তার এই অমূলক ভয়ের কারণগুলি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয় এবং বাস্তব বস্তু বা পরিস্থিতিতে ভয় কেন্দ্রীভূত হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই শৈশবকালীন ভয়ের কারণগুলি দূর হয় না এবং বহু পরিণত ব্যক্তির মধ্যে অন্ধকার, উচ্চশব্দ, ভূত-প্রেত প্রভৃতি শৈশবকালীন ভয়ের উদ্দীপক-গুলি কার্য্যকরী থেকে যায়।

দশ বার বছরের শিশুর মধ্যে বাস্তব বস্তুর চেয়ে মানসিক বা অবাস্তব বস্তুর প্রতি বেশী ভয় জাগতে দেখা যায়। ভূত, প্রেত, ইত্যাদি দৈব বা অপ্রাকৃত বস্তু, দৈত্য দানব প্রভৃতি নানা কাল্পনিক প্রাণী, মৃত্যু, আঘাত পাওয়া, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ, নানা গল্পে পড়া বা শোনা বা সিনেমায় দেখা বিভিন্ন চরিত্র ইত্যাদির প্রতি ভয় তার মধ্যে দেখা দেয়।

শিশু আর একটু বড় হলে ভয়ের কারণ সামাজিক স্তরে উন্নীত হয়ে যায়। তখন অপরের নিন্দা, বিরাগ বা সামাজিক লাঞ্ছনা প্রভৃতিকে শিশু শারীরিক বিপদের চেয়ে বেশী ভয় করতে সুরু করে।

শৈশবকালীন ভয়ের মধ্যে অন্ধকারের ভয় একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। ওয়াটসনের মতে উচ্চশব্দ থেকে অনুবর্ত্তিত (conditioned) হয়ে অন্ধকারেতে শিশুর ভয় সঞ্চারিত হয়। শৈশবকালের আর একটি ভয় হল একা একা থাকা বা পরিত্যক্ত হবার ভয়। শিশুর অসহায়ত্ব ও দুর্ব্বলতাই তাকে পূর্ণভাবে অপরের উপর নির্ভরশীল করে তোলে এবং তাই থেকেই একা থাকা বা পরিত্যক্ত হবার ভয়টা তার মধ্যে দেখা দেয়। ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী শৈশবকালে শিশুর মধ্যে পিতা কর্ত্তৃক অঙ্গহানির একটা ভয় দেখা দেয়। অতি শৈশবে মার প্রতি শিশুর যৌন আসক্তি জন্মায় এবং সে ভয় পায় যে তার এই অবৈধ কামনার শাস্তিস্বরূপ পিতা তার যৌনাঙ্গের ক্ষতি করবেন। ফ্রয়েড এই মনোভাবের নাম দিয়েছেন কাষ্ট্রেসান (castration) কমপ্লেক্স।

প্রক্ষোভ হিসাবে ভয় নিকৃষ্টতম ও অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই প্রক্ষোভটি মানসিক স্বাস্থ্যকে বিশেষভাবে বিপর্য্যস্ত করে ও ব্যক্তির সুষ্ঠু বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ভয়ের প্রভাব ধ্বংসমূলক। সঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্য থেকে ভয় জন্মায়, কিন্তু ভয় বাড়তে থাকলে সেই অসামর্থ্য আরও বেড়ে যায়

এবং যতটুকু সঙ্গতিবিধান ব্যক্তির আয়ত্তাধীন তাও করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

ভয় ব্যক্তির মানসিক দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসকে নষ্ট করে দেয়। ভীত ব্যক্তি সব চেয়ে বেশী করুণা করে নিজেকেই। ভয় থেকে মুক্তি পাওয়ার পর প্রায়ই আত্মগ্লানি বা আত্মতাচ্ছিল্য দেখা যায়।

ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলি অনেক ক্ষেত্রে ভয়ের জন্য পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে না। ফলে মনের মধ্যে দুর্ব্বলতা ও অসম্পূর্ণতা চিরস্থায়ীভাবে থেকে যায়।

এই সকল কারণে শিশুর মধ্যে যাতে ভয় বাসা বাঁধতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। শৈশবে যাতে নানা অকারণ ও অবাস্তব ভয় এসে শিশুর মনকে দুর্ব্বল না করে ফেলে সেদিকে দেখা শিক্ষকের প্রথম কর্ত্তব্য। শিশুর অভিজ্ঞতাগুলিকে ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত করা এবং কোন আকস্মিক আঘাতধর্ম্মী অভিজ্ঞতা (Trauma) যাতে শিশুকে ভয়গ্রস্ত না করে সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

দুশ্চিন্তা ভয়ের সহগামী। বহু অবাস্তব ভয় পরিণত বয়সে দুশ্চিন্তার রূপ নিয়ে দেখা দেয় এবং সুস্থ মানসিক প্রক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। এই ধরনের অবাস্তব ভয় (Phobia) মানসিক শক্তি ও সহজাত সম্ভাবনাগুলিকে নষ্ট করে দেয় এবং অনেক সময় মনোবিকারের কারণ হয়েও ওঠে।

কারও কারও মতে ভয়ের উপকারিতাও আছে। যেমন ভয় মানুষকে দুঃসাহসিক কাজ থেকে বিরত করে, অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করে, নিয়ন্ত্রিত আচরণ করতে বাধ্য করে এবং নিয়মানুবর্ত্তী ও অনুগত করে তোলে। একথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে অন্যায় বা অবাঞ্ছিত কাজ থেকে নিবৃত্ত করায় ভয়ই প্রবলতম উপকরণ। সামাজিক সংগঠনের শৃঙ্খলা ও নিয়মকানুন বজায় রাখায় ভয় যে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধক রূপে কাজ করে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমাজে প্রচলিত অনুশাসন ও বিধিনিষেধগুলি এবং সেগুলির সঙ্গে সংযুক্ত শাস্তির ভীতি ও পুরস্কারের প্রলোভন শিশুর মধ্যে ছেলেবেলা থেকেই অসামাজিক কাজের প্রতি ভীতি জাগিয়ে তোলে এবং পরে এই ভীতিই তাকে সমাজ অনুমোদিত পথে জীবন কাটাতে বাধ্য করে। অসাধুতা, অপহরণ, প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা, প্রভৃতি অসামাজিক আচরণ থেকে শিশু নিন্দা বা শাস্তির ভয়ে বিরত থাকে।

এই মতের মধ্যে যথেষ্ট সত্য থাকলেও শিশুর মধ্যে ভয় জাগান বা তাকে ভয়গ্রস্ত করে বাঞ্ছিত আচরণ করতে বাধ্য করার পক্ষে এটি কোন মতেই যুক্তি হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

স্বাভাবিক ও সহজ পথে যদি শিশুর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করা না হয় তবে ভয় দেখানোর মত অস্বাভাবিক পন্থার সাহায্য নেওয়া সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তাছাড়া মনের উপর ভয়ের ক্ষতিকর প্রভাব এত বেশী যে কোন মতেই ভয়কে পোষণ করার পক্ষে মত দেওয়া যায় না।

তবে সামাজিক শাস্তি, নিন্দা প্রভৃতির প্রতি ভয়কে কিছুটা সমর্থন করা যায়। কিন্তু যুক্তির দিক দিয়ে দেখতে গেলে সামাজিক আদর্শের প্রতিও আনুগত্য আনা উচিত সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে, ভয় বা অন্য কোন অস্বাভাবিক পন্থায় নয়।

আনন্দ (Pleasure, Joy and Delight)

আনন্দও সামান্য তৃপ্তির অনুভূতি বা আরামবোধ থেকে সুরু করে উদ্দাম উচ্ছ্বাসের রূপ নিতে পারে। আনন্দ আসে চাহিদার তৃপ্তি থেকে। প্রাণী-দেহের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য কতকগুলি জৈবিক চাহিদা বা প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই চাহিদাগুলির তৃপ্তি প্রাণীর অস্তিত্ব বজায় রাখাকে সম্ভব করে তোলে এবং ফলে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ অনুভূত হয়। ক্ষুধা, যৌন চাহিদা, বিশ্রাম বা নিদ্রার চাহিদা, দেহের সংরক্ষণমূলক চাহিদা ইত্যাদির তৃপ্তি থেকে আনন্দের প্রাথমিক উৎপত্তি।

শিশু যত বড় হয় ততই এই প্রাথমিক উদ্দীপকগুলি থেকে তার আনন্দের বোধ ক্রমশ অন্যান্য উদ্দীপকে সঞ্চালিত হয়। প্রথম প্রথম সে যে সকল তুচ্ছ ঘটনা বা বস্তু থেকে আনন্দ পেত, একটু বড় হলে সেগুলি তার কাছে অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমশ সে তার যতই চতুষ্পার্শ্বের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিতি হয়ে ওঠে ততই তার আনন্দের উৎসেরও প্রকৃতি বদলে যায়। সে তখন অপরের প্রশংসা, সামাজিক স্বীকৃতি, সমর্থন, বন্ধুত্ব প্রভৃতি থেকে আনন্দ আহরণ করে।

সামাজিক জীবনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর চাহিদা আর দৈহিক ব্যাপারে সীমাবদ্ধ থাকে না, ধীরে ধীরে নানা মানসিক ও সামাজিক ব্যাপারে সঞ্চালিত হয়ে যায়। ফলে দৈহিক চাহিদার তৃপ্তির চেয়ে এইসব নতুন মানসিক ও সামাজিক চাহিদার তৃপ্তিতে সে অধিকতর আনন্দ লাভ করে। পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শিশুর আনন্দ জন্মের প্রথম দিকে থাকে সম্পূর্ণ আত্ম-সীমিত। সে বাইরের জগৎ থেকে তখনও আনন্দ আহরণ করতে শেখে না। ছমাস বয়সে এই আনন্দ থেকে জন্ম নেয় উচ্ছ্বাস (elation)। তখনও শিশুর আনন্দের কারণ থাকে নিছক দৈহিক ও ইন্দ্রিয়স্থলভ পরিতৃপ্তি। কিন্তু ১০।১১ মাস বয়স থেকে দেখা যায় যে সে মা, বাবা ভাই বোন প্রভৃতি বহির্জগতের লোকদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ সময় থেকে তার মানসিক বা সামাজিক চাহিদা বোধ জাগতে থাকে বলা চলতে পারে এবং ক্রমশ তার এই মানসিক চাহিদা-গুলির তৃপ্তিই তার আনন্দের একটা বড় উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

ছোট শিশুর আনন্দের প্রধান কারণ হল শারীরিক সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দ্য। তাছাড়া যতই সে নতুন কাজ করতে সমর্থ হয় ততই তার আনন্দ আরও বেড়ে উঠে। মুখে শব্দ করা, চেঁচান, হামাগুড়ি দেওয়া, হাঁটা, দাঁড়ান ইত্যাদি কাজগুলি করায় সে প্রচুর আনন্দ পায়। জেরসিল্ডের পরীক্ষণে দেখা গেছে যে যখন শিশুর কাছে কোন কাজ শক্ত বলে মনে হয় বা কোন কাজ করতে সে বাধার সম্মুখীন হয় তখন তার আনন্দ আরও বেড়ে ওঠে। তাছাড়া যখন সে অন্যদের সঙ্গে খেলাধূলা করে তখনও সে প্রচুর আনন্দ পায়। শিশুর আনন্দপ্রকাশের রূপ হল হাসি, তার সঙ্গে শব্দ করা, হাত পা ছোড়া, মাথা নাড়া ইত্যাদিও।

শিশু আর একটু বড় হলে নিঃসঙ্গ সম্পর্কহীন বস্তুর চেয়ে যে সব পরিস্থিতিতে আরও অন্যান্য ছেলেমেয়ে থাকে সেই সব পরিস্থিতি থেকে বেশী আনন্দ পেতে স্বরু করে। অন্যান্য ছেলেমেদের সঙ্গে সে খেলে আনন্দ পায়। এই সময় থেকে শিশু কমিক কার্টুন বা হাসির ছবি দেখে আনন্দ পেতে শেখে। অপরকে বিরক্ত করে বা অপ্রতিভ করে বা অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলেও সে আনন্দ পায়।

যখন সে আরও বড় তখন সে অদ্ভুত কিছু দেখলে বা শুনলে হাসে এবং নিজেও রসিকতা করতে শেখে। নিজের সাফল্যে বা নিজেকে উন্নত প্রমাণ করে সে আনন্দ পায়। সে সব কাজ করতে বারণ সেই সব কাজ করতে বা তা নিয়ে আলোচনা করেও সে আনন্দ লাভ করে। এই বয়সে উচ্চ বা মৃদু হাসি হল আনন্দের সাধারণ

প্রকাশ। আনন্দের সময় সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা শিথিল বা শ্লথ ভাব অনুভূত হয়।

প্রাপ্তযৌবনের ক্ষেত্রে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা তার আনন্দবোধকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। যেমন, সক্রিয়তার চাহিদা ও সৃজন বা উদ্ভাবনের চাহিদা, জানবার চাহিদা, দায়িত্ব গ্রহণের চাহিদা, সঙ্গী বা সঙ্গিনীর চাহিদা ইত্যাদি চাহিদাগুলির তৃপ্তি তার আনন্দের প্রধান উদ্দীপক হয়ে দাঁড়ায়।

ব্যক্তির উপর প্রভাবের দিক দিয়ে প্রক্ষোভগুলির মধ্যে আনন্দ সর্ব্বোত্তম। দেহমনের সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধি এবং মানসিক স্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার দিক দিয়েও আনন্দের প্রভাব সবচেয়ে বেশী।

শিশুর ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদাগুলি যদি যথাযথ তৃপ্তিলাভ করে তবে তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সুষ্ঠ ও স্বাস্থ্যময় হবে। আর যদি কোন কারণে কোন চাহিদাটি অবদমিত হয় তবে তা তার মানসিক স্বাস্থ্যকে বিপর্যস্ত করে তুলবে। শিশুদের মধ্যে যত আচরণমূলক অসঙ্গতি দেখা যায় সে সকলেরই মূলে আছে চাহিদার অতৃপ্তি।

শিক্ষায় আনন্দের প্রভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ। থর্নডাইকের শিখনের ফললাভের সূত্র থেকে দেখা যায় যে আনন্দ বা তৃপ্তিলাভ শিখনকে সম্ভবপর ও স্থায়ী করে। শাস্তি এবং পুরস্কারের উপর যতগুলি গবেষণা হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে আনন্দ বা তৃপ্তি হচ্ছে শিক্ষার পরম সহায়ক। যে শিখনে শিশু তৃপ্তি বা আনন্দ পায় তা সে স্বাভাবিক ও স্বতঃপ্রণোদিতভাবে গ্রহণ করে আর যেখানে সে আনন্দ পায় না তা সে পরিহার করে।

এই থেকেই জন্মেছে আধুনিক কালের শিক্ষাকে শিশুর আগ্রহ-ভিত্তিক করার আন্দোলন। শিশুর শিক্ষা জন্ম নেবে শিশুর চাহিদা থেকেই এবং তার ফলে স্বেচ্ছায় সে শিক্ষাকে গ্রহণ করবে কেননা সে শিক্ষা হবে শিশুর আনন্দের স্বাভাবিক উৎস।

ভালবাসা (Affection and Love)

ভালবাসা হল আনন্দের প্রতিক্রিয়া। কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ভালবাসা জন্ম নেয় ঐ বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে আনন্দকর অভিজ্ঞতা বা প্রতিক্রিয়া থেকে।

সাধারণত ছোট শিশুর শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যারা যত্ন নেয়, যারা তার সঙ্গে খেলাধূলা করে, যারা তাকে কোন না কোন উপায় আনন্দ দান করে তাদের প্রতি তার ভালবাসা জন্মায়। বস্তুর সম্বন্ধেও একই কথা। যে সব বস্তু থেকে সে কোন রকমে আনন্দ পায় সেই সব বস্তুকে সে ভালবাসে। প্রকৃতপক্ষে ভালবাসামাত্রেই অনুবর্ত্তন প্রক্রিয়ার ফল। বস্তু ও ব্যক্তি থেকে সঞ্জাত আনন্দ ঐ বস্তু বা ব্যক্তিতে অনুবর্ত্তিত হয়।

শিশুর ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশে যে প্রক্ষোভটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ অভিনয় করে সেটি হল এই ভালবাসা। ভালবাসা প্রক্ষোভটি দ্বিমুখী—অপরের কাছ থেকে তার ভালবাসা পাবার আকাংক্ষা এবং অপরের প্রতি ভালবাসার অনুভূতি। শিশু যখন প্রথম পৃথিবীতে আসে তখন সে থাকে সম্পূর্ণ অক্ষম, অসহায় ও অপরের সাহায্য ও যত্নের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এই সময় শিশুর মনের স্বাস্থ্যময় সংগঠনের জন্য প্রয়োজন তার প্রতি বড়দের যথেষ্ট মনোযোগ, সস্নেহ যত্ন, আদর, ভালবাসা ইত্যাদি। যে শিশু উপযুক্ত পরিমাণে এই ভালবাসা পায় তার ব্যক্তিসত্তা স্বাস্থ্যময় ও সুপরিণত হয়ে ওঠে। আর যে শিশু কোন কারণে এই ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয় তার মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাহত হয় এবং তার ব্যক্তিসত্তা দুর্ব্বল বা জটিলতা-সম্পন্ন হয়ে ওঠে। আবার তেমনই অপর পক্ষে শিশুকে অতিরিক্ত আদর বা ভালবাসা দেখালে বিপরীত ফল হয়ে থাকে। শিশুর প্রতি মাতাপিতার ভালবাসা অনেক সময় মাত্রা ছাড়িয়ে যায় এবং তার স্বনির্ভর হবার পথে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া অতিরিক্ত আদর, যত্ন বা স্নেহের আবহাওয়ায় শিশু মানুষ হলে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং বহু কৃত্রিম ও বিকৃত মানসিক ধারণা তার মনে বাসা বাঁধে। ফলে যখন সে বড় হয় তখন তার পক্ষে বাস্তব পরিবেশে সঙ্গতিবিধান করা একেবারে অসম্ভব হয়ে ওঠে। সাধারণত পিতামাতার একমাত্র সন্তানদের ক্ষেত্রে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতএব শিশুকে ভালভাবে মানুষ করতে হলে যেমন তার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ, যত্ন ও ভালবাসা দরকার তেমনই দেখা উচিত এগুলি যেন মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। ভালবাসা যেন তার স্বাস্থ্যময় ও স্বাভাবিক ব্যক্তিসত্তা গঠনের সহায়ক হয়ে ওঠে, প্রতিবন্ধক না হয়ে দাঁড়ায়।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কটিও যেন ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষকের প্রকৃত কর্ত্তব্য নিছক শিক্ষাদানে সীমাবদ্ধ নয়, সত্যকারের সহানুভূতি ও

ভালবাসার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে আত্মীয়ের স্তরে উন্নীত করা শিক্ষকের কর্ত্তব্যের প্রধান অঙ্গ। কেবল মাত্র শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য নয়, শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াটিকেও কার্য্যকরী করে তোলার জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কটি পারস্পরিক প্রীতি ও অনুরাগের ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

বিকাশমান শিশুর মনের চাহিদাগুলির মধ্যে নিরাপত্তার চাহিদা এবং আত্মস্বীকৃতির চাহিদা হল দুটি প্রধান চাহিদা এবং এগুলির তৃপ্তি হয় শিশু যখন বোঝে যে সে অপরের ভালবাসা এবং অনুরাগের পাত্র।

শিশু যেমন অপরের ভালবাসা চায় তেমনই সে অপরকে ভালবাসতেও স্বাভাবিক প্রেরণা অনুভব করে। দেখা গেছে এক বছর বয়স থেকেই শিশুর মধ্যে বড়দের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ পায় এবং বছর দেড়েক বয়স থেকেই অন্যান্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতিও তার অনুরাগ জন্মায়।

পাঁচ ছমাস থেকে শিশু তার পরিবারের ব্যক্তিদের ভালবাসতে শেখে। এই সময় থেকে সুরু হয় তার সামাজিক সংযোগ। যতই সে লোকেদের সংস্পর্শে আসে এবং সুখের অভিজ্ঞতা লাভ করে তত বেশী সংখ্যক লোকদের সে ভালবাসতে শেখে। একটা দ্রষ্টব্য বিষয় হল যে শিশুর ভালবাসা মুখ্যভাবে ব্যক্তিকে নিয়েই গড়ে ওঠে, গৌণভাবে গড়ে ওঠে জড়বস্তু নিয়ে। বানহামের পর্য্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যে জড়বস্তুর প্রতি শিশুর ভালবাসা জন্মায় সেটিকে সে প্রকৃতপক্ষে তার কোন প্রিয় ব্যক্তির প্রতীক বা বিকল্প বলে মনে করে। এর পরের ধাপে সে তার পরিবারের গণ্ডীর বাইরের ব্যক্তিদের ভালবাসতে শেখে। এসব ব্যক্তিরাই তাকে তার বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে সাহায্য করে এবং শিশু এদের তার "বন্ধু" বলে মনে করে।

শিশু যখন আরও বড় হতে থাকে তত সে বাইরের ছেলেমেয়ে ও বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতি অনুরক্ত হতে থাকে। বাড়ীর গণ্ডী ছাড়িয়ে বাইরের বস্তু বা ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শিশুর ভালবাসার এই সঞ্চালন তার সামাজিক জীবনবিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ সোপান। সুষ্ঠু সমাজ জীবনের বিকাশের জন্য গৃহের প্রতি শিশুর প্রাক্ক্ষোভিক আসক্তি হ্রাস পাওয়া একান্ত দরকার।

এর পরের স্তরে শিশুর ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা ধীরে ধীরে অ-ব্যক্তিতে সঞ্চালিত হয়। স্কুল, ক্লাব, অন্যান্য সামাজিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংঘ, খেলার

দল প্রভৃতি শিশুর আন্তরিক ভালবাসার বস্তু হয়ে ওঠে এবং দলের প্রত্যেকটি সদস্যের প্রতি একটা প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন দেখা দেয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর এই ভালবাসার মূল্য অনেকখানি। বিদ্যালয়, শিক্ষক, শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষার লক্ষ্য প্রভৃতি সকলের প্রতিই যদি শিশুর আন্তরিক আসক্তি না জন্মায় তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। শিক্ষা-প্রচেষ্টার প্রাথমিক লক্ষ্যই হল সমস্ত শিক্ষা-প্রক্রিয়াটির উপর শিশুর আন্তরিক অনুরাগ বা আসক্তি সৃষ্টি করা।

যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ভালবাসা যৌনস্তরে উন্নীত হয়। অবশ্য ফ্রয়েডের সংব্যাখ্যানে শিশুর ভালবাসা প্রথম থেকেই যৌনপ্রকৃতির। এই সময় সঙ্গী বা সঙ্গিনীর প্রতি ছেলেমেয়েদের বিশেষ আসক্তি দেখা দেয় এবং পরিবার-গঠনের অভিলাষ ধীরে ধীরে তাদের মনে বাসা বাঁধে। এই সময়ে ছেলেমেয়েদের পরিণত মনে জাতীয়তাবোধ, দেশভক্তি, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ জন্মায় এবং এই বহুধা আসক্তি ও অনুরাগ তাদের ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করে।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the nature of fear and anger. How far do they affect the child's personality ?

Ans. (পৃঃ ৯৬—পৃঃ ১০৩)

2. What are the effects of the emotion of pleasure in the child's life.

Ans. (পৃঃ ১০৩—পৃঃ ১০৫)

3. Discuss the educational value of the emotion of love.

Ans. (পৃঃ ১০৫—পৃঃ ১০৮)

ছয়

জাবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তর (Stages of Development)

প্রত্যেক মানুষই তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের উপযোগী নানারকম দৈহিক ও মানসিক উপকরণ নিয়ে জন্মায়। কিন্তু তার জন্মের সময় সেগুলি থেকে নিতান্ত অপরিণত অবস্থায়। তারপর যতই দিন যেতে থাকে ততই সেগুলি এক আভ্যন্তরীণ বিকাশমূলক শক্তির প্রভাবে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করতে থাকে এবং এমন একদিন আসে যখন সেগুলি পূর্ণ পরিণতিতে পৌছয়। মানব-সত্তার এই জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তরের আমরা বিভিন্ন নাম দিয়ে থাকি, যেমন শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবনাগম, বয়ঃপ্রাপ্তি ইত্যাদি। এই স্তরগুলির বিভাগ সম্পূর্ণ কল্পনাজাত এবং এদের স্থায়ীত্ব সম্বন্ধেও বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ডক্টর আরনেষ্ট জোনসের মতে শৈশব থাকে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত, বাল্যকাল বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, যৌবনাগম বার থেকে আঠার এবং তারপর আসে বয়ঃপ্রাপ্তি। আবার কারও কারও মতে শৈশব সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, বাল্যকাল সাত থেকে চোদ্দ, যৌবনাগম চোদ্দ থেকে একুশ এবং একুশে দেখা দেয় পূর্ণ পরিণতি। এ সম্বন্ধে মতান্তর থাকা খুবই স্বাভাবিক এবং কোন সুনির্দ্দিষ্ট বয়সের সীমারেখা স্তরগুলির মধ্যে টানা যেতেই পারে না।

শৈশব (Infancy)

জন্মের আগে গর্ভাবস্থাতেই শিশুর বিকাশ-প্রক্রিয়া অনেক খানি সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন; শিশুর পূর্ণপরিণতি-প্রাপ্ত মস্তিষ্কের প্রায় চার ভাগের একভাগ তার জন্মের সময়ই তৈরী হয়ে থাকে। গেসেল (Gesell) এবং ম্যাকগ্র (Mcgraw) শিশুর ক্রমবিকাশকে চার শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যথা দৈহিক, ভাষাগত, সঙ্গতিমূলক এবং ব্যক্তিক-সামাজিক।

দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি শৈশবের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। একমাসের শিশু মাথা তুলতে পারে, দু'মাসে মাথা খাড়া করতে পারে, পাঁচ মাসের কিছু উপর ভর দিয়ে বসতে পারে, আট ন মাসে দাঁড়াতে পারে, দশ মাসে হামাগুড়ি দিতে

পারে, বার মাসে কারও হাত ধরে চলতে পারে, পনেরো মাসে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারে এবং দেড় বছরে দৌড়তে পারে। শরীরের অন্যান্য অংশের চেয়ে মাথার বৃদ্ধি এই সময় অনেক দ্রুত হয়ে থাকে। চলা ফেরা করবার ক্ষমতা শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিণতির উপর নির্ভর করে, যেমন মেরুদণ্ড শক্ত হওয়া, হাড় ও পেশী সবল হওয়া ইত্যাদি। শৈশবে এই অতি-প্রয়োজনীয় কাজগুলি ঘটে থাকে।

শিশু প্রথম ছ'মাসে অস্পষ্ট আওয়াজ, দু'একটা অর্থহীন শব্দের উচ্চারণ ইত্যাদি ছাড়া বিশেষ কিছুই করতে পারে না। কিন্তু একবৎসর বয়স থেকেই সে কথা বলতে শেখে। কোন্ বয়সে কত কথা শিশু শেখে স্মিথ (Smith) তার একটা হিসাব দিয়েছেন।

বয়স :—	১ বৎ	২ বৎ	৩ বৎ	৪ বৎ	৫ বৎ……১২ বৎ
শব্দসংখ্যা :—	৪	২৭২	৮৯৬	১৫৪০	২০৭২……১৫,০০০

প্রথম প্রথম শিশুর প্রক্ষোভ থাকে অসংযত ও সরল প্রকৃতির। এই সময় সামান্য কারণে শিশুর প্রক্ষোভ জাগতে পারে এবং অতি অল্পেই প্রক্ষোভের প্রকৃতি বদলে যেতে পারে। তিন বছর বয়স পর্য্যন্ত প্রক্ষোভের এই সংযত অবস্থা থাকে কিন্তু চারবৎসর বয়স থেকে সামাজিক পরিবেশের চাপে অনিয়ন্ত্রিত প্রক্ষোভ ধীরে ধীরে সংযত ও সুশৃঙ্খল হয়ে উঠে।

শৈশবের এই সময়েই শিশুর নিজের সম্বন্ধে ধারণা গড়ে উঠতে থাকে। এই ধারণার প্রকৃতি অনেকখানি নির্ভর করে তার আশেপাশের আর সকলে তার প্রতি কি মনোভাব গ্রহণ করে তার উপর। শিশুকে যদি তার কাজে প্রশংসা বা উৎসাহিত করা হয় তবে তার আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয়ে ওঠে এবং সে ভবিষ্যতে আত্মনির্ভর-পরায়ণ ব্যক্তি হয়। তাকে যদি নিন্দা বা শাসন করা হয় তবে সে দুর্ব্বল ও আত্ম-বিশ্বাস-হীন ব্যক্তিরূপে বড় হয়ে ওঠে। আর যদি তাকে তাচ্ছিল্য বা অবহেলা করা হয় তাহলে সে হয়ে ওঠে আত্মকেন্দ্রিক ও অসামাজিক। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের মতে শৈশবেই ব্যক্তির পরিণত বয়সের ব্যক্তিসত্তার কাঠামোটি তৈরী হয়ে যায় এবং এই সময়ে সে যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করে সেগুলিই তার ভবিষ্যৎ মনোভাব ও জীবনদর্শনের রূপদান করে এবং তার পরিণত জীবনের আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। অতএব শিশু কি ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করে সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি রাখা দরকার। বিশেষভাবে

দেখা উচিত যে শিশু যেন উত্তেজনাপূর্ণ বা আঘাতাত্মক কোন অভিজ্ঞতার (Trauma) সম্মুখীন না হয়। কেননা তেমন অভিজ্ঞতা তার বিকাশমুখী মনে গভীর ছাপ রেখে যাবে এবং তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বৃদ্ধিকে ব্যাহত করে তুলবে।

শিশুর অধিকাংশ আচরণই প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত। পরিবেশের সংস্পর্শে আসার ফলে ধীরে ধীরে সে নতুন জিনিষ শিখতে সুরু করে এবং তখনই তার প্রবৃত্তিমূলক আচরণ তার শিক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। অতএব এই সময় শিশুকে কোন কিছু শেখাতে হলে তা যেন তার সহজাত প্রবণতার সমাভিমুখী হয়।

মানসিক বিকাশের দিক দিয়ে শিশুর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তার কৌতূহল। সে তার চারপাশে যা দেখে তাই তার কাছে নূতন। অতএব তার প্রশ্নের আর শেষ থাকে না। আবার কেবল প্রশ্ন করেই সে ক্ষান্ত হয় না। অনেক কিছু সে নিজে পরীক্ষা করে, অনুসন্ধান করে এবং স্বহস্তে নাড়াচাড়া করে দেখে। শিশুর এই জানবার এবং অনুসন্ধানের ইচ্ছাকে তার শিক্ষার কাজে নিযুক্ত করলে শিশু স্বাভাবিকভাবে এবং অতি সহজেই শেখে।

শৈশবের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল শিশুর নির্ভরশীলতার মনোভাব। শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য শিশু ত অপরের উপর নির্ভর করেই, মনের দিক দিয়েও সে চায় সকলের মনোযোগ ও ভালবাসা। সে নিজেকে আর সকলের অনুরাগের একমাত্র কেন্দ্ররূপে দেখতে চায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদিও স্বাভাবিকভাবে এই পরনির্ভরতার ভাবটা কেটে যায় এবং শিশু আত্মনির্ভর হতে শেখে তবুও এই ভালবাসার আকাঙ্ক্ষাটি কিন্তু একেবারে চলে যায় না। শিশুকে নানা ভিন্নধর্ম্মী অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। কখনও কখনও এমন পরিস্থিতিতে গিয়ে সে পড়ে যেখানে সে খুব ভালভাবে সঙ্গতিবিধান করে উঠতে পারে না। ফলে তার আত্মবিশ্বাস বিশেষভাবে ধাক্কা খায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার মধ্যে হীনতাবোধ, ভীতি ইত্যাদি জাগে। তখন সে নানা প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। খেলা একটা এই ধরনের প্রচেষ্টা। খেলার মধ্য দিয়ে শিশু সেই বিশেষ পরিস্থিতিটি কল্পনা করে নেয় এবং চেষ্টা করে সেই পরিস্থিতিটিকে স্ববশে আনার। একটা কাজ বার বার করাও শৈশবের একটা বিশেষ লক্ষণ। ফ্রয়েডের মতে এই পুনরাবৃত্তির (Repetition)

মাধ্যমে শিশু কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার প্রত্যুত্তর দেয় এবং যে পরিস্থিতিটিকে সে বাস্তবে আয়ত্ত করতে পারেনি সেটিকে সে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে।

শৈশবের যৌনতার (Sexuality) মধ্যে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। পূর্ব্বে মনে করা হত যে শিশুর কোনরূপ যৌন-সচেতনতা নেই এবং বেশ কিছু বয়স হলেই তবে যৌনবোধ দেখা দেয়। কিন্তু ফ্রয়েডের ব্যাপক গবেষণার ফলে এ ধারণা অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। দেখা গেছে যে বেশ সুতীব্র যৌনবোধ অতি শৈশব থেকেই শিশুর মধ্যে কাজ করে এবং তার আচরণ ও বিকাশকে বহু দিক দিয়ে প্রভাবিত করে।

শিশুর যৌনবোধ এবং পরিণত ব্যক্তির যৌনবোধের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পার্থক্য হল এই যে শিশুর ক্ষেত্রে যৌন অনুভূতি অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও চলিত ব্যাখ্যায় তাকে অস্বাভাবিক বলা চলে। স্বাভাবিক যৌনতা বলতে বোঝায় সেই যৌনতা যা ব্যক্তিকে প্রজননক্ষম আচরণ করতে প্ররোচিত করে। কিন্তু শিশুর যৌনতার সঙ্গে প্রজননমূলক উদ্দেশ্যের কোন সম্বন্ধ নেই। শিশুর ক্ষেত্রে যৌন-শক্তি—যাকে ফ্রয়েড লিবিডো বলেছেন—নানা বিভিন্ন অস্বাভাবিক পাত্র থেকে পাত্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় এবং যৌবনের সুরুতে সেটি যেন তার স্বাভাবিক আশ্রয় খুঁজে পায় এবং প্রজননমূলক আচরণের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। ফ্রয়েডের মতে পরিণত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যৌনতার লক্ষ্য হল প্রজনন, কিন্তু শিশুর ক্ষেত্রে সেটি কেবলমাত্র দৈহিক আনন্দলাভেই নিবদ্ধ থাকে এবং নিজের দেহের যে কোন অঙ্গ বা যে কোন প্রক্রিয়া থেকেই যৌন আনন্দ পাওয়া যায় শিশু তাতেই আসক্ত হয়। এই জন্য শিশুর যৌনকে স্বরতিমূলক (Auto-erotic) বলা হয়। পরে ধীরে ধীরে শিশুর যৌনবোধ নিজের দেহ ছেড়ে অপরের প্রতি নিবদ্ধ হয়। এই সময় ছেলেদের আসক্তির পাত্রী হন তাদের মা, মেয়েদের ক্ষেত্রে তাদের বাবা। ফ্রয়েডের মতে এই আসক্তি যৌনমূলক এবং এর নাম তিনি দিয়েছেন ইডিপাস কমপ্লেকস (Oedipus Complex)। শিশুর মধ্যে যখন এই কমপ্লেকস দেখা দেয় তখন সে বাবাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে এবং তাঁর প্রতি তার মনে একটা বিদ্বেষের ভাব আসে। মেয়েদের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীতটি ঘটে। বাবার প্রতি ভালবাসাকে কেন্দ্র করে মার সঙ্গে মেয়ের একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়।*

---

* মনঃসমীক্ষণ শীর্ষক পরিচ্ছেদটি দ্রষ্টব্য।

ফ্রয়েডের মতে শিশুর মায়ের প্রতি আকর্ষণ ও পিতার প্রতি বিদ্বেষের সঙ্গে শিশুর মনে দেখা দেয় একটা প্রচণ্ড ভয়। তার ভয় হয় পিতা বুঝি তার প্রতি প্রতিহিংসা নেবার জন্য তার যৌনাঙ্গছেদ করবেন। একে ফ্রয়েড কাষ্ট্রেসন কমপ্লেকস (Castration complex) নাম দিয়েছেন। এই ভয় পরে কমে যায় যখন সে দেখে যে এই পিতাই তার প্রয়োজন, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করছেন না। এই থেকে পিতার প্রতি বিদ্বেষের পাশাপাশি দেখা দেয় তাঁর প্রতি ভালবাসাও। ফ্রয়েড পিতার প্রতি বিদ্বেষ ও ভালবাসার এই মিশ্র অনুভূতিকে যুগ্মানুভূতি (ambivalence) বলে বর্ণনা করে থাকেন। মাতার প্রতি যৌনাকর্ষণ ও পিতার প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ভীতি থেকে জন্মায় তাঁদের প্রতি নিষ্প্রতিবাদ আনুগত্য ও শৈশবকালীন নানা বিধিনিষেধ অনুসরণের অভ্যাস। এই কারণে এই আনুগত্য ও বাধ্যতাকে আমরা ইডিপাস কমপ্লেকস থেকে সঞ্জাত বলতে পারি। শিশু যখন বড় হয় তখন তার এই ভীতিময় আনুগত্য ও বাধ্যতা থাকে না। তার জায়গায় দেখা দেয় যাকে আমরা বলি বিবেক বা নীতিবোধ। এইজন্য বিবেককে ইডিপাস কমপ্লেকসের দান বলা হয়।

ফ্রয়েডের মতে এই যৌনতার বিকাশ ৭।৮ বৎসর পর্য্যন্ত চলে। তারপর আসে যৌনতার একটা প্রসুপ্ত কাল (Latent period)। প্রসুপ্তকালে কোনরূপ যৌন আচরণ শিশুর মধ্যে দেখা যায় না। এই কাল স্থায়ী থাকে যৌবনাগম পর্য্যন্ত, যখন যৌনতা পরিণত ও স্বাভাবিকরূপ নিয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করে।

শিশুর মানসিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল তার সর্ব্বপ্রাণবাদ (animism) অর্থাৎ শিশু সব জিনিষকেই—তা সে জড়ই হোক বা প্রাণীই হোক —প্রাণবান বলে মনে করে। চেয়ারটা যখন পড়ে যায় বা বলটা যখন গড়ায় তখন সে সেগুলিকে জীবন্ত বলে মনে করে। ৫।৬ বৎসর বয়স থেকে শিশুর এই সর্ব্বপ্রাণবাদ কমতে থাকে এবং প্রাকৃতিক ঘটনার সাহায্যে সে সব কিছুর ব্যাখ্যা করতে শেখে।

শিশু খুব ছোট বয়স থেকেই চিন্তা করতে পারে কিন্তু তার চিন্তা মূলত প্রতিরূপের উপর নির্ভরশীল। শিশুর প্রাথমিক চিন্তন হল প্রতিরূপমূলক ও কল্পনাধর্ম্মী। এই সময় থেকে শিশু দিবাস্বপ্ন ও অলীককল্পনা দেখতে সুরু করে এবং এ অভ্যাস যৌবনাগম পর্য্যন্ত অতিতীব্র মাত্রায় থাকে।

শিশু যখন ভাষা বলতে শেখে তখন তার চিন্তন ব্যাপক ও জটিল হয়ে ওঠে।

তার পরের ধাপে সে ধারণা গঠন করতে শেখে। এই ধাপে শিশুর মানসিক প্রক্রিয়াগুলি বেশ পরিণতি লাভ করে। কিন্তু সত্যকারের বিচারকরণের ক্ষমতা ৭।৮ বছরের আগে দেখা দেয় না।

বাল্যকাল (Boyhood)

শৈশবের সঙ্গে বাল্যকালের একটা বিস্ময়কর পার্থক্য দেখা যায়। শৈশবে সব কিছুই থাকে অসংযত ও অসংহত অবস্থায়। দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভগত যৌনতামূলক সকল দিক দিয়েই শৈশব একটা বিপর্য্যয় ও বিশৃঙ্খলার প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু বাল্যকালে একটা অদ্ভুত শৃঙ্খলা ও সাম্যভাব কোথা থেকে যেন দেখা দেয়। ৮।১০ বৎসরের একটি ছেলে বা মেয়েকে পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে তার মধ্যে কোনরূপ অসংহতি বা অসঙ্গতি নেই। সে তার পরিবেশের সঙ্গে সব দিক দিয়েই বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে। একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির মতই তার মানসিক স্থৈর্য্য ও সুসংযত আচরণ। এইজন্য আর্নেষ্ট জোন্স বয়ঃপ্রাপ্তিকে (Adulthood) বাল্যকালের পুনরাবৃত্তি (recapitulation) বলে বর্ণনা করেছেন। বাল্যকালে এই বয়ঃপ্রাপ্তিসুলভ পরিণতির একটা বড় কারণ ফ্রয়েডের প্রসুপ্তকালের (latent period) সংব্যাখ্যানে পাওয়া যায়। শৈশবের শেষে বাল্যকালে যৌনতা সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং কোন দিকে তার কোন বাহ্যিক অভিব্যক্তি থাকে না বলে প্রক্ষোভমূলক কোনরূপ চাঞ্চল্য তার মধ্যে দেখা যায় না এবং তার পারিবেশিক সঙ্গতিবিধান সহজেই সংঘটিত হয়।

বাল্যকালের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল তার সামাজিক বোধের পরিণতি। শৈশবে শিশু থাকে পুরোপুরি আত্মকেন্দ্রী। যত সে বড় হয় ততই তার সামাজিক চেতনা ধীরে ধীরে বিকশিত হয় এবং বাল্যকালে এই সামাজিক বোধ বন্ধুপ্রীতি ও দলবাঁধার আকাঙ্ক্ষারূপে দেখা দেয়। এই সময় সে আর একা থাকতে বা খেলতে চায় না। সকল সময়েই সে তার সমবয়সীদের সঙ্গ খোঁজে। ম্যাকডুগাল প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীরা একেই যৌথ-প্রবৃত্তি (Gregarious instinct) নাম দিয়েছেন।

এই দলপ্রিয়তা থেকে জন্ম নেয় শিশুর সামাজিক অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য। বাড়ীর এবং বাড়ীর অধিবাসীদের বন্ধন অনেকটা ছিন্ন করে সে

বাইরের জগৎকে ভালবাসতে শেখে। সে বোঝে যে দলে থাকতে হলে তাকে দলের নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। সমাজের আর সকলের নিন্দা প্রশংসাকে সে ধীরে ধীরে মূল্য দিতে শেখে। এইভাবে তার মধ্যে জন্মায় সমাজের প্রচলিত রীতি, নীতি, আচার-ব্যবহারের প্রতি আনুগত্যবোধ। এই সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকেই আবার বিকশিত হয় শিশুর নৈতিক বোধ। কোন্‌টি করণীয়, কোন্‌টি বর্জ্জনীয় সে শিক্ষার সুরুও হয় এই সময়। নীতিজ্ঞান তৈরির পেছনে সামাজিক শাস্তি-পুরস্কার, নিন্দা-প্রশংসা প্রভৃতি উদ্‌বোধকগুলির প্রচুর প্রভাব থাকে।

বাল্যকালের শেষের দিকে, যাকে আমরা কৈশোর (Later childhood) বলতে পারি, ছেলেমেয়েদের দল-প্রীতি অতি তীব্রভাবে দেখা দেয়। এ সময়টিকে দলবাঁধার কাল (Gang period) বলাও হয়। এই সময় দল-বিশ্বস্ততা সকল রকম চিন্তা ও বিচারবুদ্ধিকে ছাড়িয়ে যায় এবং অত্যন্ত গভীর ভাবে শিশুর মনকে প্রভাবিত করে। দলের প্রতি আনুগত্য এতই তীব্র হয়ে দেখা দেয় যে দলের সম্মানরক্ষার জন্য তার প্রত্যেকটি কিশোর সদস্যই প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকে।

এই বয়সের ছেলেমেয়ের আত্মপ্রতিষ্ঠা-করার আকাঙ্ক্ষা তাদের খেলা-ধূলার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। শিকার করা, যুদ্ধ করা, প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা, কুস্তি, বক্সিং প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ছেলেরা নিজেদের সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পায়। মেয়েরাও সাজসজ্জা, নাচ-গান অভিনয় এবং ঘরকন্না পুতুল খেলা প্রভৃতির মাধ্যমে আর সকলের চক্ষুতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। খেলাকে এইজন্য অনেক মনোবিজ্ঞানী শিশুর প্রস্তুতির প্রচেষ্টা বলে বর্ণনা করেন। তবে খেলা যে এই সময় শিশুর নানা মানসিক চাহিদা ও স্পৃহাকে অভিব্যক্ত করে তাতে সন্দেহ নেই।

এই বয়সের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল নতুন কিছু সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা। কাঠের বা মাটির জিনিস তৈরী করা, ছবি আঁকা, মূর্ত্তি গড়া প্রভৃতি কাজের দিকে এসময় ছেলেমেয়েরা একটা সহজ আকর্ষণ বোধ করে এবং সুযোগ সুবিধা পেলেই কোন কিছু সৃষ্টি করার আনন্দে মেতে ওঠে। কিন্তু সাধারণত এই সময় উপযুক্ত সাহায্য না পাওয়ার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের উৎসাহ কমে যায় এবং একটু বড় হলেই এই অতি-মঙ্গলকর প্রবণতাটি পরিপোষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্য যাতে এই বৈশিষ্ট্যটি সময়োচিত সাহায্য ও উৎসাহ পেয়ে পুষ্ট হয়ে ওঠে সেদিকে শিক্ষক, পিতা, মাতা সকলের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

শৈশবের মত বাল্যকাল এবং কৈশোরের চিন্তাতেও প্রতিরূপের (images) আধিক্য একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। গ্যাল্টনের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে কোনরূপ মানসিক কার্য্যে ছোট ছেলেমেয়েরা পরিণত ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশী প্রতিরূপের সাহায্য নিয়ে থাকে।

মনোযোগের বিস্তারের পরীক্ষণে প্রমাণিত হয়েছে যে পরিণত ব্যক্তির মনোযোগের বিস্তার ছোট ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশী। অর্থাৎ একজন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি একটি কিশোর অপেক্ষা অনেক বেশী জিনিসে একসঙ্গে মনোযোগ দিতে পারে।

বুদ্ধির বিকাশের দিক দিয়ে আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি যে বুদ্ধি শৈশব থেকে ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে ১৫।১৬ বৎসর বয়সে তার শেষ সীমায় পৌছোয় এবং তারপর আর বাড়ে না।

বিচারকরণের শক্তি শৈশবে খুবই কম থাকে এবং সাত আট বছরের ছেলেমেয়ে সহজ সাধারণ সমস্যা ছাড়া শক্ত কিছুর সমাধান করতে পারে না। ১১।১২ বৎসর বয়স থেকে সত্যকারের বিচার করার ক্ষমতা জন্মায় এবং আরও বয়স না বাড়লে জটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয় না।

যৌবনাগম (Adolescence)

যৌবনাগমের স্বরু যৌন-পরিণতিতে (puberty)। যৌন-পরিণতি বলতে ছেলেদের ক্ষেত্রে বীর্য্যোৎপাদন ও মেয়েদের ক্ষেত্রে রজঃসৃষ্টি বোঝায়। ছেলেমেয়ে উভয় ক্ষেত্রেই এই সময় যৌন ইন্দ্রিয়ের পূর্ণতালাভ ঘটে ও দেহে নানারূপ যৌনসূচক চিহ্নের আবির্ভাব হয়। এগুলিকে গৌণ যৌন চিহ্ন (Secondary sexual characters) বলা হয়।

কি ছেলে কি মেয়ে উভয়ের জীবনেই যৌবনাগম নানা দিক দিয়ে একটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কোন কোন প্রাচীন মনোবিজ্ঞানী এই সময়টিকে পীড়ন ও কষ্টের (stress and strain) কাল বলে বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ কেউ এই সময়টিকে অপরাধপরায়ণতার কাল বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু এ ধরনের চরম বর্ণনার মধ্যে যথেষ্ট অতিরঞ্জন থাকলেও এ কথা সত্য যে যৌবনাগম ব্যক্তির জীবনে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ সময় এমন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন প্রাপ্তযৌবনদের (adolescent) জীবনে দেখা দেয়—যা তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

যৌবনাগমকে আর্নেষ্ট জোনস শৈশবের পুনরাবৃত্তি বলে বর্ণনা করেছেন। শৈশবে দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভগত ও যৌনমূলক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে এক চরম অসংহতি ও বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, বাল্যকাল ও কৈশোরের আগমনে সে অসংহতি ও বিশৃঙ্খলা ধীরে ধীরে লোপ পায় এবং শিশু অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু যৌবনের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সেই শৃঙ্খলা ও সংহতি আকস্মিকভাবে আবার লোপ পেয়ে যায় এবং ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও যৌনমূলক জগতে এক বিরাট বিপর্য্যয় দেখা দেয়। শৈশবে যেমন তাকে এক নতুন জগতের অপরিচিত শক্তিগুলির সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান করার জন্য প্রয়াস করতে হয়েছিল যৌবনাগমেও সেইভাবে আবার তার চারপাশের পৃথিবীর সঙ্গে নতুন করে সঙ্গতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শৈশবে যেমন নতুন পরিবেশের সঙ্গে ঠিক মত সঙ্গতিবিধান করতে না পারার জন্য বার বার তাকে দুঃখকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল যৌবনাগমেও তেমনই পুরানো পরিবেশের সঙ্গেই সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্য তাকে প্রতিপদে ব্যর্থতা, লজ্জা ও হতাশা বরণ করতে বাধ্য করে। এই দিক দিয়ে শৈশবের সঙ্গে যৌবনাগমের একটা খুব বড় মিল আছে।

যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক সর্ব্বাঙ্গীন পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। এই সময়ে ছেলে মেয়ে উভয়ের দেহেই আকস্মিকভাবে এমন কতকগুলি পরিবর্ত্তন ঘটে যেগুলি পরিবার বা বাইরের আর সকলের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। তার ফলে তাদের মনে একটা অস্বাচ্ছন্দ্যময় ও অস্বস্তিকর মনোভাব দেখা দেয় এবং তাদের আচরণ সঙ্কোচময় ও আড়ষ্ট হয়ে ওঠে।

বুদ্ধি বা মানসিক শক্তির দিক দিয়ে যৌবনপ্রাপ্তির সময় ছেলেমেয়েদের মনে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটে না। তবে এই সময় মনের ক্ষমতাগুলি তাদের সহজ বৃদ্ধি প্রচেষ্টায় পূর্ণতালাভ করে। ফলে মননশক্তি, বোধশক্তি, বিচারশক্তি ইত্যাদি মানসিক সমর্থতার দিক দিয়ে ছেলেমেয়েরা পরিণত ব্যক্তির সমকক্ষ হয়ে ওঠে। এই নবলব্ধ সামর্থ্য সম্বন্ধে তাদের মনে সচেতনতা দেখা দেয় এবং পরিবার বা সমাজের আর দশজনের মত তারাও ছোট বড় সমস্যা সমাধানে নিজেদের অভিমত নিয়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু সাধারণত তাদের এই হস্তক্ষেপকে অনেক পরিণত ব্যক্তিই অকালপক্বতা বলে মনে করেন এবং ধমক দিয়ে সরিয়ে দেন বা অগ্রাহ্য করেন। এর ফলে এই ছেলেমেয়েরা নিজেদের

অবহেলিত বলে মনে করে এবং তাদের মধ্যে সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধেই একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা দেয়।

প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পরিবর্ত্তন দেখা দেয় তাদের অনুভূতির রাজ্যে। সেখানে একটা ছোটখাট বিপ্লব ঘটে যায়। দেহের আকস্মিক পরিবর্ত্তন, যৌনপরিণতি, মানসিকশক্তির পূর্ণতা লাভ, বাইরের জগতের উপর এগুলির প্রতিক্রিয়া, এসবে মিলে প্রাপ্তযৌবনের মনে একটা বিরাট আলোড়ন এনে দেয় এবং তার এতদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রক্ষোভের সংগঠনকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। নিজের বহুমুখী পরিপূর্ণতার নতুন উপলব্ধিতে যেমন একদিক দিয়ে তার মনে এক অনাস্বাদিত আনন্দ দেখা দেয় তেমনই তার সামর্থ্য ও প্রয়োজনের প্রতি সমাজের উদাসীনতা ও তাচ্ছিল্য তার মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এর ফলে অধিকাংশ প্রাপ্তযৌবনকেই দেখা যায় অন্তর্মুখী (introvert) বা আত্মকেন্দ্রিক (self-centred) হয়ে যেতে। বাইরের জগতের প্রতি তাদের একটা বিক্ষোভের ভাব জাগে এবং অনেকেই মনে করে যে তার প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করা হচ্ছে না বরং সকলে মিলে তার উপর পীড়ন করছে। পরিবার বা সমাজের অন্যান্য বয়স্ক লোকেরা প্রাপ্তযৌবনদের মানসিক চিন্তাধারাকে অনুসরণ করতে না পেরে তাদের প্রতি সত্যই যথেষ্ট অবিচার করে থাকেন এবং তাদের মধ্যে এই ধরনের নিপীড়নমূলক মনোভাব (Persecution mentality) সৃষ্টি করেন।

এই নিপীড়নমূলক মনোভাব থেকেই প্রাপ্তযৌবনের মধ্যে জন্ম নেয় বিদ্রোহের মনোবৃত্তি। সহজেই সে কোন কিছু স্বীকার করতে বা মেনে নিতে চায় না। তার পরিণত বুদ্ধি ও উন্নত মননক্ষমতা তাকে জোগায় তার বিদ্রোহের পেছনে আত্মবিশ্বাস। সে প্রচলিত বিশ্বাস, রীতি নীতি, ধর্ম্মীয় বা সামাজিক মান প্রভৃতি সবেরই বিরোধিতা করে। সে সমাজ সংস্কারকের অংশ অভিনয় করতে চায়। তবে সমাজের প্রাচীন যা কিছু তা ভাঙ্গার মধ্যেই তার আনন্দ সীমাবদ্ধ থাকে, নতুন করে কিছু গড়ার প্রতি তার তেমন আগ্রহ দেখা যায় না।

যৌবনপ্রাপ্তিতে যৌনতা পূর্ণবিকাশ লাভ করে। সেইজন্য প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা প্রাপ্তযৌবনদের যৌন চাহিদাকে খুব বড় স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক পরীক্ষণে দেখা গেছে যে এ সময় সত্যকারের যৌনচাহিদা তেমন কিছু অস্বাভাবিক রূপ গ্রহণ করে না। এই সময়ে যৌনঘটিত আকস্মিক শারীরিক পরিবর্ত্তনগুলো ছেলেমেয়েদের কাছে মধুর বিস্ময়রূপে দেখা দেয় এবং তাদের

যৌনচাহিদা মূলত প্রণয়ঘটিত কল্পনা ও চিন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। গভীর ভাববিলাসময় প্রেমের ঘটনা এসময়ে ছেলেমেয়েদের জীবনে প্রায়ই ঘটে থাকে।

যৌন-কৌতূহল কিন্তু এসময় তীব্রতম আকার ধারণ করে এবং যৌনঘটিত রহস্য জানার জন্য প্রাপ্তযৌবনদের আগ্রহের সীমা থাকে না। কিন্তু অধিকাংশ দেশেই যথোপযুক্ত যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় প্রাপ্তযৌবনদের হয় সে কৌতূহল অতৃপ্ত থেকে যায়, নয় অবাঞ্ছিত স্থান থেকে অর্দ্ধসত্য ও বিকৃত ব্যাখ্যা আহরণ করতে হয়।

যৌবনপ্রাপ্তির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল দিবাস্বপ্নের আধিক্য। সর্ব্বতোমুখী পরিণতি প্রাপ্তযৌবনের মধ্যে যে সকল নতুন চাহিদার সৃষ্টি করে সেগুলি বাস্তবে তৃপ্তিলাভ করতে পারে না। ফলে সে দিবাস্বপ্নের সাহায্য নেয় সেগুলিকে পূর্ণ করতে। প্রাপ্তযৌবনদের দিবাস্বপ্ন বিশ্লেষণ করলে দু'শ্রেণীর স্বপ্ন পাওয়া যায়, প্রথম আত্মপ্রতিষ্ঠাঘটিত বা আত্মগৌরবমূলক। যেমন, প্রাপ্তযৌবন স্বপ্ন দেখে যে সে পড়াশোনায় প্রথম হচ্ছে, বা খেলায় সবচেয়ে সেরা প্রমাণিত হচ্ছে, বা কোন দুঃসাহসিক কাজ করছে ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় হচ্ছে প্রণয়মূলক যেমন, সে তার আকাঙ্ক্ষিত প্রণয়ী বা প্রণয়িনীকে লাভ করেছে। অধিকাংশ দিবাস্বপ্নই তীব্র প্রক্ষোভে নিষিক্ত থাকে এবং প্রাপ্তযৌবন কল্পনার সাহায্যে তার অতৃপ্ত প্রক্ষোভের তৃপ্তি সাধন করে। সে দিক দিয়ে দিবাস্বপ্ন প্রাপ্তযৌবনদের মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখতে সাহায্য করে এবং প্রাক্ষোভিক সাম্য বজায় রাখে। কিন্তু অতিরিক্তি ও অতি-অবাস্তব দিবাস্বপ্ন সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ববিকাশের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।

প্রাপ্তযৌবনের চাহিদা ও সমস্যা
(Needs and Problems of the Adolescent)

যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তযৌবনের দেহে মনে চিন্তায় ধারণায় ও অনুভূতিতে, এক কথায় তার সমগ্র সত্তার মধ্যে প্রচণ্ড পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। এই বহুমুখী পরিবর্ত্তন তার পূর্ব্বতন সঙ্গতিবিধানের সমস্ত প্রয়াসকেই নিষ্ক্রিয় করে তোলে এবং পরিবেশের সঙ্গে নতুন করে তার আবার সঙ্গতিবিধান করার প্রয়োজন হয়। তার নিজের চাহিদার মধ্যেও এই বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। তার দেহ-মন প্রক্ষোভ ও চিন্তার ক্ষেত্রে নানা পরিবর্ত্তন থেকে তার মধ্যে নানা নতুন নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয়। বাল্যকালে তার চাহিদা মূলত শারীরিক ও

কতকগুলি সহজ মানসিক চাহিদায় সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যৌবনাগমে তার মনের রাজ্যের আরও অনেক নতুন নতুন দরজা খুলে যায়। ধর্ম্মাধর্ম্ম, বৃহত্তর সমাজের আবেদন, ভালমন্দের বিচার, যৌনস্পৃহা, জীবনরহস্য সম্পর্কে কৌতূহল ইত্যাদি নতুন নতুন ধারণা ও অনুভূতি তার মনের দুকূল প্লাবিত করে দেয় এবং তার মধ্যে নব নব প্রয়োজনের উত্তুঙ্গ তরঙ্গের সৃষ্টি করে।

প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে সমস্যা তখনই দেখা দেয় যখন তার এই নতুন নতুন চাহিদাগুলি বস্তুত অতৃপ্ত থেকে যায়। আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় এইসব চাহিদা তার পুরোন পরিচিত পরিবেশে সাধারণত তৃপ্ত হবার কোন অবকাশ পায় না। ফলে তার মধ্যে দেখা দেয় অতৃপ্তি এবং অতৃপ্তি থেকে আসে অপসঙ্গতি (maladjustment)। অপসঙ্গতি বলতে বোঝায় পরিবেশের সঙ্গে সুসঙ্গতি বিধানে অসমার্থ্য। প্রাপ্তযৌবনের চারপাশে যে শক্তিগুলি থাকে সেগুলির সঙ্গে সে ঠিকমত মানিয়ে নিতে পারে না এবং এই অপসঙ্গতি থেকেই তার মধ্যে জন্মায় নানারকম অপরাধপ্রবণতা, দুষ্কৃতি এবং সমস্যামূলক আচরণ। এই জন্যই অনেকে যৌনপ্রাপ্তিকে "ঝড়ঝঞ্ঝার কাল" বা "অপরাধপ্রবণতার কাল" বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তযৌবনের মনে ঝড়ঝঞ্ঝা, অপরাধ প্রবণতা সবই দেখা দেয় তার চাহিদা যদি ঠিকমত তৃপ্ত না হয় তবেই। উপযুক্ত যত্ন ও মনোযোগ, সুবিবেচনা ও সহানুভূতি, মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রাপ্তযৌবনদের এই সমস্যাগুলিকে সমাধান করার চেষ্টা করলে প্রাপ্তযৌবনদের বিকাশ প্রচেষ্টা কোনরূপে ক্ষুণ্ণ হবে না এবং সুস্থ ও সুষম ব্যক্তিসত্তা নিয়ে তারা গড়ে উঠবে।

ষ্টানলী হল, হলিংওয়ার্থ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদা নিয়ে বিস্তারিত পর্য্যবেক্ষণ করে তাদের প্রধান প্রধান চাহিদার বিবরণী দিয়েছেন। তাদের সেই পর্য্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে এবং প্রাপ্তযৌবনদের পরিবর্ত্তনের স্বরূপ বিচার করে তাদের কতকগুলি অতিপ্রয়োজনীয় চাহিদার একটি তালিকা দেওয়া যেতে পারে। যেমন,

১। মুক্ত সক্রিয়তার চাহিদা

এই সময় ছেলেমেয়েদের সর্ব্বদেহে একটা আকস্মিক বৃদ্ধি দেখা দেয়। এই দৈহিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পর্য্যাপ্ত সক্রিয়তার সুযোগ, মুক্ত বাতাসে রোদে

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবাধ সঞ্চালনের অবকাশ। খেলাধূলা, দৌড়ঝাঁপ, ভ্রমণ, পিকনিক ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাপ্তযৌবনদের এই চাহিদার তৃপ্তি হতে পারে। সেইজন্যই মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সহপাঠক্রমিক কার্য্যাবলীর অন্তর্ভুক্তি মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে অপরিহার্য্য বলেই পরিগণিত হয়েছে।

২। স্বাধীনতার চাহিদা

যৌবনপ্রাপ্তিতে যে চাহিদাটি ছেলেমেয়ের মনে সর্ব্বপ্রথম দেখা দেয় সেটা হল বন্ধন-মুক্তির চাহিদা। আজন্ম সে যে সব দিক দিয়ে পরের উপর নির্ভরশীল ছিল আজ সেই অবস্থা থেকে সে মুক্তি খোঁজে এবং সমাজের একজন হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। সে নিজে থেকেই নানা গুরুকর্ম্মের দায়িত্ব বহন করতে এগিয়ে আসে, পরিবারের সাধারণ সমস্যা সম্বন্ধে মতামত দেয় এবং কোন কাজের ভার পেলে আনন্দে ও সোৎসাহে সম্পন্ন করে। ছেলেমেয়েদের এই স্বাধীনতার আকাঙ্খা তাদের মনের স্বাভাবিক পরিণতির ফল। মনের বিভিন্ন দিকের পূর্ণতা থেকেই তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা জাগে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার আগ্রহ দেখা দেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের বয়ঃপ্রাপ্তেরা প্রাপ্তযৌবনের এই মনোভাবকে ভাল চোখে দেখেন না। ফলে সংঘর্ষ অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে এবং ছেলেমেয়েদের মধ্যে নানা রকম আচরণবৈষম্য দেখা দেয়।

৩। সমাজ-জীবনের চাহিদা

যৌবনাগমের পূর্ব্বে শিশু বৃহত্তর সমাজ সম্পর্কে একান্ত উদাসীনই ছিল। তার নিকটতম পরিবেশ ছাড়া তার আগ্রহ দূরতর ক্ষেত্রে বিস্তৃত হত না। কিন্তু যৌবনাগমে তার পরিণত মনের দরজায় বৃহত্তর পৃথিবীর আবেদন এসে পৌছয়। নিজের ক্ষুদ্র পরিবেশের গণ্ডীর বাইরে মানবসমাজের সঙ্গে একাত্মতার এক অনুভূতি তার মনকে স্পর্শ করে। সে সঙ্গ খোঁজে, অপরিচিতের সঙ্গে পরিচিত হয়, নিজের স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় গোষ্ঠীর স্বার্থে বিলিয়ে দেয়। স্কুল, ক্লাব, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন, নানাবিধ যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রাপ্তযৌবনের এই সমাজ-জীবনের চাহিদা তৃপ্ত হয়।

৪। যৌন-তৃপ্তির চাহিদা

প্রাপ্ত-যৌবনের ক্ষেত্রেই যৌনসচেতনতা পরিণতিলাভ করে। শৈশবে যৌনবোধ নিতান্ত অসংগঠিত ও অপরিণত অবস্থায় থাকে। বাল্যকালে যৌনতা থাকে সুপ্ত বা অবদমিত অবস্থায়। কিন্তু যৌবনাগমে এই যৌনবোধ পরিণত ও সুসংগঠিত হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক যৌনজীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। এই পরিণত যৌনসচেতনতা প্রকাশ পায় ছেলেদের ক্ষেত্রে সঙ্গিনী এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে সঙ্গীর জন্য কামনার রূপে। এই সময় ছেলেরা ও মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গ কামনা করে এবং পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ও মেলামেশায় আনন্দ লাভ করে। সঙ্গী বা সঙ্গিনীর জন্য কামনা ছাড়াও যৌন চাহিদা আর একটি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেটি হল যৌন কৌতূহল। এই সময় যৌন-ঘটিত বিষয় ও যৌন রহস্য সম্পর্কে জানবার জন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ দেখা দেয়। তাদের এ চাহিদা তৃপ্ত করার জন্য সমাজে বিজ্ঞান-ভিত্তিক যৌনশিক্ষাদানের আয়োজন থাকা উচিত। যে সব সমাজে তার ব্যবস্থা নেই সেখানে প্রাপ্তযৌবনেরা নানা উৎস থেকে অর্দ্ধসত্য ও বিকৃত মিথ্যা তথ্য সংগ্রহ করে এবং বহু ভুল ও ক্ষতিকর জ্ঞান আহরণ করে থাকে।

৫। নতুন জ্ঞানের চাহিদা

প্রাপ্ত-যৌবনদের মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি এই সময়ে পূর্ণতা লাভ করে এবং বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলিও তাদের পরিণতিতে পৌঁছয়। ফলে তাদের স্বাভাবিক কৌতূহল তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং নতুন নতুন জ্ঞানলাভের প্রতি তাদের আকাঙ্খা জন্মায়। মানব অস্তিত্বের বহুমুখী ভাবধারার প্রতি তারা আকৃষ্ট হয় এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন জ্ঞানভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করার প্রয়াস দেখা দেয়। এই সময় তাদের এই স্বতস্ফূর্ত্ত জ্ঞানলিপ্সাকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করার উপরেই প্রাপ্তযৌবনদের জীবন প্রস্তুতি নির্ভর করে।

৬। আত্ম-অভিব্যক্তির চাহিদা

প্রাপ্তযৌবনের প্রাক্ষোভিক তৃপ্তি প্রধানত নিজেকে অভিব্যক্ত ও প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। লেখাপড়া, খেলাধূলা, সঙ্গীত অভিনয়, সৃজনী-

মূলক প্রচেষ্টা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তারা চেষ্টা করে নিজেদের বিকাশোন্মুখ সত্তাকে অভিব্যক্ত করতে এবং সমাজে আর সকলের কাছে নিজের মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতে। এই চাহিদাটির তৃপ্তি প্রাপ্তযৌবনের সুস্থ ও সুষম ব্যক্তিসত্তার বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য্য। যেসব ছেলেমেয়েদের এই অত্যাবশ্যক চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে যায়—তারা দুর্ব্বলচেতা, আত্মবিশ্বাসহীন ও জীবনসংগ্রামে পশ্চাদ্‌পদ হয়ে ওঠে।

৭। নীতিবোধের চাহিদা

এই সময়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভালমন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদির বোধ-গুলিও পরিণত হয়ে ওঠে। ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন বস্তু বা কাজ সম্পর্কে নৈতিক মান তাদের মধ্যে নিতান্তই অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট আকারে ছিল। যৌবনাগমে তাদের এসম্পর্কে একটা সুচিন্তিত ও সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসার প্রচেষ্টা দেখা যায়। নিজের বা পরের সকলের কাজই এ নীতিবোধের মাপকাঠিতে সে পরিমাপ করে এবং নিজে কখনও তার এই নৈতিক মানের বিরোধী কাজ করলে তিক্ত অপরাধ-বোধ থেকে কষ্ট পায়।

৮। আত্মনির্ভরতার চাহিদা

এ সময়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবতে দেখা যায় এবং কেমন করে স্বনির্ভর হওয়া যায় সে সম্বন্ধেও চিন্তা তাদের মনে উদয় হয়। স্বাধীন উপার্জ্জনক্ষম হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা নানাভাবে তাদের মধ্যে দেখা দেয়। বিভিন্ন বৃত্তি ও উপার্জ্জনের পন্থার প্রতি তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হতে দেখা যায়। অনেকে এইজন্য এই চাহিদাটিকে **বৃত্তির চাহিদা** বলেও বর্ণনা করে থাকেন।

৯। জীবন-দর্শনের চাহিদা

যৌবনপ্রাপ্তিতেই প্রথম ছেলেমেয়েদের মনে জীবন ও বহির্জগৎ সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন জাগে। মানুষের জীবনের অর্থ কি, কিসেই বা

জীবনের সার্থকতা বা এই সৃষ্টির রহস্য কি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তার মনকে বার বার দোলা দিয়ে যায়। এসব প্রশ্নগুলির তারা উত্তর সন্ধান করে এবং যতটুকু তথ্য তারা সংগ্রহ করে তাই নিয়ে মোটামুটি একটা ধারণা তারা গড়ে তোলে। এ সময় দরকার তার একটি সন্তোষজনক জীবন-দর্শনের, যেটা তাকে তার ভবিষ্যৎ কর্ম্ম-প্রণালীকে প্রবুদ্ধ ও অর্থময় করে তুলতে পারবে।

প্রাপ্তযৌবনদের এই চাহিদাগুলির যদি তৃপ্তি না হয় তা হলে তাদের সঙ্গতিবিধান বিশেষভাবে ব্যাহত হয় এবং তাদের মধ্যে নানারকম অবাঞ্ছিত মানসিক জটিলতা ও আচরণমূলক বৈকল্য দেখা দেয়। ফলে তাদের ক্রমবিকাশের সুষ্ঠু অগ্রগতি ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। যারা সাহসী তারা তাদের অতৃপ্ত চাহিদাগুলি মেটানোর জন্য অসামাজিক অমঙ্গলকর পন্থা গ্রহণ করে এবং সমাজে অপরাধপ্রবণ (Delinquent) বলে কুখ্যাত হয়। যারা তা পারে না তারা আংশিক বা কৃত্রিম তৃপ্তিতেই সন্তুষ্ট থাকে বা চাহিদাকে দমন করতে বাধ্য হয়। অধিকাংশ প্রাপ্তযৌবনই দিবাস্বপ্ন বা অলীক কল্পনার মধ্যে দিয়ে তাদের চাহিদার তৃপ্তি খোঁজে। এর কোনটিই স্বাভাবিক বিকাশের লক্ষণ নয় এবং সুস্বাস্থ্যময় ব্যক্তিসত্তার সৃষ্টিতে বাধাস্বরূপ। অতএব পিতামাতা শিক্ষক সকলের কর্ত্তব্য হল যে যাতে প্রাপ্তযৌবনের চাহিদাগুলি যথাসম্ভব তৃপ্তিলাভ করে এবং তাদের মধ্যে অবাঞ্ছিত জটিলতা দেখা না দেয় সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া।

পিতামাতা-শিক্ষকের কর্ত্তব্য

প্রাপ্তযৌবন ছেলেমেয়েদের বৃদ্ধি-প্রক্রিয়া যাতে কোনরূপ বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং তাদের মানসিক ও প্রাক্ষোভিক সমস্যাগুলি যাতে ঠিকমত সমাধান লাভ করে তার জন্য পিতামাতা শিক্ষকদের কতকগুলি ব্যাপারের উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত। যেমন—

১। প্রাপ্তযৌবনদের সঙ্গে সহানুভূতি ও বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। তাদের শারীরিক পরিবর্ত্তনগুলিকে সহজভাবে নিতে হবে এবং যথাসম্ভব তাদের সঙ্গে সংঘাতকে এড়িয়ে চলতে হবে।

২। তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার চাহিদাকে তৃপ্তিলাভের জন্য যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে। ছোটখাট দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার তাদের উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদাটি তৃপ্ত করতে হবে।

৩। ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপর প্রাপ্তযৌবনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে যদি তার প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষালাভ করতে পারে তাতে তাদের ব্যক্তিগত সার্থকতাবোধ পরিতৃপ্ত হবে, নতুবা ব্যর্থতা বা আংশিক সাফল্য তাদের আত্মবিশ্বাসকে ক্ষীণবল করে তুলবে। এইজন্য মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বহুমুখী পাঠক্রমের প্রচলন করা একান্ত প্রয়োজন। আধুনিক প্রগতিশীল দেশগুলিতে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের মধ্যে সেইজন্য নানা বিভিন্ন পাঠ্য-বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে, যাতে প্রাপ্তযৌবনদের বিকাশমান বহুমুখী সম্ভাবনা ও চাহিদাগুলি তাদের পরিতৃপ্তি খুঁজে পায়। ভারতে সম্প্রতি প্রবর্ত্তিত বহু-সাধক বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত গতানুগতিক একমুখী পাঠক্রমকে পরিত্যাগ করে নানা বিভিন্নধর্ম্মী পাঠ্যবিষয়ের প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। এর ফলে প্রাপ্তযৌবনদের দীর্ঘ-অবহেলিত চাহিদাগুলি কিছু পরিমাণে পরিতৃপ্তি পাবে।

৪। তাদের সর্ব্বতোমুখী বৃদ্ধিকে পূর্ণতালাভের সুযোগ দেবার জন্য প্রচুর পরিমাণে সহপাঠক্রমিক কার্য্যাবলীর ব্যবস্থা রাখতে হবে। খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সম্মেলন, ভ্রমণ, অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের সত্তার সবদিকগুলি যাতে অবাধে অভিব্যক্ত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৫। এই সময় ছেলেমেয়েরা যাতে একটি উপযুক্ত জীবনদর্শন গড়ে তুলতে পারে সেদিক দিয়ে শিক্ষক পিতামাতারা তাদের যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। ভাল ভাল বই পড়ার সুযোগ দেওয়া, জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা, প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার অবকাশ দেওয়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জীবন সম্বন্ধে একটি গঠনমূলক পরিকল্পনা গড়ে তুলতে ছেলেমেয়েদের সাহায্য করা উচিত। প্রকৃতি-বীক্ষণ ও কল্পনাশক্তির বিকাশের পক্ষে খুব সহায়ক এবং ভ্রমণ, পিকনিক, স্কাউটিং ইত্যাদির মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগে আসতে পারে। তাছাড়া নানাদেশ ভ্রমণের ফলে প্রাপ্ত-যৌবনদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত হয় এবং তারা উদার জীবনদর্শন গড়ে তুলতে পারে।

৬। যৌনবিষয় সম্বন্ধে প্রাপ্তযৌবনদের নবজাগ্রত কৌতূহল মিটানোর জন্য যৌন-শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা দরকার। যৌন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যাতে ছেলে-মেয়েরা বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান লাভ করতে পারে তার ব্যবস্থা পাঠক্রমেরই অন্তর্ভুক্ত রাখা উচিত।

প্রশ্নাবলী

1. Give the chief characteristics of the different stages in the general development of a child. (B. T. 1951)

Ans. (পৃঃ ১০৯—পৃঃ ১১৯)

2. What are the characteristics of the adolescent ? Is adolescence invariably a period of 'storm and stress' ? How can the teacher be of help at this stage ? (B. T. 1951, B. A. 1960)

Ans. (পৃঃ ১১৬—পৃঃ ১২৫)

3. Discuss the characteristics of adolescence. How far are they dependent on environmental factors ? What are their bearings on secondary school curriculum ? (B. T. 1953)

Ans. (পৃঃ ১১৬—পৃঃ ১২৫)

4. The adolescent period is also a critical one for the development of 'criminality'. Do you agree ? Justify your answer with reasons and state how the teacher can be of help to the pupil at this stage. (B. T, 1956)

Ans. (পৃঃ ১১৬—পৃঃ ১২৫)

5. State how a child of eight differs from an adolescent in interest and ideal. (B. T. 1956)

Ans. (পৃঃ ১১৪—পৃঃ ১১৬)

6. State the main stages of human development and determine some characteristic features of each stage. (B. A. 1957)

Ans. (পৃঃ ১০৯—পৃঃ ১১৯)

7. "There is a tide which begins to rise in the veins of youth at the age of eleven or twelve......If that tide can be taken at the flood, and a new voyage begun in the strength and along the flow of its current, we think that it will move on to fortune." Critically examine the statetment. (B. T. 1958)

Ans. (পৃঃ ১১৬—পৃঃ ১২৫)

8. Explain why adolescence is regarded as a recapitulation of the first period of life. (B. A. 1958)

Ans. (পৃঃ ১১৬—পৃঃ ১২০)

9. What are the special needs of the adolescent ? Examine how far these are satisfied in a Multipurpose school.

(B. T. 1959)

Ans. (পৃঃ ১১৯—পৃঃ ১২৫)

10. Describe the main stages of human development from infancy to adolescence. (B. A. 1959, 1961)

Ans. (পৃঃ ১০৯—পৃঃ ১১৯)

11. Describe the nature and needs of adolescence.

(B. A. 1962)

Ans. (পৃঃ ১১৬—পৃঃ ১২৫)

12. What are the physical, mental, social and spiritual needs of the adolescent ? How can the school meet the needs. ?

(B.T. 1963)

Ans. (পৃঃ ১১৯—পৃঃ ১২৫)

13. Adolescence is described as an awkward stage—a period of 'storm and stress', 'strife and strain'. Do you agree ? Give reasons for your answer. (B. A. 3-Yr. 1963)

Ans. (পৃঃ ১১৬—পৃঃ ১২৫)

সাত

মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis)

মনঃসমীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা হলেও পরিকল্পনা ও পদ্ধতির দিক দিয়ে প্রচলিত সাধারণ মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে এর প্রচুর পার্থক্য। এটিকে প্রধানত মানব আচরণের বিজ্ঞান বলা চলতে পারে, যদিও আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীদের (Behaviorist) সঙ্গে কোন দিক দিয়েই এর কোন মিল পাওয়া যায় না। বরং আরও নিখুঁতভাবে বলতে গেলে এটিকে সঙ্গতিবিধানের মনোবিজ্ঞান (Psycho:-logy of adjustment) নাম দেওয়া যায়। অর্থাৎ ভিন্ন পারিবেশিক পরিস্থিতিতে মানুষ কি ভাবে সঙ্গতিবিধানের চেষ্টা করে তার বৈজ্ঞানিক কারণ-নির্ণয়ই মনঃ-সমীক্ষণের প্রধান কাজ। সাধারণ মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে মনঃসমীক্ষণের সব চেয়ে বড় পার্থক্য হল এই যে সাধারণ মনোবিজ্ঞানে মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে পৃথকভাবে তাদের পরিবেশ থেকে বিচ্যুত করে নেওয়া হয় এবং তারপর তাদের বিশ্লেষণ করে তাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয়, কিন্তু মনঃসমীক্ষণে মানব আচরণকে তার পারিবেশিক শক্তিগুলির সমন্বয়েই বিচার করা হয় এবং তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার সংব্যাখ্যান দেওয়া হয়।

ভিয়েনাবাসী মনোব্যাধির চিকিৎসক সিগমুণ্ড ফ্রয়েড এই নবীন মনোবিজ্ঞানের জনক। বস্তুত মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা পদ্ধতি থেকেই মনঃসমীক্ষণ জন্ম লাভ করেছে এবং এর পুষ্টি ও বিকাশ ঐ মনোব্যাধির চিকিৎসাগারেই। হিস্টেরিয়া ও অন্যান্য মানসিক বিকারের চিকিৎসা করতে গিয়ে তিনি মানব মনের গভীর অন্তঃ-স্থলে এমন কতকগুলি বৈচিত্র্যের সন্ধান পেলেন যাতে মানব আচরণের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য এক নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে তাঁর সামনে দেখা দিল। এই নতুন ব্যাখ্যাকে ভিত্তি করে ফ্রয়েড প্রচলিত করলেন এক নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি এবং গড়ে তুললেন তাঁর অধুনা প্রসিদ্ধ মনঃসমীক্ষণের অভিনব সৌধ।

দীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দী ধরে ফ্রয়েড তাঁর অদ্ভুত প্রতিভা ও কর্ম্মক্ষমতার সাহায্যে মনঃসমীক্ষণের বিভিন্ন তত্ত্বগুলির বাস্তব রূপ দিয়ে যান। তাঁর জীবিতদশাতেই তিনি নিজে তাঁর তত্ত্বগুলির মধ্যে প্রচুর পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধন করেন। তাঁর

মৃত্যুর পর অনেকেই তাঁর তত্ত্বগুলির মধ্যে নানারূপ পরিবর্ত্তন করে নিজেদের প্রয়োজন মত স্বতন্ত্র শাখার সৃষ্টি করেছেন। আমরা বর্ত্তমান আলোচনায় ফ্রয়েডের নিজস্ব মতের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করব। তবে ফ্রয়েডের প্রথম দিকের তত্ত্বগুলি এখানে বর্জ্জন করা হল এবং তার পরবর্ত্তীকালের সংব্যাখ্যান-গুলিরই বর্ণনা প্রধানত দেওয়া হল।

প্রাণশক্তি (Eros) ও মরণশক্তি (Thanatos)

মনঃসমীক্ষণ একটি পুরোপুরি গতিশীল বিজ্ঞান এবং এতে আভ্যন্তরীণ শক্তি এবং প্রেষণার সাহায্যেই মানব-আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ফ্রয়েডের মতে সমস্ত মানসিক সক্রিয়তার মূলে আছে দুটি আদিম শক্তি। একটির তিনি নাম দিয়েছেন প্রাণশক্তি (Eros)—জীবন এবং অনুরাগের শক্তি। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, নিজের এবং অপরের প্রতি ভালবাসা, আত্মসংরক্ষণ এবং জাতি সংরক্ষণের চাহিদা। এরস বা প্রাণশক্তির পাশাপাশি অথচ বিপরীতধর্ম্মী রয়েছে আর একটি আদিম শক্তি। ফ্রয়েড তার নাম দিয়েছেন মরণশক্তি বা থ্যানাটস (Thanatos)। এই শক্তি প্রাণীকে তার অপরিহার্য্য গন্তব্য মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। ফ্রয়েডের মতে প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে যেমন আছে বাঁচার ইচ্ছা তেমনই তার পাশাপাশি আছে তার মরণের ইচ্ছা। এই দুইয়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। মরণশক্তির প্রকাশ আবার দুরকমের হতে পারে, যখন এটি অন্তর্মুখী হয় তখন আত্ম-নির্য্যাতন, আত্মহত্যা ইত্যাদির রূপ নেয়, আবার যখন এটি বহির্মুখী হয়ে ওঠে তখন এই মরণশক্তি মারণের প্রচেষ্টায় পরিণত হয়। নিষ্ঠুরতা, আক্রমণমূলক আচরণ, বিনাশ বা ধ্বংসের প্রচেষ্টা ইত্যাদি মারণাত্মক প্রবণতাগুলি মরণশক্তিরই বহির্মুখী প্রকাশ।

ফ্রয়েডের এই সংব্যাখ্যান থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তিনি জীবনীশক্তি-বাদী (Vitalist) এবং অন্যান্য জীবনীশক্তিবাদীর সঙ্গে তাঁর মতের মৌলিক মিল যথেষ্টই আছে। ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁর জীবন প্রেষণার (Elan Vital) পরিকল্পনা বা বার্নার্ড শ'র জীবন-শক্তির (Life Force) পরিকল্পনার সমগোত্রীয় হল ফ্রয়েডের প্রাণশক্তির পরিকল্পনা। কিন্তু ফ্রয়েডের প্রাণশক্তি ও মরণশক্তি এই দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তির পরিকল্পনার মধ্যে সত্যই অভিনবত্ব আছে।

এর দ্বারা মানব-মনের মধ্যে যে মৌলিক অন্তর্বিরোধিতা আছে তার একটা সংব্যাখ্যান পাওয়া যায়।

প্রাণশক্তির অন্তর্নিহিত মূলশক্তির নাম দিয়েছেন তিনি লিবিডো (Libido)। এই লিবিডো হল তেজ ও উদ্যমের আধার। ফ্রয়েডের পরিকল্পনায় এই লিবিডোই হল ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, বৃদ্ধি এবং পরিণতির একমাত্র নিয়ন্ত্রক। এটি একটি পুরোপুরি মানসিক বা অতি-দৈহিক শক্তি। দেহগত শক্তি, পুষ্টি বা অন্যান্য দৈহিক শক্তির সঙ্গে একে মিশিয়ে ফেললে চলবে না।

প্রত্যেক ব্যক্তিই সমান পরিমাণ বা প্রকৃতির লিবিডো নিয়ে জন্মায় না। কারও এই তেজোভাণ্ডার থাকে কম, আবার কারও থাকে বেশী। আবার লিবিডোর বিকাশ প্রচেষ্টা নানা বিভিন্ন পথ বেয়ে এগোতে পারে এবং লিবিডোর এই গতিপথের উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিক স্বাভাবিকতা বা অস্বাভাবিকতা। অতএব ফ্রয়েডের মতে লিবিডোর পরিমাণ, তার গতিধারা এবং তার উপর পরিবেশের প্রতিক্রিয়া এইগুলির উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ ও সংগঠন।

ফ্রয়েডের মতে এই লিবিডোর প্রকৃতি যৌনমূলক। অর্থাৎ লিবিডোর সকল বিকাশ প্রচেষ্টাই ব্যক্তির যৌনকামনা-তৃপ্তির প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। ফ্রয়েডের এই সংব্যাখ্যান বহুযুগের প্রতিষ্ঠিত মানব-চিন্তার জগতে বিরাট এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। তাঁর মতে প্রাণীর বিকাশ বা বৃদ্ধির মূলগত যে তেজ বা শক্তি সেটি যৌনকামনারই অভিব্যক্তির সঙ্গে অভিন্ন। অবশ্য যৌনতাকে ফ্রয়েড প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেন নি। তিনি যৌনতা বলতে সকল রকম আসক্তিকেই বুঝিয়েছেন। যৌনতার অন্তর্গত হল সকলরকম সুখ-অন্বেষণের প্রচেষ্টা। আত্মপ্রীতি, পিতামাতা-বন্ধু-বান্ধবের প্রতি আকর্ষণ, মানবজাতির প্রতি প্রেম এবং ভালবাসা বলতে যত রকম আসক্তিকে বোঝায় সে সকলই ফ্রয়েডের যৌনতার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তা বলে যৌনতার সংকীর্ণ অর্থটিও এখানে বাদ যাচ্ছে না। দৈহিক মিলন বা প্রজনন-ক্রিয়া যে লিবিডোর মুখ্য লক্ষ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

লিবিডোর ক্রমগতি বা ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ

ফ্রয়েডের পরিকল্পনায় লিবিডো একটি চলমান তেজপ্রবাহ। জন্মের মুহূর্ত

থেকে এর চলা সুরু হয় এবং নানা পথ ধরে এটি তার পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। শিশুর ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ লিবিডোর ক্রমগতিরই সমার্থক।

লিবিডো বা ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের তিনটি প্রধান স্তর আছে। প্রথম শৈশব, জন্ম থেকে পাঁচ-ছ বৎসর পর্য্যন্ত, দ্বিতীয় প্রসুপ্ত কাল (Latent period), পাঁচ ছয় থেকে বার বা তের বৎসর পর্যন্ত এবং তৃতীয় যৌবনাগম যার স্থায়িত্ব ১৮ থেকে ২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত। এই স্তর তিনটির মধ্যে ফ্রয়েডের মতে শৈশবের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এই সময় লিবিডোর মধ্যে নানা পরিবর্ত্তন দেখা যায়।

জন্মের সময় শিশুর লিবিডো থাকে অসংহত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কিন্তু খুব শীঘ্রই লিবিডো তার আশ্রয় বা অবস্থান খুঁজে নেয়। কিন্তু লিবিডোর এই অবস্থান অপরিবর্ত্তিত থাকে না, শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার লিবিডোও স্থান পরিবর্ত্তন করে চলে। লিবিডোর অবস্থান প্রথমে থাকে শিশুর মুখে। একে বলে মৌখিক-রতি (Oral erotic) স্তর। এই সময় শিশু তার মুখের ব্যবহার থেকেই অধিকাংশ আনন্দ পেয়ে থাকে। প্রথম প্রথম চোষা এবং পরে কামড়ান চিবোনো ইত্যাদি কার্য্য থেকে সে লিবিডোর তৃপ্তি আহরণ করে। এই মৌখিক রতিরই শেষের দিকে আসে মৌখিক-ধর্ষণমূলক (Oral sadistic) স্তর। এই স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিশুর ধ্বংসমূলক মনোভাব। এই সময় সে যা পায় তাই ভাঙা বা নষ্ট করার প্রতি একটা প্রবণতা সে অনুভব করে।

মৌখিক-রতি স্তরের পরে আসে পায়ু-রতি (Anal-erotic) স্তর। এই স্তরের প্রথম প্রথম মল-নিঃসারণ প্রক্রিয়ায় শিশু আনন্দ পায় কিন্তু শেষের দিকে দেহের মধ্যে মল-সংরক্ষণে তার লিবিডো-তৃপ্তি ঘটতে দেখা যায়। ফ্রয়েডের মতে পরবর্ত্তী জীবনে কৃপণতা বা সংরক্ষণের প্রবণতা এই স্তরেই লিবিডোর সংবন্ধন থেকে দেখা দেয়।

পায়ু-স্তরের পর আসে লৈঙ্গিক (Phallic) স্তর। এই সময় যৌন-ইন্দ্রিয়ের সুখদানের ক্ষমতা শিশু আবিষ্কার করে। এই স্তরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিশুর যৌনতা অস্বাভাবিক ক্ষেত্রগুলিতে ঘুরে বেড়ায়। এই লৈঙ্গিক স্তর থেকেই তার লিবিডো স্বাভাবিক গতিপথ অনুসরণ করে।

কিন্তু লৈঙ্গিক স্তরেই লিবিডোর সংগঠন সম্পূর্ণ হয় না। লিবিডোর পরিণতি ও সংগঠন পূর্ণতা লাভ করে যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে। এই সময় লিবিডো তার বিভিন্ন ও অস্বাভাবিক অবস্থানগুলি ত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে জননেন্দ্রিয়ে এসে বাসা

বাঁধে। এই স্তরকে উপস্থ (Genital) স্তর বলা হয়। এইখানেই লিবিডোর বৈচিত্র্যময় যাত্রার শেষ হয় এবং তার চরম লক্ষ্য প্রজননক্রিয়ার প্রচেষ্টায় এসে সুসংহত হয়।

এত হল লিবিডোর স্বাভাবিক অগ্রগতি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে লিবিডোর ক্রমবিকাশ অস্বাভাবিক পথও অবলম্বন করে। লিবিডো তার চলার পথে যে সকল অস্বাভাবিক আশ্রয়ে শৈশবে সাময়িকভাবে অবস্থান করে কোন কোন ক্ষেত্রে এই সকল আশ্রয় ত্যাগ করে লিবিডো আর এগোতে পারে না। একে লিবিডোর সংবন্ধন (fixation) বলা হয়। অবশ্য সম্পূর্ণ লিবিডোটি কখনও কোন ক্ষেত্রে সংবন্ধিত হয় না, হয় তার কিছুটা অংশ। বাকী অংশ সামনের দিকে এগিয়ে চলে। কিন্তু লিবিডো এই সংবন্ধনের ফলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং সংবন্ধিত লিবিডোর প্রভাব তার পরিণত ব্যক্তিসত্তাকে একদিকে যেমন প্রভাবিত করে তেমনিই তার জীবন বিকাশের প্রচেষ্টা ও লিবিডোর বিভাজনে দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। ফ্রয়েডের মতে বহু মানসিক বিকারের মূলে আছে শৈশবের কোন অস্বাভাবিক অবস্থানস্থলে লিবিডোর এই ধরনের সংবন্ধন।

এই প্রসঙ্গে লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তির (regression) সঙ্গেও আমরা পরিচিত হতে পারি। পরিণত বয়সে কোন মানসিক আঘাত বা দুঃসহ ব্যর্থতার ফলে প্রবহমান লিবিডো চলার পথে বাধা পায় এবং তার পুরানো-শৈশবের অবস্থান-স্থলে ফিরে এসে আশ্রয় নেয়। একে লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি বলে। মানসিক বিকারের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি প্রায়ই ঘটে থাকে। উদাহরণস্বরূপ হিষ্টেরিয়ায় আক্রান্ত রুগীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ব্যক্তিটি বাস্তবজীবনে কোন দুরূহ পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি-বিধান করতে না পেরে শৈশবের অবাস্তব কল্পনার আশ্রয় নিয়েছে, এমন কি শিশুসুলভ আচরণও করতে সুরু করেছে। তার লিবিডো বর্ত্তমান বাস্তবের কাছে হার মেনে শৈশবের কল্পনাময় ও অবাস্তব সুখের দিনগুলিতে ফিরে গেছে। অবশ্য লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তিকে সম্ভব করে তোলে লিবিডোর শৈশবকালীন সংবন্ধন। যার মধ্যে যত বেশি সংবন্ধিত লিবিডো আছে তার ক্ষেত্রে প্রত্যাবৃত্তি তত্ত্ব সহজে ঘটে। হিষ্টেরিয়ার বৈশিষ্ট্য হল ঈডিপাস কম্‌প্লেক্সে সংবন্ধন ও লিবিডোর সেই সংবন্ধন স্থানে প্রত্যাবৃত্তি।

লিবিডোর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার আসক্তির বিষয় বা পাত্রেরও মধ্যে

পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। প্রথম প্রথম লিবিডোর আসক্তি থাকে বিষয়-বিহীন অবস্থায় এবং কেবলমাত্র দৈহিক সুখানুভূতিতেই তার তৃপ্তি সীমাবদ্ধ থাকে। এখানেই স্বতঃরতি (Auto-erotic) স্তরের সুরু।

এই সময় কোন বিশেষ বিষয়ে লিবিডোর তৃপ্তি সংযুক্ত থাকে না, নিছক আঙ্গিক সুখই তখন শিশুর কাম্য। কিন্তু যখন ধীরে ধীরে তার সত্তার (অহমের) বিকাশ হতে সুরু করে তখন লিবিডো অহমের উপর সংযুক্ত হয়ে যায়। এটি হল স্বতঃরতি স্তরেরই পরিণত রূপ। একে প্রাথমিক নার্সিসাসত্ব (Primary Narcissism) বলা হয়। নার্সিসাসত্ব কথাটা এসেছে গ্রীক পৌরাণিক চরিত্র নার্সিসাসের কাহিনী থেকে। নার্সিসাস জলেতে নিজের ছায়া দেখে তাকেই ভালবেসে ফেলেছিল। অতএব নার্সিসাসত্ব মানে হল আত্মরতি।

এই প্রাথমিক আত্মরতি অহংসত্তার বিকাশে সাহায্য করে এবং চিরকালই আমাদের মধ্যে কিছু না কিছু মাত্রায় থেকে যায়। যদিও অতিরিক্ত আত্মরতি কখনই কাম্য নয়, তবু কিছুটা আত্মরতি ব্যক্তির সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বগঠনে সর্ব্বদাই অত্যাবশ্যক। এই প্রাথমিক নার্সিসাসত্বের স্তরে যাদের লিবিডোর সংবন্ধন বা। প্রত্যাবৃত্তি ঘটে তারা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। যৌবনাগমে নার্সিসাসত্বের দ্বিতীয় স্তর দেখা দেয়। প্রাপ্তযৌবন বালকবালিকারা নতুন করে নিজেদের ভালবাসতে শেখে।

লিবিডো-আসক্তির তৃতীয় স্তরে লিবিডো অহংকে ছেড়ে দিয়ে বাইরের বিষয়ে সংযুক্ত হয়। শিশুর আসক্তির প্রথম বিষয়বস্তু হল তার পিতামাতা। এর সুরু হয় লৈঙ্গিক স্তরে। পিতামাতার প্রতি শিশুর আসক্তি থেকেই জন্মায় ঈডিপাস কম্প্লেক্স্। এ সম্বন্ধে পরের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

চেতন, প্রাক্চেতন ও অচেতন (Conscious, Preconscious and Unconscious)

ফ্রয়েডের পূর্ব্বে চেতন মন ছাড়া অন্য কোন মনের কথা মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণা বা আলোচনায় স্থান পায় নি। ফ্রয়েডই প্রথম দেখালেন যে মনের অজ্ঞাত অংশটি জ্ঞাত অংশের চেয়ে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ত নয়ই বরং মানব-আচরণের প্রকৃতি ও গতি নির্দ্ধারণে অচেতন মনই চেতন মনের চেয়ে অনেক বেশী প্রভাবশালী। তাঁর পরিকল্পনায় মনের তিনটি বিভাগ আছে যথা চেতন, প্রাক্চেতন ও অচেতন।

আমাদের যে মনটি বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং যে মনটির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা সচেতন, মনের সেই অংশটিকে চেতন (Conscious) বলা হয়। এই চেতন মন অচেতনের তুলনায় আয়তনে অনেক ক্ষুদ্র এবং প্রায় অচেতনের সাত ভাগের একভাগের মত। তাছাড়া চেতন প্রক্রিয়ার একটা বড় অংশ অচেতন প্রক্রিয়ারই প্রভাব থেকে জন্মলাভ করে থাকে। চেতনের ঠিক নিচেই হল প্রাক্‌চেতন (Preconscious)। এটি যদিও সাধারণ অবস্থায় আমাদের জ্ঞানের বাইরে, কিন্তু চেষ্টা করলে প্রাক্‌চেতনের বিষয়-বস্তুগুলি চেতন মনে আনা যায়। যে সকল ঘটনা আমাদের মনে নেই অথচ মনে করতে পারি সেইগুলিরই অবস্থান প্রাক্‌চেতনে। অবশ্য প্রাক্‌চেতনের সমস্ত ঘটনাই যে সহজে মনে করা যায় তা নয়, এমন অনেক ঘটনা আছে যা মনে করতে যথেষ্ট কষ্ট বা অসুবিধা হতে পারে।

প্রাক্‌চেতনের নীচে হল অচেতন (Unconscious)। মনের অধিকাংশ জায়গা জুড়েই অচেতনের অবস্থান। যদিও অচেতন প্রক্রিয়াগুলি আমাদের জ্ঞানের বাইরে তবুও আমাদের সচেতন চিন্তা ও আচরণের উপর তাদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী।

চেতন মনে যেমন আছে শৃঙ্খলা ও সংহতি, অচেতনে তেমনই আছে চরম অসংহতি। অচেতন প্রক্রিয়াকে অসঙ্গতিপূর্ণ, শিশুসুলভ ও আদিম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অচেতনের প্রধান অধিবাসী হল নগ্ন কামনা, বাসনা, প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের দল। এগুলি আসে দুটি উৎস থেকে—প্রথম, কতকগুলি চেতন মন থেকে অবদমিত হয়ে অচেতনে এসে বাসা বাঁধে। আর দ্বিতীয়, কতকগুলি সহজাত, জন্ম থেকেই অচেতনের অধিবাসী, কখনও চেতনের স্তরে ওঠে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর অচেতন বস্তুগুলি ইউঙ্ (Jung) নাম দিয়েছেন জাতিগত অচেতন (Racial Unconscious বা Archetype)। এগুলি আদিম মানুষের মন থেকে বংশধারার মধ্যে দিয়ে আমাদের মনে সঞ্চালিত হয়ে থাকে।

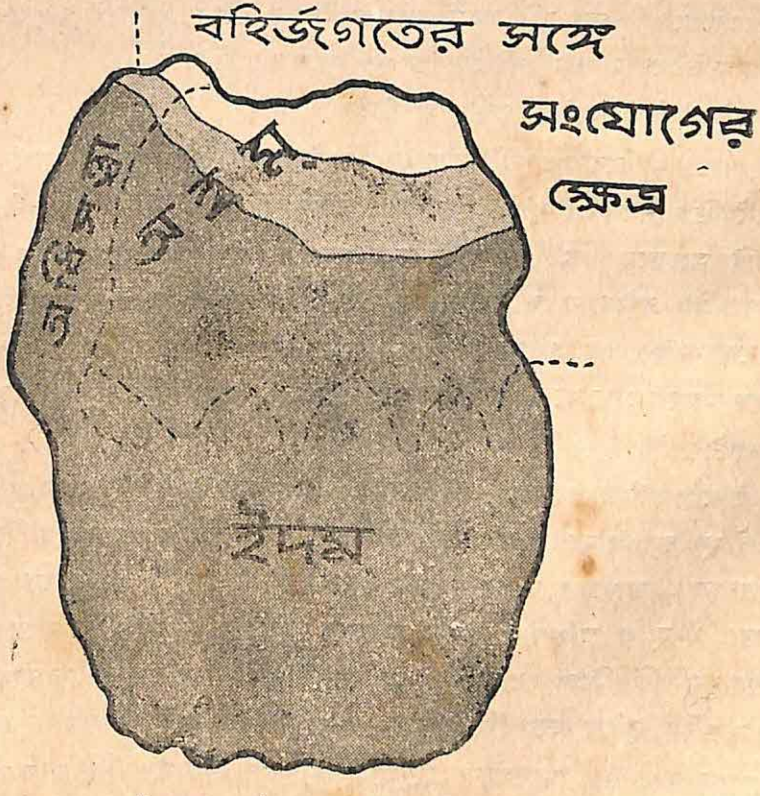
ইদম্ (Id), অহম্ (Ego) ও অধিসত্তা (Super-Ego)

এছাড়া ফ্রয়েড মনের আরও তিনটি বিশেষ অধিবাসীর, কল্পনা করেছেন ; যথা, ইদম্, অহম্ এবং অধিসত্তা।

ইদম্ হল পুরোপুরি অচেতন। এটি লিবিডোর আদিম আশ্রয়স্থল এবং ব্যক্তির

সমস্ত প্রবৃত্তিমূলক কামনার পেছনে জোগায় শক্তি। এ ছাড়া চেতন মনে যত অবাঞ্ছিত অসামাজিক ইচ্ছা জেগে থাকে সেগুলিও অবদমিত হয়ে ইদমে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ইদম্ প্রকৃতিতে অতি আদিম। সে পুরোপুরি অনুসরণ করে সুখভোগ নীতি (Pleasure Principle) ; অর্থাৎ সে চায় দুঃখকে এড়িয়ে যেতে এবং সুখকে পেতে। সে সমাজ, শিক্ষা, নীতি কোন কিছুরই ধার ধারে না। ইদম্ মূর্ত্তিমতী কামনা, মানুষের নগ্ন বাসনার প্রতিচ্ছবি। তার মধ্যে কোন যুক্তি নেই, বিচারবুদ্ধি নেই, নৈতিক ভালমন্দের জ্ঞান নেই। আদিম মানব মনের সে প্রতীক। সে চায় আনন্দ, তার কামনা-বাসনার পরিতৃপ্ত, তা সে ভাল হোক, মন্দ হোক সমাজ অনুমোদিত হোক আর না হোক—সেদিকে তার কোন দৃষ্টি নেই।

ইদম্ ব্যক্তির কামনা বাসনার আধার হলেও বাস্তবের সঙ্গে তার কোন যোগা-



[মনের সংগঠনের ফ্রয়েডীয় পরিকল্পনা]

যোগ নেই। ফলে সে সরাসরি কোন ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে না। তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে একমাত্র পারে ইগো বা অহম্।

অহমের কিছুটা চেতন, আবার কিছুটা অচেতন। জন্মের সময় অহম্ থাকে অতি দুর্ব্বল, কিন্তু শিশু যত বড় হয় ততই বাস্তবের সংস্পর্শে অহম্ পুষ্ট হতে থাকে। অহমের চেতন অংশটা বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলে আর তার অচেতন দিকটা ইদমের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখে। ইদম্ অনুসরণ করে সুখভোগের নীতি কিন্তু অহম্ পরিচালিত হয় বাস্তব নীতির (Reality Principle) দ্বারা। অহম্ বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন এবং যুক্তিধর্ম্মী। সে বোঝে তাকে টিঁকে থাকতে হলে বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে হবে। সে জন্যই বাস্তবের অনুশাসন মেনে চলাই তার নীতি এবং এই নীতির জন্যই সে ইদমের দাবী পূর্ণ করতে পারে না। বস্তুত ইদমের তৃপ্তি মানে অহমেরই তৃপ্তি, কিন্তু বাস্তবের চাপে অহম্ বাধ্য হয় ইদম্‌কে দাবিয়ে রাখতে। তবে যদি অহম্ বোঝে যে ইদমের কোন বিশেষ ইচ্ছা পূরণে কোন ক্ষতি হবে না তখন সেই ইচ্ছা সে পূর্ণ করতে আপত্তি করে না।

এই মানসিক সংগঠনের তৃতীয় অংশটি হল অধিসত্তা। কিছুটা উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া নীতিবোধ ও বিধিনিষেধ এবং কিছুটা পিতামাতার কাছ থেকে অর্জ্জন করা নৈতিক শিক্ষা, এই দু'য়ে মিলে তৈরী হয়েছে অধিসত্তা। অধিসত্তার বেশীর ভাগই অচেতনে এবং সেইজন্য অহমের চেয়ে অধিসত্তা ইদমের অবাঞ্ছনীয় ও অসামাজিক কামনা সম্বন্ধে বেশী খবর রাখে। অধিসত্তার সর্ব্বপ্রধান কাজ হল সমালোচনা করা এবং এই সমালোচনার মাধ্যমে সে ইদমের বাসনাগুলিকে দমন করতে অহংকে বাধ্য করে। আমরা প্রচলিত ভাষণে যাকে বিবেক বলি অধিসত্তা অনেকটা তাই।

উপরের বর্ণনায় আমরা ইগো বা ব্যক্তির অহংসত্তার যে ছবিটি পেলাম সেটি সত্যই খুব সুখকর নয়। অহংকে একাধিক বিপরীতধর্ম্মী শক্তির সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়। ফ্রয়েডের ভাষায় অহংকে একসঙ্গে তিনটি প্রভুর সেবা করতে হয়, বাস্তব, ইদম্ ও অধিসত্তা। অহম্‌কে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বাস্তবের অনুশাসন, বিধিনিষেধ প্রভৃতি মেনে চলতে হয়। আবার ইদ্‌মের কামনা বাসনাগুলির তৃপ্তির জন্য বিরামহীন চাপ তাকে সহ্য করে যেতে হয়। এবং সবশেষে অধিসত্তার সমালোচনা অনুযায়ী তাকে তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। এককথায় এই তিনটি শক্তির অনুক্ষণ চাপ অহংকে সর্বদা সহ্য করে যেতে হয়।

যতক্ষণ অহম্ এই ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে সুসমন্বয় সাধন করে চলতে পারে ততক্ষণ তার মানসিক সাম্য বজায় থাকে। যে মুহূর্ত্তেই এই পারস্পরিক সমন্বয় নষ্ট হয়ে যায় সেই মুহূর্ত্তেই দেখা দেয় মানসিক বিপর্য্যয়। ফ্রয়েডের মতে মানসিক বিকারের রুগীর অহম্ যে কোন কারণেই এই তিনটি পরস্পরবিরোধী শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারে নি।

কম্প্লেক্স (Complex)

কম্প্লেক্স কথাটির সাধারণ অর্থ হল জটিল। ফ্রয়েড কম্প্লেক্স কথাটি ব্যবহার করেছেন একধরনের বিশেষ মানসিক সংগঠনকে বোঝাতে। যখন কোন বস্তু বা ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে আমাদের মনের মধ্যে একটা স্থায়ী জটিল সংগঠনের সৃষ্টি হয় তখন তাকে কম্প্লেক্স বলা হয়। এই মানসিক সংগঠনের দুটি বৈশিষ্ট্য অছে, প্রথম এটি প্রক্ষোভাত্মক, অর্থাৎ কোন কম্প্লেক্স সক্রিয় হয়ে উঠলে ব্যক্তি বিশেষ একটি প্রক্ষোভের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ওঠে এবং দ্বিতীয়, কমপ্লেক্স মাত্রেই ব্যক্তির আচরণের নিয়ন্ত্রক অর্থৎ কম্প্লেক্স ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। ব্যক্তির মধ্যে যখন কোন কম্প্লেক্স জাগে তখন ব্যক্তির আচরণ বিশেষ একটি গতিপথ অনুসরণ করে থাকে।

ফ্রয়েডের মতে কম্প্লেক্সের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। সেটি হল এর অচেতনধর্ম্মিতা। অর্থাৎ ব্যক্তি তার নিজের কম্প্লেক্স সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সচেতন থাকে না এবং কম্প্লেক্সের প্রভাবে সে যে আচরণ করে তার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে তার কোন জ্ঞানই থাকে না। কম্প্লেক্স ব্যক্তির অচেতন মনের গভীর তলদেশে নিহিত থাকে এবং ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে তার সচেতন আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। ফ্রয়েডের মতে অচেতনধর্ম্মিতাই কম্প্লেক্সের অপরিহার্য্য বৈশিষ্ট্য।

কম্প্লেক্সের সৃষ্টি হয় অবদমন থেকে। যখন ব্যক্তির মনে এমন কোন চিন্তা বা ইচ্ছা দেখা দেয় যেটা তার সজ্ঞান শিক্ষা বা সামাজিক মান বা ধর্ম্মবোধের কাছে আবাঞ্ছনীয় বলে মনে হয় তখন সে সেটাকে তার অচেতন মনে অবদমন করে এবং তার ফলে সেটি সে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। কিন্তু এই চিন্তা বা ইচ্ছা তার অচেতনের গভীর তলদেশে কম্প্লেক্স বা জটিল একটি সংগঠনের রূপে বাস করে এবং

যখনই সুযোগ পায় তখনই তার সচেতনস্তরে উঠে এসে তার আচরণকে প্রভাবিত করে।

অচেতনে নির্ব্বাসিত অবস্থায় থাকলেও কম্প্লেক্স তার কর্ম্মক্ষমতা বিন্দুমাত্র হারায় না এবং প্রক্ষোভ-নিষিক্ত অপূর্ব্ব এক শক্তির আধার রূপে তার অচেতনের অন্তঃস্থলে অভিব্যক্ত হবার সুযোগের প্রতীক্ষা করে। কম্প্লেক্স মাত্রেই কোন না কোন মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে প্রসূত। সেইজন্য যখনই কম্প্লেক্সের প্রভাবে ব্যক্তি কোন আচরণ করে তখনই তার সেই আচরণে তার মনের সেই গুপ্ত অন্তর্দ্বন্দ্বটি প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এইজন্য কম্প্লেক্স জাত আচরণ অস্বাভাবিক হয়ে থাকে।

এ থেকে আমরা কম্প্লেক্সের আর একটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই। কম্প্লেক্সের মধ্যে একটা অবাঞ্ছনীয়তা থাকবেই, কেননা সচেতন সত্তার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ইচ্ছা বা চিন্তা থেকেই কম্প্লেক্স জন্মে থাকে। এই কারণেই কম্প্লেক্সের সচেতন মনে প্রবেশাধিকার নেই, তাকে অচেতনে বাস করতে হয়।

যে কোন বিষয় বা ঘটনাকে ঘিরেই কম্প্লেক্সের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন একটি শিশু বার কয়েক অঙ্কতে ফেল করায় তার অঙ্ককে ঘিরে একটা কম্প্লেক্স তৈরী হল। ফলে যখনই অঙ্কের প্রসঙ্গ ওঠে বা নিজে অঙ্ক করার চেষ্টা করে তখনই তার মধ্যে ভীতিময় একটা অনুভূতি দেখা দেয় এবং তার আচরণও কিছুমাত্রায় অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এই ধরনের ব্যক্তিগত কম্প্লেক্স ছাড়াও কতকগুলি সর্ব্বজনীন কম্প্লেক্স দেখা যায়। তার মধ্যে হীনমন্যতার কম্প্লেক্স (Inferiority Complex) উল্লেখযোগ্য। যখন তার কোন ত্রুটী, বা অক্ষমতা বা অসাফল্যের জন্য নিজেকে ছোট বলে মনে করে তখন তাকে হীনমন্যতার কম্প্লেক্স বলা হয়। তেমনই অপর পক্ষে আত্মশ্লাঘার কম্প্লেক্সের (Superiority Complex) নামও করা যেতে পারে। এছাড়া ফ্রয়েড আরও কয়েকটী সর্ব্বজনীন কম্প্লেক্সের কথা বলেছেন। তাদের মধ্যে ঈডিপাস কম্প্লেক্স, কাস্ট্রেসন কম্প্লেক্স প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ঈডিপাস কম্প্লেক্স (Oedipus Complex)

শিশুর লিবিডো যখন প্রথম নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেড়ে বাইরের বিষয় বা পাত্রের দিকে পরিচালিত হয়, তখন তার প্রথম আসক্তির বিষয় হন তার মা। লিবিডোর

পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই আসক্তি ক্রমশ যৌনমূলক হয়ে ওঠে। কিন্তু নানা কারণে শিশু বুঝতে পারে যে এই যৌন আসক্তি অনুচিত এবং সে তখন সেটাকে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। এই বুঝতে পারার মূলে আছে শিশুর উপর তার পিতার প্রভাব। যেমন করেই হোক শিশু বুঝে নেয় যে মার প্রতি এ ধরনের অধিকারটা আছে সম্পূর্ণ পিতারই এবং মার প্রতি তার এই যৌন কামনাটি একান্ত অসঙ্গত।

ফলে তার সে কামনাকে সে অবদমন করে এবং এই অবদমিত কামনাটি কম্প্লেক্সরূপে মনে বাসা বাঁধে। এরই নাম দেওয়া হয়েছে ঈডিপাস কম্প্লেক্স। কম্প্লেক্সটির নামকরণ হয়েছে গ্রীসদেশের একটি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে। ঈডিপাস ছিল থিব্সের রাজার ছেলে। তাকে শৈশবে এক পাহাড়ে ফেলে আসা হয় এবং একজন রাখাল তাকে মানুষ করে। বড় হয়ে ঈডিপাস্ বড় যোদ্ধা হয়ে দাঁড়ায় এবং ঘটনাচক্রে তার বাবার রাজ্য আক্রমণ করে। যুদ্ধে ঈডিপাস নিজের বাবাকে হত্যা করে ও তখনকার প্রথামত মাকে বিবাহ করে, অবশ্য এসবই সে করে তার মা বাবার আসল পরিচয় না জেনে।

ঈডিপাস কম্প্লেক্স্ বলতে অতএব বোঝায় মার প্রতি ছেলের যৌনমূলক আসক্তি। মনে রাখতে হবে যে শিশুর এই ইচ্ছা সম্পূর্ণ তার অচেতন মনের। সে চেতন মনে তার মার প্রতি কোনরূপ যৌবনমূলক আসক্তির কথা জ্ঞাত নয়। মার প্রতি তার এই আসক্তি প্রকাশ পায় মার আদর ও মনোযোগ পাওয়া, বা মার কাছে শোওয়া প্রভৃতি ইচ্ছার মধ্যে দিয়ে। প্রথম প্রথম মনে করা হত যে সে শিশুর এই আসক্তি বোধ করি তার মায়ের দৈহিক সত্তার প্রতি উদ্দিষ্ট, কিন্তু পরে দেখা গেছে যে শিশু তার অচেতন মনের অবাস্তব কল্পনার রাজ্যে তার মার একটি প্রতিরূপ তৈরী করে নিয়েছে এবং তার অচেতনের সেই মাতৃমূর্ত্তিকে (Imago) ঘিরেই তার সমস্ত আসক্তি। মায়ের প্রতি যত এই যৌন আসক্তি বেড়ে চলে ততই পিতাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত পিতার প্রতি বিদ্বেষ, তার দৈহিক ক্ষতি এমন কি তাঁর মৃত্যুকামনাও শিশুর চিন্তার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

ছেলের যেমন মায়ের প্রতি আসক্তি ঠিক সেই রকম আসক্তি দেখা দেয় মেয়ের তার পিতার প্রতি। মেয়ে তার বাবার সঙ্গ কামনা করে এবং মাকে তার ভালবাসার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে। মেয়ের এই মনোভাবকে প্রথমে ইলেক্ট্রা

কম্‌প্লেক্‌স্ নাম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে ছেলেমেয়ে উভয়ের এই মনোভাবকে ঈডিপাস কম্‌প্লেক্‌স্ নাম দিয়েই বোঝান হয়ে থাকে।

অধিসত্তার অনেকখানি ঈডিপাসেরই অবদান। মায়ের প্রতি আসক্তি শিশুর মনে পিতার সম্বন্ধে একটা বিরাট ভীতির সৃষ্টি করে। শিশু মনে করে তার এই আসক্তির জন্য পিতা তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন এমন কি তার যৌনাঙ্গ-ছেদ করতে পারেন। এই মনোভাবের নাম কাষ্ট্রেসন (Castration) কম্‌-প্লেক্‌স্। পিতার সম্বন্ধে এই ভীতিবোধ তাকে পিতার প্রতি অনুগত ও বাধ্য করে তোলে। পরে যখন শিশু বড় হয় তখন তার উপর ঈডিপাস কম্‌প্লেক্‌সের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে যায় এবং পিতার সম্বন্ধে অস্বাভাবিক ভীতিবোধও চলে যায়। কিন্তু পেছনে থেকে যায় একটা বিধিনিষেধ ও নৈতিক আদর্শের প্রতি স্বতঃপ্রসূত আনুগত্য। তারই নাম অধিসত্তা বা সুপার-ইগো।

প্রতিরক্ষণ কৌশল (Defence Mechanism)

অহংকে তিনটি বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সর্ব্বদাই খাপ খাইয়ে চলতে হয়, ইদম্, অধিসত্তা ও বাস্তব। কিন্তু ইদমের অধিকাংশ ইচ্ছাই বাস্তবের বিরোধী এবং অধিসত্তার দ্বারা অননুমোদিত। তার ফলে প্রায়ই এমন একটি জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন অহমের অবস্থা বেশ সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে। তখন অহংকে আত্মরক্ষার জন্য কতকগুলি কৌশলের শরণাপন্ন হতে হয়। এই কৌশলগুলিকে প্রতিরক্ষণ কৌশল (Defence Mechanism) বলা হয়।

প্রতিরক্ষণ কৌশলগুলির উদ্দেশ্য দু' প্রকারের হতে পারে। প্রথম, অবদমিত করা ইচ্ছাগুলির প্রকাশের বিরুদ্ধে অহমের আত্মরক্ষার প্রয়াস আর দ্বিতীয়, ইদমের ইচ্ছাগুলিকে আংশিক তৃপ্তিদান। এইজন্য এগুলিকে সঙ্গতিবিধানের কৌশল (Adjustment Mechanism) নামও দেওয়া হয়ে থাকে।

অবদমন (Repression)

প্রতিরক্ষণ কৌশলগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় অবদমনের।

ইদমের কামনাগুলি তৃপ্তিলাভের জন্য নিয়তই তাদের আবেদন নিয়ে অহমের কাছে হাজির হয়। কিন্তু তাদের অসামাজিক ও নীতিবিরোধী প্রকৃতির জন্য

অহমের পক্ষে সেগুলির তৃপ্তিসাধন করা সম্ভব হয় না। তখন সেগুলিকে হয় আংশিক বা কৃত্রিম তৃপ্তি দিতে হয় কিংবা সেগুলিকে সম্পূর্ণ দাবিয়ে রাখতে হয়। এই দাবিয়ে রাখার কাজটিকে অবদমন বলে। সময় সময় চেতন মনেও এই ধরনের সমাজ-বিরোধী বা নীতিবিরুদ্ধ ইচ্ছা দেখা দেয়। তখনও অহম্ সেই ইচ্ছাটিকে তার অচেতনে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। অবদমনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এটি একটি অচেতন প্রক্রিয়া এবং যে ইচ্ছা বা চিন্তাকে ব্যক্তি অবদমন করে তার সম্বন্ধে কোন সচেতনতা তার আর পরে থাকে না। সেই ইচ্ছা বা চিন্তাটি চেতন স্তর থেকে নেমে অচেতনে এসে বাসা বাঁধে এবং তার ফলে ব্যক্তি সেই বিষয়টি সম্পূর্ণ ভুলে যায়।

কিন্তু অচেতনে অবদমিত হলেও এই ইচ্ছা বা কামনাগুলি তাদের শক্তি বা ক্ষমতা হারায় না। অনেকটা টাইম বোমার মত সেগুলি অচেতনে অবস্থান করে এবং সময় ও সুযোগ পেলেই বিস্ফোরিত হয়। এই অননুমোদিত এবং বাতিল করা ইচ্ছাগুলিকে দাবিয়ে রাখার জন্য অহংকে তাদের উপর একটা বাধা চাপিয়ে দিতে হয়। এই বাধাকে সেন্সর নাম দেওয়া হয়েছে। সেন্সরের কাজ হল ইদমের তৃপ্তিকামী ইচ্ছাগুলিকে পরীক্ষা করে দেখা। যে ইচ্ছাগুলি সেন্সরের বিচারে তৃপ্তিদানের যোগ্য সেগুলিকে সেন্সর চেতনে প্রবেশ-অধিকার দেয় এবং যেগুলি তার বিচারে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয় সেগুলিকে সে জোর করে দাবিয়ে রাখে। এক কথায় সেন্সর অবদমিত ইচ্ছাগুলির পাহারাদাররূপে কাজ করে।

অবদমনের কাজে অধিসত্তার অংশ প্রচুর। যদিও অধিসত্তা সরাসরি অবদমন করতে পারে না এবং অবদমন করাটা একমাত্র অহমেরই কাজ, তবু সেন্সরের প্রকৃতি নির্দ্ধারণে অধিসত্তার অবদান সব চেয়ে বেশী। কোন্ ইচ্ছাটি চেতনে স্থান পাবার যোগ্য আর কোন্‌টি নয় এটির চরম নিয়ন্ত্রক হল অধিসত্তা এবং সেন্সর পরিচালিত হয় অধিসত্তারই অনুশাসন অনুযায়ী।

প্রকৃতির দিক দিয়ে অবদমন হল চরমতম এবং নিকৃষ্টতম কৌশল। কেননা এর মাধ্যমে ইদমের বিন্দুমাত্র তৃপ্তি হয় না এবং ইদম্-অহমের দ্বন্দ্বের কোন মীমাংসা ঘটে না। অবদমন যখন অতিরিক্ত হয়ে ওঠে তখন ইদম্-অহমের অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্রতম রূপ ধারণ করে এবং তার ফলে ব্যক্তির মানসিক স্থৈর্য্য যে কোন মুহূর্ত্তে বিপর্য্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। অধিকাংশ মানসিক বিকারের কারণই হল অতৃপ্ত ইচ্ছার অতিরিক্ত অবদমন।

প্রতিক্রিয়া সংগঠন (Reaction Formation)

কখনও কখনও কোন অবদমিত ইচ্ছাকে অস্বীকার করার জন্য ব্যক্তি সেই ইচ্ছার বিপরীত মনোভাবটি দেখায় বা বিপরীত আচরণ করে। এই কৌশলটিকে প্রতিক্রিয়া সংগঠন বলা হয়। *উদাহরণস্বরূপ অবদমিত যৌন-ইচ্ছা যৌন-ভীতির রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে। ঈডিপাস কম্‌প্লেক্‌স্ বা কাষ্ট্রেশন কম্‌প্লেক্‌স্ থেকে জাত পিতার প্রতি বিদ্বেষ পিতার জন্য অতিরিক্ত উদ্বেগে পরিবর্ত্তিত হয়ে যেতে পারে।

অপব্যাখ্যান (Rationalisation)

যখন আচরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা কারণের পরিবর্ত্তে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট বা সমাজ অনুমোদিত কোন উদ্দেশ্য বা কারণ উপস্থাপিত করা হয় তখন সেই কৌশলটিকে অপব্যাখ্যান বলা যেতে পারে। এই কৌশলের দ্বারা অহম্ তার আচরণটির সত্যকার উদ্দেশ্য বা কারণটি প্রকাশ করার অবাঞ্ছিত কাজ থেকে রেহাই পায়। অবশ্য এই প্রকৃত কারণটা গোপন রেখে অন্য একটি কারণ উপস্থাপিত করার কাজটি সম্পূর্ণ অচেতনভাবেই অহমের দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে। যে মিস্ত্রী তার নিকৃষ্ট কাজের জন্য তার যন্ত্রপাতির দোষ দেয় বা যে নর্ত্তকী তার নৃত্যকলায় অজ্ঞতার দায়িত্ব উঠানের উপর চাপায়, সেই মিস্ত্রী বা নর্ত্তকী নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য অপব্যাখ্যানেরই আশ্রয় নিচ্ছে। আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্ত্তা ও আচরণে আমরা এই ধরনের বহু অপব্যাখ্যানের সাহায্য নিয়ে থাকি।

প্রতিক্ষেপণ (Projection)

প্রতিক্ষেপণ অপব্যাখ্যানেরই একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত মাত্র। এই কৌশলটিতে ব্যক্তি তার ইদমের অতৃপ্ত কামনাটি বাইরের জগতের উপর প্রতিক্ষিপ্ত করে। যেমন কোন স্ত্রীর স্বামীর প্রতি অচেতন মনের ঘৃণাটি প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে স্ত্রীর মনে এই ধারণা সৃষ্টি করতে পারে যে তার প্রতিই তার স্বামীর আসক্তি নেই বা স্বামীই তাকে ঘৃণা করে। মানসিক বিকৃতির অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রুগী নিপীড়নের বিভ্রান্তিতে (Delusion of persecution) ভোগে। অর্থাৎ তার ধারণা হয় যে সকলেই তাকে নির্য্যাতন করছে। প্রকৃতপক্ষে তার অভ্যন্তরস্থ ধ্বংসাত্মক কামনাটি বাইরের জগতে প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে তার মধ্যে নিপীড়নমূলক বিভ্রান্তির রূপ নিয়েছে।

উন্নয়ন (Sublimation)

সঙ্গতিবিধানের কৌশল হিসাবে এটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কেননা এর দ্বারা অহমের পক্ষে ইদমের অতৃপ্ত কামনার আংশিক তৃপ্তি দেওয়া সম্ভব হয়। ফ্রয়েডের মতে লিবিডোর সকল কামনার লক্ষ্যই যৌনমূলক। কিন্তু নানা ক্ষেত্রে লিবিডোর যৌনমূলক লক্ষ্যটিকে নিরুদ্ধ করে তাকে অন্যপথে পরিচালিত করা হয় বা তাকে আংশিক তৃপ্তি দেওয়া হয়ে থাকে। একেই উন্নয়ন প্রক্রিয়া বলে। কোন কামনাকে তার নিম্নশ্রেণীর লক্ষ্য থেকে সরিয়ে এনে কোন উচ্চশ্রেণীর লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করাই হল উন্নয়নের প্রকৃত অর্থ। এই লক্ষ্য–নিরুদ্ধ শক্তি সৃজনমূলক নানা কার্য্যের মধ্য দিয়ে তৃপ্তি লাভ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যৌন-মিলনের ইচ্ছা উন্নীত হয়ে ক্লাব, পার্টি, সহনৃত্য প্রভৃতির মাধ্যমে নর-নারীর মধ্যে অবাধ মেলামেশায় পরিণত হয়েছে, আক্রমণাত্মক কামনা বক্সিং, কুস্তি ও অন্যান্য প্রতি-যোগিতামূলক খেলাধূলার রূপ নিয়েছে। দেখা গেছে যে এইভাবে লক্ষ্য-নিরুদ্ধ লিবিডোর শক্তি শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি, সামাজিক কার্য্যাবলী, ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান, হবি প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে তাদের তৃপ্তি খুঁজে নেয়।

অভেদীকরণ (Identification)

এটিও একটি ইদমের কামনাকে আংশিক তৃপ্তি দেবার পন্থাবিশেষ। এই কৌশলে ব্যক্তি অপরের সঙ্গে বা অপরের কৃতিত্বের সঙ্গে নিজেকে বা নিজের কৃতিত্বকে অভিন্ন বলে মনে করে তৃপ্তি পায়। শৈশবে শিশু তার পিতার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে তৃপ্তি লাভ করে। আমরাও যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কৃতিত্ব নিয়ে গর্ব্ববোধ করি সেটিও একটি অভেদীকরণের দৃষ্টান্ত।

প্রত্যাবৃত্তি (Regression)

লিবিডো যখন বাস্তবের কোন বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে পারে না তখন সে বর্ত্তমানকে ত্যাগ করে অতীতের শৈশবে ফিরে যায় এবং শৈশবের যে সকল আচরণে সে আনন্দ পেত সেই সকল আচরণ করতে সুরু করে দেয়। হিষ্টেরিয়া প্রভৃতি মনোবিকারের ক্ষেত্রে লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি প্রায়ই ঘটে থাকে। (১৩২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) দেখা গেছে যে মানসিক বিকারের রুগী নিজের হাতে খাবার খেতে পারছে না বা কাপড় পরতে পাচ্ছে না। অর্থাৎ ব্যক্তি

তার বর্ত্তমান পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে না পেরে তার শৈশবের আচরণে প্রত্যাবর্ত্তন করেছে।

অবাস্তব কল্পনা এবং দিবাস্বপ্ন (Fantasy & Day-dreaming)

যে সকল ইচ্ছা বাস্তবে তৃপ্ত হয় না সেগুলিকে কল্পনা বা দিবাস্বপ্নের মাধ্যমে ব্যক্তি তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। অবদমিত বাসনাকে তৃপ্তিদানের এই কৌশলটি খুবই সহজ এবং সকলেরই আয়ত্তাধীন। অনেক সময় অতৃপ্ত যৌন-কামনাও অযৌন রূপ নিয়ে দিবাস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে নিজেদের তৃপ্তি খুঁজে নেয়।

রূপান্তর (Conversion)

কখনও কখনও অবদমিত ইচ্ছা শারীরিক অভিব্যক্তির রূপ নিয়ে দেখা দেয়। তখন তাকে রূপান্তর বলা হয়। যেমন রূপান্তরিত (Conversion Hysteria) ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শারীরিক পরিবর্ত্তনের মাধ্যমে মানসিক দ্বন্দ্বের সমাধান ঘটেছে। একটি মেয়ে দীর্ঘদিন তার অসুস্থ পিতার সেবা করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠল। অথচ পিতার প্রতি তার স্বাভাবিক কর্ত্তব্যবোধও একটুও কমল না। ফলে জন্ম নিল মানসিক দ্বন্দ্ব এবং শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে মেয়েটির একটি হাত অবশ হয়ে গেছে। এখানে তার পিতাকে সেবা করার অনিচ্ছাটি শারীরিক লক্ষণ নিয়ে দেখা দিল।

মনোবিকারের কারণ (Causes of Neurosis)

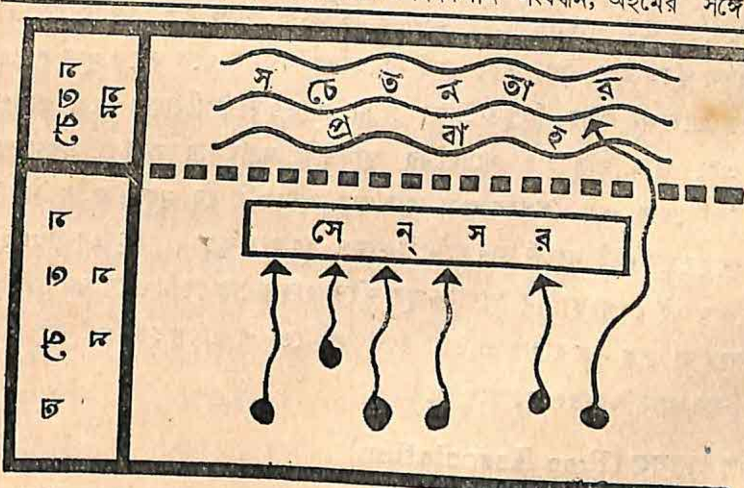
লিবিডো তার সহজ অগ্রগতির পথে কোন কারণে বাধা পেয়ে যদি তার শৈশবের কোন সংবন্ধনের (fixation) স্থানে ফিরে আসে তাহলে ব্যক্তির মধ্যে মনোবিকার (Neurosis) দেখা দেয়। লিবিডোর এই প্রত্যাবৃত্তির (regression) ফলে ব্যক্তি বাস্তবের সংযোগ হারিয়ে ফেলে এবং শৈশবের যে সকল আচরণ বা পন্থার দ্বারা তার লিবিডো তৃপ্তি পেত সেই সকল আচরণ বা পন্থা সে আবার অবলম্বন করে।

এটি হল মনোবিকারের প্রত্যক্ষ কারণ। ব্যক্তির পক্ষে আঘাতাত্মক ও ব্যর্থতামূলক কোন ঘটনা লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি ঘটাতে পারে। কিন্তু আঘাতাত্মক

বা ব্যর্থতামূলক ঘটনা ত ব্যক্তির জীবনে নিয়তই ঘটছে। কিন্তু সকলের ক্ষেত্রেই মনোবিকার দেখা দেয় না কেন? তার ব্যাখ্যা হল মনোবিকারের আর একটি অপ্রত্যক্ষ কারণ আছে। সেটি হল মনোবিকারমূলক প্রবণতা অর্থাৎ ব্যক্তির মনের মধ্যে এমন একটা পরিস্থিতি পূর্ব্ব থেকেই সৃষ্ট হয়ে থাকে যাতে ঐ প্রত্যক্ষ কারণটি ঘটলেই লিবিডো প্রত্যাবৃত্ত করবে।

এই অপ্রত্যক্ষ কারণের মধ্যে প্রধানত পড়ে লিবিডোর অতিরিক্ত শৈশবকালীন সংবন্ধন, যার ফলে ব্যক্তির জীবন-সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় লিবিডোর পরিমাণ হয়ে যায় কম এবং কোনরূপ মানসিক আঘাত বা ব্যর্থতাকে সহ্য করতে লিবিডো অসমর্থ হয়ে পড়ে। তাছাড়া শৈশবকালীন যৌন তৃপ্তির ক্ষেত্রগুলিতে লিবিডো সংবন্ধ থাকার ফলে ব্যক্তির অচেতনে সকল সময়ই একটা দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। শৈশবে সংবন্ধ লিবিডো চায় তৃপ্তি কিন্তু পরিণত মনের অহম্ তাকে সে তৃপ্তি দিতে পারে না। ফলে অহম্‌কে জোর করে সেই শৈশবকালীন কামনাগুলিকে অবদমিত করতে হয়। তার ফলেও বেশ কিছুটা লিবিডো ব্যয়িত হয়ে যায় এবং বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য লিবিডোর পরিমাণ আরও কমে যায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে লিবিডোর শৈশবকালীন সংবন্ধন, অহমের সঙ্গে সেই



চেতন মনে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অসামাজিক ও অবাঞ্ছিত কামনাবাসনাগুলি অচেতনে অবদমিত হয় এবং সেখান থেকে সেগুলি সচেতন স্তরে উঠে আসার বার বার চেষ্টা করে। কিন্তু সেন্সর তাদের উপরে ওঠার সে প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে। কোন কোন অবদমিত কামনা কৌশলে সেন্সরকে এড়িয়ে সচেতন স্তরে এসে পৌঁছয়।

সংবন্ধ লিবিডোর দ্বন্দ্ব এবং তার ফলে অহম্ কর্তৃক শৈশবকালীন কামনাগুলির অবদমন—এ সবে মিলে ব্যক্তির মনে সৃষ্টি করে এমন একটা পরিস্থিতি যেটা মনোবিকার ঘটানোর পক্ষে উপযোগী। এর সঙ্গে আবার থাকতে পারে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া মনোবিকারমূলক প্রবণতা। এই অপ্রত্যক্ষ কারণগুলির সঙ্গে যখন আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতা-রূপ প্রত্যক্ষ কারণটি সংযুক্ত হয় তখনই দেখা দেয় মনোবিকার।

একটি কথা মনে রাখতে হবে যে মনোবিকারও ব্যক্তির একপ্রকার সঙ্গতিমূলক প্রচেষ্টা। অহম্ যখন দেখে যে ইদমের অবদমিত আকাঙ্ক্ষাগুলিকে সে আর দাবিয়ে রাখতে পারছে না, অথচ সেগুলির তৃপ্তি দেওয়ার অর্থ চরম বিপর্য্যয়কে ডেকে আনা তখন মনোবিকারের মাধ্যমে সে সেগুলিকে তৃপ্তি দেয়। যেমন অবৈধ যৌনকামনাকে প্রকাশ্য পথে পূর্ণ তৃপ্তি দেওয়ার চেয়ে অহম্ সেগুলিকে হিষ্টেরিয়ার লক্ষণের মধ্যে দিয়ে আংশিক তৃপ্তি দেওয়া অনেক নিরাপদ বলে মনে করে। মনোবিকার হল চরম বিপর্য্যয়কে এড়াবার জন্য আংশিক বিপর্য্যয়কে বরণ করবার প্রচেষ্টা মাত্র।

মনোবিকারের চিকিৎসা

ফ্রয়েডের মতে মনোবিকারের একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে প্রত্যাবৃত্ত লিবিডোর আশ্রয়স্থল খুঁজে বার করা এবং সেই সংবন্ধনের বন্ধন থেকে তাকে মুক্ত করা। এর জন্য প্রয়োজন রুগীর বিস্মৃত শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা-বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রবেশ করা এবং তার লিবিডোর সংবন্ধনের স্থানগুলি আবিষ্কার করা। ফ্রয়েডের মতে লিবিডোর এই শৈশবকালীন আসক্তির স্থানগুলি যে মুহূর্তে রুগীর নিকট জ্ঞাত হয়ে যাবে সেই মুহূর্তে তার মনোবিকারও দূর হয়ে যাবে। ইয়ুংএর (Jung) মতে কিন্তু এই শৈশবকালীন আসক্তি-স্থল খুঁজে বার করার কোন প্রয়োজন নেই। যে বাস্তব বা কাল্পনিক বাধায় প্রতিহত হয়ে লিবিডো প্রত্যাবৃত্ত হয় সেইটাই দূর করে দিলে মনোবিকারও দূর হয়ে যাবে।

অবাধ অনুষঙ্গ (Free Association)

শৈশবের লিবিডো-আসক্তির ক্ষেত্রগুলি খুঁজে বার করা স্বাভাবিকভাবে সম্ভব নয়। কেননা সেই অভিজ্ঞতাগুলি সচেতন মন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ফলে অহম্ কর্তৃক অচেতন মনে অবদমিত হয়ে থাকে। সাধারণ পন্থায় ব্যক্তি চেষ্টা করলেও সেই অতীতের স্মৃতিগুলিকে তার চেতন মনে আনতে পারে না।

প্রথম প্রথম সম্মোহন প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই অতীত অভিজ্ঞতাগুলি মনে জাগানোর চেষ্টা করা হত। কিন্তু পরে ফ্রয়েড সম্মোহন প্রক্রিয়াটি ত্যাগ করে অবাধ অনুষঙ্গের পদ্ধতির প্রচলন করলেন। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে মনের উপর কোনরূপ বাধা না চাপিয়ে যা মনে আসে তাই বলে যাবার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

একটি নির্জ্জন ঘরে শান্ত পরিবেশে কেবলমাত্র মনঃসমীক্ষকের উপস্থিতিতে ব্যক্তিকে একটি আরাম কেদারায় শুইয়ে দেওয়া হয় এবং তার পরে তাকে বিনা দ্বিধা ও সঙ্কোচে যা তার মনে আসে তাই নিঃসঙ্কোচে বলে যেতে বলা হয়। প্রথম প্রথম ব্যক্তি তার বর্ত্তমান ও চেতন মনের চিন্তার কথাই বলে কিন্তু ক্রমশ সে ধীরে ধীরে তার বিস্মৃত অতীতে এবং অচেতন মনের শৈশবকালীন অভিজ্ঞতায় চলে যায় এবং তার কথার মধ্য দিয়ে বহু অপূর্ণ কামনা ও অবদমিত অভিজ্ঞতার কাহিনী আত্ম-প্রকাশ করে। মনঃসমীক্ষক এই সকল তথ্য থেকে তার মানসিক দ্বন্দ্বটির নিখুঁত ছবিটি পেয়ে যান এবং তার মনোবিকার দূর করার উপায় নির্দ্ধারণ করে দিতে পারেন। এই পদ্ধতিটিকে অবাধ অনুষঙ্গ বলা হয়। কেননা এক চিন্তা থেকে আর এক চিন্তায় অনুষঙ্গ (association) স্থাপনে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি এখানে করা হয় না। ব্যক্তির চিন্তাধারা তার সহজ ও অবাধিত অগ্রগতির পথ ধরে এগোতে পারে। যদিও এ পদ্ধতিতে অনুষঙ্গ যথেষ্ট অবাধিত তবু এটিকে পুরো বাধাহীন বলা চলে না, কারণ চিকিৎসকের উপস্থিতি ও তাঁর নির্দ্দেশদান, পরিস্থিতির বৈচিত্র্য, নিজের রোগ সম্বন্ধে সচেতনতা ইত্যাদি ব্যাপারগুলি ব্যক্তির অনুষঙ্গকে যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে।

মনঃসমীক্ষণের একটি বড় অঙ্গ হল এই অবাধ অনুষঙ্গের পদ্ধতিটি। এই পদ্ধতির সাহায্যে ফ্রয়েড এবং তার অনুগামীরা মনোবিকারের কারণ নির্ণয় ও দূরীকরণে অত্যন্ত সন্তোষজনক ফল লাভ করেছেন। এই পদ্ধতিটি অবশ্য যথেষ্ট আয়াসবহুল এবং অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ এবং বিশেষধর্ম্মী শিক্ষণ ছাড়া এই পদ্ধতিটি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা শক্ত।

অচেতনতার মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষক (Psychology of Unconscious and Teacher)

পূর্ব্বে মন বলতে একমাত্র সচেতন মনকেই বোঝা হত। শিশুর কাজকর্ম্ম

আচরণ সবই মনে করা হত তার সচেতন মনের চিন্তা বা ইচ্ছা থেকে প্রসূত। অতএব তার সমস্ত আচরণের ব্যাখ্যাও যেমন তার সচেতন মনের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা দেওয়ার চেষ্টা করা হত তেমনই তার আচরণের সংশোধন বা পরিবর্ত্তনের জন্যও তার এই সচেতন মনেরই বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংশোধিত বা পরিবর্ত্তিত করার চেষ্টা করা হত। উদাহরণস্বরূপ যদি একটি ছেলে মিথ্যা কথা বলত তাহলে শিক্ষক মনে করতেন যে সে তার মনের অসৎ কোন ইচ্ছা বা শাস্তি এড়াবার ভয় থেকে মিথ্যা বলছে। কোন ছেলে যদি চুরি করত তাহলে মনে করা হত যে সে লোভের বশবর্ত্তী হয়ে চুরি করছে। আবার যদি কোন ছেলে ক্লাশ থেকে পালাত তাহলে শিক্ষক মনে করতেন যে সে নিশ্চয়ই পড়াশোনায় অমনোযোগী বা অসৎসঙ্গের প্ররোচনায় সে পড়ায় অবহেলা করছে। এই সব দুষ্কৃতিকারীদের সংশোধনের জন্যও সেইরকম পন্থা অবলম্বন করা হত। অর্থাৎ যে ছেলে মিথ্যা কথা বলছে তার মনের অসৎ ইচ্ছাকে দমন করার বা তার মনের ভয় দূর করার চেষ্টা করা হত। যে ছেলে চুরি করত তাকে তার লোভ দমন করার শিক্ষা দেওয়া হত বা যাতে সে চুরি করার সুযোগ না পায় তার ব্যবস্থা করা হত। তেমনই যে ছেলে ক্লাশ পালাত সে ছেলে যাতে ক্লাশ পালাবার সুযোগ আর না পেত সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হত। শিক্ষকদের এই সংশোধনমূলক প্রচেষ্টায় দুটি বস্তুর সাহায্য বিশেষ করে নেওয়া হত, শাস্তি এবং পুরস্কার। যাতে ছেলেমেয়েদের দুষ্কৃতির দিকে প্রবণতা না দেখা দেয় সেজন্য শাস্তি এবং পুরস্কারকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হত।

কিন্তু যেদিন থেকে আমরা অচেতন মনের অস্তিত্বের কথা জানতে পারলাম সেদিন থেকেই আমরা বুঝতে পারলাম যে মানব আচরণের যে ব্যাখ্যা এতদিন আমরা দিয়ে এসেছি সে ব্যাখ্যা নিতান্তই ভুল ও অসম্পূর্ণ। আমাদের আচরণের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক আমাদের সচেতন মন নয়, আমাদের অচেতন মনই। শিশুর সচেতন মনের কোন চাহিদা বা ইচ্ছা পূর্ণ না হলে তা অবদমিত হয়ে যায় তার অচেতন মনে এবং সেখানে সেটি সৃষ্টি করে অন্তর্দ্বন্দ্বের। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তার সচেতন মনে প্রতিফলিত হয় না বটে, কিন্তু তা তার সচেতন আচরণকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে এবং বহুক্ষেত্রে তার সচেতন চিন্তাধারা, আচরণ, মনোভাব প্রভৃতির প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে।

যেমন, যে ছেলে মিথ্যা কথা বলছে সে নিছক অসৎ ইচ্ছায় বা শাস্তির ভয়ে

যে তা বলছে তা না হতেও পারে। হয়ত তার আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা স্বাভাবিক পথে তৃপ্ত না হওয়ায় সে মিথ্যা কথা বলে অপরের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করায় চেষ্টা করছে। তেমনই যে ছেলে চুরি করছে সেও হয়ত তার অতৃপ্ত সঞ্চয়ের চাহিদা কিংবা প্রত্যাখ্যাত স্বীকৃতির চাহিদাকে তৃপ্ত করার জন্য চুরি করছে। যে ছেলে ক্লাশ পালাচ্ছে সেও হয়ত ক্লাশে তার কৌতূহল তৃপ্তির যথেষ্ট উপাদান না পাঁওয়ায় বাইরে বেরিয়ে পড়েছে তার কৌতূহল তৃপ্তির জন্য। এই সব ছেলেমেয়েদের আধুনিক মনোবিজ্ঞানে অপসঙ্গতিসম্পন্ন (maladjusted) শিশু বলা হয়ে থাকে। এরা স্বাভাবিক পন্থায় নিজেদের চাহিদার তৃপ্তি করতে না পেরে অস্বাভাবিক পথ নিয়েছে সেই চাহিদার পরিতৃপ্তি আনতে। এতদিন এই সব ছেলেমেয়েদের আচরণের ব্যাখ্যা গতানুগতিক পথেই দিয়ে আসা হয়েছে এবং তাদের সংশোধনের চেষ্টাও হয়েছে বাহ্যিক উপায়ে। কিন্তু সে চিকিৎসা হয়েছে নিছক লক্ষণমূলক (symptomatic) অর্থাৎ সেখানে কেবলমাত্র তাদের লক্ষণগুলি দূর করার চেষ্টাই হয়েছে প্রকৃত রোগ দূর করার চেষ্টা হয়নি। যে ছেলে ক্লাশ থেকে পালাচ্ছে বা চুরি করছে তাকে কড়া শাসনে রাখলে সে হয়ত ঐ কাজগুলি আর করতে পারবে না, কিন্তু তাতে তার চাহিদার তৃপ্তি হবে না বা মনের অন্তর্দ্বন্দ্বও দূর হবে না। ফলে তার অতৃপ্ত চাহিদা অপর কোনও অস্বাভাবিক পথে প্রকাশিত হবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু বর্ত্তমানে শিশুর অচেতন মন সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান লাভ করায় শিক্ষকেরা শিশুদের সমস্যামূলক আচরণের সত্যকারের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা করতে পারেন। শিশুর অপসঙ্গতির যে মূল কারণটি তার অচেতনের গভীরতায় নিহিত থাকে যতক্ষণ সেটির চিকিৎসা না হচ্ছে ততক্ষণ শিশুর অপসঙ্গতি দূর হবে না! ফলে আজকাল শিশুর সমস্যামূলক আচরণের চিকিৎসা হয়ে দাঁড়িয়েছে মূলগত, নিছক লক্ষণগত নয়। এই ধরনের শিশুকে আজকাল আর শাস্তি-পুরস্কারের সাহায্যে বা নৈতিক বিধিনিষেধের কড়া বাঁধনে বেঁধে শোধরাবার চেষ্টা করা হয় না, তাদের সমস্যাগুলির প্রকৃত স্বরূপ চিকিৎসকের দৃষ্টি নিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হয় এবং রোগের মূল কারণটি খুঁজে বার করে সেটিকে দূর করার চেষ্টা হয়। এই কারণেই আজকাল প্রতি প্রগতিশীল বিদ্যালয়ে শিশুদের সমস্যার সমাধানের জন্য শিশু-চিকিৎসাগারের (Child Guidance Clinic) সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। স্কুলের পরিবেশে যাতে শিশুদের বিভিন্ন মৌলিক চাহিদাগুলি তৃপ্তি লাভ করে

এবং যাতে শিশু সুসঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে বেড়ে ওঠে তার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়ে থাকে।

বস্তুত অচেতন মনের আবিষ্কার মানব মনের বহুশতাব্দীর বদ্ধ দরজা আজ খুলে দিয়েছে। শিক্ষক আজ শিশুর মনের বহু জটিল ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। মানুষের বহু আচরণই বাহ্যত নির্দোষ বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে কোন অন্তর্নিহিত চাহিদা বা অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে সেগুলি জন্মে থাকে। অনেক সময় অচেতনে অবদমিত কমপ্লেক্সও আমাদের বহু আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। এই সব আচরণগুলিকে মনঃসমীক্ষণে প্রতিরক্ষণ কৌশল (Defence mechanism) বা সঙ্গতিবিধান কৌশল (Adjustment mechanism) বলা হয়। শিশুর কোন আচরণকে আজকাল আর তার বাহ্যিক স্বরূপের দ্বারা বিচার না করে তার অন্তর্নিহিত গুপ্ত কারণ বা উদ্দেশ্যটিকে খুঁজে বার করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

অচেতনতার মনোবিজ্ঞান যেমন একদিকে সাধারণ সমস্যামূলক আচরণের ব্যাখ্যা দেয় তেমনই গুরুতর মনোবিকারের কারণেরও সন্ধান দিয়ে থাকে। ফ্রয়েডের অসংখ্য পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে মনোবিকারের কারণ নিহিত থাকে ব্যক্তির অচেতনে। লিবিডোর সংবন্ধন, প্রত্যাবৃত্তি, শৈশবকালীন আঘাতাত্মক (traumatic) অভিজ্ঞতা ইত্যাদি মানসিক ঘটনাগুলি যে মনোবিকারের কারণ এ সত্যের সঙ্গে শিক্ষক পরিচিত হয়েছেন এবং যাতে শিশুর জীবনে এই ধরনের কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা না ঘটে সেদিকে যত্ন নিতে পারেন।

শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ তার অচেতন মনের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। অচেতনের অধিবাসী অসংখ্য অসামাজিক কামনাবাসনার তৃপ্তির তাগাদা ও বাস্তব জগতের অনুশাসন ও দাবীর মধ্যে যতটুকু ও যেভাবে ব্যক্তি সামঞ্জস্য করতে পারে সেইভাবেই তার ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে। শিক্ষকের কাছে এই প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু জানা থাকলে তিনি উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করে শিশুর ব্যক্তিসত্তাকে সুষ্ঠু বিকাশের পথে পরিচালিত করতে পারেন।

এ ছাড়াও মনঃসমীক্ষণের কাছ থেকে আমরা আরও অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি। এইসব তথ্যগুলি আধুনিক শিক্ষকের কাজকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। সেগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

শিক্ষায় মনঃসমীক্ষণের দান

শিক্ষার নতুন সংব্যাখ্যান ও আধুনিক পদ্ধতি নির্ণয়ে মনঃসমীক্ষণের দান যত বেশী মনোবিজ্ঞানের অন্য কোন শাখার দান বোধ করি তত বেশী নয়।

মনঃসমীক্ষণের গবেষণায় মানব মনের কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ এতদিন অজানা বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের সন্ধান আমরা পেয়েছি, যার ফলে শিশুকে মানুষ করা ও শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণাগুলি একেবারে বদলে গেছে। প্রত্যক্ষভাবে হোক আর অপ্রত্যক্ষভাবে হোক, পূর্ণভাবে হোক আর আংশিকভাবেই হোক, সব দেশের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যেই মনঃসমীক্ষণের মৌলিক তথ্যগুলি অনুপ্রবেশ করেছে এবং সর্ব্বক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন এনেছে।

শিক্ষা ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে মনঃসমীক্ষণ কোন্ কোন্ দিক দিয়ে প্রভাবিত করেছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী নীচে দেওয়া হল।

১। শৈশবের গুরুত্ব

মনঃসমীক্ষণের সব চেয়ে বড় দান হল শৈশবের উপর গুরুত্ব স্থাপন। আগে মনে করা হত শৈশবের বিশেষ কোন প্রভাব ব্যক্তির পরিণত জীবনে থাকে না কিন্তু এখন মনঃসমীক্ষণ প্রমাণ করে দিয়েছে যে শৈশবই জীবনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাল এবং ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার বারো আনাই সংগঠিত হয়ে যায় তার জীবনের প্রথম কয় বছরের মধ্যেই। অতএব শিশু তার শৈশবে যাতে কোনরূপ আঘাতাত্মক (traumatic) অভিজ্ঞতা না পায় এবং তার ক্রমবিকাশ স্বাস্থ্যময় ও অভীষ্ট পথ ধরে এগোতে পারে সেটা দেখাই শিক্ষার প্রধান কাজ।

২। মানসিক সমস্যার নতুন ব্যাখ্যা

ছাত্রছাত্রীদের সমস্যামূলক আচরণ এবং দুষ্কৃতির একটি নতুন ব্যাখ্যা মনঃসমীক্ষণ আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। পূর্ব্বে ছাত্রছাত্রীদের দুষ্কৃতি বা নীতিবিরোধী আচরণগুলিকে সাধারণ গতানুগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হত এবং তাদের প্রতিকারও করা হত প্রচলিত নিয়মানুযায়ী। অর্থাৎ কেউ মিথ্যা কথা বললে তাকে শাস্তি বা পুরস্কারের সাহায্যে সত্য কথা বলতে প্ররোচিত করা হত। কেউ ক্লাশ থেকে পালালে যাতে সে আর ক্লাশ থেকে না পালাতে পারে তার জন্য কড়া নজর রাখা হত ইত্যাদি। কিন্তু এই ধরনের

চিকিৎসাগুলি পুরোপুরি লক্ষণ-ভিত্তিক (symptomatic), অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে রোগের লক্ষণের চিকিৎসা করাই হয়, প্রকৃত রোগের চিকিৎসা করা হয় না। কিন্তু সত্যকারের রোগের চিকিৎসা করতে হলে যেতে হবে রোগের মূলে, যেখানে দেখা যাবে কোন বিশেষ মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব বা কোন অবদমিত কামনা শিশুকে ঐ ধরনের অস্বাভাবিক কাজ করতে বাধ্য করছে এবং ঐ তথাকথিত দুষ্কৃতি তখনই দূর হবে যখন শিশুর ঐ মানসিক দ্বন্দ্বের মীমাংসা হবে বা তার অপূর্ণ কামনা তৃপ্তি পাবে। লক্ষণ-ভিত্তিক চিকিৎসায় রোগের লক্ষণ দূর হয় কিন্তু রোগ দূর হয় না।

যে ছেলে মিথ্যা কথা বলছে বা চুরি করছে, হয়ত সে সেটা করছে তার অতৃপ্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনাকে তৃপ্ত করতে। সে হয়ত লেখাপড়ায় ভাল ফল দেখাতে পারছে না, তার ফলে সে সহপাঠীদের মধ্যে কোনরূপ স্বীকৃতি পাচ্ছে না। সেইজন্য সে মিথ্যা কথা বা চুরি করার মাধ্যমে আত্মস্বীকৃতি পাবার চেষ্টা করছে। অতএব এ ছেলেটির চিকিৎসা করতে হলে তার মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করতে হবে অর্থাৎ সে যাতে স্বাভাবিক উপায়ে আত্মস্বীকৃতি পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিশুদের সমস্যামূলক আচরণের এই নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি থেকেই জন্ম নিয়েছে মনোব্যাধি-চিকিৎসার (Psychiatry) আধুনিক শাস্ত্র এবং মানসিক স্বাস্থ্যবিধির (Mental Hygiene) সাম্প্রতিক পরিকল্পনা।

৩। মানসিক নির্দ্ধারণ-বাদ

মনঃসমীক্ষণের দেওয়া মানসিক সংগঠনের পরিকল্পনাটিও শিক্ষায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষ করে অচেতনের পরিকল্পনাটি মানব আচরণের ব্যাখ্যায় যুগান্তর এনেছে। ব্যক্তির আচরণ যে কেবলমাত্র তার মনের চিন্তা, ইচ্ছা এবং ধারণা থেকেই জন্মায় না বরং তার প্রত্যেকটি আচরণের চরম নির্ণায়ক ও নির্দ্ধারক হল তার অচেতন মনের অদৃশ্য শক্তি—এই অভিনব তথ্যটি আজ আমাদের হস্তগত হওয়ায় শিক্ষার পদ্ধতিরও আমুল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এই তত্ত্বটির নাম দেওয়া হয়েছে মানসিক নির্দ্ধারণবাদ (Psychic Determinism)। এই অভিনব তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে মানব আচরণের স্বরূপ-নির্ণয় ও সংব্যাখ্যান সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধারণ করেছে।

৪। মানসিক দ্বৈততা

মনঃসমীক্ষণের আর একটি অবদান হল মানব মনের চিরকালের দ্বৈততাকে (duality) প্রকাশিত করা। মানুষের মনে বহু সম্পূর্ণ বিপরীতধর্ম্মী শক্তি পাশাপাশি থেকে মানুষের সমস্ত আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এরস হল প্রাণের শক্তি, তার পাশেই রয়েছে থ্যানাটস, মৃত্যুর শক্তি। ইদম্ অন্ধ ও যুক্তি-হীন, নগ্ন কামনার প্রতিমূর্ত্তি, তার পাশে থেকে কাজ করছে অহম্, আমাদের বাস্তব-সচেতন মন ও বিচারবুদ্ধির বাহক। অতএব মানুষের আচরণের মধ্যে বৈষম্য ও স্ববিরোধিতা থাকা খুবই স্বাভাবিক এবং এই বিপরীতধর্ম্মী প্রবণতাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখাই হচ্ছে শিক্ষার কাজ।

৫। শৈশবকালীন যৌনতা

শৈশবকালীন যৌনতার (Infantile sexuality) তত্ত্বটি মনঃসমীক্ষণের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। শৈশবে শিশুর ব্যক্তিসত্তা নির্ণয়ে যৌনশক্তির প্রভাবই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ তথ্যটি প্রথম মনঃসমীক্ষণই প্রকাশ করে। অবশ্য ফ্রয়েডীয় সংব্যাখ্যানে মানবের আচরণের সকল স্তরেই যৌনতাই একমাত্র শক্তি, এ তত্ত্ব আজও সর্ব্বজনস্বীকৃত না হলেও, মানব আচরণের নির্ণায়করূপে যৌনতা যে একটি প্রধান শক্তি এ কথাটি আজকাল সকলেই স্বীকার করে থাকেন। এই জন্যই আধুনিক শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর যৌন চাহিদাকে আর অবহেলা করা হয় না এবং নানা বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার তৃপ্তির আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই একই কারণে যৌন-শিক্ষাও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে।

৬। আবেগমূলক শক্তি

মনঃসমীক্ষণে প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, অনুভূতি প্রভৃতির শক্তির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাধারণ প্রচলিত মনোবিজ্ঞানে যুক্তিমূলক ইচ্ছা, অভ্যাস, রিফ্লেক্স প্রভৃতিকেই আচরণের প্রধান উৎস বলে মনে করা হয়। কিন্তু মনঃ-সমীক্ষণের ব্যাখ্যায় ঐগুলির প্রকৃত আচরণ-নির্ণয়ে বিশেষ ক্ষমতা নেই এবং বাস্তবক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ আবেগমূলক শক্তিই যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে পরাজিত করে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

৭। অচেতন প্রেষণা

আমাদের আচরণের পিছনে যে প্রেষণা বা ইচ্ছা থাকে সেটার প্রকৃত স্বরূপ যে প্রায়ই আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকে এই তথ্যটি মনঃসমীক্ষণের দান অর্থাৎ আমাদের বহু আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় অচেতন প্রেষণার (unconscious motivation) দ্বারা। যেমন প্রতিক্ষেপন, অপব্যাখ্যান প্রভৃতি প্রতিরক্ষণ কৌশলের ক্ষেত্রে আমাদের আচরণের প্রকৃত উৎস নিহিত থাকে আমাদের অচেতনের কোন অজ্ঞাত কামনায়।

৮। অবদমন

অবদমনের তথ্যটিও শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক অনুশাসন, মাতাপিতার নিয়ন্ত্রণ, শাস্তির ভয় ইত্যাদি কারণে শিশু তার ইচ্ছাকে অবদমিত করতে বাধ্য হয় এবং তার ফলে তার অচেতনে দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে এবং তার শিক্ষা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। এই জন্য সুশিক্ষার প্রথম মন্ত্র হল শিশুর ইচ্ছাকে যতদূর সম্ভব পূর্ণ করার ব্যবস্থা করা এবং যাতে প্রতিকূল পরিবেশের চাপে তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয় তা দেখা।

৯। অবাধ অনুষঙ্গ

সর্ব্বশেষে শিক্ষায় মনঃসমীক্ষণের একটি বড় অবদান হল অবাধ অনুষঙ্গের পদ্ধতি এবং তার মূলগত তত্ত্বটি। মনঃসমীক্ষণই প্রথম পরীক্ষণের সাহায্যে প্রমাণ করে দেয় যে সকল প্রকার মানসিক বিকারের মূলে আছে অচেতনের অবদমিত বাসনা যাকে একমাত্র অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতির সাহায্যে মুক্ত করা সম্ভব হতে পারে।

১০। যৌন-শিক্ষা

মনঃসমীক্ষণের আধুনিক আবিষ্কার থেকেই সাম্প্রতিককালে যৌনশিক্ষাকে প্রাপ্তযৌবনদের পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার আন্দোলন দেখা দিয়েছে। শিক্ষাবিদেরা উপলব্ধি করেছেন যে যৌনতা শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি এবং তার ফলে যৌনমূলক শিক্ষা দেওয়াটা শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য অপরিহার্য্য।

প্রশ্নাবলী

1. Write an essay on—Psycho-Analysis and its bearing on Education. (B. T. 1951)

Ans. (পৃঃ ১২৮—পৃঃ ১৫৪)

2. Discuss the place of Psychoanalysis and its bearing on Education. (B. T. 1952)

Ans. (পৃঃ ১৪৭—পৃঃ ১৫৪)

3, Write notes on—The unconscious. (B. T. 1953)

Ans. (পৃঃ ১৩৩—পৃঃ ১৩৭+পৃঃ ১৪৭—পৃঃ ১৫৫)

4. Does the unconscious exert influences upon the conscious life ? Does a little knowledge of Psycho-Analysis help the teacher to understand some generally unintelligible reactions of his pupils with advantage and to treat them in better ways ? (B. T. 1955)

Ans. (পৃঃ ১৩৩—পৃঃ ১৪৭+পৃঃ ১৫৪)

5. Show how the psychology of the unconscious can explain some of the strange behaviours of pupils. (B. T. 1957)

Ans. (পৃঃ ১৩৩—পৃঃ ১৪৭+পৃঃ ১৫০—পৃঃ ১৫৪)

6. Write an essay on :—The influence of the psycho-analytic school of psychology upon educational practice. (B. A. Hons. 1959)

Ans. (পৃঃ ১৩০—পৃঃ ১৩৪)

7. How has the psychology of the Unconscious helped us in understanding our own behaviour as well as that of others ? Illustrate your answer with example. (. 63)

Ans. (পৃঃ ১৩৩+পৃঃ ১৪৭—পৃঃ ১৫০)

আট

চিন্তন (Thinking)

যে প্রক্রিয়াগুলিকে আমরা সাধারণ ভাষণে মানসিক প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করে থাকি তার মধ্যে চিন্তন (thinking) একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। শিক্ষণের (learning) সঙ্গে চিন্তনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আমরা যা শিখি তাই নিয়েই চিন্তা করি। তবে চিন্তন প্রক্রিয়াটি শেখা বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তার নিজস্ব ক্ষমতার বলে সে শিখনের গণ্ডী ছাড়িয়ে বেরিয়ে যায় এবং উদ্ভাবনের (inventing) পর্য্যায়ে গিয়ে ওঠে। তখন সেই চিন্তন থেকেই নতুন শিখন ঘটে থাকে।

যখন আমরা আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের যে কোন একটির মাধ্যমে কোন বস্তু সম্বন্ধে সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভ করি তখন তাকে প্রত্যক্ষণ (perception) বলি। প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তুকে প্রত্যক্ষিত (percept) বলা যায়। একই বস্তু নিয়ে আমরা চিন্তন করি আবার প্রত্যক্ষণও করি, কিন্তু চিন্তনের বিষয়বস্তু এবং প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য হল এই যে প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে একটি বাহ্যিক উদ্দীপক প্রয়োজন হয় কিন্তু চিন্তা করতে তার প্রয়োজন হয় না। যেমন সামনের টেবিলের উপর রাখা বইখানা প্রত্যক্ষণ করতে হলে আমাকে চোখ খুলে সেটি দেখতে হবে, কিন্তু চোখ বন্ধ করেই সেটি নিয়ে আমি চিন্তা করতে পারি।

অতএব চিন্তনের ক্ষেত্রে আমরা প্রকৃত বস্তুটির স্থানে অন্য আর একটি বস্তু দিয়ে কাজ চালাই। বই সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে প্রত্যক্ষিত বইটির পরিবর্তে আমরা বইয়ের একটি প্রতীক (symbol) বা চিহ্ন (sign) নিয়েই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে থাকি। এই প্রতীক বা চিহ্নটি যদিও প্রত্যক্ষিত বস্তুর মত নিখুঁত নয়, তবুও আমাদের কাজ চালানোর পক্ষে এটি যথেষ্ট।

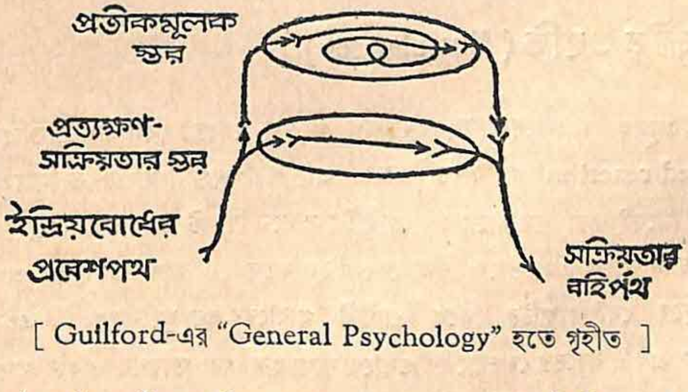
মানবমনের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল যে কোন বস্তু তার প্রত্যক্ষের গোচরে না থাকলেও সেই বস্তুটিকে সে মনে মনে বহন করতে পারে এবং তার উদ্দেশ্যে তার প্রয়োজনমত আচরণ বা প্রতিক্রিয়াও সম্পাদন করতে পারে। প্রত্যক্ষের গোচরীভূত নয় এমন কোন বস্তুর পরিবর্তে যে বস্তুটিকে আমরা মনে মনে বহন করি সেটিকে এক কথায় প্রতীক (symbol) বলা চলে। এই প্রতীক নানা রকমের

হতে পারে যেমন ধারণা, প্রতিরূপ, ভাষা ইত্যাদি। যা কিছুই অন্য একটি বস্তুর পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করে থাকি, তাকেই প্রতীক বলা যায়। প্রত্যক্ষিত বস্তুর প্রতি আমরা যে ধরনের প্রতিক্রিয়া করে থাকি প্রতীকের প্রতিও অনেকটা সেই ধরনের প্রতিক্রিয়া করে থাকি। প্রিয়জনকে দেখলে যেমন আনন্দ হয় তার সম্বন্ধে চিন্তা করলেও তেমনি আনন্দ হয়। অতএব চিন্তনকে আমরা সেই প্রাণী-আচরণ বলে বর্ণনা করতে পারি যাতে প্রকৃত বস্তুর স্থানে তার প্রতীকের ব্যবহার করা হয়। কিংবা এক কথায় চিন্তন হল প্রতীকমূলক আচরণ (symbolical behaviour)।

সাধারণ আচরণ ও প্রতীকমূলক আচরণ

সাধারণ আচরণ এবং চিন্তন বা প্রতীকমূলক আচরণের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। সাধারণ আচরণে প্রথমে হয় উদ্দীপকের প্রত্যক্ষণ, তা থেকে জাগে স্নায়ুঘটিত উত্তেজনা, সে উত্তেজনা গিয়ে পৌঁছয় মস্তিষ্কে, মস্তিষ্ক থেকে আবার উত্তেজনা নেমে আসে মাংসপেশী, গ্রন্থি প্রভৃতিতে এবং তখনই আচরণটি সম্পন্ন হয়। এই স্তরটিকে আমরা প্রত্যক্ষণ-সক্রিয়তামূলক স্তর বলতে পারি এবং এই স্তরে আচরণের সোপানগুলি হল—উদ্দীপনা → প্রত্যক্ষণ → সক্রিয়তা।

প্রতীকমূলক স্তরটিকে এই প্রত্যক্ষণ-সক্রিয়তামূলক স্তরের উপর অধি-স্থাপিত একটি স্তর বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রতীকমূলক স্তরটি যখন সক্রিয়



[Guilford-এর "General Psychology" হতে গৃহীত]

হয়ে ওঠে অর্থাৎ প্রাণী যখন চিন্তা করতে সুরু করে তখন তার দৈহিক অভিব্যক্তিটি সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে এবং নিম্নস্তরে যে আচরণগুলি সংঘটিত হত সেগুলি চিন্তার

স্তরে অনুষ্ঠিত হয়। সম্ভবপর সকল প্রকার প্রতিক্রিয়াগুলি একের পর এক চিন্তায় সম্পন্ন করা যেতে পারে এবং সেগুলির দোষগুণ, উপকারিতা-ব্যর্থতারও বিচার করা সম্ভব হয়, অথচ নিম্নস্তরের মত সেগুলির জন্য কোনরূপ দৈহিক প্রচেষ্টা লাগে না বা উদ্যম ব্যয়িত হয় না। একটি সমস্যার সমাধানে প্রতীকমূলক স্তরে যে আচরণগুলি আমরা সম্পন্ন করতে পারি সেগুলি যদি আমাদের বাস্তবে সম্পন্ন করতে হত তাহলে তাতে যে কেবলমাত্র প্রচুর সময়ই লাগত তা নয়, যে পরিমাণ অনর্থক দৈহিক প্রচেষ্টা সম্পন্ন করতে হত সেটা একজনের পক্ষে সম্ভবপরই হয়ে উঠত না। তা ছাড়া এমন অনেক আচরণই চিন্তায় সম্পন্ন করা সম্ভব হয় যেগুলি বাস্তবে সম্পন্ন করলে রীতিমত বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।

সমস্যার সমাধানে সাধারণত যে প্রচেষ্টা-ও-ভুল (trial-and-error) মূলক আচরণের সাহায্য আমাদের বাস্তবে নিতে হয়, চিন্তন প্রক্রিয়ার ফলে সেটি আমরা প্রতীকের সাহায্যে করতে পারি এবং তার ফলে বহু উদ্যম ও প্রচেষ্টার অপচয় থেকে রেহাই পাই। চিন্তন এই জন্যই উন্নত, আয়াসহীন ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের প্রধান অস্ত্রস্বরূপ এবং বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতায় প্রাণীর পরম সহায়ক।

চিন্তনের উপকরণ হল প্রতীক। প্রতীক নানা প্রকারের হতে পারে, যথা, পেশীঘটিত প্রস্তুতি (Muscular set), প্রতিরূপ (Image), ধারণা (Concept) ভাষা (Language) ইত্যাদি।

পেশীঘটিত প্রস্তুতি (Muscular set)

প্রতীকমূলক আচরণের সরলতম রূপ পাওয়া গেছে বিলম্বিত-প্রতিক্রিয়ার (delayed-reaction) পরীক্ষণগুলিতে। এই পরীক্ষণগুলি সাধারণত নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের নিয়েই করা হয়ে থাকে। প্রাণীটির সামনে তিনটি খাবারের বাক্স রাখা হয়। এখন তাকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে যে বাক্সটির উপর আলো জ্বালা হবে সেই বাক্সটির দিকে প্রাণীটি খাবারের জন্য ছুটে যাবে। এইবার প্রাণীটিকে একটা কাঁচের দেওয়ালের ওপাশে রাখা হল এবং তারপর একটা বাক্সের উপর আলোটা জ্বেলে নিবিয়ে দেওয়া হল। প্রাণীটিকে তখনই কিন্তু বাক্সের দিকে যেতে দেওয়া হল না। তাকে কিছুক্ষণ ধরে রাখার পর ছেড়ে দেওয়া

হল। এখন প্রাণীটিকে যদি ঠিক বাক্সটায় পৌছতে হয় তবে তাকে মনে রাখতে হবে যে কোন বাক্সটির উপর আলোটা জ্বলেছিল। দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রে প্রাণীরা কিছুক্ষণ পরেও ঠিক বাক্সটিতে গিয়ে পৌছতে পেরেছে। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে প্রাণীটি তার আলো জ্বলার কোন প্রতীক মনে সংরক্ষণ করে রেখেছিল এবং পরে বাক্সটি খুঁজে বার করতে সেই প্রতীকেরই সাহায্য নিয়েছে। মনোবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে এই ক্ষেত্রে প্রাণী যে বস্তুটি প্রতীকরূপে তার মনে বহন করে সেটি হল ঐ বিশেষ বাক্সটির দিকে ছুটে যাবার জন্য একটা দৈহিক পেশীঘটিত প্রস্তুতি। এই পেশীঘটিত প্রস্তুতির প্রতীকটি মনে মনে বহন করা ও আচরণে তার প্রয়োগ করাকে চিন্তনের সরলতম রূপ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে এবং এ থেকে সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে যে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও চিন্তন প্রক্রিয়া বর্ত্তমান আছে তবে তা অত্যন্ত সরলরূপে।

প্রতিরূপ (Image)

চিন্তনের আর একটি উপাদানের নাম প্রতিরূপ। প্রত্যক্ষিত বস্তুর ছবি বা অনুলিপিকে প্রতিরূপ বলা হয়। প্রত্যক্ষিত বস্তুর অনুকরণ হলেও প্রতিরূপ প্রকৃতিতে দুর্ব্বল, অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। তবে স্পষ্টতা এবং সম্পূর্ণতার দিক দিয়ে প্রতিরূপ নানা প্রকারের হতে পারে। কোন বস্তু বা ঘটনার প্রতিরূপ আমাদের কাছে এত স্পষ্ট হতে পারে যে সেটি প্রত্যক্ষণের সমপর্য্যায়ের হয়ে দাঁড়ায়। আবার কোন কোন প্রতিরূপ খুবই অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ থাকে।

প্রতিরূপের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Images)

যে কোন ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতাই প্রতিরূপের রূপ নিয়ে আমাদের মনে সংরক্ষিত হতে পারে। ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা হতে পারে পাঁচ রকমের, অতএব প্রতিরূপও হতে পারে পাঁচ রকমের, যথা চাক্ষুষ (visual), শ্রাবণ (auditory), স্পর্শজ (tactual), ঘ্রাণজ (olfactory), এবং রাসন (gustatory)। এ ছাড়াও তাপমূলক (thermal), বেদনামূলক এবং গতিমূলক (kinaesthetic) প্রতিরূপও আমাদের চিন্তায় স্থান পায়। প্রতিরূপগুলি আবার সাধারণত মিশ্র অবস্থায় আমাদের মনে দেখা দেয়। যেমন সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রতিরূপের সঙ্গে মিশে থাকতে পারে ঢেউয়ের আছড়ানির শব্দ। বরফের দেশের ছবি মনে

জাগলে শীতল স্পর্শের অনুভবটাও তার সঙ্গে মনে দেখা দেয়। গোলাপের কথা ভাবলে তার সুমিষ্ট গন্ধের অনুভূতিও পাওয়া যায়। কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন প্রতিরূপের বহুল ব্যবহার।

যদিও সব রকম প্রতিরূপই সকলের মধ্যেই আছে তবু প্রত্যেকেই একটি বিশেষ প্রতিরূপের সাহায্য নেয় তার অধিকাংশ চিন্তার কার্য্য সম্পন্নের জন্য। বেশীর ভাগ লোকেই চাক্ষুষ প্রতিরূপের উপর নির্ভর করে। কিন্তু আবার এমন লোক আছে যে হয় শ্রাবণ কিংবা স্পর্শজ বা অন্য কোন প্রতিরূপের উপর বেশী নির্ভরশীল।

অনুবেদন (After image)

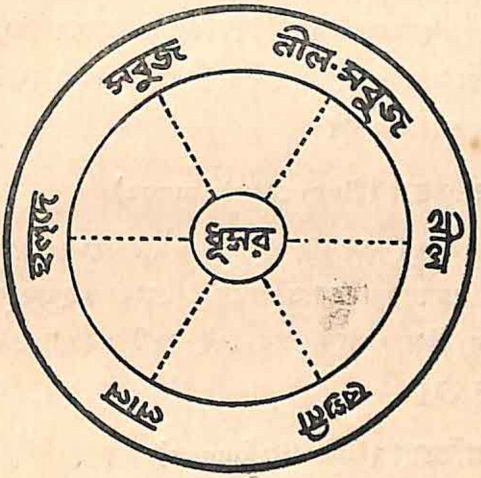
যখন কোন প্রত্যক্ষিত বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার পরও বস্তুটির সংবেদন (sensation) থেকে যায় তখন ঐ অভিজ্ঞতাকে অনুবেদন বলা হয়। ইংরাজীতে যদিও এই ধরনের অভিজ্ঞতাকে প্রতিরূপ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে তবুও এটি আসলে প্রতিরূপ নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি প্রত্যক্ষিত বস্তুর সংবেদনেরই বিলম্বনের একটি ক্ষেত্র। অর্থাৎ প্রকৃত বস্তুটি ইন্দ্রিয়ের সামনে থেকে অপসারিত করার পরও কিছুক্ষণের জন্য সংবেদনটি থেকে যায়।

সমবর্ণ (Positive) এবং অসমবর্ণ (Negative) অনুবেদন

অনুবেদন দু'শ্রেণীর হতে পারে, সমবর্ণ (Positive) এবং অসমবর্ণ (Negative)। যখন অনুবেদনে দৃষ্ট রঙগুলি প্রত্যক্ষিত প্রকৃত বস্তুর রঙের সঙ্গে অভিন্ন থাকে তখন তাকে সমবর্ণ অনুবেদন বলা হয়। আর যখন প্রত্যক্ষিত বস্তুর যা রঙ অনুবেদনে দৃষ্ট রঙগুলি তার বিপরীত হয় তখন তাকে অসমবর্ণ অনুবেদন বলা হয়।

এক টুকরো গভীর লাল রঙের কাগজের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে যদি আমাদের দৃষ্টি সাদা দেওয়াল বা পর্দার উপর সরিয়ে নিয়ে যাই তবে দেখা যাবে যে আমরা সেই লাল রঙের টুকরোটির পরিবর্তে সবজে নীল রঙের একটা টুকরো দেখতে পাচ্ছি। এখানে পরে প্রত্যক্ষিত বস্তুটির সংবেদনই রইল কিন্তু প্রকৃত বস্তুটির রঙটি বদলে তার বিপরীত রঙ অর্থাৎ সবজে-নীল হয়ে গেল। এটি অসমবর্ণ অনুবেদনের একটি দৃষ্টান্ত।

বিপরীত রঙ বলতে বোঝায় প্রতিপূরক রঙ। যখন ছুটি রঙ পরস্পরের সঙ্গে মেশালে সাদা রঙের সৃষ্টি হয়, তখন সেই রঙ ছুটিকে পরস্পরের প্রতিপূরক রঙ বলা হয়। যেমন, লাল এবং নীল-সবুজ রঙ পরস্পরের প্রতিপূরক। তেমনই হলদে এবং নীল রঙ পরস্পরের প্রতিপূরক রঙ। অসম অনুবেদনে প্রত্যক্ষিত বস্তুর যা রঙ তার পরিবর্তে তার প্রতিপূরক রঙটি দেখা যায়।



[প্রতিপূরক রঙের তালিকা]

সমবর্ণ অনুবেদনের ক্ষেত্র কিন্তু খুব বেশী পাওয়া যায় না। খুব তীব্রভাবে যদি দৃষ্টিশক্তিকে উত্তেজিত করা যায় তবে সমবর্ণ অনুবেদনের সৃষ্টি হয়। পরিষ্কার একটি একশ-বাতির আলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে তাকালে বা চোখ বন্ধ করলেও ঠিক সেই সাদা আলোটির একটি সমবর্ণ প্রতিরূপ দেখা যাবে। সমবর্ণ অনুবেদন কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের বেশী স্থায়ী হয় না।

স্মৃতি প্রতিরূপ (Memory Image)

সাধারণত প্রত্যক্ষিত বস্তুর যে প্রতিরূপ আমরা মনেতে সংরক্ষণ করি এবং চিন্তন বা কল্পনের সময় যেগুলির বহুল ব্যবহার করি সেগুলিকেই স্মৃতি প্রতিরূপ (Memory image) নাম দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন, কোন বন্ধুর কথা ভাবতে গিয়ে তার মুখখানা আমাদের চিন্তায় জেগে উঠলো। এটি হল সাধারণ প্রতিরূপ বা স্মৃতি প্রতিরূপ।

প্রাথমিক স্মৃতি প্রতিরূপ (Primary Memory Image)

এ নামটি জার্মান পদার্থতত্ত্ববিদ ফেকনারের (Fechner) দেওয়া। ফেকনারের মতে যখন আমরা দুটি জিনিষ একটির পর একটি হাতে তুলে তাদের ওজনের তুলনা করি তখন আসলে আমরা প্রথম বস্তুটির একটি প্রতিরূপের সঙ্গে দ্বিতীয় বস্তুটির প্রত্যক্ষণের তুলনা করছি। এই প্রথম বস্তুটির প্রতিরূপের ফেকনার নাম দিয়েছেন প্রাথমিক স্মৃতি প্রতিরূপ। ফেকনারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রাথমিক স্মৃতি প্রতিরূপ এবং সাধারণ স্মৃতি প্রতিরূপের মধ্যে পার্থক্য হল প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ।

পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ (Recurrent Image)

একটি প্রতিরূপ যখন বার বার ঘুরে ঘুরে মনে এসে দেখা দেয় তখন তাকে পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ বলা চলতে পারে। যেমন অনুবীক্ষণের মধ্যে দিয়ে অনেকক্ষণ কোন কিছু দেখলে পরে সেই বস্তুটি বার বার যেন চোখের সামনে ভাসছে বলে মনে হয়।

আইডেটিক প্রতিরূপ (Eidetic Image)

জার্মান মনোবিজ্ঞানী জীংস্কের (Jaensch) সাম্প্রতিক পরীক্ষণ থেকে এক নতুন ধরনের প্রতিরূপের সন্ধান পাওয়া গেছে। তিনি দেখেন যে কোন কোন ছেলেমেয়ের প্রত্যক্ষিত বস্তুটিকে পরে অতি নিখুঁত ও স্পষ্টভাবে জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা আছে। যেমন একটি ছবির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর তারা যদি একটা সাদা পর্দার উপর দৃষ্টি ফেরায় সেই ছবিটির একটি নিখুঁত প্রতিরূপ সেখানে তখন তারা দেখতে পায়। একেই আইডেটিক প্রতিরূপ বলা হয় এবং এই ধরনের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আইডেটিক শ্রেণীর ব্যক্তি বলা হয়। সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষণের সময় যা দেখে তাই পরে স্মৃতি থেকে বলতে পারে এবং তাও পুরো বা পরিষ্কারভাবে পারে না। কিন্তু আইডেটিক শ্রেণীর ব্যক্তিরা প্রত্যক্ষণের সময় যা দেখেনি পরে ঐ বস্তুর প্রতিরূপ থেকে সেই সকল জিনিষও বলতে পারে। তারা ইচ্ছা করলে পূর্ব্ব প্রত্যক্ষিত যে কোন বস্তুর প্রতিরূপকে মনে বা কোন পর্দার উপর জাগিয়ে তুলতে পারে এবং তাই থেকে বস্তুটির খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্যগুলি যা হয়ত সে আগেও দেখেনি তারও বর্ণনা করতে পারে।

সাধারণত আইডেটিক প্রতিরূপ ৬ থেকে ১২ বৎসরের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রতিরূপ পরিণত বয়সেও থাকতে দেখা গেছে। জীংস্কের মতে এই আইডেটিক প্রতিরূপ দেখার বিশেষ ক্ষমতাটা এণ্ডোক্রিন (endocrine) গ্রন্থির বিশেষ সংগঠন থেকেই জন্মায়।

প্রতিরূপের ব্যবহার (Use of Images)

আগে মনে করা হত যে চিন্তন-প্রক্রিয়ার পক্ষে প্রতিরূপের সাহায্য অপরিহার্য্য। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রতিরূপ ছাড়াও চিন্তন সম্ভবপর। বরং সমস্যামূলক বা তত্ত্বমূলক চিন্তা করতে হলে প্রতিরূপের ব্যবহার সুষ্ঠু চিন্তনের পক্ষে বিঘ্নকরই। গণিত বা দর্শনের উন্নতশ্রেণীর সমস্যাগুলি নিয়ে চিন্তা করার সময় চিন্তা পরিপূর্ণভাবে প্রতিরূপ-বর্জ্জিত (imageless) হয়ে ওঠে।

গ্যালটনের পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিশুদের চিন্তনে প্রতিরূপের ব্যবহার অত্যন্ত বেশী। কিন্তু পরিণত ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষ করে সে সকল ব্যক্তি বুদ্ধিমূলক কাজে ব্যাপৃত থাকেন তাঁদের মধ্যে প্রতিরূপের ব্যবহার তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। সাধারণত যে সকল বৃত্তি প্রতিরূপের ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল বলে মনে হয় প্রকৃতপক্ষে কিন্তু দেখা গেছে যে সে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিরা প্রতিরূপের ব্যবহার মোটেই করেন না। যেমন এমন অনেক চিত্রকর আছেন যাঁদের তেমন উল্লেখযোগ্য চাক্ষুষ প্রতিরূপই নেই বা এমন অনেক সুরকার পাওয়া যায় যাঁরা যথেষ্ট শ্রাবণ প্রতিরূপ ছাড়াই তাঁদের কাজ চালিয়ে যান। এই সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিরা প্রতিরূপ ছাড়া অন্য কোন প্রতীকের সাহায্য নিয়ে কাজ চালান।

ধারণা (Concept)

আর এক শ্রেণীর প্রতীকের নাম হল ধারণা (concept)। যখন আমরা একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত বহু বস্তুর সংস্পর্শে আসি তখন তাদের পারস্পরিক বৈষম্য সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত মিল বা অভিন্নতা সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরী করে নিই। যেমন বহু বিভিন্ন আকৃতি, প্রকৃতি, জাতি ও বর্ণের গরু আমরা দেখে থাকি কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিভিন্ন গরুগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে সমভাবে বর্ত্তমান এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমরা খুঁজে পাই। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা এক কথায় গোত্ব বলতে পারি এবং এই থেকেই তৈরী হয়

আমাদের গরুর ধারণা। গরুর এই ধারণাটি বিভিন্ন গরুর অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে তৈরী এবং সেইজন্য সকল গরুর উপরই প্রযোজ্য।

কোন কিছুর ধারণা তৈরী করতে হলে ছুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয়, (১) পৃথকীকরণ (abstraction) ও (২) সামান্যীকরণ (generalisation)।

পৃথকীকরণ (Abstraction)

ধারণা তৈরী করতে হলে প্রথমে বিভিন্ন বস্তুগুলির মধ্যে যে সব বৈশিষ্ট্য সাধারণ ভাবে বর্ত্তমানে, সেগুলিকে পৃথক করে নিতে হবে এবং যে বৈশিষ্ট্যগুলি অসাধারণ বা অবান্তর অর্থাৎ যে বৈশিষ্ট্যগুলি সমস্ত বস্তুগুলির মধ্যে সমভাবে বর্ত্তমান নয় সেগুলিকে বাদ দিতে হবে। এই প্রক্রিয়াটিকেই পৃথকীকরণ বলা হয়।

সামান্যীকরণ (Generalisation)

এইভাবে কতকগুলি বস্তুর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে পৃথক করে নেবার পর আমরা ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত বস্তুগুলির উপর ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি আরোপ করি অর্থাৎ ধরে নেই যে ঐ জাতীয় প্রত্যেক বস্তুটিরই ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি থাকবে। এই প্রক্রিয়াটিকে সামান্যীকরণ বলা হয়। অনুবর্ত্তিত প্রতিক্রিয়া (conditioned response) হল এই সামান্যীকরণের অতি-প্রাথমিক রূপ।

পৃথকীকরণের মাধ্যমে আমরা কতকগুলি সমজাতীয় অভিজ্ঞতার অধিকারী হই এবং সামান্যীকরণের সাহায্যে সেই অভিজ্ঞতারাশি থেকে একটা মৌলিক তত্ত্ব আহরণ করি। এই ছুটি প্রক্রিয়া মিলিত না হলে ধারণা তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হয় না।

শিশুর ধারণার ক্রমবিকাশ (Development of Concept)

শিশুর ক্ষেত্রে ধারণার স্থুরু হয় বিশেষ বিশেষ বস্তুর অভিজ্ঞতা থেকে। যেমন, প্রথমে সে শুনল তার বাড়ীর সামনের একটা শিউলীফুলের গাছকে লোকে গাছ বলছে। তারপরে আবার শুনল যে টবের গোলাপফুলের গাছটিকেও সকলে গাছ বলছে। আবার একদিন সে দেখল যে বিরাট একটা নিমগাছকেও আর সকলে গাছ বলে বর্ণনা করছে। যদিও তিনটি গাছই আকৃতিতে প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ পৃথক তবু সে তাদের মধ্যে কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেল এবং গাছের একটা ধারণা মনে মনে তৈরী করে নিল। তারপর যখন একদিন সে প্রথম একটি

পদ্মফুলের গাছ দেখল তখন সে নিজে থেকেই সেটিকে গাছ বলে ধরে নিতে ইতস্তত করল না। এইভাবেই শিশুর মধ্যে বিভিন্ন বস্তু বা ভাব সম্বন্ধে ধারণা গড়ে ওঠে।

ধারণা তৈরী কেবলমাত্র মানুষেরই ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখা গেছে যে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে পৃথকীকরণের ক্ষমতা যথেষ্টই আছে।

ধারণা-শিখনের পদ্ধতি (Methods of Learning Concept)

শিক্ষার একটা বড় অঙ্গ হচ্ছে নির্ভুল ধারণা তৈরী করতে শেখানো। বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে শিক্ষা মানেই হল বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে ধারণা তৈরী করতে সাহায্য করা। অতএব কিভাবে শিশুর মনে ধারণা তৈরী করানো যায় সে সম্বন্ধে শিক্ষকের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। ধারণা শিখনের তিনটি পদ্ধতির উল্লেখ করা যায়।

আরোহণ পদ্ধতি (Inductive Method)

এই পদ্ধতিতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তু বা দৃষ্টান্ত শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে নিজে এবং স্বাভাবিকভাবেই তার ধারণা গড়ে নেয়। ধারণা শিখন অন্যান্য শিখনের মত প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে সুরু হয় এবং অন্তর্দৃষ্টিতে গিয়ে শেষ হয়ে থাকে।

অবরোহণ পদ্ধতি (Deductive Method)

এই পদ্ধতিতে আগে একটি বিশেষ প্রাণীর অন্তর্গত বস্তুগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথমে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরা হয় এবং তারপর তাকে ঐ শ্রেণীর বস্তুগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে চিনতে সাহায্য করা হয়। আমাদের অধিকাংশ শিখনই এই পদ্ধতিতে সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু কেবলমাত্র এই অবরোহণ পদ্ধতির উপর নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

মিশ্র পদ্ধতি (Mixed Method)

আরোহণ এবং অবরোহণ এই দুটি পদ্ধতি একসঙ্গে প্রয়োগ করাই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত। প্রথমে আরোহণ পদ্ধতির মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ বস্তুগুলি উপস্থাপিত করা এবং তাদের অন্তর্নিহিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। তারপর অবরোহণ পদ্ধতির মাধ্যমে সেই ধারণাটিকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে এবং শিক্ষার্থীর মনে ধারণাটি সম্বন্ধে পরিষ্কার অর্থ জন্মাতে সাহায্য করা প্রয়োজন।

ভাষা (Language)

মানব চিন্তার প্রতীকগুলির মধ্যে কার্য্যকারিতা ও ব্যবহারের দিক দিয়ে ভাষার সমকক্ষ আর কোন প্রতীকই নয়। আমাদের চিন্তার প্রধানতম উপাদানই হল ভাষা। প্রতীকরূপে ভাষার বহুল ব্যবহারের একটা বড় কারণ হল এই যে ভাষা সহজেই অপরের বোধগম্য হয় এবং ভাব-বিনিময়ের পক্ষে এটি সহজতম বাহন। তাছাড়া ভাষাত্মক চিন্তার সব সময়ই একটা সামাজিক দিক আছে।

আমাদের সাধারণ চিন্তা শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য প্রভৃতির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। ভাষা-বিহীন চিন্তা যে হয় না তা নয়। আমরা চেষ্টা করলে এমন জিনিষের চিন্তা করতে পারি যার কোনরূপ নাম নেই। প্রতিরূপ-বর্জ্জিত চিন্তার মত ভাষা-বর্জ্জিত চিন্তাও সম্ভবপর।

কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে ভাষামূলক প্রতীকই চিন্তার প্রধানতম উপাদান হিসাবে কাজ করে থাকে। আজকের পৃথিবীর অধিকাংশ বস্তুকেই ভাষার সাহায্যে বর্ণনা করা হয় এবং সে ভাষা কথিত বা লিখিত বা ভঙ্গীগত হতে পারে। বস্তুত আমাদের চিন্তার বেশীর ভাগই এই ভাষামূলক প্রতীকের মানসিক প্রয়োগ ছাড়া আর কিছু নয়।

ভাষার সঙ্গে চিন্তার এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখে ওয়াটসন চিন্তনকে রুদ্ধ-স্বর কথন (Subvocal talking) বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে চিন্তন হল এক ধরনের কথা বলা যাতে কণ্ঠস্বরের ব্যবহারকে অবদমিত করা হয়েছে। তাঁর এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে ছোট শিশু প্রথম প্রথম একা নিজে কথা বলে। কিন্তু শীঘ্রই পিতামাতা এবং সমাজের অন্য সকলের চাপে পড়ে সে এই একা একা কথা বলাটা বন্ধ করতে বাধ্য হয় বটে কিন্তু তার পরিবর্ত্তে সে মনে মনে কথা বলা সুরু করে। এই মনে মনে কথা বলাকেই আমরা চিন্তন বলে থাকি। ওয়াটসনের তত্ত্বের স্বপক্ষে কতকগুলি পরীক্ষণের উল্লেখ করা যায়। যেমন জিভ, গলা, স্বরযন্ত্র ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে চিন্তনের সময় এগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে।

গ্যালভ্যানোমিটারের সাহায্যেও দেখা গেছে যে কথা বললে যে ধরনের পরিবর্ত্তন জিভ বা গলায় দেখা দেয় চিন্তা করার সময়ও ঠিক সে প্রকৃতির পরিবর্ত্তনই ব্যক্তির জিভে এবং গলায় সংঘটিত হয়ে থাকে।

ভাষার স্বরূপ (Nature of Language)

ভাষা বলতে বোঝায় চিন্তা বিনিময় করার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রস্তুত এক ধরনের চিহ্ন-ব্যবহারের প্রণালীবিশেষ। ভাষাকে প্রধানত দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, প্রথম, স্বাভাবিক চিহ্নের ভাষা এবং দ্বিতীয়, কৃত্রিম চিহ্নের ভাষা। স্বাভাবিক চিহ্নের ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট বস্তু এবং চিহ্নের মধ্যে সুস্পষ্ট সম্বন্ধ পাওয়া যায়—যেমন দেখা যায় আদিম মানবের ব্যবহৃত ভঙ্গীমূলক বা চিত্র-লিখন ভাষায়। প্রচলিত চিহ্নের ক্ষেত্রে কিন্তু এ ধরনের কোন সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। যেমন, আগুনকে কেন জল, এবং জলকে কেন আগুন বলা হবে না তার পিছনে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখান যায় না। এই নামগুলি নিছক কল্পনাপ্রসূত এবং দীর্ঘ দিন ব্যবহারের দ্বারা অনুমোদিত।

অনেকগুলি শব্দ আবার আমাদের দৈহিক ভঙ্গীর স্থান গ্রহণ করে থাকে। যেমন, হ্যাঁ বা না এই শব্দ দুটি আদিম মানুষের সর্ব্বদৈহিক ভঙ্গীর আধুনিক ভাষাময় রূপ।

আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ব্যক্তি, বস্তু, কার্য্য প্রভৃতিকে বোঝানর জন্যই ভাষার সৃষ্টি। বর্ত্তমানে ভাষা আমাদের নিজস্ব সত্তা ও পরিবেশের সঙ্গে এমন নিবিড় ভাবে জড়িয়ে গেছে যে ভাষা ছাড়া এই পৃথিবীর অধিকাংশ বস্তু সম্বন্ধেই আমরা আজ আর চিন্তা করতে পারব না। ভাষাই আমাদের ধারণা তৈরী করতে সাহায্য করে এবং বিভিন্ন ধারণার নামকরণও আমরা করি ভাষার সাহায্যে। মনে করা যাক 'বই' সম্বন্ধে কোন শিশুর ধারণা তৈরী হয়েছে, কিন্তু সেই ধারণাটি যদি সে ভাষায় প্রকাশ করতে না পারে বা তার বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করতে না পারে তাহলে তার ঐ ধারণাটিই অত্যন্ত অপরিণত থেকে যাবে। তাছাড়া যে সকল ধারণা অমূর্ত্ত বা বস্তুবর্জ্জিত সেগুলি ভাষার সাহায্য ছাড়া তৈরী করাই যায় না। যেমন স্বাধীনতা, সততা, দয়া ইত্যাদি। কতকগুলি ধারণার জন্য আবার বিশেষ প্রকৃতির ভাষার সাহায্য লাগে, যেমন বাই-নোমিয়াল সূত্রের মত গাণিতিক তত্ত্বগুলির ধারণা মনে রাখতে হলে সংখ্যামূলক বা বীজগাণিতিক চিহ্ন বা প্রতীকের সাহায্য নিতেই হবে। তেমনই রসায়ন শাস্ত্রেরও বিভিন্ন পদার্থের ধারণা মনে রাখতে হলে শব্দ বা সংখ্যার সাহায্য অপরিহার্য্য। এই থেকেই আমাদের চিন্তায় ভাষার প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তা বোঝা যাচ্ছে। বস্তুত চিন্তনের বিষয়বস্তুকেই

কেবলমাত্র ভাষা যে রূপ দেয় তা নয়, চিন্তনের প্রসার ও বিকাশের জন্যও ভাষার সাহায্য অপরিহার্য্য। এই জন্যই ভাষাকে আমাদের চিন্তার প্রধানতম উপকরণ বলা হয়ে থাকে।

ভাষার অপূর্ণতা

কিন্তু চিন্তার প্রধান বাহক হলেও ভাষার মধ্যে যথেষ্ট অপূর্ণতা আছে। ভাষা আমাদের চিন্তনকে পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারে না। সাধারণত আমরা আমাদের চিন্তার বিষয়বস্তুগুলির ভাষামূলক নাম দিই এবং ধরে নিই যে ঐ নামগুলিই আমাদের চিন্তনকে পুরোপুরি প্রকাশ করছে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ বস্তুর ক্ষেত্রে ভাষার সে ক্ষমতা থাকলেও সম্পূর্ণ চিন্তনের প্রবাহকে ভাষা প্রকাশ করতে পারে না। ভাষার সত্তা হল পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কিন্তু আমাদের চিন্তন হল নিরবচ্ছিন্ন ভাবপ্রবাহ। অতএব আমাদের সম্পূর্ণ চিন্তনটিকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যেমন সূর্য্যের আলোর মধ্যে আমরা সাতটা রঙের কথাই ভাষায় উল্লেখ করি। এমন কি মিশ্র রঙগুলির জন্য আমরা নীলচে-বেগুনি বা সবজে হলুদ ইত্যাদি ভাষারও ব্যবহার করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও রঙের এমন অনেক অতিসূক্ষ্ম স্তর থেকে যায় যেগুলির জন্য আমাদের অভিধানে কোন ভাষাই নেই অথচ সেগুলি আমাদের ধারণায় ঠিকই আছে। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে ভাষা ধারণা তৈরীর অত্যাবশ্যক উপাদান হলেও ভাষা ছাড়াও ধারণা তৈরী হতে পারে।

শিশুর মধ্যে ভাষার বিকাশ

ছোট শিশুর মধ্যে কেমন করে ভাষার বিকাশ হয় এই নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। দেখা গেছে যে শিশুর ভাষার বিকাশ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ স্তরের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়। এইরকম কয়েকটি প্রধান স্তরের বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

১। রিফ্লেক্স স্তর

শিশু প্রথম থেকেই কতকগুলি বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করার ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। প্রথমে সে স্বরবর্ণগুলি উচ্চারণ করতে পারে, তার পর ম এবং ন

এই দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ বলতে পারে। তার পরে সে বলতে পারে প এবং ব এবং তারপর ধীরে ধীরে আর সকল বর্ণগুলি উচ্চারণ করতে পারে। মুরের (Moore) পরীক্ষণ অনুযায়ী চার মাসের সময় শিশু সব রকম শব্দই উচ্চারণ করিতে পারে।

২। অনুকরণ-পুনরাবৃত্তির স্তর

এই স্তরে শিশু বড়দের উচ্চারিত শব্দ অজ্ঞাতসারেই অনুকরণ করতে সুরু করে এবং একটি শব্দই বার বার উচ্চারণ করে, যেমন মা, মা, মা, মা কিংবা দা, দা, দা, দা ইত্যাদি। এই সময় অনুবর্ত্তন (conditioning) প্রক্রিয়াটি বিশেষ-ভাবে কার্য্যকরী হয়ে ওঠে এবং অনেক নতুন শব্দ সে অনুবর্ত্তনের মাধ্যমে শেখে।

৩। অর্থবোধের স্তর

প্রায় ১ বৎসর বয়স থেকে শিশু শব্দের অর্থ বুঝতে শেখে। তখন সে একটি বস্তুর উপর একটি বিশেষ শব্দ আরোপ করতে পারে। এটিও অনুবর্ত্তন প্রক্রিয়ার প্রভাবে ঘটে থাকে। যেমন যখন সে দুধের বোতলে হাত দেয়, তখন মা দুধ কথাটি উচ্চারণ করেন। ফলে সে শেখে যে ঐ বিশেষ বস্তুর নাম দুধ। এই ভাবে শিশু তার চার পাশের বস্তুর নাম ও বিভিন্ন শব্দের দ্বারা কি বোঝান হয়ে থাকে তা শেখে।

৪। ভাষা-সচেতনতার স্তর

এই স্তরে শিশু ভাষার ব্যবহার ও তার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। সে দেখে যে শব্দের সাহায্যে কোন বিশেষ বস্তুকে সে চিহ্নিত করতে পারে এবং তার বক্তব্য প্রকাশ করতে পারে। প্রায় দেড় বছর বয়স থেকে শিশু তার সামনে যা অনুপস্থিত এমন কোন বস্তুকে শব্দ দিয়ে জানাতে শেখে। যেমন ক্ষিদে পেলে সে বলে "দুধ"। এই সময় থেকে সে নিজে ভাষার ব্যবহার শেখে এবং অপরের ব্যবহৃত ভাষার অর্থ বুঝতে পারে।

৫। বাক্য-কথন স্তর

অনুপস্থিত বস্তুর পরিবর্ত্তে বিশেষ শব্দের-ব্যবহার থেকেই শিশু বাক্য বলার ক্ষমতাটি আহরণ করে। যখন সে বলে "দুধ" বা "ভাত" তখন সে আসলে বলছে যে "আমার ক্ষিদে পেয়েছে" বা "আমি খেতে চাই।" এর পর

থেকেই সে কথার সঙ্গে কথা জুড়ে পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করতে শেখে। এর পরে স্থুরু হয় তার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পালা এবং তিন বছরে শিশু বেশ বলিয়ে কইয়ে হয়ে ওঠে। স্মিথের একটি হিসাবে দেখা যায় যে ১ বৎসরে শিশু ৪টি শব্দ শেখে, ২ বৎসরে শেখে ২৭২, ৩ বৎসরে ৮৯৬টি, ৪ বৎসরে ১৫৪০টি, ৫ বৎসরে ২০৭২টি, এবং ১২ বৎসরে ১৫০০০টি শব্দ বলতে শেখে।

৬। পঠন ও লিখন

পঠন ও লিখন বা চিত্রমূলক ভাষা ব্যবহারের জ্ঞান জন্মায় আরও কয়েক বছর পরে এবং সাধারণভাবে এই সময়টি নির্ভর করে শিশু যে সমাজে বাস করে সে সমাজের প্রচলিত প্রথা বা নিয়মের উপর। সাধারণত ছ'বছর বয়স থেকে শিশু পড়তে এবং সাত আট বছর বয়স থেকে লিখতে শিখে থাকে।

প্রশ্নাবলী

1. "Thinking is a symbolical behaviour"—Discuss

Ans. (পৃঃ ১৫৬—পৃঃ ১৫৮)

2. What is a concept ? How is concept formed ?

Ans. (পৃঃ ১৬৩—পৃঃ ১৬৫)

3. What is an image ? How does image help thinking ? Discuss the different types of images.

Ans. (পৃঃ ১৫৯—পৃঃ ১৬৩)

4. What is the relation between thought and language ? How does language develop in the child ?

Ans (পৃঃ ১৬৬—পৃঃ ১৭০)

5. Write short notes on :—After Image and Eidetic Image.

Ans. (পৃঃ ১৬০—পৃঃ ১৬২)

দশ

বিচারকরণ (Reasoning)

বিচারকরণ চিন্তনের প্রকার ভেদ। চিন্তনের মাধ্যমে যখন কোন সমস্যার সমাধান করা হয় তখন তাকে বিচারকরণ বলা হয়। অথবা প্রতীকমূলক কার্য্যের মধ্যে দিয়ে কোন সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টার নাম বিচারকরণ।

প্রাণী যখন তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হয় না তখন সমস্যা দেখা দেয়। সমস্যা আবার আচরণের দুটি বিভিন্ন স্তরে সমাধান করা যায়। প্রথম, প্রত্যক্ষণ-সক্রিয়তার স্তর ও দ্বিতীয়, প্রতীকমূলক স্তর। যখন মূর্ত্ত বস্তু নিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচালনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয় তখন সেটাকে প্রত্যক্ষণ-সক্রিয়তার স্তর বলা যেতে পারে। আর যখন নিছক প্রতীকের সাহায্যে কোন সমস্যার সমাধান করা হয় তখন তাকে প্রতীকমূলক স্তর বলা যেতে পারে। এই দ্বিতীয় পন্থায় সমস্যা সমাধানকেই বিচারকরণ বলে।

প্রত্যক্ষণ-সক্রিয়তার স্তরে যে সকল আচরণ আমরা সাধারণত করে থাকি সেগুলিই বিচারকরণে প্রতীকমূলক স্তরে পুনরনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বিচারকরণও এক ধরনের শিখন। কোন সমস্যা বিচারকরণের মাধ্যমে সমাধান করার পর প্রাণীর পুরোনো আচরণ-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন দেখা দেয় এবং সে নতুন আচরণ-ধারা অনুসরণ করে। বিচারকরণের মধ্যেও প্রচেষ্টা-ও-ভুলের প্রক্রিয়া এবং অন্তর্দৃষ্টি দুইই কাজ করে থাকে। তবে সাধারণ প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখার সঙ্গে বিচারকরণের পার্থক্য হল এই যে বিচারকরণে অতীত অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে কার্য্যকরী হয়।

বিচারকরণের সুরু সমস্যা দিয়ে। সমস্যা দেখা দিলেই কাজের সহজ অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যায়। তখন ব্যক্তি সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তা করতে সুরু করে দেয়। এই থেকেই জন্মলাভ করে বিচারকরণ।

প্রথমেই একের পর এক সম্ভাব্য সমাধানগুলি ব্যক্তির সামনে দেখা দেয়। সে একটি একটি করে সেগুলিকে পরীক্ষা করে। এই পরীক্ষা করা মানেই সেগুলিকে প্রয়োগ করে দেখা এবং এই প্রয়োগের কাজটি সম্পন্ন হয় মানসিক বা প্রতীকমূলক স্তরে। এই ভাবে সম্ভাব্য সমাধানগুলি

নিয়ে চিন্তা করতে করতে আকস্মিকভাবে নির্ভুল সমাধানটি ব্যক্তির সামনে আবির্ভূত হয়ে যায়। এখানে প্রথমে বিচারকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হচ্ছিল প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে কিন্তু সেটি শেষ হল অন্তর্দৃষ্টিতে, যখন সমাধানটি বিদ্যুতের ঝলকানির মত ব্যক্তির সামনে এসে দেখা দিল।

বিচারকরণের প্রয়োজন তখনই দেখা দেয় যখনই আমাদের প্রচলিত আচরণধারা সঙ্গতিবিধানে অসমর্থ হয়ে পড়ে অর্থাৎ যখন সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা নানা কারণে দেখা দিতে পারে। প্রথমত আমাদের দৈনন্দিন জীবনধারণের প্রচেষ্টায় নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে—যেমন, কেমন করে খাদ্য সংগ্রহ করা যাবে, কেমন করে যথেষ্ট আয় করতে পারা যাবে, কেমন করে বিপদকে এড়িয়ে যেতে হবে ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, আমাদের স্বাভাবিক কৌতূহলও আমাদের সামনে বহু সমস্যা তুলে ধরতে পারে। আমাদের মধ্যে জানবার ইচ্ছাটি সহজাত এবং অনেক কিছু জানার জন্যও আমরা প্রায়ই বিচারকরণের সাহায্য নিয়ে থাকি।

অনুমান (Inference)

বিচারকরণের একটা বড় সহায়ক হল অনুমান-পদ্ধতি। জানা তথ্য থেকে অজানা তথ্যে যাওয়াকে অনুমান বলে। অনুমান আমাদের পুরোনো সত্য থেকে নতুন সত্যে যেতে সাহায্য করে। যেমন পথে নেমে দেখলাম পথটা ভিজে। আকাশের দিকে তাকালাম, দেখলাম আকাশে মেঘ। সিদ্ধান্ত করলাম যে বৃষ্টি হয়েছে। এটি হল অনুমানের দৃষ্টান্ত। এখানে আমাদের কাছে জ্ঞাত সত্য হল পথ ভিজে ও আকাশে মেঘ, আর নতুন সত্য হল বৃষ্টি হওয়াটা।

অতীত অভিজ্ঞতা ও বিচারকরণ

বিচারকরণে অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্য অপরিহার্য্য। বর্ত্তমান সমস্যাকে সমাধান করার জন্য দরকার অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োগ। অতীতের জ্ঞান যত বেশী হবে বিকল্প বা সম্ভাব্য সমাধানের সংখ্যা ততই বেশী হবে। আর বিকল্প সমাধানের সংখ্যা যত বেশী হবে নির্ভুল বা প্রকৃত সমাধানটি খুঁজে বার করা ততই সহজ হবে। এইজন্য তথ্য বা জ্ঞানের উপর যার যত বেশী অধিকার তার পক্ষে বিচার করা তত সহজ।

অনেক শিক্ষাবিদ আছেন যাঁরা শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তথ্য বা জ্ঞান আহরণের

বিরোধিতা করে থাকেন। তাঁরা বলেন যে কেমন করে চিন্তা করতে হয় শিক্ষার্থীকে তাই শেখালেই চলবে। তথ্য বা জ্ঞান তার যখন খুসী সে আহরণ করে নিতে পারবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এ ধরনের যুক্তি ত্রুটিপূর্ণ। নতুন জ্ঞান কিছু শেখার পিছনে আছে বিচারকরণের জন্য প্রয়োজন পর্য্যাপ্ত তথ্য বা জ্ঞানের উপর অধিকার। যাঁরা তথ্য বা জ্ঞান আহরণের বিরোধিতা করেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে অতীত অভিজ্ঞতার উপর বিচারকরণের এই নির্ভরশীলতাটিকে উপেক্ষা করেন।

অবশ্য কেবল অতীত অভিজ্ঞতা বা তথ্যের উপর অধিকার থাকলেই চলবে না। তার সঙ্গে বিচারকরণের শক্তি থাকাও দরকার। এমন অনেককে দেখা যায় যাঁরা যথেষ্ট তথ্য বা জ্ঞানের অধিকারী হয়েও সুসঙ্গত বিচার করতে পারেন না। বুঝতে হবে তাঁদের বিচারকরণের শক্তিই পর্য্যাপ্তভাবে নেই। বিচারকরণ বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল এবং বুদ্ধি একটি প্রকৃতিদত্ত শক্তি। অতএব বিচারকরণের শক্তি ইচ্ছা করলেই বাড়ানো যায় না, যদিও ব্যক্তি যথোপযোগী শিক্ষার দ্বারা বিচারকরণের পদ্ধতির উন্নতি করতে পারে।

বিচারকরণের সাফল্য নির্ভর করে অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োগের নির্ভুল গতিপথের (direction) উপর। বর্ত্তমান সমস্যার সমাধানে যখন অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োগ করা হয় তখন সব চেয়ে বড় দ্রষ্টব্য হল এই যে এই অতীত অভীজ্ঞতার প্রয়োগটি যেন ঠিক গতিপথ ধরে চলে। যদি এই গতিপথটি ভুল হয়ে যায় তবে সেই অনুমান থেকে কখনই নির্ভুল সিদ্ধান্ত করা যাবে না।

শিশুর বিচারকরণ

মানসিক শক্তি পূর্ণপরিণতি লাভ না করলে উন্নত শ্রেণীর বিচারকরণ কারও পক্ষে সম্ভব নয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে সাধারণ ছেলেমেয়েদের ১৫।১৬ বৎসরে মানসিক শক্তি পূর্ণতা লাভ করে। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বিচারকরণের শক্তিও পরিপূর্ণতা লাভ করে ১৫।১৬ বৎসর বয়সের সময়ই।

কিন্তু আংশিক বিচারকরণের শক্তি তার অনেক আগেই শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। তিন চার বৎসর বয়স থেকেই শিশু নানারূপ প্রশ্ন করে বড়দের উত্যক্ত করে তোলে। এতেই বোঝা যাচ্ছে যে ঐ সময়ে তাদের মধ্যে সমস্যা উপলব্ধি করার ক্ষমতা জন্মে গেছে। ঐ সমস্যা উপলব্ধি থেকেই জাগে বিচারকরণের

শক্তি। ছোট ছেলেমেয়েদের প্রায়ই নানা বিজ্ঞোচিত মন্তব্য বা উক্তি করতে শোনা যায়। আবার কখনও কখনও হাস্যকর সিদ্ধান্তে পৌছতেও দেখা যায়। এ সকলই বিচারকরণের প্রাথমিক প্রচেষ্টা।

ন্যায়পদ্ধতির (Syllogism) সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তিন চার বছর বয়স থেকেই শিশুরা সহজ ন্যায় থেকে সিদ্ধান্তে আসতে পারে। তবে ঠিক যুক্তির সাহায্যে বিচার করার ক্ষমতাটা জাগে সাত আট বৎসর বয়স থেকে এবং এই ক্ষমতাটা অনেকটা আকস্মিকভাবেই দেখা দেয়। সাধারণ ভাষণে যাকে বিচারকরণের বয়স বলে বর্ণনা করা হয় সেটি এই সাত আট বৎসর বয়সেই জন্মায় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। বিচারকরণের শক্তির পরিণতি নির্ভর করে দুটি বস্তুর উপর—প্রথম, চিন্তার ধারা এবং পারস্পরিক সম্বন্ধ উপলব্ধির উপর এবং দ্বিতীয়, চিন্তনের কতকগুলি বিশেষ অভ্যাস অর্জ্জনের উপর।

প্রশ্নাবলী

1. What is reasoning? How is reasoning differentiated from thinking?

Ans. (পৃঃ ১৭১—পৃঃ ১৭৪)

2. Discuss the role of past experience in reasoning.

Ans. (পৃঃ ১৭২—পৃঃ ১৭৩)

3. Describe the development of reasoning power in children.

Ans. (পৃঃ ১৭৩—পৃঃ ১৭৪)

এগার

অনুষঙ্গের সূত্রাবলী (Laws of Association)

চিন্তন, কল্পন, বিচারকরণ প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রে মনে করা কাজটির অংশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে সকল প্রতীকের সাহায্যে আমরা চিন্তনের কাজ চালিয়ে থাকি সেগুলি আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ এবং কোন না কোন রূপে সেগুলি আমাদের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয়েছে। চিন্তনের সময় সেগুলিকে আমরা পুনরুজ্জীবিত করে তুলি, অর্থাৎ এককথায় সেগুলিকে আমরা মনে করি।

এই মনে করা প্রক্রিয়াটিকে প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত করে যে বস্তুটি তার নাম অনুষঙ্গ। অনুষঙ্গ বলতে বোঝায় দুটি বস্তুর মধ্যে এমন একটা বিশেষ ধরনের সম্পর্ক যার দ্বারা একটি আর একটির কথা মনে জাগাতে পারে। যেমন, দুই ভাইকে যদি দেখতে একরকম হয় তবে একজনকে দেখলে আর একজনের কথা মনে পড়ে যায়। অনুষঙ্গ যে কোন দুটি প্রতীকের মধ্যে হতে পারে, যেমন দুটি ধারণার মধ্যে বা দুটি প্রতিরূপের মধ্যে বা একটি ধারণা আর একটি প্রতিরূপের মধ্যে। তেমনই আবার অনুষঙ্গ একটি প্রত্যক্ষিত বস্তু এবং একটি প্রতীকের মধ্যেও হতে পারে, অর্থাৎ কোন বস্তু বা ব্যক্তি দেখে আমাদের মনে একটি ধারণা বা প্রতিরূপের উদয় হতে পারে। যেমন, হিমালয় দেখে মনে একটি প্রশান্তির ধারণা জন্মাতে পারে।

অনুষঙ্গ আবার, আর একদিক দিয়ে দু' শ্রেণীর হতে পারে। যেমন, সর্ব্বজনীন এবং ব্যক্তিগত। কতকগুলি ব্যাপারে একটি বিশেষ সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যে একই প্রকারের অনুষঙ্গ তৈরী হতে পারে। যেমন প্রত্যেক ভারতীয়েরই চরকা দেখলে মহাত্মা গান্ধীর কথা মনে পড়ে বা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই সেবাধর্ম্মের কথা উঠলে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথা মনে পড়ে ইত্যাদি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অনুষঙ্গ একেবারে ব্যক্তিগত হতে পারে, যেমন কারও রেলগাড়ী দেখলে জন্মগ্রামটির কথা মনে পড়ে যায় বা ছোট ছেলে দেখলে মৃত পুত্রের কথা মনে পড়ে যেতে পারে।

অনুষঙ্গের প্রকৃতি অনুযায়ী তিনটি প্রধান সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। (১) সাদৃশ্যের সূত্র (Law of Similarity), (২) সান্নিধ্যের সূত্র (Law of Contiguity) এবং (৩) বৈসাদৃশ্যের সূত্র (Law of Contrast).

১। সাদৃশ্যের সূত্রাবলী (Law of Similarity)

যখন ছুটি বস্তুর মধ্যে আকারগত বা প্রকৃতিগত কোনরূপ সাদৃশ্য থাকে তখন একটির প্রত্যক্ষণ বা চিন্তা অপরটির স্মৃতি আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে, যেমন কারও ছবি দেখলে আসল ব্যক্তিটির কথা মনে পড়ে যায়, ছেলেকে দেখলে তার বাবার কথা মনে পড়ে ইত্যাদি। কাব্যে, সাহিত্যে বা দৈনন্দিন ভাষণে আমরা যে সকল উপমা ও রূপকের ব্যবহার করে থাকি সেগুলির মূলে এই সাদৃশ্যসূচক অনুষঙ্গ প্রচুর আছে যেমন, পুরুষ-সিংহ, চন্দ্রানন, শোক-সমুদ্র, হরিণ-চক্ষু ইত্যাদি।

২। সান্নিধ্যের সূত্র (Law of Contiguity)

যখন ছুটি বস্তু একসঙ্গে বা পর পর আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয় তখন ছুয়ের মধ্যে এমন একটি অনুষঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয় যার ফলে একটির প্রত্যক্ষণ বা চিন্তা অপরটির স্মৃতিকে আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে। যেমন, গীতাঞ্জলীর নাম করলে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হয় বা পণ্ডিচেরী বললে অরবিন্দের কথা মনে হয় বা কুইনাইন বললে তিক্ততার কথা মনে হয় ইত্যাদি। সান্নিধ্য আবার ছ'প্রকারের হতে পারে, স্থানগত এবং কালগত। কখনও কখনও ছুটি বস্তুর মধ্যে তাদের স্থানগত সমতা বা সান্নিধ্যের জন্য অনুষঙ্গ স্থাপিত হতে পারে, যেমন ফুল দেখলে গন্ধের কথা মনে পড়ে। আবার কখনও সময়গত একতা বা সান্নিধ্যের জন্য একটি বস্তু আর একটি বস্তুর কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, যেমন একটি গানের প্রথম কলিটি মনে এলে পরের কলিগুলি পর পর মনে এসে যায়।

৩। বৈসাদৃশ্যের সূত্র (Law of Contrast)

ছুটি বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈসাদৃশ্য থাকলেও একটির কথা মনে হলে অপরটির কথা মনে পড়ে যায়, যেমন ছুঃখের মধ্যে সুখের দিনগুলির কথা মনে পড়ে যায়, পরিণত বয়সের তিক্ত দিনগুলিতে ছেলেবেলায় নির্ঝঞ্ঝাট দিন-

গুলির কথা মনে পড়ে যায়, বড়লোকের বাড়ীতে অপচয়ময় ভোজের দিনে পথবাসী অনাহারী ভিক্ষুকের কথা মনে পড়ে যায় ইত্যাদি।

যদিও অনুষঙ্গের এ তিনটি সূত্রের পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে তবু এদের মধ্যে প্রচুর মিল আছে এবং অনেক দিক দিয়ে এরা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

যখন দুটি বস্তু তাদের সান্নিধ্যের জন্য আমাদের মনে উদিত হয় তখন সাদৃশ্যও তাদের মধ্যে বেশ কিছুটা কাজ করে থাকে। যেমন ফুল দেখে গন্ধের কথা মনে পড়ল। অর্থাৎ বর্ত্তমানে প্রত্যক্ষিত ফুলটি প্রথমে আমাদের মনে পূর্ব্বে প্রত্যক্ষিত গন্ধসম্পন্ন একটি ফুলের কথা মনে জাগাল। তারপর সেই ফুল থেকে সান্নিধ্যের জন্যই আমাদের গন্ধের কথা মনে পড়ল। অতএব সান্নিধ্যের অনুষঙ্গে প্রথমে আসে সাদৃশ্যসূচক অনুষঙ্গ তারপর সান্নিধ্যসূচক অনুষঙ্গ।

তেমনই সাদৃশ্যের অনুষঙ্গে সান্নিধ্য ত আছেই। সাদৃশ্য মানে কিছুটা মিল, কিছুটা অমিল। মিলটুকু মনে হয় সাদৃশ্যের জন্য কিন্তু তারপর দুয়ের মধ্যে যেটুকু অমিল সেটুকু মনে আসে সান্নিধ্যের জন্য, যেমন এক ভাইকে দেখে অপর ভাইটির কথা মনে পড়ল। এখানে প্রথম ভাইয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় ভাইয়ের যেখানে যেখানে মিল সেটুকু মনে এল সাদৃশ্যের জন্য। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মনে এল অমিলটুকু। এখানে দ্বিতীয় ভাইয়ের সঙ্গে প্রথম ভাইয়ের মিলটুকু তাদের মধ্যে অমিলটুকুকে আমাদের মনে জাগিয়ে তুলল এবং সেটি হল সান্নিধ্যের জন্যই।

সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের সূত্র দুটির মধ্যে প্রচুর মিল আছে। দুটি বস্তুর মধ্যে বৈসাদৃশ্যের সূত্র তখনই কাজ করে যখন তাদের মধ্যে শ্রেণীগত বা জাতিগত অভিন্নতা থাকে। দুঃখের অভিজ্ঞতা সুখের স্মৃতি জাগায় বা খুব গরমের দিনে শীতের দিনের কথা মনে পড়ে। এখানে দুঃখ-সুখ, গরম-শীত ইত্যাদিগুলি একই শ্রেণী বা জাতির অন্তর্গত। নইলে একটি অপরটির কথা মনে করাতে পারত না। তাছাড়া বৈসাদৃশ্যের চিন্তার মধ্যে সান্নিধ্যও কাজ করে থাকে। সাধারণত একটা বস্তুর প্রকৃতিকে ভাল করে বোঝার জন্য তার বিপরীত প্রকৃতির বস্তুটিকে আমরা তার পাশাপাশি রাখি এবং তুলনা করে থাকি। সেজন্য যখনই একটি বস্তু দেখে তার বিপরীত বস্তুটিকে মনে পড়ে তখনই এই সান্নিধ্যসূচক অনুষঙ্গটি কাজ করে থাকে। অতএব বৈসাদৃশ্যের সূত্রটি সাদৃশ্য এবং সান্নিধ্য এই দুয়ের উপর নির্ভরশীল।

অনেক মনোবিজ্ঞানী এই তিনটি সূত্রের পরিবর্ত্তে একটি সূত্র দেওয়ার

পক্ষপাতী। বেন, জেমস্ প্রভৃতি সান্নিধ্যের সূত্রটিকেই মৌলিক সূত্র বলে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের মতে আর দুটি সূত্র এই সূত্রটিরই অন্তর্ভুক্ত। আবার কোন কোন মনোবিজ্ঞানী সাদৃশ্যের সূত্রটিকেই মৌলিক সূত্র বলে বর্ণনা করে থাকেন।

হ্যামিলটনের মতে সমষ্টিকরণের সূত্রকে (Law of Redintegration) অনুষঙ্গের মৌলিক সূত্র বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে এবং সান্নিধ্য, সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য এ সবগুলিকেই এই সূত্রটির বিভিন্ন রূপ বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এই সূত্রটির অর্থ হল যে একটি বিশেষ সমষ্টির যদি একটি অংশ মনের সামনে উপস্থাপিত করা যায় তাহলে মানসিক প্রচেষ্টা হবে ঐ সমষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ ফুলের আকৃতি, গন্ধ, গঠন সমস্ত নিয়েই আমাদের মনে তৈরী হয়ে আছে একটি সমষ্টিগত বা সমগ্র ধারণা। এখন যদি এই সমগ্র ধারণার একটা অংশ, যেমন ফুলের আকৃতি বা গন্ধ যদি মনে আসে তাহলে মনের চেষ্টাই হবে ঐ সমগ্র ধারণাটিকে জাগিয়ে তোলা। অনুষঙ্গের এই সংব্যাখ্যানটি বেশ সুসঙ্গত এবং আধুনিক গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অনুষঙ্গতত্ত্বের সমালোচনা

এক সময়ে মানসিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা ও ব্যাখ্যার একটি প্রধান উপকরণ ছিল অনুষঙ্গের পরিকল্পনাটি। অনুষঙ্গবাদীরা (Associationist) মনে করতেন যে সকল রকম মানসিক প্রক্রিয়ার মূলে আছে কতকগুলি মানসিক একক এবং সেগুলির একটীর সঙ্গে আর একটীকে জুড়ে আমাদের স্মৃতি, চিন্তা, কল্পনা, বিচারকরণ ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে। এই মানসিক এককগুলিরও তাঁরা শ্রেণী বিভাগ করলেন, যেমন সংবেদন (sensation), ধারণা (idea or concept), প্রতিরূপ (image) ইত্যাদি। এদের সংযোগ-প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা হিসাবে তাঁরা তৈরী করলেন অনুষঙ্গের সূত্রগুলি। তাঁদের মতে সংবেদন, ধারণা, প্রতিরূপগুলি নানা রূপ অনুষঙ্গের জন্য পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায় এবং আমাদের মনের বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অনুষঙ্গবাদীরা মানসিক প্রক্রিয়ার এই ব্যাখ্যাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে করেন।

কিন্তু পরবর্তী বহু মনোবিজ্ঞানী অনুষঙ্গবাদীদের এই অতি সহজ ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁদের মতে অনুষঙ্গ মানসিক প্রক্রিয়ার সংগঠনের

বর্ণনামাত্র, ব্যাখ্যা নয়। মানসিক প্রক্রিয়াকে ঐভাবে টুকরো টুকরো করে ভাগ করে পরীক্ষা করতে গেলে তার প্রকৃত সত্তাটিই নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব মানসিক প্রক্রিয়ার যথার্থ্য ব্যাখ্যা হবে সমগ্রগত, অংশগত নয়। অনুষঙ্গবাদীদের মানসিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণের প্রথাকে তাঁরা মানসিক রসায়ন (Mental Chemistry) বলে সমালোচনা করলেন। আধুনিককালে মানসিক প্রক্রিয়ার সমগ্রতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে এবং তার সম্পূর্ণ সংগঠনকে মূল ভিত্তি করে ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা হয়।

অবশ্য অনুষঙ্গমূলক বর্ণনা মানসিক প্রক্রিয়ার পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে না পারলেও মনের প্রকৃতি ও কাজ সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য আজ আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছে। থর্নডাইকের সংযোজনবাদ ও প্যাভলভের অনুবর্ত্তন প্রক্রিয়ার তত্ত্বটিকে শিখন-প্রক্রিয়ার অনুষঙ্গমূলক সংব্যাখ্যানের আধুনিক রূপ বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় খণ্ডের ৭ এবং ২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শিক্ষা ও অনুষঙ্গ

শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুষঙ্গের সূত্রগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। আমাদের স্মৃতির সংগঠনে অনুষঙ্গের প্রভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বহু স্মৃতি অনুষঙ্গকে ভিত্তি করে গড়ে উঠে থাকে। অর্থহীন শব্দতালিকা মুখস্থ করার সময় দেখা গেছে যে অনুষঙ্গের সাহায্যে আমরা একটি শব্দের সঙ্গে আর একটি শব্দকে গ্রন্থিবদ্ধ করে থাকি। আমাদের অনেক ধারণা, বিশ্বাস, মনোভাব, অনুরাগ, বিরাগ নিছক অনুষঙ্গ থেকেই জন্মলাভ করে থাকে। শব্দের অর্থ বা নাম আমরা শিখে থাকি অনুষঙ্গের সাহায্যে।

সাধারণত আমাদের মধ্যে অনুষঙ্গ সৃষ্ট হয় স্বতস্ফূর্তভাবে, অনেকটা যান্ত্রিক উপায়ে। যাকে আমরা অনুবর্ত্তন প্রক্রিয়া (Conditioning) বলে বর্ণনা করে থাকি সেই প্রক্রিয়াতেই আমাদের চিন্তা বা ধারণাগুলির মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়ে থাকে। যেমন রক্তকে লাল রঙের দেখতে দেখতে আমাদের মধ্যে রক্ত এবং লাল রঙের মধ্যে একটা অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়ে যায় এবং তার ফলে ঘন লাল কিছু দেখলে আমাদের রক্তের কথা মনে পড়ে।

আবার পরিকল্পিত প্রচেষ্টায় কৃত্রিম উপায়েও কোন কোন ক্ষেত্রে অনুষঙ্গ সৃষ্টি করা যায়। অর্থাৎ কোন একটা বিশেষ বস্তুর ধারণা আমাদের মনে রাখতে হলে আমরা অন্য কোন একটি বস্তু যেটি আমাদের আগে থেকেই মনে আছে বা

যেটি সহজে আমরা ভুলিনা এমন বস্তুর স্মৃতির সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ করে দেওয়া যেতে পারে এবং এইভাবে গ্রন্থিবদ্ধ হলে আমরা এই নতুন বস্তুটিও ভুলব না। যখন কোন নতুন বিষয়বস্তু আমরা মুখস্থ করি তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা সেগুলিকে আমাদের পূর্ব্বে শেখা বস্তুর সঙ্গে অনুষঙ্গ স্থাপন করে মনে রাখার চেষ্টা করি। অর্থাৎ মুখস্থকরণ মানেই হল নতুন অনুষঙ্গ স্থাপন। বিষয়বস্তু যত অর্থহীন এবং কৌশলধর্ম্মী হবে ততই অনুষঙ্গ যান্ত্রিক এবং কৃত্রিম হবে! আর বিষয়বস্তু যত অর্থপূর্ণ হবে তত অনুষঙ্গ স্বাভাবিক ও আয়াসহীন হবে। অর্থহীন বিষয়বস্তু, কৌশল ইত্যাদি শেখার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টার সাহায্যে অনুষঙ্গ স্থাপন করতে হয় এবং বারবার অনুশীলনের সাহায্যে সেই অনুষঙ্গকে দৃঢ়বদ্ধ করতে হয়। শিক্ষক এই মানসিক প্রক্রিয়াটিকে শিক্ষার কাজে লাগাতে পারেন। যে সব বিষয়বস্তু দুরূহ বা সহজে মনে রাখা যায় না সেগুলিকে অনুষঙ্গের সাহায্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনে গ্রন্থিবদ্ধ করে দিতে পারেন। এইসব ক্ষেত্রে সাধারণত সান্নিধ্যের অনুষঙ্গেরই সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। তবে একথা অনস্বীকার্য্য যে কৃত্রিম অনুষঙ্গের সাহায্যে মনে রাখা অনেক সময় কষ্টকর ও অস্থায়ী হয়ে থাকে।

প্রশ্নাবলী

1. Write short notes on Laws of Association.

(B. T. 1955, B. A. 56, 59)

Ans. (পৃঃ ১৭৫—পৃঃ ১৭৭).

2. Explain the Laws of Association by contiguity and discuss its educational importance. (B. A. 1957)

Ans. (পৃঃ ১৭৬—পৃঃ ১৮০)

3. Explain and illustrate the Laws of Association.

Ans, (পৃঃ ১৭৫—পৃঃ ১৮০) (B. A. 1958)

পনেরো

কল্পন (Imagination)

কল্পন হল একটি মানসিক প্রক্রিয়া। এতে আমরা প্রতিরূপকে উপাদানরূপে ব্যবহার করে থাকি। যা আমরা প্রত্যক্ষ করি তার একটি ছবি আমরা মনের মধ্যে বহন করতে পারি। এইটি হল প্রতিরূপ। যেমন যে ব্যক্তি তাজমহল দেখে বাড়ী ফিরলেন তিনি তাজমহলের একটি প্রতিরূপ মনের মধ্যে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। যখনই তিনি তাজমহল সম্বন্ধে চিন্তা করেন তখনই তাজমহলের প্রতিরূপটি তার মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। এটি হল চাক্ষুষ প্রতিরূপের দৃষ্টান্ত। এইভাবে আমরা আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও প্রতিরূপ মনে রাখতে পারি, যেমন কোন শব্দ, গন্ধ, আস্বাদন বা পেশীসঞ্চালনের প্রতিরূপও (প্রতিরূপের পরিচ্ছেদ ১৫৯ পৃঃ) মনে রেখে থাকি।

কল্পনের ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের বিভিন্ন প্রতিরূপকে একটির পর একটি পাশাপাশি রেখে এক ধরনের মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করি। যে ভদ্রলোক আগ্রা থেকে তাজমহল দেখে ফিরলেন তিনি ঘরে বসে বসে আগ্রার রাস্তা, টাঙাওয়ালা, তাজমহল ইত্যাদির প্রতিরূপগুলিকে একসঙ্গে জুড়ে ভাবতে পারেন যে তিনি আগ্রার পথ দিয়ে টাঙ্গায় চড়ে তাজমহল দেখতে যাচ্ছেন। এইটি হল কল্পন।

প্রতিরূপ মাত্রেই হল প্রত্যক্ষিত বস্তুর মানসিক রূপ অর্থাৎ প্রত্যেক প্রতি-রূপটিই প্রত্যক্ষণ থেকে জন্ম নিয়েছে। কিন্তু প্রত্যক্ষণের সঙ্গে কল্পনের পার্থক্য হল এই যে কল্পনে আমরা আমাদের ইচ্ছামত প্রতিরূপগুলিকে সাজিয়ে প্রয়োজন-মত মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করতে পারি। কিন্তু প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা বাস্তবের প্রকৃতি ও নিয়মের দ্বারা নির্দ্ধারিত। যেমন একটি গাছ মাটির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে—এটি আমাদের প্রত্যক্ষিত অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতার ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন আমরা প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে করতে পারি না। কিন্তু কল্পনের ক্ষেত্রে আমরা এই গাছটির প্রতিরূপ নিয়ে আমাদের ইচ্ছামত মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করতে পারি। যেমন গাছটি মাটির উপর চলে ফিরে বেড়াচ্ছে

বা আকাশে উড়ছে ইত্যাদি আমরা কল্পনা করতে পারি। মনে রাখতে হবে যে কল্পনের ক্ষেত্রে যে সব প্রতিরূপের আমরা ব্যবহার করি সেগুলি কিন্তু আমাদের মন থেকে স্বষ্ট নয়। প্রতিরূপগুলি সব সময়েই প্রত্যক্ষণ থেকে উদ্ভূত। যা আমরা কখনও প্রত্যক্ষণ করিনি তার আমরা প্রতিরূপ স্বষ্টি করতে পারি না। তবে সেগুলিকে পছন্দমত সাজিয়ে গুজিয়ে ইচ্ছামত অভিজ্ঞতা স্বষ্টি করার ক্ষেত্রেই আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

কল্পন ও স্মরণ (Imagination & Memory)

কল্পন ও স্মরণ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রতিরূপের ব্যবহার হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা যখন পূর্ব্বে দেখা বা শেখা বস্তু মনে করি তখন আমরা সেগুলির প্রতিরূপকে উজ্জীবিত করি। যেমন প্রয়োজন হলে আমাদের পরিচিত কোন বন্ধুর চেহারা বা কোন দৃশ্য বা বাড়ীর ছবি আমরা মনের মধ্যে প্রতিরূপের আকারে জাগিয়ে থাকি। একেই স্মৃতি বলে। কল্পনের ক্ষেত্রেও ঐ একই ভাবে আমরা প্রতিরূপকে জাগিয়ে থাকি। তবে স্মৃতি ও কল্পনের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে স্মৃতির সঙ্গে বাস্তবের অভিজ্ঞতার পুরোপুরি মিল আছে। অর্থাৎ যা প্রত্যক্ষ করি এবং যেমনভাবে প্রত্যক্ষ করি সেইটিকে সেইভাবে দেখাকেই স্মৃতি বলে। কিন্তু কল্পনের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রতিরূপগুলিকে ইচ্ছামত সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে অভিজ্ঞতার স্বষ্টি করতে পারি। যেমন একটি ঘোড়া এবং একজোড়া ডানার প্রতিরূপকে মনে জাগানোর নাম হল স্মরণ। আর সেই ঘোড়াটার গায়ে দুজোড়া ডানা লাগিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়া তৈরী করাটা হল কল্পন। এইজন্য অনেকে স্মৃতিকে পুনরুৎপাদনমূলক (reproductive) কল্পন এবং সাধারণ কল্পনকে উৎপাদনমূলক বা স্বজনমূলক (productive) কল্পন বলে থাকেন। যে অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের একবার পূর্ব্বে হয়েছে সেগুলিকেই আবার উৎপাদন করা বা জাগান হল স্মৃতির কাজ। সেইজন্য স্মৃতিকে পুনরুৎপাদনমূলক বলা হয়। কিন্তু প্রকৃত কল্পনায় আমরা প্রতিরূপগুলিকে নতুনভাবে সংগঠিত করে নতুন অভিজ্ঞতার স্বষ্টি করে থাকি। সেইজন্য কল্পনাকে উৎপাদনমূলক বা স্বজনমূলক বলা হয়।

কল্পন ও স্মরণের মধ্যে একটা বড় পার্থক্যের কথা মনে রাখতে হবে। কল্পনের একমাত্র উপাদান হল প্রতিরূপ, অন্য কোন বস্তু উপাদান হিসাবে

ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু স্মৃতির ক্ষেত্রে প্রতিরূপ ছাড়া আরও অন্যান্য বস্তু উপাদান রূপে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন ধারণা (concept), ভাষা (language), সংখ্যা (number) ইত্যাদি।

কল্পন ও চিন্তন (Imagination & Thinking)

কল্পন হল চিন্তনের একটি বিশেষ প্রকার বা শ্রেণীমাত্র। আমরা যখন প্রকৃত বস্তুর পরিবর্তে তার কোন প্রতীক (symbol) নিয়ে আচরণ করি তখন আমাদের সেই আচরণকে চিন্তন বলা হয়। কোন একটি বস্তুর পরিবর্তে যদি আমরা অন্য একটি বস্তুর ব্যবহার করি তাহলে পরের বস্তুটিকে প্রথম বস্তুর প্রতীক (symbol) বলা হয়। আমরা যা প্রত্যক্ষ করি সেগুলির নানারূপ প্রতীক আমরা মস্তিষ্কে বহন করতে পারি। চিন্তনের ক্ষেত্রে প্রকৃত বস্তুগুলির পরিবর্তে এই ধরনের প্রতীকগুলি নিয়ে আমরা আচরণ করে থাকি। যেমন একটি বই, টেবিল থেকে হাত দিয়ে তোলা হল প্রকৃত আচরণ। কিন্তু আমরা যদি বই, টেবিল, হাত ইত্যাদির প্রতীকের সাহায্যে মনে মনে ঐ একই কাজ সম্পন্ন করি তাহলে আমাদের আচরণটি হল চিন্তন। এইজন্য চিন্তনকে বলা হয় প্রতীকমূলক আচরণ (symbolical behaviour)।

প্রতীক আবার নানাপ্রকারের হতে পারে, যেমন প্রতিরূপ, ধারণা, ভাষা, সংখ্যা, পেশীমূলক প্রস্তুতি ইত্যাদি। এইসব বিভিন্ন প্রতিরূপের সাহায্যে আমরা চিন্তন করে থাকি। যেহেতু চিন্তার ক্ষেত্রে প্রকৃত বস্তুর পরিবর্তে প্রতীকের সাহায্যে আমরা আচরণ করে থাকি সেহেতু চিন্তনের ক্ষেত্রে সময় ও শ্রমের প্রচুর সাশ্রয় হয়। এইজন্যই চিন্তন আমাদের এত উপকারে লাগে।

চিন্তন আবার নানা প্রকারের হতে পারে, যেমন কল্পন (imagining), বিচার-করণ (reasoning), উদ্ভাবন (inventing) ইত্যাদি। বিচারকরণ হল সেই চিন্তন যার মধ্যে আছে কোন একটি সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা। উদ্ভাবন হল সেই চিন্তন যার মধ্যে আছে কোন নতুন কিছু সৃষ্টি করা। আর কল্পন হল সেই চিন্তন যাতে আছে প্রতিরূপগুলিকে ইচ্ছামত নিযুক্ত করে নানারূপ নতুন মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করা। অন্যান্য চিন্তনের ক্ষেত্রে আমরা প্রতিরূপ ছাড়া অন্যান্য প্রতীকগুলিও ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু কল্পনের উপাদান প্রধানত প্রতিরূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

কল্পনের শ্রেণীবিভাগ

কল্পনের প্রকৃতি অনুযায়ী অনেক মনোবিজ্ঞানী এর নানা শ্রেণীবিভাগ করেছেন। ড্রেভারের দেওয়া শ্রেণীবিভাগটি নীচে বর্ণিত হল।

ড্রেভারের মতে সৃজনমূলক কল্পন দু'শ্রেণীর হতে পারে, প্রয়োগমূলক (Pragmatic) এবং সৌন্দর্য্যবোধমূলক (Aesthetic)। প্রয়োগমূলক কল্পনে ব্যক্তির কল্পনা নতুন কিছু সৃষ্টি করলেও বাস্তব জগতের সঙ্গে সমতা রেখে অগ্রসর হয়—যেমন, কল্পনায় কোন ইঞ্জিনীয়ার একটা ব্রিজ তৈরী করছেন বা কোন স্থপতি একটি প্রাসাদ সৃষ্টি করছেন। এ সকল ক্ষেত্রে কল্পনা বাস্তবজগতের নিয়মকানুন মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু সৌন্দর্য্যবোধমূলক কল্পনায় ব্যক্তির কল্পনা বহুলাংশে অবাধিত ও অনিয়ন্ত্রিত। যেমন কবিতা, গল্প বা উপন্যাস লেখা, কোন সৌন্দর্য্য-শিল্প তৈরী করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যক্তির কল্পনা বাস্তবের নিয়মকানুন অতটা মেনে চলতে বাধ্য নয়। এ দুয়ের মধ্যে আর একটা বড় পার্থক্য হল যে প্রয়োগমূলক চিন্তনে তৃপ্তি আসে যখন কল্পনের যে লক্ষ্য সে লক্ষ্যতে গিয়ে পৌছান যায়। কিন্তু সৌন্দর্য্যবোধমূলক কল্পনে কল্পন-ক্রিয়াতেই তৃপ্তি পাওয়া যায়।

প্রয়োগমূলক কল্পনকে আবার ড্রেভার দুশ্রেণীতে ভাগ করেছেন, ব্যবহারমূলক (Practical এবং তত্ত্বগত (Theoretical)। যে প্রয়োগমূলক কল্পন বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্যই সৃষ্ট হয় তাকে বলা যেতে পারে ব্যবহারিক প্রয়োগমূলক কল্পনা। আর যে প্রয়োগমূলক কল্পনাকে কোনরূপ তত্ত্ব আহরণ করার জন্য সৃষ্টি করা হয় তাকে বলা যেতে পারে প্রয়োগমূলক তত্ত্বগত কল্পনা। ইঞ্জিনীয়ারের ব্রিজ তৈরীর কল্পনা হল প্রথমটির দৃষ্টান্ত এবং কোন বৈজ্ঞানিকের কোন বিজ্ঞান-মূলক তত্ত্ব উদ্ঘাটনের জন্য কল্পনা হল দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত।

সৌন্দর্য্যবোধমূলক কল্পনাও আবার দুরকমের হতে পারে, শিল্পমূলক (Artistic) এবং অলীক বা অবাস্তব (Fantastic)। যখন কোন চিত্রকর কল্পনায় একটি ছবি আঁকছেন বা ভাস্কর কল্পনায় কোন মূর্ত্তি গড়ছেন তখন তাঁদের কল্পনাকে শিল্পমূলক বলা চলে, কিন্তু নিছক তৃপ্তি পাবার উদ্দেশ্যে লক্ষ্যহীন উদ্ভট কল্পনার জাল যখন ব্যক্তি বুনে যায় তখন তাঁর কল্পনাকে অলীক বা অবাস্তব কল্পনা বলা হয়।

শিক্ষা ও কল্পন

নানা দিক দিয়ে কল্পন শিক্ষা-পরিচালনায় একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

গ্যাল্টন প্রভৃতির পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিশুর চিন্তন-প্রক্রিয়াটি প্রধানত কল্পনামূলক। সে সমস্ত কিছুই চিন্তা করে প্রতিরূপের সাহায্যে। ধীরে ধীরে সে যত বড় হয় তত তার চিন্তায় প্রতিরূপের আধিক্য কমতে থাকে। যৌবন-প্রাপ্তির সময়ে আবার কল্পনের আধিক্য নতুন করে দেখা দেয়। এ কল্পনা অবাস্তব ও দিবাস্বপ্নের গোত্রীয়। প্রাপ্তযৌবন তার বহুবিধ অতৃপ্ত কামনার তৃপ্তি আহরণ করে কল্পনার মধ্য দিয়ে। পরিণত বয়সে এই দিবাস্বপ্নের আধিক্য কমে আসলেও একেবারে চলে যায় না। সারাজীবন ধরে অল্পবিস্তর পরিমাণে দিবাস্বপ্ন মানুষের মনোরাজ্যকে প্রভাবিত করে থাকে এবং ব্যর্থতা বা অতৃপ্তির হতাশার মধ্যে মানুষকে আংশিক তৃপ্তি এবং আনন্দ দিয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত কল্পনা হল উদ্ভাবন বা সৃজনীমূলক চিন্তনের ভিত্তি। কল্পন যখন সুনিয়ন্ত্রিত ও বাস্তব অনুগামী হয় তখন সেই কল্পনা সত্যকারের নতুন জিনিষ সৃষ্টি করতে পারে। বৈজ্ঞানিক বা শিল্পমূলক আবিষ্কার, সৌন্দর্য্যমূলক বস্তু-সৃষ্টি, নতুন কবিতা বা উপন্যাস লেখা এ সকলেরই প্রথম সুরু তাদের সৃজকদের কল্পনার রাজ্যে। সেখানে তাদের সৃজন পূর্ণতা লাভ করলে তখন তারা বাস্তবে রূপলাভ করে। অতএব কল্পনের নিয়ন্ত্রণ এবং উপযুক্ত পথে পরিচালন শিক্ষাপ্রক্রিয়ার একটা বড় অঙ্গ। অর্থাৎ যাকে আমরা প্রয়োগমূলক কল্পনা বলে বর্ণনা করি সেই কল্পনা শিশুর মধ্যে সৃষ্টি করাই হচ্ছে শিক্ষার একটা বড় লক্ষ্য।

শিশুর প্রাথমিক কল্পনা কিন্তু প্রয়োগমূলক নয়। তার প্রকৃতি প্রধানত অলীক ও অবাস্তব শ্রেণীর। বাস্তবের নিয়মকানুন বা স্থান ও সময়ের সঙ্গতি কিছুই কল্পনা মানে না, মুক্ত বিহঙ্গমের মত নিজের খুসীমত পথে নির্বাধগতিতে সে অগ্রসর হয়।

এই সময়ে শিশুদের এই অবাস্তব কল্পনা খোরাক পায় রূপকথার গল্পে—পরী, পক্ষীরাজ ঘোড়া, দুধসাগরের দেশ, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী প্রভৃতি কাল্পনিক কাহিনীতে। সবদেশেই শিশুদের মনস্তুষ্টির জন্য রূপকথার গল্প শোনাবার প্রথার প্রচলন আছে।

কিন্তু আধুনিক একদল মনোবিজ্ঞানী শিশুদের রূপকথার গল্প শোনাবার বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে রূপকথার গল্প শিশুকে বাস্তব থেকে দূরে

সরিয়ে নিয়ে যায় এবং তার মনে পৃথিবী সম্বন্ধে এমন কতকগুলি অবাস্তব ধারণার সৃষ্টি করে যা তার ভবিষ্যৎ জীবন-প্রস্তুতির বিরাট পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। এই সকল গল্পে সাধারণত অতিপার্থিব বা দৈবশক্তির প্রচুর ব্যবহার দেখা যায় এবং শিশুর মনে বিশ্বাস জন্মে যায় যে সে যদি কোন বিপদ বা সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে পড়ে তবে দৈবশক্তি তাকে সাহায্য করবে উদ্ধার পেতে। কিন্তু বাস্তবজীবনে তার এই ধারণা শোচনীয় ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং সে পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান করতে পারে না।

প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ মণ্টেসরী এই মতেরই সমর্থক। তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশুকে কোনরূপ রূপকথা বা কাল্পনিক গল্প শোনান নিষিদ্ধ। তিনি বলতে চান যে শিক্ষার কাজ শিশুকে তার শিশুসুলভ অবাস্তব রাজ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে বাস্তব জগতের জন্য প্রস্তুত করা। তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষাদায়ক উপকরণ (Didactic apparatus) গুলির মাধ্যমে শিশুর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়জাত প্রতিরূপগুলিকে সুপরিণত ও সুপুষ্ট করে তোলা হয়। তাঁর মতে শিশুর ইন্দ্রিয়মূলক অভিজ্ঞতাগুলিকে বাস্তবধর্মী শিক্ষার মধ্য দিয়ে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিশু বড় হয়ে বাস্তবের বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে সার্থকভাবে সঙ্গতিবিধান করতে পারে।

শিশুর অবাস্তব কল্পনা এবং রূপকথা-পঠনের বিরুদ্ধে মণ্টেসরী প্রভৃতির যে অভিযোগ তার যে যথেষ্ট মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রায়ই দেখা গেছে যে শৈশবের রূপকথার মায়াময় জগৎটি যখন পরিণত বয়সে বাস্তবের রূঢ় পরিবেশের সংঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তখন ব্যক্তির পক্ষে সেটা প্রচণ্ড আশাভঙ্গ ও মানসিক আঘাতের রূপ নেয়। অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি এই অপ্রত্যাশিত আঘাত থেকে অক্ষত অবস্থায় বার হতে পারে না এবং সারাজীবন ধরেই অতৃপ্ত ও অসংহত জীবনযাপন করে চলে।

মনঃসমীক্ষণের সংব্যাখ্যানেও শৈশবের অবাস্তব কল্পনার আধিক্য ব্যক্তির পরিণত জীবনে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তি যখন বাস্তবজীবনে কোন দুরূহ সমস্যা বা পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে সার্থকভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না তখন সে তার শৈশবের কল্পনার রাজ্যে ফিরে গিয়ে বাস্তবকে এড়িয়ে যায়। একে প্রত্যাবৃত্তি (Regression) বলা হয়। প্রাণশক্তির এই প্রত্যাবৃত্তি মানসিক স্বাস্থ্যের নাশক, সার্থক জীবন-গঠনের চরম পরিপন্থী।

তা বলে অবাস্তব কল্পনা বা দিবাস্বপ্নের একেবারে কোন উপকারিতা নেই যে

তা নয়। অতি শৈশবে শিশুর বহুবিধ কামনা—যার রূপ আমাদের কাছে খুব সুস্পষ্টও নয় এবং যা পূর্ণ করা আমাদের সাধ্যও নয়—এই অবাস্তব কল্পনার মাধ্যমে তৃপ্তি আহরণ করে। শিশুর মানসিক বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে এই মুক্ত কল্পনা অনেকখানি সাহায্য করে এবং অনেক অপরিণত মানসিক প্রক্রিয়া এই কল্পনার মাধ্যমে পরিণতি লাভ করে।

কিন্তু একথা অনস্বীকার্য্য যে শিশুর লক্ষ্যহীন অবাস্তব কল্পনাকে লক্ষ্যসম্পন্ন বাস্তবধর্ম্মী কল্পনায় পরিণত করাই শিক্ষার প্রথম কার্য্যসূচী। রূপকথার গল্প বা অবাস্তব কাল্পনিক কাহিনী শিশুকে একটা বিশেষ বয়স পর্য্যন্ত, (বড় জোর প্রাক্-বিদ্যালয় সময় পর্য্যন্ত) পড়তে বা শুনতে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু তারপর তাকে ধীরে ধীরে কল্পনার জগৎ থেকে সরিয়ে আনতে হবে এবং বাস্তব চিন্তাধারায় দীক্ষিত করতে হবে। তার উন্মেষকামী কল্পনাকে উপযুক্ত পরিচালনা ও সাহায্যের দ্বারা বাস্তবমুখী করে তুলতে হবে এবং ব্যবহারিক কার্য্যে প্রযুক্ত হতে পারে এমন ভাবে তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

এই কল্পনা-নিয়ন্ত্রণের একটা প্রধান উপায় হল তার বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর তার কল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করা। শিশু যত বিভিন্ন ও বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার অধিকারী হবে তত তার কল্পনা বাস্তবধর্ম্মী ও কম উদ্ভট হয়ে উঠবে। দেখা গেছে যে শিশু যত সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ পরিবেশে বাস করে তার কল্পনা তত বেশী অবাস্তব। বাস্তব অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ও বিবিধতা শিশুর কল্পনাকে গঠনমূলক ও ব্যবহারিক করে তোলে।

সমস্ত শিক্ষাকেই সক্রিয়তার উপর ভিত্তি করা উচিত। মৌখিক বর্ণনা বা পুস্তকলব্ধ ধারণা কোনটাই সত্যকারের বাস্তব জ্ঞান দিতে পারে না। ফলে শিশুর কল্পনা নানা বিকৃত ও অবাস্তব রূপ ধারণ করে। কিন্তু সক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে যা শেখা যায় তাতে এই অবাস্তব কল্পনা গড়ার কোন অবকাশ থাকে না। সেখানে বাস্তব অভিজ্ঞতা শিশুর কল্পনার প্রকৃতিকে দৃঢ়হস্তে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তার গতি-ধারাকে প্রয়োগমূলক পথে পরিচালিত করে।

যেখানে যেখানে মৌখিক বর্ণনা বা পুস্তকলব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না সেখানে ইন্দ্রিয়সহায়ক উপকরণের (Audio-visual aids) সাহায্য নেওয়া উচিত। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন, ছবি, চার্ট, ম্যাপ, ফিল্ম ইত্যাদির সহায়তায় শিশুর কল্পনাকে বাস্তবমূলক পথে পরিচালিত করা যায়।

ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধনের সাহায্যে (Sense training) কল্পনাকে বাস্তবধর্ম্মী করে তোলা যায়। কল্পনার বিষয়বস্তু যে প্রতিরূপ তা আসে ইন্দ্রিয়জ্ঞান থেকে। মণ্টেসরী প্রবর্ত্তিত পন্থায় ইন্দ্রিয়গুলির উৎকর্ষসাধন করলে কল্পনা অবাস্তব বা উদ্ভটরূপ গ্রহণ করতে পারে না। তবে শিশুর মধ্যে চিন্তামূলক কল্পনাশক্তি বৃদ্ধির পক্ষে ইন্দ্রিয় চর্চ্চা খুব বেশী কার্য্যকরী বলে মনে হয় না।

প্রশ্নাবলী

1. Write an essay on—Imagination and Day Dreams of children. (B. T. 1954)

Ans. (পৃঃ ১৮১—পৃঃ ১৮৮)

2. Write notes on—Imagination. (B. T. 1954)

Ans. (পৃঃ ১৮১—পৃঃ ১৮৪)

3. Distinguish clearly between the following giving example—(i) After Image (ii) Memory Image (iii) Primary Memory Image and (iv) Eidetic Image. (B. A. 1954)

Ans. (পৃঃ ১৬০—পৃঃ ১৬২)

4. Discuss the different forms of imagination and the importance of imagination in early childhood. How would you develop imagination in children ?

Ans. (পৃঃ ১৮১—পৃঃ ১৮৮)

5. Write notes on—Image. (B. A. 1959)

Ans. (পৃঃ ১৫৯—পৃঃ ১৬২)

তেরো

সেন্টিমেণ্ট (Sentiment)

সেন্টিমেণ্ট কথাটি মনোবিজ্ঞানে প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন স্যাণ্ড (Shand)। তাঁর সংব্যাখ্যান অনুযায়ী বিশেষ কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে যখন প্রক্ষোভমূলক প্রবণতাগুলি একটি সুসংবদ্ধ সংগঠনের সৃষ্টি করে তখন তাকে সেন্টিমেণ্ট বলে।

প্রত্যেক ব্যক্তিই কতগুলি সহজাত প্রবণতা নিয়ে জন্মায় এবং তার প্রাথমিক আচরণগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় এই প্রবণতাগুলির দ্বারা কিন্তু যত সে বড় হয় তত পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার ফলে তার সেই সহজাত প্রবণতাগুলি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হতে থাকে। তার প্রবণতাগুলি প্রথম প্রথম থাকে অনিয়ন্ত্রিত, অসংহত ও স্বতন্ত্র সত্তার রূপে। কিন্তু ক্রমশ সেগুলি নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ ধারণ করে। সেন্টিমেণ্ট এই প্রক্ষোভমূলক প্রবণতাগুলিরই একটি সুসংগঠিত রূপ ছাড়া আর কিছু নয়।

যেমন, কোন কিছুকে ভালবাসা একটা প্রক্ষোভ। কিন্তু যখন বিশেষ কোন বস্তু, যেমন নিজের জন্মভূমি, বা নিকট জনকে ঘিরে এই ভালবাসার প্রক্ষোভটি সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংগঠিত হয়ে ওঠে, তখনই সেন্টিমেণ্ট জন্ম নেয়।

প্রক্ষোভ সহজাত, কিন্তু সেন্টিমেণ্ট অর্জ্জিত। সেন্টিমেণ্ট কোন মানসিক প্রক্রিয়া নয়, বা কোন মানসিক শক্তিও নয়। সেন্টিমেণ্ট মনের একটা বিশেষ অর্জ্জিত সংগঠন বা রূপ মাত্র যা বিশেষ কোন বস্তু বা ব্যক্তির বা ধারণা সম্বন্ধে ব্যক্তিকে বিশেষ পন্থায় কাজ করতে প্ররোচিত করে।

যখন প্রক্ষোভমূলক প্রবণতাগুলি এইভাবে সেন্টিমেণ্টের রূপ নিয়ে সুসংগঠিত হয় তখন ব্যক্তির মানসিক সংগঠনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন দেখা দেয় এবং সেন্টি-মেণ্টের বিষয়বস্তুটিকে ঘিরে ব্যক্তির মধ্যে একটি সুনির্দ্দিষ্ট ও স্থায়ী আচরণধারা গড়ে ওঠে। ম্যাকডুগালের মতে প্রত্যেকটি সেন্টিমেণ্টই কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি একটি স্থায়ী প্রয়াসমূলক মনোভাব যা ঐ বস্তুটির অভিজ্ঞতা থেকে প্রসূত হয়ে থাকে।

পরিবেশের সংস্পর্শে আসার ফলে ধীরে ধীরে শিশুর প্রক্ষোভগুলি বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। সে কোন বস্তুকে ভালবাসে, কোনটিকে

আবার ঘৃণা করে। এখন এই বস্তুগুলিকে ঘিরে যদি তার ভালবাসা, ঘৃণা প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলি বার বার অভিব্যক্ত হতে থাকে তবে কিছুদিন পরে সেই বিচ্ছিন্ন ও অসংহত প্রক্ষোভগুলি স্থায়ী ও সুসংহত সেন্টিমেণ্টের রূপ ধারণ করে। সেন্টিমেণ্ট বস্তু এবং ব্যক্তিকে ঘিরে যেমন তৈরী হয়, তেমনই আবার ধারণাকে কেন্দ্র করেও সেন্টিমেণ্ট তৈরী হয়। যেমন, ধর্ম্মের প্রতি কারও অনুরাগের সেন্টিমেণ্ট থাকতে পারে। আমাদের সকলেরই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি ঘৃণার সেন্টিমেণ্ট আছে।

সেন্টিমেণ্ট ও কমপ্লেক্স্ (Sentiment & Complex)

সেন্টিমেণ্ট ও কমপ্লেক্স্ মানসিক সত্তার দিক দিয়ে অভিন্ন প্রকৃতির। উভয়েরই জন্ম প্রক্ষোভের সংগঠনে। উভয়েই কোন বস্তু, ব্যক্তি বা বিষয়কে ঘিরে তৈরী হয় এবং উভয় ক্ষেত্রেই যখন ঐ বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণার উল্লেখ করা হয় বা চিন্তা মনে আসে তখনই প্রক্ষোভমূলক প্রচেষ্টা দেখা দেয় এবং আমরা সুনির্দ্দিষ্ট পন্থায় কাজ করতে সুরু করে দিই। কিন্তু তবু কতকগুলি দিক দিয়ে দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ত্তমান।

প্রথমত, কমপ্লেক্সকে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যানে অচেতন মনের বৈশিষ্ট্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্যক্তি তার কমপ্লেক্স্ সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞাত নয় এবং যখন সেই কমপ্লেক্সের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে সে কোন বিশেষ আচরণ করে তখন সে তার কোনরূপ ব্যাখ্যা দিতে পারে না, অন্তত যে ব্যাখ্যা সে দেয় বা বিশ্বাস করে তা প্রকৃত নয়। কিন্তু সেন্টিমেণ্ট ব্যক্তির জ্ঞাত মনের উপাদান এবং তার স্বরূপ এবং তৎপ্রসূত আচরণ সম্বন্ধে সে পূর্ণভাবেই সচেতন।

দ্বিতীয়ত, কমপ্লেক্সের মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতার ছাপ আছে। ব্যক্তির অহংসত্তার কাছে পরিত্যক্ত হয়ে যখন কোন চিন্তা বা কামনা অবচেতনে অবদমিত হয় তখনই কমপ্লেক্স্ জন্ম নেয়। কিন্তু সেন্টিমেণ্ট স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যময় মানসিক প্রক্রিয়ার ফল এবং ব্যক্তির মানসিক সংগঠনে পরম সহায়ক। সেন্টিমেণ্ট মনের সুসমন্বয়নের উপকরণ-স্বরূপ, কমপ্লেক্স্ মানসিক সংহতির পরিপন্থী এবং মনের অস্বাভাবিক অবস্থার সূচক।

সেন্টিমেণ্টের সৃষ্টি ও বিকাশ

সেন্টিমেণ্টের সৃষ্টি হয় অভিজ্ঞতা থেকে। ড্রেভারের মতে প্রত্যক্ষণমূলক স্তরের অভিজ্ঞতা থেকে সেন্টিমেণ্ট জন্মায় না, সেন্টিমেণ্ট জন্মায় যখন অভিজ্ঞতা চিন্তামূলক

স্তরে ওঠে। বস্তু বা ব্যক্তির অভিজ্ঞতা যখন নিছক প্রত্যক্ষণে সীমাবদ্ধ থাকে তখন সেন্টিমেণ্ট তৈরী হয় না, কিন্তু যখন ঐ বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিকে ঘিরে চিন্তন অনুষ্ঠিত হয় তখনই সেন্টিমেণ্ট দেখা দিতে পারে।

মনের বিকাশ ও বৃদ্ধির তিনটি বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করা যেতে পারে। জ্ঞান বা উপলব্ধির দিক দিয়ে এই তিনটি স্তরের নাম দেওয়া যায়, প্রত্যক্ষণমূলক স্তর, চিন্তামূলক স্তর ও বিচারমূলক স্তর। এই তিনটি স্তরের অনুভূতিরও তিনটি শ্রেণী বিভাগ করা যায়, যথা, অসংহত প্রক্ষোভ, সেন্টিমেণ্ট এবং আদর্শ বা জীবনতত্ত্বের অনুভূতি।

প্রথম স্তরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মনের বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তির সহজ ও অবাধ সক্রিয়তা। মনোবিকাশের এই প্রাথমিক স্তরে মন বলতে এই প্রবৃত্তিগুলিরই সমষ্টিকে বোঝায়। এই স্তরে প্রবৃত্তিগুলি প্রত্যক্ষভাবে যে সকল বস্তুর অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে তাদের প্রতিই সংযুক্ত হয়ে যায়। এই স্তরের নাম প্রত্যক্ষণমূলক স্তর এবং অসংযত প্রক্ষোভ হল এই স্তরের অনুভূতি।

দ্বিতীয় স্তরে হয় চিন্তনের সুরু। পূর্ব্বের অসংহত প্রবৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে গোষ্ঠীবদ্ধ হতে থাকে এবং মনের মধ্যে একটা একতা দেখা দেয়। বিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তি গুলির পারস্পরিক সমন্বয়নের মাধ্যমে এমন একটা নতুন মানসিক একতার সৃষ্টি হয় যেটি ইতিপূর্ব্বে একেবারে ছিল না। এই স্তরেই অসংযত প্রক্ষোভগুলি পরস্পরের সঙ্গে একতাবদ্ধ ও সুসংগঠিত হয়ে সেন্টিমেণ্টের জন্ম দেয় এবং এই স্তরেই মনের স্বাভাবিক সংগঠন প্রথম দেখা দেয়। এর পরে মানসিক সংহতি বা সমন্বয়ের মাত্রা যখন আরও এক ধাপ অগ্রসর হয় তখন দ্বিতীয় স্তরে যে সকল সেন্টিমেণ্ট বা অর্জ্জিত প্রবণতাগুলি আমাদের মধ্যে জন্মলাভ করেছিল তাদের মধ্যে আবার সংগঠন দেখা দেয় এবং তা থেকে জন্ম নেয় একটি অধিশাসক সেন্টিমেণ্ট (Master Sentiment)। ম্যাকডুগাল এই সেন্টিমেণ্টের নাম দিয়েছেন আত্মবোধের সেন্টিমেণ্ট। এই স্তরটি চিন্তনমূলক স্তরের একধাপ উঁচুতে এবং একে বিচার-করণমূলক স্তর বলা চলে। এই স্তরে যে মানসিক সংগঠন সংঘটিত হয় তা থেকেই জন্ম নেয় মনের সুসম্পূর্ণ রূপটি।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রবৃত্তির প্রত্যক্ষমূলক স্তরে সেন্টিমেণ্ট জন্মায় না। সেন্টিমেণ্ট জন্মায় তখন যখন প্রাণী তার প্রক্ষোভের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করতে শেখে। অর্থাৎ সেন্টিমেণ্ট সৃজনের জন্য দুটি বস্তুর দরকার—প্রথম, বস্তুটি সম্বন্ধে

মানসিক জ্ঞান বা উপলব্ধি এবং দ্বিতীয়, বস্তুটির প্রতি প্রক্ষোভের জাগরণ। এই দুটি ঘটনাই সেন্টিমেণ্ট সৃজনের পক্ষে অপরিহার্য্য।

শিক্ষায় সেন্টিমেণ্টের প্রভাব

সেন্টিমেণ্ট কথাটির পরিষ্কার সংব্যাখ্যান প্রথম দেন স্যাণ্ড। পরে ম্যাকডুগাল, ড্রেভার প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীরা স্যাণ্ডের সংজ্ঞাটি গ্রহণ করেন এবং তাঁদের প্রদত্ত মানব-আচরণের ব্যাখ্যায় সেন্টিমেণ্টকে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দেন। বিশেষ করে ম্যাকডুগালের প্রসিদ্ধ প্রবৃত্তি-প্রক্ষোভ তত্ত্বে সেন্টিমেণ্টের অংশ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

ম্যাকডুগালের মতে শিশুর ব্যক্তিসত্তা গঠনে সেন্টিমেণ্টের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। শিশুর জন্মের সময় তার মানসিক কর্ম্মপ্রবণতাগুলি অসংবদ্ধ অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ তখন শিশুর ব্যক্তিসত্তা বলে কোন বস্তুই থাকে না। তার আচরণ কেবল কতকগুলি অসংলগ্ন কর্ম্মপ্রচেষ্টার সমষ্টিমাত্র। কিন্তু এই অসংলগ্ন কর্ম্মপ্রচেষ্টাগুলি ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে সেন্টিমেণ্টের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, অর্থাৎ তখনই শিশুর প্রক্ষোভমূলক প্রচেষ্টাগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে দানা বেঁধে ওঠে। তা থেকেই শিশুর সংঘবদ্ধ মনের অস্তিত্ব প্রথম দেখা দেয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ম্যাকডুগাল প্রভৃতির মতে ব্যক্তিসত্তা সৃষ্টির প্রথম ও অতি প্রয়োজনীয় ধাপ হল সেন্টিমেণ্টের জন্ম। পরের ধাপে বিভিন্ন সেন্টিমেণ্টগুলির সমন্বয়সাধক রূপে দেখা দেয় আত্মবোধের (Self-regarding) সেন্টিমেণ্ট। এই জন্যই ম্যাকডুগাল এর নাম দিয়েছেন অধিশাসক সেন্টিমেণ্ট।

আত্মবোধ (Self-regarding) সেন্টিমেণ্ট

প্রত্যেক সেন্টিমেণ্টই কোন বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং প্রত্যেকটারই একটা নিজস্ব সংগঠন ও গতিধারা আছে। এখন এই বিভিন্ন সেন্টিমেণ্টগুলির মধ্যে যদি পারস্পরিক সমন্বয়ন না থাকে তবে ব্যক্তির আচরণ পরস্পরবিরোধী ও অসংলগ্ন হয়ে ওঠে। সেইজন্য ব্যক্তিসত্তা বিকাশের শেষ স্তরে দেখা দেয় এই আত্মবোধের সেন্টিমেণ্ট যাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য সেন্টিমেণ্টগুলি একটি সুসংহত সংগঠন তৈরী করে। আত্মবোধের সেন্টিমেণ্ট জন্ম লাভ করে শিশুর অহংসত্তাকে কেন্দ্র করে। যেহেতু শিশুর অভিজ্ঞতার সকল

বস্তুই কোন না কোন দিক দিয়ে শিশুর অহংসত্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সেই হেতু শিশুর সব কটি সেন্টিমেণ্টই আত্মবোধের সেন্টিমেণ্টের কর্তৃত্ব ও পরিচালনার অধীনস্থ হয়ে পড়ে।

শিশুর অহংসত্তার সচেতনতা থেকেই এই আত্মবোধের সেন্টিমেণ্টটি জাগে। নবজাত শিশুর অহম্ সম্বন্ধে কোন বোধ থাকে না, কিন্তু যতই সে পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তু এবং ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে ততই সে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এবং ক্রমশ অন্যান্য সেন্টিমেণ্টের মতই তার সেই নিজস্ব সত্তাকে ঘিরে একটি গভীর ও স্থায়ী প্রক্ষোভমূলক সংগঠন গড়ে ওঠে।

আত্মবোধের সেন্টিমেণ্টটি মানসিক সংগঠনের কেন্দ্রস্বরূপ। বিভিন্নধর্ম্মী সেন্টিমেণ্টগুলির মধ্যে সংঘর্ষ দূর করে এই আত্মবোধের সেন্টিমেণ্টটিই তাদের মধ্যে সংহতি আনে এবং ব্যক্তির নৈতিকবোধের প্রধানতম নির্ণায়ক ও নির্দ্ধারক শক্তিরূপে কাজ করে থাকে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে এই আত্মবোধের সেন্টিমেণ্টটি শিশুর ব্যক্তিসত্তাগঠনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শক্তি। সুষ্ঠু ও বাঞ্ছিত মানসিক বিকাশের জন্য এই সেন্টিমেণ্টটির জাগরণ অত্যাবশ্যক। সেইজন্য যাতে যথাসময়ে এবং স্বাভাবিকভাবে শিশুর মধ্যে এই সেন্টিমেণ্টটি দেখা দেয় তার ব্যবস্থা করাই সমগ্র শিক্ষা প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য।

শিশুর মধ্যে সুষ্ঠু অহংবোধ জাগরণের দুটি দিক আছে। একটি শিশুর সহজাত শক্তি ও সম্ভাবনাগুলির অবাধ বিকাশ এবং তার আভ্যন্তরীণ চাহিদা ও ইচ্ছার তৃপ্তিসাধন আর দ্বিতীয়টি, তার সামাজিক সচেতনতার সুষ্ঠু জাগরণ ও পরিপুষ্টি।

এই উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষক-পিতামাতা প্রভৃতির অনেক কিছু করার আছে। শিশুর স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে যদি ব্যাহত করা যায়, যদি তার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেওয়া হয়, যদি কঠিন শাসনমূলক পরিস্থিতিতে তাকে মানুষ করা হয় তবে অনিবার্য্যরূপে তার অহংবোধের বিকাশ ব্যাহত হয়ে যায় এবং তার ফলে তার আত্মবোধের সেন্টিমেণ্টটি ভাল ভাবে জাগতে পারে না। পরিণত জীবনে এই সকল শিশু দুর্ব্বলমনা, অব্যবস্থচিত্ত ও উদ্যোগহীন ব্যক্তিরূপে বড় হয়ে ওঠে। অতএব শিশুর অহংবোধের অবাধিত বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন কোন ঘটনা বা পরিস্থিতি শিশুর জীবনে কখনই সৃষ্টি করা উচিত নয়।

এর পর আসে শিশুর সামাজিক সচেতনতার জাগরণের দিকটি। অহংবোধের সুষ্ঠু বিকাশের উপর শিশুর সামাজিক মনোভাবের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর অহম্ জাগে বাস্তবের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এবং এই প্রক্রিয়াটি পুরোপুরি সামাজিক। শিশু যতই অন্যান্য ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে এবং তাদের সঙ্গে আচরণ করে ততই তার এই সামাজিক বোধ জেগে ওঠে এবং সে নিজের অহম্ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। সে ধীরে ধীরে বুঝতে শেখে যে তার এই সত্তা আর সকলের সত্তা থেকে বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বসম্পন্ন একটি বস্তু।

কিন্তু এই অহম্‌বোধের জাগরণের সময় যদি শিশুর চতুষ্পার্শ্বের সামাজিক পরিবেশটি সত্যকারের সমাজধর্ম্মী না হয় তাহলে শিশুর অহমের বিকাশ হয়ে ওঠে একমুখী, সমতাহীন, অসম্পূর্ণ ও ত্রুটীময়। এইজন্য প্রয়োজন শিশুর চারপাশের সমাজটিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাতে শিশুর প্রতিক্রিয়াগুলি সামাজিক আদর্শ ও মানের অনুগামী হয়। বাড়ীতে বা স্কুলে যেখানে শিশুর প্রাথমিক আচরণগুলি অনুষ্ঠিত হয় সেখানে যাতে সত্যকারের সমাজধর্ম্মী পরিবেশের সাহায্য শিশু পায় সেদিকে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। স্কুলে যৌথ কর্ম্মপ্রচেষ্টা, খেলাধূলা, সম্মিলিত উদ্যোগ ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুদের উন্মেষকামী অহংসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ ও পরি-পোষণের ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রশ্নাবলী

1. Explain what is sentiment and how it contributes to the development of character. (B. T. 1953, 1956)

Ans. (পৃঃ ১৮৯—পৃঃ ১৯৪)

2. What is the Sentiment? How does a sentiment differ from an instinct? Indicate the place of Self-Regarding Sentiment in a healthy character. (B. A 1955, 1961)

Ans. (পৃঃ ১৮৯—পৃঃ ১৯৪)

3. What is a sentiment? Describe how the Self Regarding sentiment is formed. (B. A. 1954, 1957, 1963)

Ans. (পৃঃ ১৮৯—পৃঃ ১৯৪)

4. Distinguish between emotion and Sentiment. Discuss the importance of Self-Regarding Sentiment in education. (B. A. 1956)

Ans. (পৃঃ ১৮৯+পৃঃ ১৯২—পৃঃ ১৯৪)

বার

ব্যক্তিসত্তা (Personality)

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিত্ব সকলের থাকে না। বিশেষ সৌভাগ্যবান মুষ্টিমেয় কয়েকজনমাত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে জন্ম নেন এবং এই ব্যক্তিত্বের জোরেই জীবনে সাফল্য ও সম্মান অর্জ্জন করে থাকেন। সাধারণ মানুষ ব্যক্তিত্বরূপ মূল্যবান সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে এবং তার ফলে সারা জীবন কষ্ট ও সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাদের কাটাতে হয়। ব্যক্তিত্বের এই লৌকিক ব্যাখ্যাটি কিন্তু মনোবিজ্ঞানে গ্রাহ্য নয়। মনোবিজ্ঞানের সংব্যাখ্যানে প্রত্যেক মানুষই ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিসত্তার অধিকারী, তা সে ব্যক্তিসত্তা দুর্ব্বলই হোক বা সবলই হোক, সামাজিকই হোক বা অসামাজিক হোক, স্বাভাবিকই হোক বা অস্বাভাবিক হোক। ব্যক্তিসত্তা মানবমাত্রেরই অপরিহার্য্য বৈশিষ্ট্য, তবে বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিসত্তা বিভিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দেয়।

ব্যক্তিসত্তা বস্তুটির নিখুঁত সংজ্ঞা দেওয়া একপ্রকার অসম্ভব বললেই চলে। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের দেওয়া ব্যক্তিসত্তার উপরে বহু বিভিন্ন ও বিচিত্র সংজ্ঞার সন্ধান পাওয়া যায়। অলপোর্ট (Allport) তাঁর ব্যক্তিসত্তার উপর লিখিত গ্রন্থে ব্যক্তিসত্তার ৫০টি প্রচলিত সংজ্ঞার উল্লেখ করেছেন।

ব্যক্তিসত্তার সংজ্ঞা

অলপোর্ট প্রচলিত সমস্ত সংজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিসত্তার একটি ব্যাপক সংজ্ঞা তৈরী করেছেন। সেটি হল এই—

"ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে তার যে অনন্য সঙ্গতিবিধান সেই সঙ্গতিবিধানকে নির্দ্ধারণ করে যে সব জৈবমানসিক সত্তা, ব্যক্তির মধ্যে সেই সত্তাগুলির প্রগতিশীল সংগঠনের নামই ব্যক্তিসত্তা।"

এই সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা ব্যক্তিসত্তার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই। প্রথমত, ব্যক্তিসত্তা হল একটি চিরগতিশীল সংগঠন। সংগঠন বলতে বোঝায় যে ব্যক্তিসত্তা নিছক কতকগুলির উপাদানের যোগফল নয়, সেগুলির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফল। তাছাড়া এই সংগঠনও চিরস্থায়ী,

অপরিবর্ত্তনীয় ও অমোঘ নয়, এ হল সদাপরিবর্ত্তনশীল, ও নিয়ত বিকাশমান ও বর্দ্ধনধর্ম্মী। যখন এই সংগঠন যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় না তখনই অস্বাভাবিক ব্যক্তিসত্তা দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিসত্তার উপাদানগুলিকে জৈবমানসিক সংগঠন (Psychophysical System) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সংগঠন বলতে বোঝায় সক্রিয়ভাবে বা নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থিত একটি সংলক্ষণ বা একাধিক সংলক্ষণের সমষ্টি। জৈবমানসিক কথাটির অর্থ হল যে এই সংলক্ষণগুলি আংশিক মানসিক, আংশিক দৈহিক এবং দেহ ও মন উভয়ের প্রক্রিয়া থেকেই জন্ম নেয় ব্যক্তিসত্তা। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে ব্যক্তিসত্তা নিছক মানসিক বা নিছক দৈহিক কিছু নয়, উভয়ের মিশ্রণে তৈরী একটি সত্তাবিশেষ। ব্যক্তির অভ্যাস, বিশেষধর্ম্মী বা সাধারণধর্ম্মী মনোভাব, সেন্টিমেন্ট, অন্যান্য মানসিক সংগঠন ইত্যাদি বস্তুগুলি জৈবমানসিক সত্তার অন্তর্গত। তৃতীয়ত, ব্যক্তিসত্তা বলতে কোন ব্যক্তির আচরণ বা কাজকে বোঝায় না। বরং ব্যক্তির আচরণ বা কাজের পেছনে যে সত্তাটি আছে তাকেই ব্যক্তিসত্তা বলা যেতে পারে। ব্যক্তিসত্তা যে সব উপকরন দিয়ে তৈরী সেগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টাকে নির্দ্ধারিত করে। অবশ্য ব্যক্তির এই সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা থেকেই ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ জানা যায়। এইজন্য উপরের সংজ্ঞাতে ব্যবহৃত "নির্দ্ধারণ করে" ক্রিয়াটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চতুর্থত, ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে যে সব সঙ্গতি-বিধান করে তার প্রত্যেকটিই সময়, স্থান ও গুণের দিক দিয়ে অনন্য, অপরের সঙ্গে অতুলনীয়। সব শেষে, ব্যক্তিসত্তাই নির্দ্ধারিত করে পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টাকে। সঙ্গতিবিধান কথাটি কেবলমাত্র প্রক্রিয়া হিসাবেই সত্য নয়, বিবর্ত্তনের দিক দিয়েও সত্য। প্রাণী বিবর্ত্তনের মূল কথাই হল সঙ্গতিবিধান। ব্যক্তির ভৌগোলিক ও আচরণমূলক, উভয় প্রকার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি-বিধানের প্রয়াসমাত্রেই সৃষ্ট হয় তার ব্যক্তিসত্তার দ্বারা। এই দিক দিয়ে ব্যক্তিসত্তাকে ব্যক্তির আত্মসংরক্ষণের প্রণালীবিশেষ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে এ কথাটি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে অলপোর্ট তাঁর ব্যক্তিসত্তার সংজ্ঞায় সঙ্গতিবিধান প্রক্রিয়াটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। আর সেই সঙ্গে যে সব বৈশিষ্ট্য বা উপাদান এই ব্যক্তিসত্তার বিকাশে উপকরণরূপে কাজ করেছে সেগুলির মাধ্যমেই তিনি ব্যক্তিসত্তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই ব্যক্তিসত্তার উপাদানগুলির তিনি নাম দিয়েছেন সংলক্ষণ (traits)।

আবার অনেক মনোবিজ্ঞানী সম্পূর্ণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিসত্তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ফ্রয়েড এবং অন্যান্য মনঃসমীক্ষণবাদীদের নাম সর্ব্বাগ্রে করতে হয়। অলপোর্ট যেমন ব্যক্তিসত্তার ব্যাখ্যা করেছেন ব্যক্তিসত্তার উপাদান বা সংলক্ষণের বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে, ফ্রয়েড তেমনই ব্যাখ্যা করেছেন মানবমনের কর্ম্মপ্রেরণা বা প্রেষণার (Motive) দিক দিয়ে। ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুগামীরা ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে প্রথমে মানব আচরণের উৎস বা প্রেষণার অনুসন্ধান করেছেন এবং সেই প্রেষণার বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে ব্যক্তিসত্তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মানুষের প্রেষণামূলক শক্তি হল লিবিডো। লিবিডো হল আবার যৌনধর্ম্মী এবং শিশুর জন্মের পর থেকেই এই লিবিডো নানা যৌনমূলক পরিণতির মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয় এবং শেষে তার পূর্ণতায় গিয়ে পৌঁছয়। শিশুর ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তার লিবিডোর শৈশবকালীন পরিভ্রমণের উপর এবং ব্যক্তিসত্তার বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য, স্বাভাবিকতা, অস্বাভাবিকতা সবই চরমভাবে নির্দ্ধারিত হয় এই লিবিডোর ক্রমবিকাশের প্রকৃতির দ্বারা। এইজন্যই মনঃসমীক্ষকদের মতে ব্যক্তিসত্তার বিকাশে শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার মূল্য এত বেশী।

ব্যক্তিসত্তার বিকাশ

শিশু জন্মের সময় কোনরূপ ব্যক্তিসত্তা নিয়ে জন্মায় না। তার মধ্যে থাকে কেবল বহুমুখী বৃদ্ধি প্রচেষ্টা এবং সেই বৃদ্ধি প্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপায়িত করার উপযোগী নানা প্রকৃতির সাজসরঞ্জাম। তার দৈহিক, মানসিক প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিকগুলি নিছক সম্ভাবনার রূপ নিয়ে তার মধ্যে নিহিত থাকে। তেমনি অপর পক্ষে জন্মের মুহূর্ত্ত থেকেই তার উপর ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে পরিবেশের বিভিন্ন ও বিচিত্র শক্তিগুলি। একদিকে শিশুর বহুমুখী বৃদ্ধি-প্রচেষ্টা আর একদিকে পরিবেশের বিভিন্ন শক্তি—এ দুয়ের মধ্যে যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া চলে তাই থেকে জন্ম লাভ করে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা।

এই ব্যক্তিসত্তার গঠন কোনদিনই সম্পূর্ণ বা শেষ হয় না। পরিবেশের বৈচিত্র্য ও পরিবর্ত্তন অনুযায়ী ব্যক্তিসত্তার মধ্যেও সতত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন দেখা দেয়। এক কথায় ব্যক্তিসত্তা স্থির বা নিশ্চল কোন বস্তু নয়, ব্যক্তিসত্তা সদা বিকাশমান, পরিবর্ত্তনশীল ও গতিধর্ম্মী।

যদিও পরিবর্ত্তনশীল তবুও প্রত্যেকের ব্যক্তিসত্তার মধ্যে একটা মূলগত স্থায়িত্ব আছে এবং সেটার উপর ভিত্তি করেই আমরা কারও ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে ধারণা করে থাকি। এই স্থায়িত্বটুকু না থাকলে আমাদের পক্ষে কারও ব্যক্তিসত্তা নিয়ে আলোচনা করাও সম্ভব হত না।

ব্যক্তিসত্তার বিকাশে দুটি প্রক্রিয়া বিশেষভাবে কার্য্যকরী। সেগুলি হল বিভেদীভবন (Differentiation) ও সমন্বয়ন (Integration)।

বিভেদীভবন (Differentiation)

শিশু যখন জন্মায় তখন সে স্বতন্ত্রভাবে কোন বিশেষ একটি আচরণ করতে জানে না। সে আচরণ করে তার সর্ব্বদেহ দিয়ে। বয়স্কদের যেমন বিভিন্ন আচরণধারার মধ্যে বিভেদরেখা আছে এবং তার ফলেই তারা বিভিন্ন আচরণ স্বতন্ত্রভাবে করতে পারে। নবজাত শিশুর আচরণধারাগুলির মধ্যে তেমন কোন সুদৃঢ় সীমারেখা না থাকায় এবং সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ হওয়ায় তার সব আচরণই সামগ্রিক প্রকৃতির। শিশু যত বড় হতে থাকে তত তার আচরণগুলি ধীরে ধীরে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে এবং সেই সঙ্গে তার আচরণও হয়ে ওঠে অনেক বেশী নিখুঁত, নির্ভুল ও কার্য্যকরী। সে বিশেষ উদ্দীপককে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিতে শেখে। এই প্রক্রিয়াটিকেই বিভেদীভবন বলা হয়। ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে এই প্রক্রিয়া হল প্রাথমিক ভিত্তিস্বরূপ।

সমন্বয়ন (Integration)

ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে সমন্বয়ন প্রক্রিয়াটি হল দ্বিতীয় ভিত্তিস্বরূপ এবং এই প্রক্রিয়ার উপরেই ব্যক্তিসত্তার সম্পূর্ণ প্রাসাদটি প্রতিষ্ঠিত। যে সব বৈশিষ্ট্য ও উপকরণ নিয়ে শিশু জন্মায় সেগুলি ক্রমশ পরিবেশের সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন মানসিক সংগঠনের রূপ গ্রহণ করে। প্রথম শৈশবে এই সংগঠনগুলি থাকে বিশৃঙ্খল ও অসংহত অবস্থায়। শিশু যত বড় হয় তত সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুশৃঙ্খল ব্যাপকতর সংগঠনের আকার নেয়। একেই সমন্বয়ন প্রক্রিয়া বলা হয়। এই সমন্বয়ন প্রক্রিয়াও আবার একেবারে সংঘটিত হয় না। বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সমন্বয়ন ঘটতে ঘটতে সবশেষে ব্যক্তিসত্তার সৃষ্টিতে গিয়ে সমন্বয়নের শেষ হয়।

যে স্তরগুলির মধ্যে দিয়ে সমন্বয়ন প্রক্রিয়া অগ্রসর হয় সেগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল। ২০৯ পাতার চিত্রটি দ্রষ্টব্য।

অনুবর্ত্তিত রিফ্লেক্স

শিশুর প্রথম শেখা বলতে বোঝায় সেই সব রিফ্লেক্সগুলি যেগুলি শিশু অনুবর্ত্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শেখে। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে শিশু নির্দ্ধারিত উদ্দীপকের পরিবর্ত্তে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিতে সমর্থ হয়। এই অনুবর্ত্তিত রিফ্লেক্সগুলিই হল সহজতম সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা এবং এইগুলির সাহায্যেই শিশু প্রথম পরিবর্ত্তিত বা নতুন উদ্দীপকের প্রতি সাফল্যের সঙ্গে সাড়া দিতে পারে।

অভ্যাস

প্রথম অবস্থায় এই অনুবর্ত্তিত প্রতিক্রিয়াগুলি অসংহত ও অসংবদ্ধ অবস্থায় থাকে। পরে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে সমন্বয়ন দেখা দেয় এবং তাই থেকেই সৃষ্টি হয় অভ্যাস। একই উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে অপরিবর্ত্তিত এবং গতানুগতিক সাড়া দেওয়াকেই অভ্যাস বলে। এই অভ্যাসের সৃষ্টিকেই সমন্বয়নের প্রথম স্তর বলা যেতে পারে।

সংলক্ষণ

সমন্বয়নের দ্বিতীয় স্তরে সৃষ্টি হয় নানা ধরনের মানসিক সংগঠন। এগুলি যেমন মোটামুটিভাবে স্থায়ী এবং অপরিবর্ত্তনীয় তেমনি আর এক দিক দিয়ে এগুলি ব্যক্তির আচরণের প্রকৃতি এবং গতিপথ দুই নির্ণয় করে। মানসিক সংগঠন অনেক প্রকারের হতে পারে। যেমন, মনোভাব, সেন্টিমেণ্ট, কমপ্লেক্স, আগ্রহ ইত্যাদি। এই মানসিক সংগঠনগুলি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির আচরণেও সংহতি ও শৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সংগঠনগুলিকেই ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ বলা হয় এবং এইগুলিই প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তিসত্তার একক।

অহংসত্তাবলী

সমন্বয়নের পরবর্ত্তী স্তরে এই সংলক্ষণগুলির মধ্যে ধীরে ধীরে সংহতিপূর্ণ সম্পর্ক দেখা দেয়। এই সংহতি প্রথমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে।

এই ধরনের বিশেষ বিশেষ সংহতির ধারাকে কেন্দ্র করে এক একটি স্বতন্ত্র অহংসত্তার জন্ম হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির মধ্যে অহংবোধ দেখা দিলেও সেই অহংবোধ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকৃতি নিয়ে প্রকাশ পায়।

ব্যক্তিসত্তা

এইটিই সমন্বয়নের শেষ স্তর। বিভিন্ন স্বতন্ত্র অহংসত্তাগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি একক অহংসত্তার সৃষ্টি করে। এই পর্য্যায়ে পারিবেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্য ব্যক্তির মধ্যে যত বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া জন্ম নিয়েছিল সে সবগুলির মধ্যে একটি সংহতি দেখা দেয় এবং ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া একটি সামগ্রিক সুসংহত অর্থপূর্ণ রূপ ধারণ করে। এই সমন্বয়নের স্তরেই ব্যক্তিসত্তার বিকাশ তার পূর্ণ পরিণতিতে গিয়ে পৌছয়।

ব্যক্তিসত্তার বিকাশের সময়গত স্তর

ব্যক্তিসত্তার এই ধারাবাহিক ক্রমবিকাশকে ব্যক্তির সময়গত বয়সের দিক দিয়ে সমন্বয়নের বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। শিশুর জন্মের অব্যবহিত পর থেকেই তার অনুবর্ত্তিত প্রতিক্রিয়াগুলির গঠন সুরু হয়। খাওয়া শোওয়া, চলা, কথা বলা জিনিষের নাম শেখা ইত্যাদি কাজগুলি শিশু শেখে অনুবর্ত্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

তার পরের ধাপে শিশু যখন বড় হয়, যাকে আমরা নার্সারী বা প্রাক্‌বিদ্যালয় স্তর বলতে পারি, তখন শিশুর মধ্যে নানা অভ্যাসগঠন সুরু হয়। ভাষা আয়ত্ত করা, প্রাথমিক আচরণগুলি অনুষ্ঠান করা, সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণ করতে শেখা ইত্যাদি নানা অভ্যাস শিশুর মধ্যে ধীরে ধীরে দেখা দেয়। এই সময় শিশুর ব্যক্তিসত্তাগঠনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে তার পরিবার ও পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরা, বিশেষ করে তার মা বাবা ভাই বোন প্রভৃতি।

এর পরের স্তরে শিশুর বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলি ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করে এবং শিশুর মধ্যে সৃষ্টি হয় সেন্টিমেণ্ট, মনোভাব, আগ্রহ, কম্‌প্লেক্স প্রভৃতি নানা ধরনের মানসিক সংগঠন। বিশেষ বিশেষ বস্তু ও ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে শিশুর অনুরাগ বিরাগ, আসক্তি, ঘৃণা, ভালবাসা প্রভৃতি সংগঠিত হয় এবং তার আচরণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষধর্মী ও সুনির্দ্দিষ্ট হয়ে ওঠে। এই

স্তরে শিশু বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং স্কুল, সহপাঠী, বন্ধু, শিক্ষক প্রভৃতি তার ব্যক্তিসত্তার গঠনকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে।

এর পরের স্তরটি হল যৌবনাগমের স্তর। এই সময় শিশুর বিভিন্ন সংগঠনগুলি ধীরে ধীরে সুসংহত হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যে অহংবোধ দেখা দেয়। কিন্তু তখনও তার অহংবোধের মধ্যে পূর্ণ সংহতির অভাব থাকে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তার অহং ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। এই স্তরে শিশুর ব্যক্তিসত্তার গঠনে তার বহির্জগতের চেয়ে তার মনোজগতের প্রভাবই অনেক বেশী। নতুন নতুন ধারণা, আগ্রহ, মনোভাব, আশা ও কল্পনা তার মানসিক সমন্বয়নকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

যৌবনাগমের শেষে শিশুর আসে সব দিক দিয়ে পরিণতি। এই সময়ে তার ব্যক্তিসত্তাও তার পূর্ণতায় গিয়ে পৌছয়। বহির্জগতের বহুবিধ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ সকল প্রকার প্রতিক্রিয়াই ধীরে ধীরে একটি সুসংহত, সুসমঞ্জস ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ ধারণ করে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক, নাগরিক কর্ত্তব্য, দাম্পত্য জীবন,জীবিকা অর্জ্জন, বিনোদনমূলক কাজকর্ম্ম প্রভৃতি বিচিত্র অভিজ্ঞতাসমষ্টির মধ্য দিয়ে ব্যক্তসত্তা পূর্ণপরিণতি লাভ করে।

ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ (Personality Traits)

শিশুর বহুমুখী বৃদ্ধি প্রচেষ্টা পরিবেশের সংস্পর্শে এসে তার মধ্যে নানা বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করে। এগুলিকে ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ (Personality Traits) বলা হয়। এই সংলক্ষণগুলি মনের দিক দিয়ে কোন বিশেষ মনোভাব বা কোন দৃঢ়বদ্ধ ধারণার রূপ নেয় এবং যখন তারা সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন তারা বিশেষ সুনির্দ্দিষ্ট আচরণ ধারায় পর্য্যবসিত হয়। যেমন, সামাজিকতা (sociability) একটি ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ। এটি মনের দিক দিয়ে অপরের প্রতি সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ ও প্রীতিময় মনোভাবের সৃষ্টি করে থাকে। আবার এই বৈশিষ্ট্যটি আচরণের দিক দিয়ে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গকামনার প্রচেষ্টার রূপ নেয়। এইরূপ সমস্ত ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণেরই একটি মানসিক এবং একটি আচরণমূলক দিক আছে। এইজন্য এগুলিকে জৈব-মানসিক (Psycho-physical) সত্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলি সহজাত প্রবণতা ও পারিবেশিক শক্তি এ দুইয়ের সংঘাতের ফল থেকে জন্মায়। যদিও কোন সংলক্ষণই চিরস্থায়ী বা একেবারে অচঞ্চল নয়, তবু এগুলি মোটামুটিভাবে স্থায়ী ও অপরিবর্ত্তনধর্ম্মী এবং এদের দ্বারা প্রসূত আচরণের মধ্যে বেশ সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি থাকে।

ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলিকে আমরা ব্যক্তিসত্তার একক বলে বর্ণনা করতে পারি। এগুলির দ্বারাই ব্যক্তিসত্তা গঠিত। তবে কেবলমাত্র সংলক্ষণগুলির সমষ্টি বা যোগফলকে ব্যক্তিসত্তা বলে মনে করলে ভুল হবে। ব্যক্তিসত্তা হল এই সংলক্ষণগুলির নিছক সমষ্টির উপরেও আরো কিছু। ব্যক্তিসত্তা বলতে আমরা যে বস্তুটিকে বুঝি সেটি প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ পায় এই বিভিন্নধর্ম্মী সংলক্ষণগুলির সংগঠন থেকে। অর্থাৎ সংলক্ষণগুলি পরস্পরের সঙ্গে সঙ্গবদ্ধ হয়ে যে সমগ্র ও সুসংহত সত্তাটির জন্ম দেয় তাকেই ব্যক্তিসত্তা বলা হয়ে থাকে।

ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলির একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলির পরিকল্পনা সামাজিক পরিমাপনের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ যখন আমরা কোন লোককে গম্ভীর বা আমুদে বা স্বার্থপর বা বন্ধুবৎসল বলে বর্ণনা করি তখন আমাদের মন্তব্যের পেছনে থাকে সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে সচেতনতা। এমন কি ব্যক্তিসত্তার পরিকল্পনাটিই পুরোপুরি সামাজিক সংব্যাখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে একজন ব্যক্তি কি তা আমরা জানিনা বা জানতে চাইও না। আমরা তাকে বিচার করি সে কি ভাবে নিজেকে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করছে তাই থেকে। কোন লোক যদি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তবে তাকে আমরা অভদ্র বা অমার্জ্জিত বলে বর্ণনা করি, প্রকৃতপক্ষে সে কি তা জানার প্রয়োজনীয়তা আমাদের হয় না। ইংরাজী পার্সোনালিটি কথাটির উৎপত্তি গ্রীক শব্দ পার্সোনা (Persona) থেকে। পার্সোনা মানে মুখোস যা গ্রীক অভিনেতারা দর্শকদের নিকট নিজেদের পরিচয় জানাবার জন্য পরত। অতএব পর্সোনালিটি কথার অর্থ হল ব্যক্তি যেভাবে নিজেকে অপরের নিকট জানায় তাই।

ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এগুলির দ্বৈততা (duality), অর্থাৎ অধিকাংশ সংলক্ষণই দ্বিমুখী সত্তাবিশিষ্ট। যেমন সামাজিকতা—অসামাজিকতা, প্রাধান্য—বশ্যতা, অন্তর্বৃততা—বহির্বৃততা ইত্যাদি। কোন সংলক্ষণটিই চরম অবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে থাকে না অর্থাৎ পুরো সামাজিক বা

পুরো অসামাজিক কোন লোকই হয় না, তবে ব্যক্তির মধ্যে সামাজিকতার লক্ষণ অধিক পরিমাণে থাকলে তাকে সামাজিক বলা হয় এবং অসামাজিকতার লক্ষণ বেশী থাকলে তাকে অসামাজিক বলা হয়।

গিলফোর্ডের ফ্যাক্টর

ব্যক্তির আচরণ পর্য্যবেক্ষণ থেকেই ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলির স্বরূপ নির্ণয় করা হয় কিন্তু সম্প্রতি উপাদান-বিশ্লেষণ (Factor Analysis) নামক গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে আরও নিখুঁতভাবে ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলির প্রকৃতি নির্ণয় করার চেষ্টা হচ্ছে। এই ধরনের ফ্যাক্টর এ্যানালিসিস্ প্রক্রিয়ার সাহায্যে গিলফোর্ড ও তাঁর সহকর্মীরা ব্যক্তিসত্তার ১৩টি ফ্যাক্টরের সন্ধান পেয়েছেন। যথা— ১। সামাজিক অন্তর্বৃতি (Social introversion), ২। চিন্তামূলক অন্তর্বৃতি (Thinking introversion), ৩। বিষণ্ণতা (Depression), ৪। অস্থিরচিত্ততা (Cycloid tendency), ৫। চিন্তাহীনতা (Rhathymia), ৬। সাধারণ সক্রিয়তা (General activity), ৭। প্রাধান্য—বশ্যতা (Ascendance-Submission), ৮। পৌরুষ—নারীত্ব (Masculinity—Feminity) ৯। হীনতা (Inferiority), ১০। স্নায়ুদুর্ব্বলতা (Nervousness) ১১। বিষয়-মূর্খতা (Objectivity) ১২। সহযোগিতা (Co-operativeness) ১৩। অমায়িকতা (Agreeableness)।

ক্যাটেলের সংলক্ষণ তালিকা

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ক্যাটেলও (Cattel) ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণের একটি তালিকা দিয়েছেন। তিনি সংলক্ষণ নির্ণয়ের জন্য নানা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। ক্যাটেল ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণকে দুশ্রেণীতে ভাগ করেছেন, বাহ্যিক সংলক্ষণ (Surface traits) এবং উৎস সংলক্ষণ (Source traits)। বাহ্যিক সংলক্ষণ বলতে সেই সব সংলক্ষণকে বোঝায় যেগুলি ব্যক্তির আচরণে সরাসরি প্রকাশ পায়। যেমন আবেগশীলতা হল একটি বাহ্যিক সংলক্ষণ। কোন ব্যক্তি যদি এই সংলক্ষণটির অধিকারী হয় তাহলে তা তার বাহ্যিক আচরণেই প্রকাশ পাবে। উৎস সংলক্ষণগুলি ব্যক্তির ভিতরে নিহিত থাকে, বাইরে থেকে প্রকাশ পায় না, কিন্তু সেগুলি ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং তার বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন, প্রভূত্বপ্রিয়তা একটি উৎস

সংলক্ষণ। এটি সরাসরি কোন আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় না, যদিও তার বহু আচরণের প্রকৃতি এই সংলক্ষণের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে। ক্যাটেল তাঁর পরীক্ষণের ফলাফল থেকে ১২টি উৎস সংলক্ষণ এবং ২০টি বাহ্যিক সংলক্ষণের নাম নাম দিয়েছেন।

এর পরে ক্যাটেল ফ্যাক্টর এ্যানালিসিস পদ্ধতির প্রয়োগ করে ১৬টি ফ্যাক্টরের সন্ধান পান। তাঁর বর্ণিত ১২টি উৎস সংলক্ষণের সঙ্গে আরও চারটি সংলক্ষণ যোগ করে এই ফ্যাক্টরের তালিকাটি তিনি তৈরী করেন। ক্যাটেলের দেওয়া তালিকাটিতে প্রায় প্রতিটি ফ্যাক্টরের ছুটি করে বিপরীতধর্ম্মী সংলক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—

১। প্রাক্ষোভিক চরমভাব—প্রাক্ষোভিক সংযতভাব (Cyclothymia—Schizothymia)

২। বুদ্ধি—বুদ্ধিহীনতা (General Intellgence—Mental Defect)

৩। প্রাক্ষোভিক স্থায়িত্ব—সাধারণ মনোবিকার (Emotional stability—General neuroticism)

৪। প্রভুত্ব—বশ্যতা (Dominance—Submission).

৫। উচ্ছ্বাসপ্রবণতা—সংযত অভিব্যক্তি (Surgency—Desurgency).

৬। পরিণত চরিত্র—অপরিণত নির্ভরপ্রবণ চরিত্র (Positive character—Immature dependent character).

৭। ছুঃসাহসিক সক্রিয়তা—অন্তর্বৃত্তি (Adventurousness—Introversion).

৮। প্রক্ষোভমূলক অনুভূতিপ্রবণতা—সুকঠিন পরিপক্কতা (Emotional Sensitivity—Tough Maturity).

৯। সন্দিগ্ধমনা চাপা—বিশ্বাসপরায়ণ খোলা মন (Paranoid schizothymia—Trustful accessibility).

১০। দায়িত্বহীন অসাংসারিকতা—ব্যবহারিক সচেতনতা (Bohemianism—Practical concernedness).

১১। কৃত্রিমতা—সরলতা (Sofistication—Simplicity).

১২। সন্দিগ্ধচিত্ততা—বিশ্বাসপ্রবণতা (Suspiciousness—Trustfulness).

১৩। পরিবর্ত্তনপ্রিয়তা—রক্ষণশীলতা (Radicalism—Conservatism).

১৪। আত্মনির্ভরতা—সংকল্পের অভাব (Self-sufficiency—Lack of resolution)

১৫। ইচ্ছানিয়ন্ত্রণ এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা (Will control and character stability).

১৬। স্নায়বিক উত্তেজনা (Nervous tension).

ব্যক্তিসত্তার টাইপ (Personality Type)

বহু প্রাচীন কাল থেকেই ব্যক্তিসত্তা পরিমাপনের প্রচেষ্টা হয়ে এসেছে। প্রাচীন পরিমাপনের প্রচেষ্টাগুলি প্রধানত দুটি বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রথম দেহগত বৈশিষ্ট্য এবং দ্বিতীয় মনঃপ্রকৃতির (temperament) বিভিন্নতা।

দেহের গঠন, বিশেষ করে হাত, পা, মুখ ইত্যাদির গঠন বৈচিত্র্য অনুযায়ী ব্যক্তিসত্তার শ্রেণীবিভাগ করা হত। যেমন মহাভারতে ছদ্মবেশী অর্জ্জুনের বর্ণনায় দেখা যায় যে আজানুলম্বিত বাহু, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা ইত্যাদি প্রতিভাবান পুরুষের লক্ষণ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। দেহগত বৈশিষ্ট্য বা মনঃপ্রকৃতির বিভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তিসত্তার যে শ্রেণীবিভাগ তাকে সাধারণত টাইপ (type) বলা হয়ে থাকে।

এই ধরনের যে তত্ত্বটি সর্ব্বপ্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করে সেটি হল গলের (Gall মস্তিষ্কতত্ত্ব (Phrenology)। গলের মতে মনের শক্তিগুলির মস্তিষ্কে বিশেষ বিশেষ স্থানে অবস্থিত এবং মাথার খুলির গঠন থেকে বলা যায় যে কার কোন্ শক্তিটি কি পরিমাণে আছে। এই তত্ত্বটি পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক, কল্পনাপ্রসূত এবং বর্ত্তমানে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীতে এই ধরনের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিসত্তার টাইপের নানা বিভাগ দেন ইয়ুং (Jung), ক্রেৎসমার (Kretschmer), সেলডন (Sheldon), ষ্টিভেন্স (Stevens) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা। এই ধরনের কয়েকটি ব্যক্তিসত্তার টাইপের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

ইয়ুঙের টাইপ (Jung's Types)

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং (Jung) ব্যক্তিসত্তার একটি টাইপমূলক শ্রেণীবিভাগ করেছেন। তিনি সমস্ত মানুষকেই দুভাগে ভাগ করেছেন—অন্তর্বৃত (introvert)

ব্যক্তিসত্তা-সম্পন্ন এবং বহির্বৃত (extrovert) ব্যক্তিসত্তা-সম্পন্ন। ব্যক্তির প্রাণশক্তি (libido) যখন বাইরের দিকে উদ্দিষ্ট হয় অর্থাৎ যখন বাইরের বস্তু, লোকজন, কাজকর্ম্ম প্রভৃতিতে তার প্রাণশক্তি তৃপ্তি খুঁজে পায় তখন তার ব্যক্তিসত্তাকে বহির্বৃত বলা হয়। আর যখন তার প্রাণশক্তি অন্তরাভিমুখী হয় অর্থাৎ যখন দিবাস্বপ্ন, অবাস্তব কল্পনা, আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা প্রভৃতিতেই তার সমস্ত শক্তি ব্যাপৃত থাকে তখন তার ব্যক্তিসত্তাকে অন্তর্বৃত বলা হয়। মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে ইয়ুং এই দুভাগে ভাগ করলেও এই ধরনের সুনির্দ্দিষ্ট বিভাগ বাস্তবে পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা হল এ দুধরনেরই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মিশ্রপ্রকৃতির ব্যক্তি। তবে কারও মধ্যে অন্তর্বৃতির মাত্রা বেশী থাকে আবার কারও মধ্যে বহির্বৃতির মাত্রা থাকে বেশী। সম্পূর্ণ অন্তর্বৃত বা সম্পূর্ণ বহির্বৃত এ দুই কাল্পনিক চরম উদাহরণের ঠিক মাঝখানে আমরা ধরে নিতে পারি এমন ব্যক্তির অস্তিত্ব যার ব্যক্তিত্ব অর্দ্ধেক অন্তর্বৃত এবং অর্দ্ধেক বহির্বৃত। এই ধরনের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোককে আমরা উভবৃত (ambivert) বলতে পারি। বাস্তবে এই উভবৃত ব্যক্তিসম্পন্ন লোকও বহু পাওয়া যায়। এঁদের বৈশিষ্ট্য হল যে এঁরা বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে অন্তর্বৃত, আবার বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বহির্বৃত হয়ে দাঁড়ান।

ক্রেৎসমারের টাইপ (Kretschmer's Types)

ক্রেৎসমার ছিলেন একজন মানসিক ব্যাধির চিকিৎসক। তিনি পর্য্যবেক্ষণ করে দেখেন যে বিশেষ বিশেষ মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীদের বিশেষ বিশেষ দৈহিক বৈশিষ্ট্য থেকে থাকে। যেমন যারা সিজোফ্রেনিয়া রোগে আক্রান্ত তারা প্রায়ই লম্বা, রোগা, ওজনে হাল্কা ও সরু মুখসম্পন্ন ব্যক্তি হয়। আবার যারা ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ্ রোগের রোগী, তারা খর্ব্বকায়, মোটাসোটা ও গোলাকার মুখবিশিষ্ট হয়ে থাকে। এর পর ক্রেৎসমার সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে পর্য্যবেক্ষণ সুরু করেন এবং দীর্ঘ পর্য্যবেক্ষণের পর একটি নতুন ধরনের টাইপের শ্রেণীবিভাগ সৃষ্টি করেন।

তাঁর মতে সমস্ত মানুষকে চার ধরনের টাইপে ভাগ করা যায়, পিকনিক (Pyknik), এস্থেনিক (Aesthenic), হাইপোপ্লাষ্টিক (Hypoplastic), এবং এথলেটিক (Athletic)। এই চার ধরনের টাইপেরই সুনিদ্দিষ্ট দৈহিক ও

মানসিক বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, পিকনিক টাইপের ব্যক্তি দেখতে খর্ব্বকায়, মোটাসোটা এবং গোলাকার দেহবিশিষ্ট হয়। মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এঁদের সাইক্লোথিম (Cyclothyme) বলা হয়। এঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এঁরা প্রক্ষোভের দিক দিয়ে চরমভাবাপন্ন, অর্থাৎ যখন উত্তেজিত হন তখন অত্যন্ত বেশী মাত্রায় হন আর যখন নিরুৎসাহ হন তখনও চরমভাবে হন। এঁরা সহজেই আনন্দিত, আবার সহজেই বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। প্রকৃতিতে এঁরা মিশুকে, আবেগ-প্রবণ, বাস্তববাদী এবং সহিষ্ণু হন। এই সাইক্লোথিম শ্রেণীভুক্ত লোকেরা মানসিক বিকারগ্রস্ত হলে ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ রোগগ্রস্ত হন। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী উইনষ্টন চার্চিল, রাশিয়ার জননেতা ক্রুশ্চেভ প্রভৃতি হলেন পিকনিক-সাইক্লোথিম টাইপের আদর্শ দৃষ্টান্ত।

এস্থেনিকেরা আকৃতিতে দীর্ঘকায়, হাল্কা ও রোগা হয়ে থাকেন। মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এঁদের সিজোথিম (schizothyme) বলা হয়। প্রক্ষোভের সৃষ্টি ও প্রকাশে এঁরা খুবই সংযত এবং প্রকৃতিতে এঁরা স্বাবলম্বী, সতর্ক, আদর্শ-বাদী, অসহিষ্ণু ও রুক্ষ হয়ে থাকেন। এঁরা প্রায়ই বাস্তব থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের অবাস্তব কল্পনার রাজ্যে আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এই সিজোথিম শ্রেণী-ভুক্ত লোকেরাই যখন মানসিক বিকারগ্রস্ত হন তখন তাঁদের মধ্যে সিজোফ্রেনিয়া রোগ দেখা দেয়। রাজা গোপালাচারী, কৃপালনী, জহরলাল, ইংলণ্ডের ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস প্রভৃতি হলেন এই টাইপের দৃষ্টান্ত।

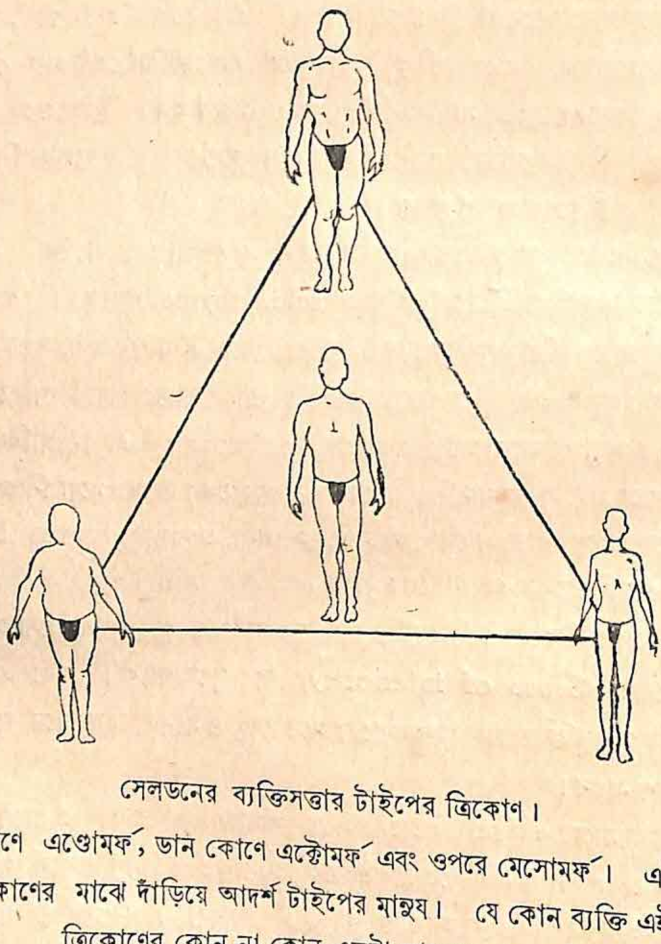
হাইপোপ্লাষ্টিকদের দৈহিক বৃদ্ধি অপরিণত অবস্থায় থাকে এবং সেইজন্য তারা হীনতাবোধ (Sense of inferiority) থেকে ভুগে থাকে। যারা এথলেটিক টাইপের অন্তর্ভুক্ত তারাই ক্রেৎসমারের মতে দেহ ও মনের দিক দিয়ে স্বাভাবিক ও আদর্শ মানুষ।

ক্রেৎসমারের এই শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে সাধারণ অভিজ্ঞতা ও ধারণার যথেষ্ট মিল আছে। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগকে সুনির্দ্দিষ্ট ও নিখুঁত বলে মেনে নিতে অনেক মনোবিজ্ঞানীরই আপত্তি আছে। কেননা এ ধরনের সুনির্দ্দিষ্ট শ্রেণী বিভাগ সত্যকার মানুষের মধ্যে দেখা যায় না।

সেলডনের টাইপ (Sheldon's Types)

ক্রেৎসমারের মত ব্যক্তিসত্তার টাইপ নিয়ে আধুনিককালে ব্যাপক গবেষণা চালান সেলডন (Sheldon) এবং ষ্টিভেন্স (Stevens)। তাঁরা প্রায় ৪০০ যুবকের

নগ্নদেহ ছবি পর্য্যবেক্ষণ করে তিনটি টাইপের নামকরণ করেন। যথা (১) এণ্ডোমর্ফ (Endomorph), এঁরা আকৃতিতে গোলাকার, কোমলদেহ এবং উদরপ্রদেশের প্রাধান্যসম্পন্ন। (২) মেসোমর্ফ (Mesomorph), এঁরা প্রশস্ত স্কন্ধবিশিষ্ট, কঠিন এবং পেশীর প্রাধান্যসম্পন্ন, এবং (৩) এক্টোমর্ফ (Ectomorph), এঁরা দুর্ব্বল দেহবিশিষ্ট, শীর্ণ এবং চর্ম্ম ও স্নায়ুর প্রাধান্যসম্পন্ন।

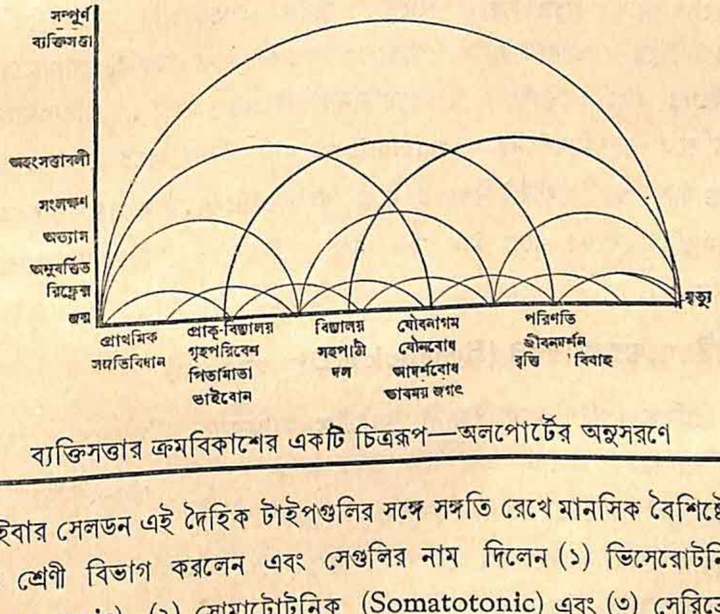


সেলডনের ব্যক্তিসত্তার টাইপের ত্রিকোণ।

বাঁ কোণে এণ্ডোমর্ফ, ডান কোণে এক্টোমর্ফ এবং ওপরে মেসোমর্ফ। এই তিন কোণের মাঝে দাঁড়িয়ে আদর্শ টাইপের মানুষ। যে কোন ব্যক্তি এই ত্রিকোণের কোন না কোন একটা জায়গায় পড়বেনই।

সেলডন প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি সাত মাত্রার স্কেলে (২১২র পাতা দেখ)। পরিমাপ করেন। যে চরম এণ্ডোমর্ফ তার স্কোর দাঁড়াচ্ছে ৭১১ (অর্থাৎ এণ্ডোমর্ফিতে তার স্কোর ৭ মাত্রা, মেসোমর্ফিতে ১, এক্টোমর্ফিতে ১), চরম মেসোমর্ফের

স্কোর হল ১৭১ (অর্থাৎ এণ্ডোমর্ফিতে তার স্কোর ১ মাত্রা, মেসোমর্ফিতে ৭, এক্টো-মর্ফিতে ১) এবং চরম এক্টোমর্ফের স্কোর হচ্ছে ১১৭ (অর্থাৎ এণ্ডোমর্ফিতে তার স্কোর ১ মাত্রা, মেসোমর্ফিতে ১, এক্টোমর্ফিতে ৭)। বাস্তবে অবশ্য এই ধরনের চরম দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় না। প্রকৃত হিসাব ধরতে গেলে সাধারণ মানুষের স্কোর ৪৪৪ এর কাছাকাছি দাঁড়ায়। কিন্তু বাস্তবে যা দেখা যায় তাতে কোন একটি বিশেষ টাইপের দিকে প্রত্যেক ব্যক্তির কিছুটা ঝোঁক আছে এবং অন্য দুটির প্রতি কম ঝোঁক থাকে। ফলে ৫২৩ বা ২৫১ বা ১৩৫ এই ধরনের স্কোরই সাধারণ ক্ষেত্রে বেশী দেখা যায়। কোন ব্যক্তির এই দৈহিক পরিমাপনকে তার সোমাটোটাইপ নাম দেওয়া হয়েছে।



ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের একটি চিত্ররূপ—অলপোর্টের অনুসরণে

এইবার সেলডন এই দৈহিক টাইপগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানসিক বৈশিষ্ট্যের তিনটি শ্রেণী বিভাগ করলেন এবং সেগুলির নাম দিলেন (১) ভিসেরোটনিক (Viscerotonic), (২) সোমাটোটনিক (Somatotonic) এবং (৩) সেরিব্রো-টনিক (Cerebrotonic)। এই মানসিক টাইপগুলির প্রত্যেকটির তিনি ২০টি করে বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দেশ করে দিলেন।

ভিসেরোটনিকদের মধ্যে পরিপাচনমূলক ও বৃদ্ধিমূলক কার্য্যের প্রাধান্য থাকে এঁরা দৈহিক আরামপ্রিয় হন, উৎসব, হৈ চৈ, বাহ্যিক অভিব্যক্তি ভালবাসেন এবং একা থাকা পছন্দ করেন না। এঁরা সহিষ্ণু হন, স্নেহ, প্রশংসা ও মনোযোগের প্রত্যাশী হন এবং মনের আবেগ বিনা বাধায় প্রকাশ করেন।

সোমাটোটনিকদের মধ্যে উদ্যমশীল ও প্রচেষ্টামূলক কার্য্যের প্রাধান্য দেখা যায়। এঁরা কাজে কর্ম্মে, কথায়, ভঙ্গীতে প্রভুত্বপ্রিয়। উত্তেজনাপূর্ণ ও অভিযানমূলক কাজ এঁরা পছন্দ করেন। এঁরা অপরের অনুভূতির প্রতি উদাসীন ও সরাসরি কাজ করার পক্ষপাতী। আচরণে এঁরা উদ্যমশীল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আক্রমণধর্ম্মী।

সেরিব্রোটনিকদের মধ্যে সামাজিক সঙ্গতিবিধানের অভাব ও সংযমমূলক আচরণের প্রাধান্য দেখা যায়। এঁরা প্রায়ই ভয়ে ভয়ে সময় কাটান এবং সামাজিক মেলামেশা এড়িয়ে চলেন। এঁদের মধ্যে সাধারণত আত্মসংযম ও আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যায়।

সেলডন পরীক্ষণের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে তাঁর দৈহিক টাইপ ও মানসিক টাইপের মধ্যে প্রচুর সঙ্গতি আছে। অর্থাৎ এণ্ডোমর্ফরা মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে ভিসেরোটনিক টাইপের অন্তর্গত, মেসোমর্ফরা সোমাটোটনিক টাইপের এবং এক্টোমর্ফরা সেরিব্রোটনিক টাইপের অন্তর্গত। পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতিতে সহপরিবর্ত্তনের (correlation) মান নির্ণয় করে দেখা গেছে যে এণ্ডোমর্ফ ও ভিসেরোটনিকদের মধ্যে সহপরিবর্ত্তনের মান ·৭৫, মেসোমর্ফ ও সোমাটোটনিকদের মধ্যে মান ·৮২ এবং এক্টোমর্ফ ও সেরিব্রোটনিকদের মধ্যে মান ·৮১।

আইসেঙ্কের আয়তন (Eysenck's Dimension)

প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী আইসেঙ্ক ব্যক্তিসত্তার বিশ্লেষণে পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রয়োগ করেন এবং এক নতুন ধরনের শ্রেণীবিভাগের প্রবর্ত্তন করেন। তিনি পূর্ব্বগামীদের মত ব্যক্তিসত্তাকে কয়েকটি টাইপে ভাগ করেন নি। তার পরিবর্ত্তে তিনি দেখিয়েছেন যে ব্যক্তিসত্তার মধ্যে তিনটি মৌলিক ফ্যাক্টর বা আয়তন (Dimension) আছে। যথা,

(১) অন্তর্বৃত্তি-বহির্বৃত্তি (Introversion-extroversion) ২। মনোবিকার প্রবণতা (Neuroticism) এবং ৩। উন্মত্ততা (Psychoticism)।

এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তিসত্তার আয়তনের মধ্যে কোন পারস্পরিক সম্বন্ধ নেই, অথচ এই তিনটি আয়তনই কম বেশী মাত্রায় সকলের মধ্যে বর্ত্তমান। এই বিভাগ অনুযায়ী মনোবিকারগ্রস্ত বা উন্মাদ মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিক মানুষের কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য নেই। পার্থক্যটুকু নিছক মাত্রাগত। এই তিনটি সর্ব্বজনীন

বৈশিষ্ট্য ছাড়া আইসেঙ্কের মতে ব্যক্তিসত্তার মধ্যে আরও কতকগুলি সংকীর্ণ ফ্যাক্টর আছে, যেমন রক্ষণশীলতা-প্রগতিশীলতা (Conservatism—radicalism) সরলতা—জটিলতা (Simplicity—complexity) এবং দৃঢ়চিত্ততা—কোমলচিত্ততা (Toughmindedness-tendermindedness)

ফ্রয়েডীয় টাইপ (Freudian Types)

ফ্রয়েড এবং তার মনঃসমীক্ষণের অনুগামীরা ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তাকে তার আভ্যন্তরীণ জীবনী-শক্তির বিচিত্র স্বরূপ ও গতিপথের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। বিশেষ করে পরিবেশের প্রভাবের ফলরূপে যে সব তৃপ্তি ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা ব্যক্তির জীবনে দেখা দেয় এবং যেগুলি ব্যক্তির যৌনতার বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, সেইসব অভিজ্ঞতার উপরই মনঃসমীক্ষকেরা বিশেষ ভাবে গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে ফ্রয়েড ব্যক্তিসত্তার কতকগুলি টাইপের উল্লেখ করেছেন।

১। মৌখিক রতিমূলক (Oral-erotic) টাইপ

এই টাইপটি আবার দুরকমের হতে পারে যথা সক্রিয় দংশনকামী (Active Biting) টাইপ এবং নিষ্ক্রিয় চোষণকামী (Passive sucking) টাইপ। মৌখিক সক্রিয় শ্রেণীর ব্যক্তিরা ব্যর্থতা থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় রূপে অতিরিক্তমাত্রায় চেবান ও কামড়ানোর আশ্রয় নিয়ে থাকে। এরা সাধারণত নিরাশাবাদী, সন্দিগ্ধমনা এবং হিংসাপরায়ণ হয়ে থাকে। মৌখিক-নিষ্ক্রিয় টাইপের ব্যক্তিরা আবার অপর পক্ষে ব্যর্থতা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য শিশুজনোচিত আচরণের আশ্রয় নেয়। এরা আশাবাদী, নির্ভরশীল, এবং অপরিণত চরিত্রের হয়ে থাকে। এরা সাধারণত কাজের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চায় এবং আশা করে যে অপরে তাদের যত্ন নেবে এবং তাদের প্রয়োজন মেটাবে।

২। পায়ু রতিমূলক (Anal-erotic) টাইপ

অতি-কৃপণতা, একগুঁয়েমি, শৃঙ্খলাবোধ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি এই ধরনের ব্যক্তির মধ্যে চরম মাত্রায় দেখা দিয়ে থাকে। এই টাইপের মধ্যেও আবার দুটি

বিভাগ আছে। প্রথমটি ধর্ষণকামী (sadistic) টাইপ, আর দ্বিতীয়টি নিষ্ক্রিয় (passive) টাইপ। প্রথম টাইপের লোকেরা অপরকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায়।

৩। উপস্থ টাইপ (Genital Type)

এই টাইপের মধ্যে আবার দুটি বিভাগ আছে। প্রথমটি লৈঙ্গিক টাইপ (Phallic type), এটি হল উপস্থ টাইপের প্রাথমিক বা অপরিণত স্তর। এই টাইপের ব্যক্তির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হল প্রদর্শনপ্রবণতা, উচ্চাকাঙ্খা, দাম্ভিকতা, আত্ম-রতি ইত্যাদি।

উপস্থ টাইপের স্বাভাবিক বা সুপরিণত বিকাশ থেকেই স্বাভাবিক মানুষ দেখা দেয়। স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে যৌনতা তার স্বাভাবিক পরিণতিতে গিয়ে পৌছয়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সংযম, নির্ভরশীলতা ও স্বাবলম্বন আত্মপ্রিয়তা ও পরার্থপরতা প্রভৃতি বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যগুলি মধ্যে সমতা দেখা দিয়ে থাকে।

বলা বাহুল্য ফ্রয়েডের দেওয়া ব্যক্তিসত্তার শ্রেণীবিভাগ অস্বাভাবিক মানুষকে ভিত্তি করেই গড়া। পুরোপুরি কোন একটি বিশেষ টাইপে পড়ে এমন ব্যক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তবে এই শ্রেণীবিভাগগুলিতে কতকগুলি অতি গভীর ও দৃঢ়বদ্ধ মানসিক প্রবণতার দিক দিয়ে যে ব্যক্তিসত্তাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ (Measurement of Personality)

বহু প্রাচীনকাল থেকেই ব্যক্তিসত্তা পরিমাপনের প্রচেষ্টা চলে এসেছে। এই প্রচেষ্টাগুলি প্রধানত পর্য্যবেক্ষণ এবং সংব্যাখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তির আচরণ কথাবার্ত্তা কাজকর্ম্ম বিশেষ প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করে এবং সেগুলিকে যথাযথ ব্যাখ্যা করে ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে ধারণা তৈরী করা হত। কিন্তু এই পর্য্যবেক্ষণের পন্থাগুলি মোটেই বিজ্ঞানসম্মত ছিল না এবং পর্য্যবেক্ষণের পরিস্থিতিকেও সুনিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হত না। তাছাড়া বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির অভাবে লব্ধ ফলাফলের ব্যাখ্যাও মোটেই সুনির্দ্দিষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য হত না। এই সব নানা কারণে ব্যক্তি পরিমাপনের প্রাচীন একান্তইপদ্ধতিগুলি অসম্পূর্ণ ছিল।

আধুনিক কালে ব্যক্তিসত্তা পরিমাপনের বহু পন্থা ও পদ্ধতির উদ্ভাবন হয়েছে। এই পন্থাগুলিও পর্য্যবেক্ষণ এবং সংব্যাখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু প্রাচীন পদ্ধতিগুলির সঙ্গে আধুনিক পদ্ধতিগুলির প্রধান পার্থক্য হল যে এগুলি অনেক বেশী বিজ্ঞানভিত্তিক এবং ক্রটিহীন। পর্য্যবেক্ষণের পদ্ধতিও বৈচিত্র্য এবং কার্য্যকারিতার দিক দিয়ে অনেক বেশী উন্নত হয়েছে। তাছাড়া আধুনিককালে সংব্যাখ্যান পদ্ধতি আগের চেয়ে অনেক নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিসত্তা পরিমাপনের কয়েকটি আধুনিক পদ্ধতির আলোচনা নীচে করা হল।

১। সাক্ষাৎকার (Interview)

ব্যক্তিকে সামনাসামনি সাক্ষাৎ করে তার আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ভাবে তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার নাম সাক্ষাৎকার। ব্যক্তি-সত্তা পরিমাপনের পদ্ধতিরূপে এইটিই হল প্রাচীনতম। বর্তমানে বহু অভিনব বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলেও মনোবিজ্ঞানীরা এর মূল্য ও উপকারিতাকে অস্বীকার করেন না। সাক্ষাৎকারের সাফল্য তিনটি বস্তুর উপর নির্ভর করে, প্রথম, সাক্ষাৎকারের বিভিন্ন কৌশলগুলি যেন সাক্ষাৎকারীর আয়ত্তে থাকে। দ্বিতীয়, যাকে সাক্ষাৎ করা হচ্ছে সে যেন সাক্ষাৎকারকের প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে প্রস্তুত থাকে এবং তৃতীয়, সাক্ষাৎকারক যে প্রশ্নগুলির সাহায্যে ব্যক্তির নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন সেগুলি যেন স্থচিন্তিত এবং কার্য্যকরী হয়।

সাক্ষাৎকারের প্রধান গলদ হল এর মধ্যে পরিমাপকের নিজস্ব প্রভাব খুব বেশী কাজ করে। বর্তমানে সেইজন্য সাক্ষাৎকারকে ব্যক্তিপ্রভাব-বর্জ্জিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সাক্ষাৎকারের প্রশ্নগুলির প্রকৃতি স্থনির্দিষ্ট করে এবং প্রশ্ন করার পদ্ধতিকে স্থনিয়ন্ত্রিত করে সাক্ষাৎকারের নির্ভরশীলতাকে বাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে।

২। কেস হিস্ট্রী পদ্ধতি (Case History Method)

ব্যক্তির অতীত আচরণ, শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা, জীবন বিকাশের গতিধারা, শিক্ষা, বংশ-পরিচয় প্রভৃতি থেকে তার ব্যক্তিসত্তার একটা মোটামুটি ধারণা করা যায়। এই পদ্ধতিটি মনোব্যাধির চিকিৎসায় বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে

৩। রেটিং পদ্ধতি (Rating Method)

রেটিং পদ্ধতির মৌলিক নীতিটি হল ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অপরের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। বহুপ্রকারের রেটিং পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তার মধ্যে রেটিং স্কেল, (Rating scale) এবং সমাজমিতিমূলক পদ্ধতি (Sociometric Method) বর্ত্তমানে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে।

(ক) রেটিং স্কেল (Rating Scale)

কোন ব্যক্তির সম্পর্কে কারও পর্য্যবেক্ষণের ফলাফল বা মতামতকে সুসংহত প্রথায় প্রকাশ করার একটি বিশেষ প্রণালীকে রেটিং স্কেল বলে। শিক্ষক বা অন্য কোন তত্ত্বাবধায়ক, সহপাঠী বা সহকর্ম্মী প্রভৃতিরা রেটিং স্কেলের সাহায্যে ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ করতে পারে। অনেক সময় নিজেই নিজের রেটিং করা যায়।

রেটিং স্কেল পদ্ধতিতে যে কোন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে তাদের বিভিন্ন মাত্রা অনুযায়ী কয়েকটি পর্য্যায়ে ভাগ করা হয়। একেই স্কেল বলা হয়। তারপর ঐ স্কেলের কোন্ পর্য্যায়ে বিশেষ কোন ব্যক্তির স্থান সেটা পরিমাপক নির্ণয় করেন। যেমন ধরা যাক, সামাজিকতা রূপ বৈশিষ্ট্যটির নিম্নরূপ রেটিং স্কেল তৈরী করা যায়।

প্রঃ—লোকটি সামাজিক না অসামাজিক ?

	অতিরিক্ত সামাজিক	বেশ সামাজিক	মাঝামাঝি সামাজিক	বেশ অসামাজিক	অতিরিক্ত অসামাজিক
ক	...	×	...	...	...
খ	...	...	×	...	...
গ	...	...	...	..	×

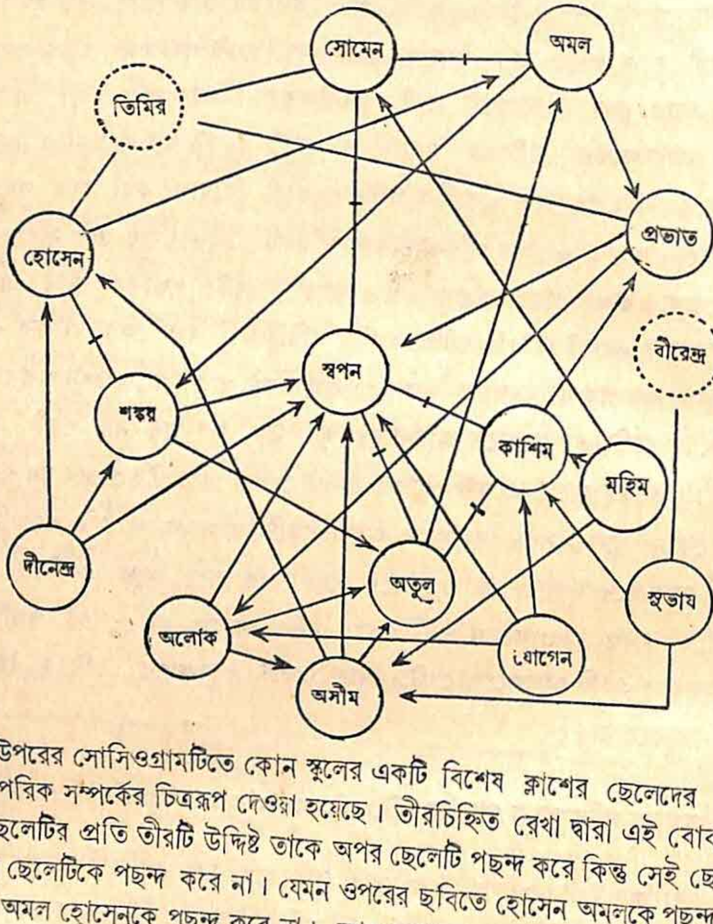
উপরের স্কেলটিতে ক, খ, গ, এই তিন ব্যক্তির সামাজিকতার দিক দিয়ে কোথায় কার স্থান তা নির্ণয় করা হয়েছে। রেটিং স্কেলের মাত্রানুযায়ী বিভাগটী সাধারণত তিনটি, পাঁচটি, সাতটি হতে পারে এবং সেইমত স্কেলটিকে তিনমাত্রা (three-point), পাঁচ-মাত্রা (five-point) বা সাত-মাত্রার (seven-point) স্কেল বলা হয়ে থাকে। উপরের দৃষ্টান্তটি একটি পাঁচমাত্রার স্কেলের।

রেটিং স্কেল সত্যিকারের কোন পরিমাপনের পদ্ধতি নয় এটি নিছক মতামত জ্ঞাপন করা এবং লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতিমাত্র। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, যে পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে রেটিং করা হয় তার চেয়ে এটি খুব বেশী কার্যাকরী হতে পারে না। তাছাড়া যে বিষয়টি বেশী পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাওয়া যায় সেই বিষয়েতেই রেটিং অধিকতর নির্ভরযোগ্য হয়। একজন মাত্র পর্যবেক্ষকের রেটিংএর ওপরও খুব বেশী নির্ভর করা যায় না। সেজন্য আজকাল রেটিং পদ্ধতিতে একাধিক পরিমাপনকারী নিয়োগ করা হয়ে থাকে। যদি গড়ে অন্তত ৮ জন পরিমাপনকারীর রেটিং নেওয়া যায় তবে ফলাফলটি নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। রেটিং পদ্ধতির আর একটি দোষ হ্যালো এফেক্ট (Halo effect) নামে পরিচিত। যখন কোন ব্যক্তির বুদ্ধি বা সাধারণ ক্ষমতার মান সম্পর্কে আগে থেকেই একটা ধারণা থাকে তখন অন্য কোন সংলক্ষণের রেটিং-এর বেলাতে আমরা হয় খুব উঁচু, নয় খুব নীচু রেটিং করে ফেলি। একেই হ্যালো এফেক্ট বলা হয়। এই হ্যালো এফেক্টের প্রভাব দূর করতে হলে কোন দলের সমস্ত ব্যক্তিকে আগে একটিমাত্র সংলক্ষণে রেটিং করে নিতে হয়। তার পরে আর একটি সংলক্ষণে এবং তার পরে আর একটিতে এবং এইভাবে সমস্ত সংলক্ষণেগুলির ওপর রেটিং করতে হয়। এই পদ্ধতিতে রেটিং করলে একটি সংলক্ষণের রেটিং আর একটি সংলক্ষণের রেটিংকে বিশেষ প্রভাবিত করে না।

(খ) সমাজমিতিমূলক পদ্ধতি (Sociometric methods)

ব্যক্তির জীবনধারণে এবং তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে সামাজিক শক্তিগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। সেজন্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানে সামাজিক সংগঠনের রূপ এবং গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তির নিজের স্থান পর্যবেক্ষণের জন্য নানা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি বিশেষ দলের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কগুলিকে একটি চিত্রের আকারে রূপ দেওয়া যেতে পারে। একে সোসিওগ্রাম (Sociogram) বলা হয়। সোসিওগ্রাম তৈরী করবার পদ্ধতিতে দলের প্রত্যেকটি সদস্যকে প্রশ্ন করা হয় যে বিশেষ কোন সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে সে দলের কাকে কাকে পছন্দ করে। যেমন স্কুলের কোন ক্লাসের ছেলেদের প্রশ্ন করা হল যে তার সঙ্গী বা সহকর্মী হিসেবে সে ক্লাসের

কাকে কাকে পছন্দ করে। তারা যে উত্তর দেবে সেই উত্তর থেকে একটা চিত্ররূপ আঁকা যেতে পারে। এই চিত্ররূপকেই সোসিওগ্রাম বলা হয়।



উপরের সোসিওগ্রামটিতে কোন স্কুলের একটি বিশেষ ক্লাশের ছেলেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছে। তীরচিহ্নিত রেখা দ্বারা এই বোঝাচ্ছে যে ছেলেটির প্রতি তীরটি উদ্দিষ্ট তাকে অপর ছেলেটি পছন্দ করে কিন্তু সেই ছেলেটি অপর ছেলেটিকে পছন্দ করে না। যেমন ওপরের ছবিতে হোসেন অমলকে পছন্দ করে কিন্তু অমল হোসেনকে পছন্দ করে না। আর যেখানে কেবলমাত্র একটি রেখার দ্বারা দুটি নাম সংযুক্ত সেখানে ছেলে দুজনই পরস্পরকে পছন্দ করে। যেমন সোমেন অমলকে পছন্দ করে অমলও সোমেনকে পছন্দ করে।

এই সোসিওগ্রাম থেকে দেখা যাচ্ছে যে ক্লাশে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছেলে হচ্ছে স্বপন যাকে ৯টি ছেলে পছন্দ করে, কিন্তু স্বপন মাত্র কাশিম অতুল আর সোমেনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। ক্লাশের মধ্যে বীরেন্দ্র হল পরিত্যক্ত ছেলে। তিমিরও নিজের তিনটি বন্ধু নিয়ে নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী তৈরী করেছে।

সমাজতত্ত্বের পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণায় সোসিওগ্রাম যে যথেষ্ট সাহায্য করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা সম্পর্কেও

নানা তথ্য সোসিওগ্রাম থেকে সংগ্রহ করা যায়। দলের অন্তর্গত অন্যান্য সদস্যদের প্রতি ব্যক্তির কি মনোভাব এবং ব্যক্তির প্রতিও অন্যান্য সদস্যদের কি মনোভাব এই দুধরনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই আমরা সোসিওগ্রাম থেকে পেতে পারি।

৪। প্রশ্নাবলী (Questionnaire)

ব্যক্তিসত্তা পরিমাপনের একটি বহু প্রচলিত পদ্ধতি হল ব্যক্তিকে তার বিশ্বাস, আচরণ, অতীত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা। যখন ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ করে সামনাসামনি প্রশ্ন করা হয় তখন তাকে সাক্ষাৎকার বলে। কিন্তু এ-ধরনের সাক্ষাৎকারে প্রায়ই ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকে না। এবং নানা কারণে ব্যক্তি স্বাভাবিক এবং সহজভাবে উত্তর দিতে পারে না। কিন্তু যদি সরাসরি প্রশ্ন করার পরিবর্ত্তে ব্যক্তিকে প্রশ্নগুলি লিখিতরূপে দেওয়া যায় এবং তার পক্ষে অনুকূল পরিবেশে স্বাভাবিকভাবে উত্তর দেবার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে দেখা গেছে যে তাতে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য ফল পাওয়া যায়। গবেষণা ও পর্য্যবেক্ষণের দিক দিয়ে এই ধরনের সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সুপরিকল্পিত প্রশ্নাবলী অনেক বেশী কার্য্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তাছাড়া প্রশ্নাবলীতে প্রশ্নগুলি লিখিত অবস্থায় থাকার জন্য মৌখিক প্রশ্নের চেয়ে সেগুলির অনেক দিক দিয়ে বেশী উপকারিতা আছে। প্রথমত, প্রশ্নগুলির সংগঠনকে সুনিয়ন্ত্রিত বা আদর্শায়িত করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন লোকের উপর প্রশ্নগুলি প্রযুক্ত হওয়ায় প্রতিটি প্রশ্নের কি ধরনের উত্তর পাওয়া গেল তারও সুনির্দ্দিষ্ট বিবরণী রাখা সম্ভব হয়।

(ক) নির্ব্বাচনী প্রশ্নাবলী

কতকগুলি ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নাবলী নিছক নির্ব্বাচন বা বাছাই করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলিকে নির্ব্বাচনী প্রশ্নাবলী বলা হয়। অতিরিক্ত মনোবৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ বা বিশেষ প্রকারের চিকিৎসার প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে বাছাই করে নেওয়ার জন্য এই ধরনের ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নাবলী ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের নির্ব্বাচনী প্রশ্নাবলী প্রথম তৈরী করেন উডওয়ার্থ ১৯১৮ সালে। এটির নাম সাইকোনিউরটিক্ ইন্‌ভেণ্টরী। এই প্রশ্নাবলীটির সাহায্যে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানে অসমর্থ ব্যক্তিদের স্বাভাবিক ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে

বেছে নেওয়া সম্ভব হয়। গত দ্বিতীয়মহাযুদ্ধের সময় এই ধরনের অনেকগুলি নির্ব্বাচনী প্রশ্নাবলী প্রস্তুত হয়েছে।

(খ) ব্যক্তিসত্তানির্ণায়ক প্রশ্নাবলী

ব্যক্তিসত্তার বিশেষ বিশেষ দিকগুলি পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে আর একধরনের প্রশ্নাবলী গঠন করা হয়ে থাকে। এগুলিকে আমরা ব্যক্তিসত্তা নির্ণায়ক প্রশ্নাবলী বলতে পারি। এই ধরনের প্রশ্নাবলীতে বিশেষ একটি বা একাধিক সংলক্ষণের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে প্রশ্ন তৈরী করা হয়। পরে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর থেকে ঐ এক বা একাধিক সংলক্ষণ ব্যক্তির মধ্যে কি পরিমাণে আছে তা নির্ণয় করা হয়। একটি সুপরিচিত ব্যক্তিসত্তানির্ণায়ক প্রশ্নাবলীর নাম হল মিনেসোটা মাল্টিফেসিক পার্সোনালিটি ইনভেন্টরী (Minnesota Multiphasic Personality Inventory or MMPI) এই প্রশ্নাবলীতে মোট ৫৫০টি উক্তি আছে। প্রত্যেকটি উক্তি এক একটি কার্ডে ছাপা থাকে। এই উক্তিগুলি পড়ে ব্যক্তিকে বলতে হয় যে উক্তিটি তার পক্ষে সত্য কি মিথ্যা।

পরে এই উত্তরগুলি থেকে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার নানা বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে এই ধরনের ব্যক্তিসত্তানির্ণায়ক প্রশ্নাবলী অনেকগুলি তৈরী হয়েছে তার মধ্যে বার্নরয়টার পার্সোনালিটি টেষ্ট প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সাধারণত ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নাবলীতে প্রশ্নগুলি মুদ্রিত পুস্তিকার আকারে থাকে কখনও কখনও স্বতন্ত্র কার্ডেও এগুলি মুদ্রিত হয়। প্রশ্নগুলির উত্তরে ব্যক্তিকে সাধারণত 'হাঁ' বা 'না' বা 'জানিনা' এই তিনের একটা উত্তর দিতে হয়।

৫। উপাদান-বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Factor Analysis)

ব্যক্তিসত্তার আধুনিকতম ও বিজ্ঞানসম্মত পরিমাপন পদ্ধতিটি ফ্যাক্টর এ্যানালিসিস্ নামক আধুনিক গাণিতিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্ধতিটিতে প্রশ্নাবলীর অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে পারস্পরিক সহপরিবর্ত্তনের মান নির্ণয় করে ব্যক্তিসত্তার মৌলিক উপাদানগুলির (factors) প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ করেন গিলফোর্ড এবং তাঁর সহকর্ম্মীরা। তাঁদের পর্য্যবেক্ষণ থেকে ব্যক্তিসত্তার ১৩টি মৌলিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। এই মৌলিক উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে তাঁরা ব্যক্তিসত্তার নানারকম প্রশ্নাবলী তৈরী করেন। তার মধ্যে অন্যতমটির নাম হল গিলফোর্ড-জিমারম্যান

টেম্পারামেন্ট সার্ভে। এই অভীক্ষাটিতে উপাদান-বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাওয়া ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য বা গুণগুলিকে ভিত্তি করে প্রশ্নগুলি রচনা করা হয়েছে। প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের উপর ৩০টি করে মোট ৩০০টি প্রশ্ন এতে আছে। সেই বৈশিষ্ট্য দশটি হল এই :—১। সাধারণ সক্রিয়তা (General activity) ২। সংযম (Restraint) ৩। প্রাধান্য (Ascendance) ৪। সামাজিকতা (Sociability), ৫। প্রক্ষোভমূলক স্থৈর্য্য (Emotional stability) ৬। বিষয়মুখিতা (Objectivity) ৭। বন্ধুত্ব (Friendliness) ৮। চিন্তাশীলতা (Thoughtfulness) ৯। ব্যক্তিগত সম্পর্ক (Personal relation) ১০। পৌরুষ (Masculinity)। ক্যাটেলও উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে একটি ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষা প্রস্তুত করেন। সেটি পার্সোনালিটি ফ্যাক্টর কোশ্চেনেয়ার নামে পরিচিত। ক্যাটেলের মতে ব্যক্তিসত্তার উপাদান ১৬টি। তার বিবরণ ২০৩ পাতায় দেওয়া হয়েছে।

৬। বাধ্যতামূলক-নির্ব্বাচনপদ্ধতি (Forced-choice Technique)

এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির সামনে দুটি বিকল্প উপস্থাপিত করে তার মধ্যে একটিকে নির্ব্বাচন করতে বলা হয়। কখনও কখনও আবার তিনটি বিকল্প দিয়ে বলা হয় যে ঐগুলির মধ্যে যেটি তার কাছে সব চেয়ে বেশী কাম্য এবং যেটি সব চেয়ে কম কাম্য—সেই দুটি নির্ব্বাচন করতে। বিকল্পগুলি এমন শ্রেণীর হওয়া চাই যাতে সেগুলি আকর্ষণীয়তার দিক দিয়ে যেন একই স্তরের বলে মনে হয় যেমন,

তুমি কোন্‌টি পছন্দ কর? নিম্ন বেতনে চিত্তাকর্ষক কাজ করতে, না উচ্চবেতনে একঘেয়ে কাজ করতে?

কিংবা, তুমি কোন্ ধরনের খ্যাতি পছন্দ কর? শান্ত বলে পরিচিত হতে, না, বন্ধুভাবাপন্ন বলে পরিচিত হতে?

সাধারণ প্রচলিত ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নাবলীর চেয়ে এই বাধ্যতামূলক-নির্ব্বাচন পদ্ধতিতে অস্পষ্টতা ও অনির্দ্দিষ্টতার স্থান অনেক কম।

৭। প্রতিফলন অভীক্ষা (Projective Test)

প্রতিফলন অভীক্ষাগুলিতে ব্যক্তিসত্তার পরিমাপনের সম্পূর্ণ অভিনব পন্থা অনুসরণ করা হয়েছে। এতে ব্যক্তিকে এমন একটি কাজ করতে দেওয়া হয় যেটির গঠন অনির্দ্দিষ্ট ও অসম্পূর্ণ এবং তার ফলে সেটি সমাধান করতে গিয়ে ব্যক্তিকে বহু বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়ার আশ্রয় নিতে হয়। এখানে অভীক্ষক

আশা করেন যে ব্যক্তি তার এই স্বতঃপ্রণোদিত কাজগুলির মধ্য দিয়ে নিজের ধারণা, মনোভাব, ইচ্ছা, ভয়, দুশ্চিন্তার প্রকৃতিগুলি প্রকাশ করে ফেলবে। প্রতিফলন কথাটি অবশ্য ফ্রয়েডের কাছ থেকে নেওয়া। ফ্রয়েডের ব্যাখ্যায় প্রতিফলন কথাটির অর্থ হল নিজের কোন বৈশিষ্ট্য অপরের মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা। এখানে অবশ্য অর্থ হল এই যে ব্যক্তি এই অভীক্ষাগুলি সমাধান করতে গিয়ে নিজের প্রকৃত ব্যক্তিসত্তাটি বাইরে প্রতিফলিত বা প্রকাশিত করে ফেলবে।

এই অভীক্ষাগুলির প্রথম বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলিতে যে সব কাজ দেওয়া হয় সেগুলির কোন নির্দিষ্ট সংগঠন বা রূপ এবং তার ফলে এগুলির ক্ষেত্রে নানা বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া সম্ভবপর। এই কাজগুলি সম্পন্ন করতে অভীক্ষার্থী তার কল্পনাশক্তির বাধাহীন প্রয়োগ করতে পারে এবং যে ভাবে সে ঐ অস্পষ্ট বহু-অর্থবোধক বস্তুগুলির ব্যাখ্যা করে তাই থেকে তার মনের অপ্রকাশিত বিভিন্ন দিকগুলির সন্ধান পাওয়া যায়।

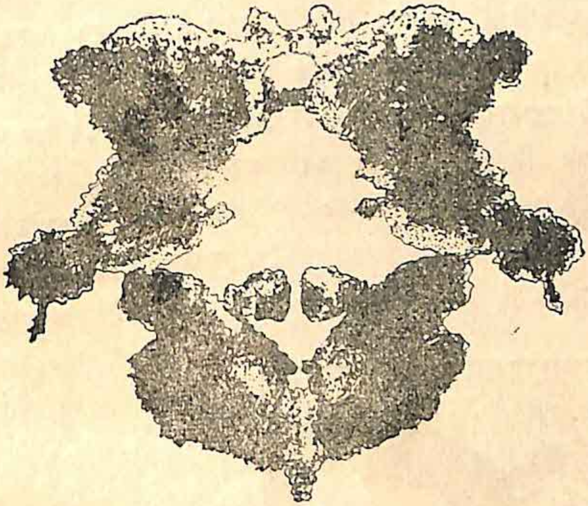
দ্বিতীয়ত, এই অভীক্ষাগুলিতে অভীক্ষার যথার্থ প্রকৃতি বা পদ্ধতিটি অভীক্ষার্থীর কাছ থেকে গোপন রাখা হয়। কেননা অভীক্ষক অভীক্ষার্থীর উত্তর বা প্রতিক্রিয়ার যে কি ধরনের বা কি ভাবে ব্যাখ্যা করেন সে সম্পর্কে কিছুই তার জানা থাকে না। তার ফলে অভীক্ষার ফলাফলের উপর অভীক্ষার্থীর পক্ষে কোন-রূপ সচেতন হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয় না।

তৃতীয়ত, এই অভীক্ষাগুলির বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলির পরিমাপের প্রচেষ্টা সামগ্রিক প্রকৃতির। ব্যক্তিসত্তার কোন একটি বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করা এগুলির উদ্দেশ্য নয়। অভীক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার একটা সামগ্রিক রূপ বা তার মনের সংগঠনের একটা সম্পূর্ণ ধারণা এগুলি থেকে পাওয়া যায়। সেদিক দিয়ে এই অভীক্ষাগুলির একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে। কয়েকটি প্রতিফলন অভীক্ষার বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

(ক) রর্সা ইঙ্কব্লট (Rorschach Inkblot) অভীক্ষা

প্রতিফলন অভীক্ষাগুলির মধ্যে সব চেয়ে প্রখ্যাত হল রর্সা ইঙ্কব্লট অভীক্ষাটি। এই অভীক্ষাটি সুইজারল্যাণ্ডবাসী হারম্যান রর্সা (Herman Rorschach) নামে একজন মনোচিকিৎসক উদ্ভাবন করেন।

একটি কাগজের উপর এক বিন্দু কালি রেখে যদি কাগজটিকে ঠিক মাঝামাঝি ভাঁজ করা হয় তাহলে ঐ বিন্দুটি একটা কালির ছবির রূপ নেবে যার খণ্ডার্দ্ধ দুটি মোটামুটি একই রকমের দেখতে। এই ধরনের দশটি কালির ছাপ নিয়ে অভীক্ষাটি গঠিত। এই কালির ছাপগুলি একটির পর একটি ব্যক্তিকে দেখতে দেওয়া হয় এবং সেগুলি দেখে তার মনে কি ধারণা বা কল্পনার উদয় হয় তার বর্ণনা তাকে



রর্সা-ইঙ্কব্লট টেস্টের একটি ছবি

করতে বলা হয়। ব্যক্তির প্রদত্ত বর্ণনা থেকে তার মানসিক সংগঠন, প্রবণতা, মনোভাব, ইচ্ছা প্রভৃতি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

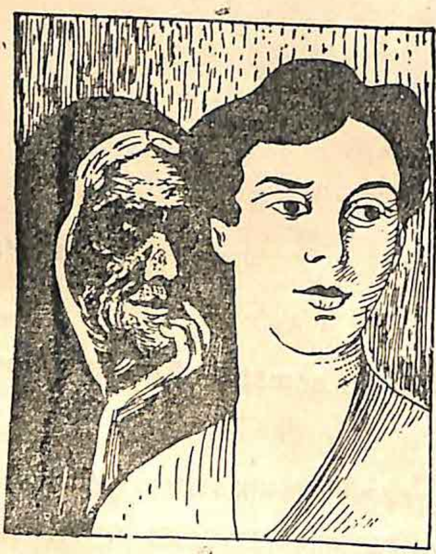
(খ) কাহিনী-সংবোধন অভীক্ষা (Thematic Apperception Test or TAT)

আর একটি অতি প্রচলিত প্রতিফলন অভীক্ষার নাম হল মারে (Murray) ও মর্গান (Morgan) কর্তৃক উদ্ভাবিত কাহিনী-সংবোধনের অভীক্ষা। এই অভীক্ষাটি ১৯টি ছবি দিয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি ছবির বিষয়বস্তুটি অনির্দ্দিষ্ট ধরনের এবং তার বহুরকমের ব্যাখ্যা হতে পারে। অভীক্ষার্থীকে এই ছবিগুলি দেওয়া হয় এবং সেগুলির উপর ছোট ছোট নিবন্ধ বা কাহিনী লিখতে বলা হয়। অভীক্ষার্থী প্রদত্ত ছবিগুলির উপর যে ধরনের কাহিনী লিখবে বা সেগুলির যে ধরনের

ব্যাখ্যা সে দেবে তা থেকে তার অপ্রকাশিত মানসিক ইচ্ছা বা দ্বন্দ্বের স্বরূপ অভীক্ষকের নিকট ব্যক্ত হয়ে পড়ে। বর্ত্তমানে ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী কাহিনী সংবোধন অভীক্ষাও তৈরী হয়েছে। এটি শিশু সংবোধন অভীক্ষা (Children's Apperception Test) নামে পরিচিত।

(গ) শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা (Word Association Test)

এই অভীক্ষাটি প্রতিফলন অভীক্ষাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। এতে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন শব্দ একটির পর একটি করে অভীক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করা হয় এবং শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই যে কথাটি অভীক্ষার্থীর মনে আসে সেইটি তাকে বলার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। অভীক্ষার্থীর উত্তর দেবার সময় এবং উত্তরের প্রকৃতি এ দুয়েরই বিচার করা হয়। যদি অভীক্ষার্থী উত্তর দিতে দেরী করে তাহলে সিদ্ধান্ত করা হয় যে সে তার প্রথম মনে আসা শব্দটি বলতে চায় না। উত্তরের প্রকৃতি থেকে অভীক্ষার্থীর অচেতনে নিহিত

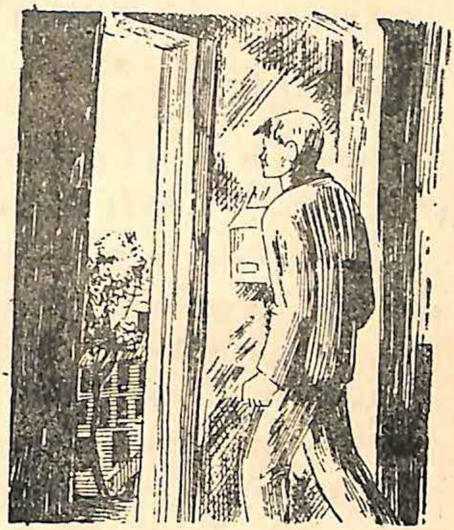


কাহিনী সংবোধন অভীক্ষার একটি ছবি।

কমপ্লেকস্ এবং অবদমিত ইচ্ছার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ইউঙ্ (Jung) এই শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষার যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। কেণ্ট ও রোজানফ (Kent and Rosanoff) উপকরণরূপে ব্যবহারের জন্য একটি বিশেষ শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা প্রস্তুত করেন।

উপরের অভীক্ষাগুলি ছাড়াও প্রতিফলন অভীক্ষার শ্রেণীভুক্ত বহু বিভিন্ন ও বিচিত্র অভীক্ষা উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন, বাক্য-সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা, রোজেন

কাহিনী সংবোধন অভীক্ষার একটি ছবি



উইগের ব্যর্থতামূলক চিত্র পর্য্যবেক্ষণ অভীক্ষা, অসম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কন অভীক্ষা ইত্যাদি।

প্রশ্নাবলী

1. Write essay on—Measuring personality.(B.T. 1953, 54)
Ans. (পৃঃ ২১২—পৃঃ ২২৩)

2. What do you understand by the term "personality"? Show how the social environment influences the development of personality. (B.A. 1960
Ans. (পৃঃ ১৯৫—পৃঃ ২০১)

3. Enumerate the different types of personality.
Ans. (পৃঃ ২০৫—পৃঃ ২১১)

4. Define Personality and trace the development of personality in the child.
Ans. (পৃঃ ১৯৫—পৃঃ ২০১)

5. What is a personality trait? What are the different traits of personality?
Ans. (পৃঃ ২০১—পৃঃ ২০৫)

পনেরো

চরিত্র (Character)

ব্যক্তিসত্তার মত চরিত্রেরও কোন সুনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়, যদিও চরিত্র কথাটি আমাদের বহু ব্যবহৃত শব্দাবলীর অন্যতম।

প্রচলিত ভাষণে চরিত্র কথাটির বহু বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে কথাটির ব্যবহার হতে দেখা গেছে। অতএব প্রথমে চরিত্র কথাটির অর্থের একটি পরিষ্কার সংব্যাখ্যান প্রয়োজন।

অনেকে চরিত্র ও ব্যক্তিসত্তাকে সমার্থক বলে গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে অলপোর্টের ব্যাখ্যাটি উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে ব্যক্তিসত্তা ও চরিত্র একই বস্তুকে দুটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখার জন্য দেওয়া দুটি বিভিন্ন নাম। যখন কতকগুলি প্রতিষ্ঠিত ও সমাজ-স্বীকৃত মানের দিক দিয়ে ব্যক্তিসত্তার মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয় তখন আমরা তাকে চরিত্র বলি। আর যখন এ ধরনের কোনরূপ মূল্য নির্দ্ধারণের প্রচেষ্টা থাকে না তখন আমরা ব্যক্তিসত্তা নামটি ব্যবহার করে থাকি। এক কথায় চরিত্র হল মূল্য-নিরূপিত ব্যক্তিসত্তা (personality evaluated) এবং ব্যক্তিসত্তা হল মূল্য-নিরূপনহীন চরিত্র (character devaluated)

বস্তুত চরিত্র ও ব্যক্তিসত্তাকে দুটি পৃথক সত্তা বলে মনে করা অসঙ্গত। দুটিই ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের সংগঠনমূলক সমষ্টির নাম। তবে যখন এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে বিশেষ কতকগুলিকে আমরা স্বতন্ত্রভাবে বিচার করি এবং সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র সংগঠনটির মূল্য নির্দ্ধারণ করি, তখনই চরিত্র কথাটি ব্যবহার করে থাকি। যে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা চরিত্রের কথা উত্থাপন করি সেগুলি মূলত সামাজিক আচরণ ও নৈতিক বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সমাজের একজন সদস্য রূপে ব্যক্তির যে সকল রীতিনীতি মেনে চলা উচিত এবং প্রচলিত নৈতিক আদর্শের যে সকল অনুশাসন তার অনুসরণ করা উচিত সেগুলি সম্বন্ধে একটা সুনির্দ্দিষ্ট মান বা আদর্শের ধারণা সকল সমাজেই আছে। এই সাধারণ ধারণার পরিপ্রেক্ষিত আমরা যখন ব্যক্তির আচরণ-বৈশিষ্ট্যের বিচার করি তখন আমরা চরিত্র কথাটীর ব্যবহার করি। উদাহরণস্বরূপ,

সততা (honesty) বলতে আমরা যা বুঝি তা একশ্রেণীর আচরণের নাম। যখন ব্যক্তিসত্তার কোনরূপ মূল্য নির্দ্ধারণের কথা ওঠে না তখন নিছক আচরণরূপে সততার অন্যান্য আচরণ থেকে পৃথক বা স্বতন্ত্র কোন মূল্য নেই। কিন্তু যেই সামাজিক বা নৈতিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে এটির বিচার করা হয় তখনই সততা ব্যক্তির একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব দেখা যাচ্ছে চরিত্র বলতে আমরা ব্যক্তিসত্তার সেই পরিকল্পনাকে বুঝি যাতে বিশেষ কতকগুলি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেওয়া হয় এবং ঐ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যেরই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির সমগ্র সংগঠনকে বিচার করা হয়। এই বিশেষ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি সামাজিক ও নৈতিক আচরণে আদর্শের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত।

সুচরিত্রের স্বরূপ

অতএব দেখা যাচ্ছে যে বিশেষ কতকগুলি মানের দিক দিয়ে যখন ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিচার করা হয় তখন আমরা চরিত্র কথাটি ব্যবহার করে থাকি। উদাহরণস্বরূপ, প্রাধান্যপ্রিয়তা একটি ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণ। এটিকে যখন সামাজিক পরিস্থিতি বা ব্যক্তির সঙ্গে তার আত্মীয় বন্ধুপ্রতিবেশী প্রভৃতি সম্পর্কের দিক দিয়ে বিচার করা হয় তখন আমরা এটিকে একটি সবল বা সুদৃঢ় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করি। তেমনই বশ্যতাপ্রবণতা বা হীনমন্যতা একটি ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ। সামাজিক সম্পর্কের দিক দিয়ে বিচার করলে এটি হয়ে দাঁড়ায় একটি দুর্ব্বল বা কোমল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

বৈশিষ্ট্যগুলিকে যখন ব্যক্তিসত্তার দিক দিয়ে বিচার করা হয় তখন সেগুলি ভাল, কি মন্দ, কাম্য কি অকাম্য ইত্যাদি প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু যখনই সেগুলিকে চরিত্রের দিক দিয়ে বিচার করা হয় তখনই ভাল মন্দ কাম্য অকাম্যের প্রশ্নটাই বড় হয়ে ওঠে। এককথায় ব্যক্তিসত্তার ধারণা হল নিছক অস্তিত্ববাচক, কিন্তু চরিত্রের ধারণা হল মানমূলক (normative)। এখন প্রত্যেক সমাজেই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মানের দিক দিয়ে চরিত্রের বিচার করা হয়। যে সব বৈশিষ্ট্য এই মানগুলির দ্বারা অনুমোদিত সেগুলিকেই আমরা সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলি আর যে যে বৈশিষ্ট্য এই মানগুলির বিচারে পরিত্যক্ত সেগুলিকে আমরা অবাঞ্ছিত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নিই। যদিও সুচরিত্রের ধারণা বিভিন্ন সমাজে

বিভিন্ন তবু সাধারণ সভ্য মনুষ্যসমাজে সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির ধারণার মধ্যে প্রচুর মিল আছে।

সাধারণত তিন প্রকার মানের দিক দিয়ে সুচরিত্রের বিচার করা হয়ে থাকে। যেমন—ব্যক্তির নিজস্ব মঙ্গলের দিক, সমাজের যৌথ মঙ্গলের দিক এবং নৈতিক মানের দিক। যে সব ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য এর কোন একটি প্রকারের মানের দিক দিয়ে কাম্য বলে বিবেচিত হবে, সেই সব বৈশিষ্ট্য সুচরিত্রের সূচক বলে ধরা হয়ে থাকে। সুচরিত্র-বিচারের এই তিন রকম মান এবং সেগুলির দ্বারা অনুমোদিত বৈশিষ্ট্যগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হল।

ব্যক্তির কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যাবলী

এই বিভাগে সুচরিত্রের সেই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অন্তর্গত যেগুলি ব্যক্তির নিজস্ব উন্নতি, পার্থিব সাফল্য, ব্যক্তিগত জীবনযাপনে সন্তুষ্টি ইত্যাদি অর্জ্জনে ব্যক্তিকে সক্ষম করে থাকে। এই পর্য্যায়ে পড়ে সংকল্পের দৃঢ়তা, স্থিরচিত্ততা, মানসিক স্থৈর্য্য, প্রাক্ষোভিক সাম্য প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি। যে সব ব্যক্তির মধ্যে এইসব গুণগুলি থাকে তাদের ব্যক্তিগত জীবন সুখময় ও তৃপ্তিদায়ক হয়ে থাকে অতএব এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে সুচরিত্রের সংলক্ষণ বলা চলে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির ঠিক বিপরীত হল দুর্ব্বলচিত্ততা, মানসিক চাপল্য, প্রক্ষোভমূলক অসমতা, সংকল্পহীনতা ইত্যাদি।

সমাজের কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যাবলী

এই পর্য্যায়ে পড়ে সেই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেগুলি সুষ্ঠু সমাজজীবন যাপনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। বন্ধুপ্রীতি, দল-বিশ্বস্ততা, সহযোগিতা, সহানুভূতি, স্বার্থত্যাগ, সামাজিক আনুগত্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এগুলি ব্যক্তির মধ্যে থাকলে সামাজিক সংগঠন সুদৃঢ় হয় এবং সমাজজীবন সুন্দর ও স্বাস্থ্যময় হয়ে ওঠে। এই সামাজিক গুণগুলির বিপরীত হল স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা সামাজিক আনুগত্য বা বিশ্বস্ততার অভাব ইত্যাদি।

অনেক সময় ব্যক্তিকল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্য এবং সমাজকল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে। তখন দুয়ের মধ্যে কোন্‌টিকে সুচরিত্রের গুণ বলে ধরা হবে তা নির্ভর করে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী বা অনুসৃত আদর্শের উপর।

যেমন, যে সমাজে ব্যক্তিগত উন্নতির অবকাশ আছে সেখানে প্রাধান্যপ্রিয়তা বা আক্রমণধর্মিতারূপ বৈশিষ্ট্যগুলি সুচরিত্রের লক্ষ্য বলে বিবেচিত হবে কিন্তু যে সমাজে সামগ্রিক অস্তিত্ব বা সমন্বয়নকে বড় বলে ধরা হয়ে থাকে সে সমাজে উপরের গুণগুলি অবাঞ্ছিত বলেই মনে করা হয়। তেমনই কোন সমাজে বহির্বৃতিকে কাম্যগুণ বলে ধরা হয়, আবার অন্য কোন সমাজে অন্তর্বৃতিকে ব্যক্তির পক্ষে কাম্য বলে মনে করা হয়ে থাকে।

নৈতিক মাননির্ণায়ক বৈশিষ্ট্যাবলী

ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণসাধক গুণগুলি ছাড়াও এমন কতকগুলি গুণকে সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয় যেগুলি নিছক নীতির দিক দিয়ে কাম্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এগুলির ব্যবহারিক উপকারিতা থাকুক বা না থাকুক নীতি-শাস্ত্রের আদর্শ বা মান অনুযায়ী সেগুলি কাম্য এবং তার ফলে সেগুলিকে সুচরিত্রের উপাদান বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে ব্যক্তির দিক দিয়ে বা সমাজের দিক দিয়ে এই গুণগুলির কিছু না কিছু মূল্য আছে কিন্তু সেগুলির স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে এই বাস্তব মূল্যের উল্লেখ না করে তাদের পেছনে নীতিশাস্ত্রের সমর্থনকেই বড় বলে মনে করা হয়। উদাহরণস্বরূপ প্রায় সমস্ত সমাজেই সত্যবাদিতা বা সাধুতাকে সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয়। এই গুণগুলির সামাজিক বা ব্যক্তিগত মূল্য থাকলেও এগুলিকে কাম্য বলে মনে করা হয় এগুলির নৈতিক মূল্যের জন্য। দরিদ্র বা দুস্থের প্রতি দয়া,বিশ্বাস রাখা, কৃতজ্ঞতা বোধ করা, সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য করা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি নীতির দিক দিয়ে বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। অসাধুতা, মিথ্যা কথা বলা, নিষ্ঠুরতা, কৃতঘ্নতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি এই পর্য্যায়ের কাম্যগুণের বিপরীত।

চরিত্রের বিকাশ (Development of Character)

চরিত্রের বিকাশ ব্যক্তিসত্তার বিকাশেরই নামান্তর। তবে স্বতন্ত্র করে চরিত্রের বিকাশকে পর্য্যবেক্ষণ করার অর্থ হল এই যে বিকাশ-প্রক্রিয়ার কোন্ স্তরে এবং কি ভাবে শিশুর মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক সচেতনতা জাগলো তা নির্ণয় করা। চরিত্র যখন সামাজিক ও নৈতিক বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত তখন যতক্ষণ না এই বোধগুলি শিশুর মধ্যে জাগছে ততক্ষণ চরিত্র বলে কোন কিছু সৃষ্টি

হয় নি বলা চলে। এইখানে ব্যক্তিসত্তা ও চরিত্রের মধ্যে আর একটি বিশেষ পার্থক্য পাওয়া গেল। ব্যক্তিসত্তা ও চরিত্র কোনটিই সহজাত নয়, উভয়ই শিশুর অর্জিত। উভয়ই আভ্যন্তরীণ উপকরণ ও বাহ্যিক শক্তিনিচয়ের সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফল। তবে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসত্তা গঠনের কাজ স্থুরু হয়ে যায়। কিন্তু চরিত্র-গঠনের কাজ স্থুরু হয় সেদিন যেদিন প্রথম তার মধ্যে সামাজিক মনোভাব ও নৈতিক ভালমন্দের বোধ দেখা দেয়। এই দিক দিয়ে ব্যক্তিসত্তার পরে দেখা দেয় চরিত্র।

সামাজিক ও নৈতিক বিচারবুদ্ধি শিশুর মধ্যে কখন দেখা দেয় এ নিয়ে নানা মতভেদ আছে। তবে প্রক্ষোভের উপর আলোচনায় আমরা দেখেছি যে প্রায় এক বছর বয়স থেকেই শিশুর মধ্যে বড়দের প্রতি ভালবাসা জাগতে স্থুরু হয় এবং তার কয়েক মাস পর থেকেই সে অন্যান্য ছোট ছেলে মেয়েদেরও ভালবাসতে স্থুরু করে। অতএব নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এই সময় থেকেই তার চরিত্রগঠনের কাজ স্থুরু হল। নৈতিক বিচারবোধ কখন জন্মায় তা অবশ্য সঠিক ভাবে বলা চলে না। এ সম্বন্ধে ম্যাকডুগালের একটা তত্ত্বের উল্লেখ করা যায়।

ম্যাকডুগাল ব্যক্তিসত্তার সংগঠনের যে সংব্যাখ্যান দিয়েছেন তাতে মূলত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের শক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তিনি সেন্টিমেণ্ট বা প্রক্ষোভের সংগঠনকে ব্যক্তিসত্তার একক বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর দেওয়া ব্যক্তিসত্তা সংগঠনের পরিকল্পনায় চারটি স্তর আছে। প্রথম স্তরে থাকে নিছক প্রবৃত্তির প্রাধান্য এবং একমাত্র স্থুখ বা দুঃখের অনুভূতির দ্বারাই এই প্রবৃত্তি-মূলক আচরণগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়। দ্বিতীয় স্তরে, সামাজিক পরিবেশের প্রভাব শিশুর উপর সক্রিয় হয়ে উঠে এবং তার প্রবৃত্তিমূলক আচরণগুলি পরিবর্তিত হয় সমাজের আরোপিত শাস্তি ও পুরস্কারের প্রভাবের দ্বারা। ম্যাকডুগালের মতে এই সময় শিশুর মনে নানারূপ সেন্টিমেণ্ট জন্মলাভ করে এবং এই স্তরে সেন্টিমেণ্টগুলি প্রধানত বাড়ীঘর, মা-বাবা, খেলনা ইত্যাদি মূর্ত্ত বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। তৃতীয় স্তরে, সামাজিক অনুশাসনের প্রভাব আরও প্রবল হয়ে হয়ে ওঠে এবং তখন সামাজিক নিন্দা বা প্রশংসাই বিশেষ করে শিশুর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। এই স্তরে অমূর্ত্ত বস্তুকে ঘিরে শিশুর মনে সেন্টিমেণ্ট তৈরী হতে স্থুরু হয় এবং ন্যায়বিচার, সততা, নিষ্ঠুরতা, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি ধারণাকে ঘিরে

সেন্টিমেণ্ট জন্মায়। চতুর্থ বা সর্ব্বোচ্চ স্তরে নিছক আচরণের আদর্শবোধের দ্বারাই ব্যক্তির কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

ম্যাকডুগালের দেওয়া উপরের বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তিসত্তা বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে সামাজিক বোধ জাগতে থাকে এবং তৃতীয় স্তরে সেটি আরও পরিণত হয়ে ওঠে। এই তৃতীয় স্তরেই শিশুর নৈতিক বোধ অঙ্কুর অবস্থায় দেখা দেয় এবং চতুর্থ স্তরে তার মনে সামাজিক ও নৈতিক আদর্শবোধ সুপরিণত রূপে নিজের আসন করে নেয়। তখন তার আচরণ আর সামাজিক শাস্তি-পুরস্কার বা নিন্দা-প্রশংসার উপর নির্ভরশীল থাকে না। তার সুপরিণত সামাজিক ও নৈতিক আদর্শবোধই তার আচরণের প্রধান নিয়ন্ত্রক ও নির্দ্ধারক হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এককথায় তার চরিত্রগঠন পূর্ণতালাভ করে।

ম্যাকডুগালের বর্ণিত তৃতীয় স্তরে নানা অমূর্ত্ত ধারণাকে ঘিরে সেন্টিমেণ্ট তৈরী হয়। এই সময় শিশুর মনে একটি বিশেষ সেন্টিমেণ্ট জন্মায় ম্যাকডুগাল যার নাম দিয়েছেন নৈতিক সেন্টিমেণ্ট (Moral sentiment)। এই সেন্টিমেণ্ট শিশুর মধ্যে উচিত অনুচিতের ধারণা এনে দেয়। এই নৈতিক সেন্টিমেণ্ট যাদের দুর্ব্বল থেকে যায় তাদের চরিত্রের দৃঢ়তা থাকে না। ম্যাকডুগাল নৈতিক সেন্টিমেণ্টকে দ্বিমুখী বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ যদি কোন নৈতিক বস্তুর প্রতি আমাদের অনুরাগ জন্মায় তখন তার বিপরীত-ধর্ম্মী বস্তুটির প্রতি আমাদের বিরাগ জন্মাবে। যেমন সত্যভাষণকে যে ভালবাসে অসত্যভাষণকে সে ঘৃণা করে।

এই নৈতিক সেন্টিমেণ্টটি মূলত জাগে সামাজিক জীবন-যাপনের মাধ্যমে। সম্পূর্ণ জনহীন প্রদেশে যে মানুষ হয়েছে তার মধ্যে কোনরূপ নৈতিক মান জন্মাতে পারে না। সমাজে বাস করা কালীন ব্যক্তি প্রচলিত নৈতিক গুণগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়, সেগুলির সম্বন্ধে আলোচনা শোনে, সেগুলির বাস্তব উদাহরণের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার ঘটে এবং শেষ পর্য্যন্ত নিজের আচরণের মধ্য দিয়ে সেগুলিকে সে আহরণ করে। ম্যাকডুগালের ভাষায় শিশু যে সব ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করে তাদেরই সংস্পর্শ ও প্রভাব থেকে শিশুর নৈতিক সেন্টিমেণ্ট সংগঠিত হয়।

শিশু প্রথমে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে ভালবাসে পরে ধীরে ধীরে সেই ব্যক্তির গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলিকেও সে ভালবেসে ফেলে। এইভাবে অমূর্ত্ত ধারণাগুলির প্রতি শিশুর সেন্টিমেণ্ট জন্মায়।

শিক্ষা ও চরিত্রগঠন

শিক্ষার পরিকল্পনায় চরিত্রগঠন যে একটি বিশেষ-স্থান অধিকার করে আছে একথা বলা বাহুল্য। বহু শিক্ষাবিদ চরিত্রগঠনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে বর্ণনা করে থাকেন। অবশ্য লক্ষ্যের এই সংব্যাখ্যানটি অতি সংকীর্ণ হলেও চরিত্রগঠন যে শিক্ষাপ্রক্রিয়ার একটা বড় অঙ্গ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সুচরিত্রগঠনকে আমরা এককথায় এই বলে বর্ণনা করতে পারি যে এটি হল ব্যক্তির মধ্যে এমন কতকগুলি বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করা যেগুলি ব্যক্তি নিজে, তার সমাজ এবং অনুমোদিত নৈতিক মানের দিক দিয়ে কাম্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। সুচরিত্রের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে তিনরকম ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণকে আমরা সুচরিত্রের লক্ষণ বলে বর্ণনা করে থাকি। সেগুলি হল ব্যক্তির কল্যাণসাধক গুণাবলী, সমাজের কল্যাণসাধক গুণাবলী এবং নৈতিক মাননির্ণায়ক গুণাবলী। এই তিন শ্রেণীর গুণ শিশুর মধ্যে সৃষ্টি করাকেই সুচরিত্র গঠন বলা হয়ে থাকে। মানসিক দৃঢ়তা, স্থিরচিত্ততা, প্রাক্ষোভিক সমতা, আত্মসংযম প্রভৃতি গুণগুলি পড়ে ব্যক্তির কল্যাণসাধক গুণাবলীর পর্যায়ে, সহযোগিতা, বন্ধুপ্রীতি, স্বার্থত্যাগ, সামাজিকতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি পড়ে সমাজের কল্যাণসাধক গুণাবলীর পর্যায়ে এবং সততা, সত্যবাদিতা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি পড়ে নৈতিক মাননির্ণায়ক গুণাবলীর পর্যায়ে। সুচরিত্রগঠন বলতে গেলে বোঝায় শিশুর মধ্যে এই তিনরকম বৈশিষ্ট্য গঠন করা। এদিক দিয়ে শিক্ষা প্রক্রিয়ার অবদান যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেননা একমাত্র শিশুর শিক্ষার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই তার মধ্যে বাঞ্ছিত গুণগুলি সৃষ্টি করা সম্ভবপর।

কিন্তু এই গুণগুলি আহরণ করতে শিশুকে কেমন করে সাহায্য করা যায় সেটিই হল শিক্ষার প্রকৃত সমস্যা। একদল শিক্ষাবিদ আছেন যাঁরা চরিত্র গঠনে নৈতিক অনুশাসনগুলির উপরই বিশেষ জোর দিয়ে থাকেন এবং এই গুণগুলির ব্যবহারিক উপকারিতার চেয়ে অনেক বড় বলে মনে করেন সেগুলির নিজস্ব মূল্যকে। তাঁদের মতে সৎ হওয়ার জন্যই মানুষ সৎ হবে। সৎ হওয়ার ব্যক্তিগত বা সামাজিক উপকারিতাটি নিতান্তই গৌণ। এসকল ক্ষেত্রে নীতিশিক্ষা দেওয়াটা বেশ শক্ত হয়ে ওঠে, কেননা নৈতিক অনুশাসনের স্বপক্ষে শিশুকে কোনরূপ

যুক্তি-নির্ভর ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না এবং বিকাশমান শিশুর মন অন্ধভাবে কোন কিছুই মেনে নিতে চায় না এবং প্রায়ই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে সে বিদ্রোহ জানায়।

কিন্তু নৈতিক অনুশাসনকে যদি ব্যক্তির নিজস্ব বা সামাজিক মঙ্গল অমঙ্গলের উপর ভিত্তি করা যায় তাহলে নীতিশিক্ষা দেওয়াটা অনেক বেশী সহজ হয়ে ওঠে। শিশুর মন যুক্তি-ধর্ম্মী। তার নিজের ও সমাজের কল্যাণের কথা বললে সে সহজেই তা বুঝতে পারে এবং নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতেও সম্মত হয়। যদি উচিত অনুচিতের মাপকাঠিটি ব্যক্তি ও সমাজের ভালমন্দের সঙ্গে এক করে ফেলা যায় তবে নীতিগত অনুশাসনগুলি মেনে চলতে শিশু আপত্তি করে না। কিন্তু যদি নিছক করণীয় বলে কোন কাজ করানোর চেষ্টা করা হয় তাহলে শিশুর মন তাকে মেনে নিতে চায় না এবং প্রায়ই বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

শিশুর সামাজিক ও নৈতিক বিচারবুদ্ধি বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তার চারপাশের পরিণত ব্যক্তিদের প্রভাব। শিশু যাকে শ্রদ্ধা করে বা ভালবাসে জ্ঞাতসারে এবং প্রায়ক্ষেত্রেই অজ্ঞাতসারে সে তার আচার-ব্যবহার, ভাব-চিন্তা এমন কি ভঙ্গীও অনুকরণ করে থাকে। এই ব্যাপক অনুকরণের ফলে শিশুর মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী, ধারণা প্রভৃতি বহুলাংশে তার শ্রদ্ধেনীয় ব্যক্তির সমধর্ম্মী হয়ে ওঠে এবং তার চরিত্রের ভবিষ্যৎ রূপটি এইভাবে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে।

অতএব শিশুর চরিত্রগঠনের দায়িত্ব শিশুর পরিবেশের প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই। শিশু যাতে অবাঞ্ছিত মনোভাব বা অস্বাভাবিক ধারণার অধিকারী না হয়ে ওঠে সে সম্বন্ধে শিক্ষক পিতামাতা প্রত্যেকেরই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

শিশু যাতে সুচরিত্রের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে সে সম্বন্ধে পিতামাতা শিক্ষকদের করণীয় কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করা হল।

শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত গুণগুলি সৃষ্টি করার একটি কার্য্যকরী পন্থা হল শিশুর পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ। অধিকাংশ ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণই পরিবেশের প্রভাবেই সৃষ্ট এবং পুষ্ট হয়ে থাকে। সেইজন্য শিশুর পরিবেশকে সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে তার মধ্যে বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যগুলি স্বাভাবিকভাবেই গড়ে ওঠে।

সুচরিত্র গঠনের আর একটি উল্লেখযোগ্য পন্থা হল শিশুর সামনে আচরণের আদর্শ স্থাপন করা। শিশুর মন অনুকরণধর্ম্মী। তার আশপাশে বয়স্ক ব্যক্তিদের

সে যা করতে দেখে তাই সে অনুকরণ করে। অতএব তার সামনে এমন আচরণ করতে হবে যা তাকে অভীষ্ট আচরণে প্রবৃত্ত করে।

মহৎব্যক্তিদের জীবনকাহিনীও সুচরিত্র গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। বিখ্যাত দার্শনিক, সমাজ-সংস্কারক দেশপ্রেমিক, কর্ম্মবীর প্রভৃতি ব্যক্তিদের জীবনী থেকে শিশুরা যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং বহু বাঞ্ছিত গুণ আহরণ করে থাকে।

সুচরিত্র গঠনের সবচেয়ে কার্য্যকরী পন্থাটী হল শিশুর মধ্যে সত্যকারের কল্যাণবোধ জাগান। তার নিজের এবং তার সমাজের কল্যাণের জন্য কি ধরনের আচরণ করা উচিত এবং কি ধরনের আচরণ করা উচিত নয় এই সচেতনতা যদি তার মধ্যে জাগান যায় তাহলে অভীষ্ট আচরণগুলি তাকে শেখান শক্ত হয় না। কোন অবাস্তব নৈতিক মানের দোহাই দিয়ে বা কোন অনির্দ্দিষ্ট আদর্শের কথা বলে শিশুকে প্রভাবিত করার চেয়ে তার নিজের বিচারবুদ্ধির সাহায্যে তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করা অনেক বেশী ফলপ্রদ।

নিছক বক্তৃতা বা উপদেশের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষাদান ফলপ্রদ হয় না বরং প্রায় ক্ষেত্রেই বিপরীত ফল দেখা দেয়। একমাত্র বাস্তব আচরণের মধ্যে দিয়ে কার্য্যকরী নৈতিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব।

দৃষ্টান্ত সকল সময়েই উপদেশের চেয়ে ভাল। কাহিনী, বাস্তব ঘটনা, ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ইত্যাদির মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া চলতে পারে।

শৃঙ্খলাবোধ সুচরিত্র গঠনের একটা বড় সহায়ক। তবে বহিঃশৃঙ্খলা উপকারের চেয়ে অপকার বেশী করে। সবচেয়ে কার্য্যকরী হল স্বতঃপ্রণোদিত শৃঙ্খলা।

যে সকল গুণাবলী শিশুর পক্ষে আহরণ করা উচিত বলে মনে করা হয় সেগুলিকে যেন তার কাছে কতকগুলি অমূর্ত্ত ধারণার রূপে উপস্থাপিত করা না হয়। সেগুলির সামাজিক সার্থকতাটুকুও শিশুর কাছে পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত।

সহপাঠক্রমিক কার্য্যাবলী, যৌথপ্রচেষ্টা, খেলাধূলা, সম্মিলিত উদ্যোগ ইত্যাদির মাধ্যমে অনেক অভীষ্ট আচরণবৈশিষ্ট্য শিশুকে শেখান যায়।

প্রশ্নাবলী

1. Define 'character'. What should the educator do in developing a child's character? (B. T. 1951)

Ans. (পৃঃ ২২৪—পৃঃ ২৩২)

ষোল

অভ্যাস (Habit)

সাধারণত প্রত্যেক আচরণে, সে ছোট হোক আর বড় হোক, দুটি বস্তু লাগে, একটি মানসিক প্রয়াস আর একটি মনোযোগ। একথা অবশ্য আমাদের সহজাত আচরণগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন, শরীররক্ষণমূলক আচরণগুলি বা রিফ্লেক্সগুলি সম্পন্ন করতে আমাদের নিজস্ব কোন প্রচেষ্টা বা মনোযোগ লাগে না। সেগুলি যন্ত্রের মত নিজে নিজে সম্পন্ন হয়ে যায়।

কিন্তু সাধারণ আচরণও বার বার করতে করতে এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌঁছয় যখন সেটি সম্পন্ন করতে আর মানসিক প্রয়াস বা মনোযোগ কিছুই লাগে না, রিফ্লেক্স বা অন্যান্য সহজাত আচরণের মত নিজে নিজেই সম্পন্ন হতে পারে। এই ধরনের আচরণকেই অভ্যাস নাম দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন, প্রথম যখন কেউ সাঁতার কাটতে বা টাইপ করতে শেখে তখন তাকে প্রচুর প্রয়াস ও মনোযোগ প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু যখন একবার সাঁতার কাটা বা টাইপ করা তার অভ্যাসে দাঁড়ায় তখন কোনরূপ প্রচেষ্টা বা মনোযোগের সাহায্য না নিয়েই সে অনায়াসে ঐ কাজগুলি করতে পারে।

অভ্যাস হল আচরণের সম্পূর্ণ ও ত্রুটিহীন রূপ। যেমন, প্রথম যখন ব্যক্তি সাঁতার কাটা শেখে তখন তার আচরণের প্রচুর মধ্যে অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি থাকে কিন্তু যখন সাঁতার কাটা তার অভ্যাসে দাঁড়ায় তখন তার আচরণ নিখুঁত, সাবলীল ও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। এর কারণ হল, কোন আচরণের যখন অতি-শিখন ঘটে তখনই সেটি অভ্যাসে পরিণত হয়। অভ্যাস মানেই হল অতি-শেখা কোন আচরণ।

সেইজন্যই অভ্যাস সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন পুনরাবৃত্তি বা বার বার প্রচেষ্টা। অধিকাংশ অভ্যাস প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখা। থর্নডাইকের অনুশীলনের সূত্রটির (Law of Exercise) এখানে প্রয়োগ করে বলতে পারি যে অভ্যাস গঠন নির্ভর করে আচরণের পুনরনুষ্ঠানের উপর।

অবশ্য এই পুনরনুষ্ঠান কাজটি আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হতে পারে। কোন কোন অভ্যাস আমরা স্বেচ্ছায় গঠন করি, আবার কোন কোন

অভ্যাস আমাদের অজ্ঞাতসারে নিজে নিজেই তৈরী হয়ে যায়। শেষোক্ত ধরনের অভ্যাসগুলি অনুবর্ত্তন (conditioning) প্রক্রিয়া থেকে জন্মায় এবং আমাদের দৈনন্দিন আচরণের একটা বড় অংশ অধিকার করে থাকে। কথা বলা, খাওয়া, শোওয়া, চলাফেরা, ভাষার ব্যবহার ইত্যাদি কার্য্যঘটিত যে সকল অভ্যাস আমাদের মধ্যে দেখা যায় তার অধিকাংশই অনুবর্ত্তন-প্রসূত।

অভ্যাস ও প্রবৃত্তি

অভ্যাসের সঙ্গে প্রবৃত্তির অতি নিকট সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধে আলোচনা প্রথম খণ্ডের ৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অভ্যাস গঠনের নিয়ম

যখন কোন আচরণ যান্ত্রিকতার স্তরে গিয়ে পৌছয় তখন তাকে অভ্যাস বলে। অভ্যাস গঠনের কতকগুলি নিয়মের আমরা উল্লেখ করতে পারি।

প্রথমত, যে কোন অভ্যাস গঠনের পিছনে একটি মানসিক প্রস্তুতি থাকার প্রয়োজন। কোন আচরণকে অভ্যাসে পরিণত করতে হলে যে প্রয়াস বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে সেটি সম্পন্ন করার উপযোগী অনুকূল মানসিক অবস্থা থাকা অপরিহার্য্য। এই জন্যেই যে সব আচরণ আমাদের কাছে তৃপ্তিকর বা সন্তোষজনক সেই সব আচরণ সহজেই অভ্যাসে পরিণত হয়। যে সব আচরণ আমাদের কাছে তৃপ্তিকর বা সুখপ্রদ নয় সেগুলি অভ্যাসে পরিণত করতে যথেষ্ট মানসিক প্রচেষ্টার দরকার। শিশুর মধ্যে কোন অভ্যাসগঠন করতে হলে তার মধ্যে সেই অভ্যাসের অনুকূল মানসিক প্রস্তুতি যাতে তৈরী হয় সেটি দেখা সর্ব্বাগ্রে দরকার।

দ্বিতীয়ত, যে আচরণটি অভাসে পরিণত হয় সেই আচরণটির সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যক্তির মধ্যে আগে থেকেই সচেতনতা থাকবে। ব্যক্তির জ্ঞাত মনের কাছেই হোক আর অজ্ঞাত মনের কাছেই হোক ঐ আচরণটির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা না থাকলে সেটি অভ্যাসে পরিণত হতে পারে না। এইজন্য শিশুর মধ্যে কোন অভ্যাস গঠন করতে হলে ঐ আচরণটির সার্থকতা বা মূল্য সম্পর্কে শিশুকে প্রথমেই সচেতন করার দরকার। এই সার্থকতা-বোধ বা সচেতনাটি জাগলেই আচরণটি অভ্যাসে পরিণত হয়।

তৃতীয়ত, পুনরনুষ্ঠান বা বার বার আচরণ সমস্ত অভ্যাসের ক্ষেত্রেই অপরিহার্য্য। আচরণকে সহজসাধ্য, ত্রুটিহীন, ও যান্ত্রিক করে তুলতে হলে ব্যক্তিকে ঐ আচরণটি বারবার অনুশীলন করতে হয়।

চতুর্থত, প্রত্যেক অভ্যাসই প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখা। বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে আচরণের দোষ ও অসম্পূর্ণতাগুলি ধীরে ধীরে দূর হয়ে যায় এবং আচরণটি ত্রুটিহীন ও নির্ভুল অভ্যাসে পরিণত হয়।

পঞ্চমত, অভ্যাস মাত্রেই এক ধরনের শিখন। থর্নডাইকের ফললাভের সূত্র অনুযায়ী যে অভ্যাসটি গঠনে ব্যক্তির মনে সন্তুষ্টি আসে সে অভ্যাসটি সহজ গঠিত হয়। আর যে অভ্যাস গঠনে ব্যক্তির মধ্যে বিরক্তি আসে সে অভ্যাস সহজে গঠিত হয় না। এই জন্য শিশুর মধ্যে কোন অভ্যাস গঠন করতে হলে সেই অভ্যাসটির ফল যাতে শিশুর কাছে তৃপ্তিকর হয়ে ওঠে সেদিকে যত্ন নিতে হবে।

ষষ্ঠত, অনেক অভ্যাস নিছক যান্ত্রিক উপায়ে গঠিত হয়ে যায়। এই অভ্যাসগুলি প্রকৃতপক্ষে অনুবর্ত্তন প্রক্রিয়া থেকে জন্মলাভ করে। আবার অনেক অভ্যাস আছে যেগুলি ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে এমন কি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও গঠিত হয়ে যায়। এগুলিও অনুবর্ত্তন প্রক্রিয়ার অবদান। পরিবেশের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ করে অনুবর্ত্তনের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত অভ্যাস সৃষ্টি করা খুব সহজেই যেতে পারে।

শিক্ষা ও অভ্যাস

অভ্যাস আমাদের অগ্রগতির বাহক। পুরানো আচরণগুলি অভ্যাসে পরিণত হলেই আমাদের পক্ষে নতুন আচরণ শেখার চেষ্টা করা ও তাতে মনোযোগ দেওয়া সহজ হয়ে ওঠে। প্রত্যেক আচরণেই যদি সকল সময় একই পরিমাণ প্রচেষ্টা ও মনোযোগ দিতে হত তাহলে আমাদের মানসিক শক্তির পক্ষে অধিকসংখ্যক আচরণ শেখা সম্ভব হত না এবং আমাদের অগ্রগতির পথ অবরুদ্ধ হয়ে যেত। যেমন অক্ষর লেখার অভ্যাস হলে শব্দ লেখা সম্ভব হয়, শব্দ লেখার অভ্যাস থেকে বাক্য লেখা সম্ভব হয় এবং বাক্য লেখা যখন অভ্যাসে পরিণত হয় তখনই মনের ভাষা অবাধে প্রকাশ করা বা সাহিত্য-কবিতা ইত্যাদি সৃষ্টি করা সহজ হয়ে ওঠে। যার অক্ষর লেখার অভ্যাস গঠন হয় নি তার পক্ষে পরের কাজগুলি করা সম্ভব হয় না।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার অগ্রগতির জন্য অভ্যাস-গঠন অপরিহার্য্য। শিক্ষণীয় আচরণগুলি যত অভ্যাসে পরিণত হবে শিক্ষার্থীর পক্ষে ততই নতুন শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। অভ্যাসকে কেবলমাত্র একটা যান্ত্রিক আচরণ বলে ধরা ভুল হবে। জন ডিউই অভ্যাস-গঠনকে ব্যক্তির ধারাবাহিক শিক্ষাপ্রবাহের একটি সক্রিয় অঙ্গ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে যখন একটি অভ্যাসের সৃষ্টি হয় তখন সেই অভ্যাস ব্যক্তির মধ্যেই পরিবর্ত্তন এনে দেয় এবং পরবর্ত্তী শিক্ষার প্রকৃতিও এই পরিবর্ত্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ওঠে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষাকে অভ্যাস দু'দিক দিয়ে সাহায্য করে, প্রথম শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা ও মনোযোগের অপচয় বাঁচিয়ে তাকে নতুন শিক্ষাগ্রহণে সমর্থ করে এবং দ্বিতীয় শিক্ষার্থীর মানসিক সংগঠনে পরিবর্ত্তন এনে তার পক্ষে ভবিষ্যৎ শিক্ষা গ্রহণকে সহজ করে তোলে।

কিন্তু যে অভ্যাস পুরোপুরি যান্ত্রিক অর্থাৎ যে অভ্যাস উদ্দেশ্যহীন ভাবে আহরিত সে অভ্যাস শিক্ষার প্রতিবন্ধক। অনেক সময় ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা-পরিকল্পনার চাপে এমন কতকগুলি অভ্যাস শিশু অর্জ্জন করে যেগুলি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন ও যান্ত্রিক। সেগুলি শিশুর অগ্রগতির পথে পরম বিঘ্ন হয়ে ওঠে এবং শিক্ষার সহজ অনুষ্ঠানে বাধার সৃষ্টি করে। অতএব দেখতে হবে, শিশু যখন কোন অভ্যাস আহরণ করে তখন যেন সে সেই অভ্যাসের সার্থকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন থাকে। উদ্দেশ্যহীন ও অন্ধভাবে অর্জ্জিত অভ্যাস মানসিক শক্তি ও প্রচেষ্টার নিছক অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়।

পিতামাতা, শিক্ষকদের অবহেলার জন্য শিশু এমন কতকগুলি অবাঞ্ছনীয় অভ্যাস আহরণ করতে পারে যেগুলি তার সুষ্ঠু ব্যক্তিসত্তার গঠনের পক্ষে সম্পূর্ণ ক্ষতিকর। যে সকল ছেলেমেয়েদের শৈশবের আচরণগুলির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় না তারা বড় হয়ে কথা বলা, পড়া, লেখা, পোষাক পরা, শারীরিক স্বাস্থ্যের নিয়মকানুন মানা ইত্যাদি আচরণগুলি সম্বন্ধে নানা ত্রুটিপূর্ণ অভ্যাস অর্জ্জন করে এবং বড় হয়ে সেগুলিকে পরিবর্ত্তন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। যেমন অশুদ্ধ উচ্চারণ করা, হাতের লেখা খারাপ হওয়া, ঠিক মত পড়তে না পারা, অপরের সঙ্গে উপযুক্ত আচরণাদি করতে না পারা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার নিয়মাদি না মানা ইত্যাদি অবাঞ্ছিত অভ্যাসগুলি বড়দের অবহেলার জন্যই শিশুরা আহরণ করে থাকে।

এত গেল আচরণমূলক অভ্যাসের কথা। এছাড়া আরও দু'শ্রেণীর অভ্যাস আছে, যথা, চিন্তার অভ্যাস এবং ইচ্ছার অভ্যাস। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দু'শ্রেণীর অভ্যাসের গুরুত্ব যথেষ্ট। চিন্তা করার মধ্যেও প্রচুর প্রচেষ্টা ও মনোযোগ লাগে। চিন্তন হল প্রতীকমূলক আচরণ। বিভিন্ন প্রতীকগুলিকে সুসংহতভাবে ব্যবহার করার উপর সুষ্ঠু চিন্তন নির্ভর করে। চিন্তনের প্রক্রিয়ার উপর যার নিয়ন্ত্রণ নেই তার চিন্তা পরস্পরবিরোধী, অসংবদ্ধ ও অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি চিন্তনের অভ্যাস করা যায় তাহলে দেখা যাবে সেখানেও প্রয়াস ও মনোযোগ ছাড়াই চিন্তা করা সম্ভব হচ্ছে। দ্বিতীয়ত চিন্তনের মধ্যে সামঞ্জস্য, সংহতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হয় তখনই, যখন চিন্তন কার্য্যটি অভ্যাসের পর্য্যায়ে উঠতে পারে। সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তা করার অভ্যাস থাকলে চিন্তন আয়াসহীন ও সার্থক হয়ে ওঠে।

তেমনই, ইচ্ছা প্রয়োগের অভ্যাসও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইচ্ছা প্রয়োগের অভ্যাস থাকলে দ্বিধা, অনিশ্চয়তা, সংশয় প্রভৃতির দ্বারা কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকে না। প্রায়ই দেখা গেছে যে বিভিন্ন চিন্তার পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ফলে ব্যক্তির পক্ষে সুনির্দ্ধারিত কর্ম্মসূচী অনুসরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ইচ্ছার অভ্যাসই একমাত্র ব্যক্তির ইচ্ছাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনিশ্চিত পথে পরিচালিত করতে পারে। যে ব্যক্তির ইচ্ছাপ্রয়োগের অভ্যাস নেই তার মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা থাকে না এবং তার পক্ষে কোনও সুপরিকল্পিত ও সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করা সম্ভব হয় না।

কু-অভ্যাস দূর করার উপায়

শিশুর কোন বিশেষ কু-অভ্যাস দূর করতে হলে নীচের উপায়গুলি অবলম্বন করা দরকার।

প্রথমত, অভাসটির অপকারিতা সম্বন্ধে শিশুকে অবহিত করতে হবে। অভ্যাসটি যে দূর করা দরকার এ বোধ তার মধ্যে প্রথমে জাগাতে হবে।

দ্বিতীয়ত, কোন অভ্যাসকে নষ্ট করতে হলে যথেষ্ট মানসিক শক্তি বা ইচ্ছার প্রয়োজন। শিশু যাতে সেই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে পারে তার জন্য উপযোগী মানসিক দৃঢ়তা ও সংকল্প তার মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে।

তৃতীয়ত, প্রত্যেক অভ্যাসের আচরণই ব্যক্তির কাছে তৃপ্তিদায়ক। সেজন্য কোন অভ্যাস দূর করতে হলে সেটিকে শিশুর কাছে বিরক্তিকর করে তুলতে

হবে। অর্থাৎ শিশু যখন সেই অভ্যাসটি আচরণ করবে তখন যেন তার মধ্যে বিরক্তি বা অসন্তোষ জাগে। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই অভ্যাসটি দূরীভূত হবে। সমালোচনা, বোঝান, মনোবিজ্ঞানমূলক শাস্তি, নিন্দা ইত্যাদির সাহায্যে শিশুর মধ্যে এই বিরক্তি বা অসন্তোষের মনোভাবের সৃষ্টি করা যায়। তবে এই পন্থাটি যথেষ্ট সংযতভাবে অবলম্বন করতে হবে, কেননা মাত্রা বেশী হয়ে গেলে বিপরীত ফল দেখা দেবে।

চতুর্থত, অভ্যাস মাত্রেই অনুবর্ত্তন প্রক্রিয়ার ফল। অতএব যদি অভ্যাস আচরণের মাঝে মাঝে বাধা পাওয়া যায় তবে সে অভ্যাস দুর্ব্বল হয়ে ওঠে। এইজন্য শিশু যখন কোন অবাঞ্ছিত অভ্যাস সম্পন্ন করবে তখন তার আচরণে বাধার সৃষ্টি করা যেতে পারে।

পঞ্চমত, কু-অভ্যাস দূর করার একটি প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে তার বিপরীত অভ্যাসটি গঠন করা। শিশুর যে অভ্যাসটি দূর করতে হবে তার বিপরীতধর্ম্মী অভ্যাসটি যদি তার মধ্যে গঠন করা যায় তাহলে ঐ অবাঞ্ছিত অভ্যাসটি নিজে নিজেই চলে যাবে।

ষষ্ঠত, অনেক সময় বিশেষ বিশেষ পরিবেশের প্রভাবেই নানা অভ্যাস গড়ে ওঠে। এই সব ক্ষেত্রে পরিবেশের পরিবর্ত্তন করাই অভ্যাসটি দূর করার প্রকৃষ্ট উপায়।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the influence of habit on the life of a child. How are habits formed ? How to eradicate bad habits ?

সতেরো

অনুকরণ (Imitation)

প্রাণীমাত্রের আচরণের প্রকৃতি নির্দ্ধারণে অনুকরণ অতি উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ছোট বড় উন্নত সকল প্রকার প্রাণীর বহু আচরণই তাদের সমাজের অন্যান্য সদস্যদের অনুকরণে শেখা। যে কোন ছোট শিশুর আচরণ-সংগঠনের গতিধারা লক্ষ্য করলে আমরা অনুকরণের অসীম গুরুত্বের পরিচয় পাবো।

অনুকরণের এই ব্যাপক প্রভাবের জন্য বহু মনোবিজ্ঞানী অনুকরণকে সহজাত প্রবৃত্তির গোষ্ঠিভুক্ত করেছেন। ম্যাকডুগাল, ড্রেভার প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীরা অনুকরণকে সাধারণ মানসিক প্রবণতা বলে বর্ণনা করেছেন। থর্নডাইক প্রভৃতি আর একদল মনোবিজ্ঞানী অবশ্য অনুকরণকে সহজাত প্রবণতা বলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে যে সকল আচরণকে অনুকরণ-জাত বলে আমরা বর্ণনা করি সেগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখা আচরণ এবং অভ্যাসের ফল।

অনুকরণকে একটি সুনির্দ্দিষ্ট প্রবৃত্তি বলা হোক আর নাই হোক, এ কথা অনস্বীকার্য্য যে প্রাণীমাত্রের মধ্যেই অনুকরণের স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে পরিবেশের সঙ্গে সার্থক এবং কার্য্যকরী সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা থেকেই অনুকরণের জন্ম। জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে ব্যক্তিমাত্রেই তার চতুষ্পার্শ্বের পারিবেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা সর্ব্বদাই করে চলেছে। সেজন্য যখন সে তার চেয়ে বড় এবং অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন বিশেষ আচরণ করতে দেখে তখন সেও ঐ ধরনের পরিস্থিতিতে ঐ আচরণটির অনুষ্ঠান করার চেষ্টা করে, অর্থাৎ সে ঐ আচরণটির অনুকরণ করে। এইজন্য আমরা আমাদের চেয়ে ছোট বা কোন কম অভিজ্ঞ ব্যক্তির আচরণ অনুকরণ করি না। যার আচরণের কার্য্য-কারিতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ভাল তারই আচরণ আমরা অনুকরণ করে থাকি। শিশুর ক্ষেত্রে সকলের আচরণই অনুকরণীয় এবং সেজন্য সে ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে সকলের আচরণই অনুকরণ করে থাকে।

কিন্তু যত সে বড় হতে থাকে ততই তার নির্ব্বিচারে অনুকরণ করার অভ্যাসটি কমে আসে এবং পরে সে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির আচরণ ছাড়া আর অনুকরণ করে না। পরিণত বয়সে অনুকরণীয় ব্যক্তি ও আচরণের সংখ্যা আরও কমে যায়।

অনুকরণের শ্রেণীবিভাগ

অনুকরণ দু'শ্রেণীর হতে পারে অচেতন অনুকরণ এবং সচেতন অনুকরণ। বহু আচরণ আছে যা শিশু সম্পূর্ণ তার অজ্ঞাতসারেই অপরের অনুকরণ করে শেখে। তার এই অনুকরণের মধ্যে কোন সজ্ঞান প্রচেষ্টা নেই। শিশুর ভাষা আচার-ব্যবহার, অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি বহু আচরণই বড়দের অনুকরণে শেখা এবং সে অনুকরণ সম্পূর্ণ অচেতন প্রকৃতির। সচেতন অনুকরণেরও দৃষ্টান্ত শিশুর আচরণের মধ্যে অজস্র পাওয়া যায়। পোষাক পরার পদ্ধতি, কথা বলার ভঙ্গী, চলাফেরার কায়দা ইত্যাদি বহু আচরণ শিশু তার সঙ্গীসাথী বা বড় বয়স্ক ব্যক্তিদের নকল করে শেখে।

অনুকরণকে আবার এক দিক দিয়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন, দৈহিক আচরণের অনুকরণ, চিন্তা বা ভাবের অনুকরণ ও অনুভূতির অনুকরণ।

অপরের বাহ্যিক আচরণ যেমন অনুকরণ করা যায় তেমনি অপরের চিন্তাধারা এবং অনুভূতিরও অনুকরণ করা যায়। অপরের চিন্তা বা ভাবের অনুকরণের আর এক নাম হল অনুভাবন (Suggestion)। তেমনই অপরের অনুভূতি বা প্রক্ষোভের অনুকরণকে সমানুভূতি (Sympathy) বলা হয়ে থাকে।

বাহ্যিক আচরণের অনুকরণ শিশুর ব্যক্তিত্বগঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শক্তিরূপে কাজ করে থাকে। বিশেষ করে সে তার অজ্ঞাতসারে বহু আচরণ অপরের দেখাদেখি শেখে ও সম্পন্ন করে। এই সময়ে শিশুর আচরণ-সংগঠনে অনুকরণ-প্রয়াসের মূল্য অসীম। বহু অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য আচরণ সে এই সময় অচেতন অনুকরণের মাধ্যমে শেখে।

কিছুটা বড় হলে সচেতন অনুকরণ কার্য্যকরী হয়। স্কুল জীবনে সচেতন অনুকরণের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। এই সময় তার মধ্যে বিশেষ কোন ব্যক্তির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও শ্রদ্ধা দেখা দেয় এবং প্রায় দেখা যায় যে শিশু সেই বিশেষ ব্যক্তির আচরণ ও চিন্তাধারা অনুকরণ করে চলেছে। শিশুমাত্রেরই

প্রথম অনুকরণের পাত্র হল পিতামাতা, কিন্তু পরিণত অবস্থায় তার আসক্তি সাধারণত কোন শিক্ষক বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি উদ্দিষ্ট হয়ে যায় এবং তাঁর আচরণধারা শিশু অনুকরণ করে।

সেজন্য পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তির আচরণ শিশুর পক্ষে অনুকরণ করা সম্ভবপর তাঁদের এ ব্যাপারে দায়িত্ব যে অসীম সে কথা বলা বাহুল্য। শিশুর সামনে এমন আচরণ দৃষ্টান্তস্বরূপ স্থাপন করা উচিত নয় যেটা তার ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াতে পারে।

শিশুর অনুকরণ প্রয়াস শিক্ষার পক্ষে অনুকূল কি প্রতিকূল এবং তাকে উৎসাহ দেওয়া আমাদের উচিত কি অনুচিত এ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। একদল মনোবিজ্ঞানী আছেন যাঁরা শিশুর অনুকরণ প্রয়াসকে শিক্ষার পরিপন্থী বলে মনে করেন এবং কোন দিক দিয়েই তার পরিপোষণ বা উৎসাহ-দানকে তাঁরা সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে অনুকরণমাত্রেই যান্ত্রিক ও অন্ধ আচরণ। এবং তার ফলে অনুকরণকারী শিশুর নিজস্ব সৃজনমূলক প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়ে যায়। এবং সে আত্মনির্ভর হয়ে কিছুই করতে পারে না। শিশুর অনুকরণ প্রয়াসকে অবরুদ্ধ করা এবং তার স্বাধীন আচরণ প্রয়াসকে পরিপুষ্ট করাকেই তাঁরা শিক্ষার প্রধান কর্ত্তব্য বলে বর্ণনা করেন।

এই মনোবিজ্ঞানীদের যুক্তির সারবত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু শিশুর স্বাধীন প্রচেষ্টা-সংগঠনে অনুকরণের যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে সেটি তাঁরা এখানে উপেক্ষা করছেন। সৃজনমূলক প্রয়াস মাত্রেরই সুরু অনুকরণে, তার পরিসমাপ্তি যদিও স্বাধীন আচরণে। কোনও স্রষ্টা প্রথম হতেই একেবারে আত্মনির্ভর হয়ে সৃষ্টি করতে পারেন না। তাঁর সৃজন-প্রয়াস কোন না কোন পূর্ব্বগামীর প্রদর্শিত পথ ধরে প্রথমে অগ্রসর হয় কিন্তু কিছুটা অগ্রসর হবার পর সে সম্পূর্ণ নিজস্ব ও নতুন পথ আবিষ্কার করে নেয় এবং তার পরিসমাপ্তি ঘটে নতুন এবং অপ্রত্যাশিত কিছুর সৃষ্টিতে। অতএব অনুকরণপ্রয়াস স্বাধীন প্রয়াসের বিরোধী নয়, বরং তার সহায়ক ও অপরিহার্য্য সোপানবিশেষ।

কিন্তু যেখানে আচরণ তার প্রাথমিক অনুকরণের গণ্ডী পার হয়ে নিজস্ব স্বাধীন পথ খুঁজে নিতে না পারে সেখানে অনুকরণ ব্যক্তিসত্তার সুগঠনের বিরোধী। সেখানে আচরণ সত্যই যান্ত্রিক ও অন্ধ হয়ে যায় এবং শিশুর স্বাতন্ত্র্য বিকাশ লাভ করে না। অতএব সুশিক্ষার কার্য্যসূচী হচ্ছে শিশুর আচরণধারাকে

ধীরে ধীরে অনুকরণের গণ্ডী থেকে মুক্ত করে উদ্ভাবন বা সৃজনের পথে পরিচালিত করা। শিশুর অনুকরণপ্রয়াসকে রুদ্ধ করা কখনই উচিত নয় বরং তাকে বিচক্ষণ-তার সঙ্গে পরিচালিত করে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে সাহায্য করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

এতেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে শিক্ষায় অনুকরণের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শিশুর ব্যক্তিসত্তাগঠনে অনুকরণপ্রয়াসের নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর।

অনুভাবন (Suggestion)

একজনের ভাব বা চিন্তাধারা অপরের মনে সঞ্চালিত করার নাম অনুভাবন। দেখা গেছে যে মানুষমাত্রেরই মনে অল্পবিস্তর অপরের দ্বারা প্রভাবিত হবার প্রবণতা আছে। একে মানব মনের অনুভাবনীয়তা (Suggestibility) বলা হয়। আমাদের মানসিক সংগঠনের প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্দ্ধারণে অনুভাবনের প্রচুর প্রভাব আছে। আমাদের বিশ্বাস, ধারণা, সংস্কার প্রভৃতির অধিকাংশই অনুভাবনের প্রভাব থেকে প্রসূত। আমাদের মনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে অপরের চিন্তার ধারা আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারেই এবং অনেক সময় নির্ব্বিচারে গ্রহণ করি। এক মন থেকে অপর মনে ভাব বা চিন্তার সঞ্চালন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভাষার মারফৎ হয়ে থাকে, তবে অঙ্গভঙ্গী বা অন্যান্য পন্থাতেও এই সঞ্চালন হতে পারে।

শিশুর বিকাশমান মনে অনুভাবনের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। তার আশ-পাশের পরিণত ব্যক্তিদের চিন্তাধারা তার অজ্ঞাতসারেই তার চিন্তাধারার গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে। আরও বড় হলে শিশু তখন কোন বিশেষ ব্যক্তিকে আদর্শ মানুষ বলে ধরে নেয় এবং তাঁর চিন্তা ও ভাবধারা তার মানসিক সংগঠনের প্রধানতম উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণত স্কুলজীবনে দেখা যায় যে কোন বিশেষ শিক্ষক বা শিক্ষিকা শিশুর আদর্শ মানুষের স্থান অধিকার করে থাকেন এবং শিশু তার চিন্তা ও জীবনদর্শন থেকে সুরু করে কথনভঙ্গী, চলন-বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিরও অনুকরণ করে। প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে এই ধরনের অনুকরণ তাদের আচরণমূলক, প্রাক্ষোভিক, চিন্তামূলক ইত্যাদি সকলপ্রকার সংগঠনেরই প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

অনুভাবনের প্রভাব পরিণত বয়সেও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত সাহিত্যিক সমালোচক, জননায়ক, সমাজ-সংস্কারক প্রভৃতি ব্যক্তিদের চিন্তাধারা আমরা অজ্ঞাতসারেই আমাদের নিজস্ব করে নিই। সময় সময় দেখা যায় যে কোন বিশেষ চিন্তানায়ক বা জননেতার ভাবধারা একটি সমগ্র জাতিকে প্রভাবিত করে তোলে। একে সামগ্রিক অনুভাবন বলা হয়।

জনমত সৃষ্টিতেও অনুভাবনের হস্তক্ষেপ যথেষ্ট, বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারার সঞ্চালনে। বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও অনুভাব-প্রক্রিয়াটির প্রভাব অত্যন্ত অধিক। বিজ্ঞাপনের ভাষা, বক্তব্য, আবেদন, উপস্থাপন-শৈলীর দ্বারা বস্তুটির প্রতি আমরা অজ্ঞাতসারেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। জার্ম্মানীর বিখ্যাত যুদ্ধকালীন প্রচারবিদ্ গোয়েবলসের ভাষায় মিথ্যা কথাও যদি বার বার এবং বেশ জোরের সঙ্গে বলা যায় তবে সেটিকে মানুষ সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়। এটি অনুভাবনের একটি দৃষ্টান্ত।

সমানুভূতি (Sympathy)

অপরের অনুভূতির অনুকরণের নাম হল সমানুভূতি। এটিকেও অনেকে সহজাত প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা করে থাকেন। অপরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করা বা অপরের সুখে সুখ অনুভব করা ইত্যাদি হল সমানুভূতির উদাহরণ। সমানুভূতি যেমন জ্ঞাতসারে হয় তেমনই ব্যক্তির অজ্ঞাতসারেও হতে পারে। পরিচিত বা প্রিয়জনের দুঃখে দুঃখিত হওয়ার পেছনে মনের একটা সক্রিয়তা আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অপরিচিত ব্যক্তির প্রক্ষোভ আমাদের মধ্যে সঞ্চালিত হতে পারে। বিদ্যালয়ে সার্থক সমাজজীবন গঠনের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই সমানুভূতি জাগিয়ে তোলা বিশেষভাবে প্রয়োজন। ভয়ের ক্ষেত্রেও অনুভূতির এই স্বতঃ-প্রণোদিত সঞ্চালন দেখা যায়। জনসমষ্টির এক অংশ কোন কারণে ভয়গ্রস্ত হলে অন্যান্য অংশেও দেখতে দেখতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

সমানুভূতি আমাদের সামাজিক সংগঠনের প্রাণস্বরূপ। মানুষে মানুষে অনুভূতির ঐক্যই আমাদের সমাজজীবনকে একসাথে বেঁধে রেখেছে এবং একজনকে অপরের জন্য স্বার্থত্যাগ বা দুঃখবরণ করতে প্রবৃত্ত করেছে।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the different types of imitation. What is the importance of imitation in the child's life. Should imitation be encouraged in children ?

   Ans. (পৃঃ২৩৯—২৪৩পৃঃ)

2. Write notes on :

   Sympathy and suggestion.

আঠারো

যৌথ মনোবিজ্ঞান (Group Psychology)

মনোবিজ্ঞান হল আচরণের বিজ্ঞান। ব্যক্তির আচরণের স্বরূপ, কারণ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করাই তার কাজ। মানব আচরণের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল এর বৈচিত্র্য ও পরিবর্ত্তনশীলতা। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষ বিভিন্ন আচরণ করে থাকে। দেখা গেছে যে একা বা সঙ্গীহীন অবস্থায় ব্যক্তি যে ধরনের আচরণ করে সেই আচরণ এবং দলবদ্ধ অবস্থায় থাকার সময় তার আচরণের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তি যখন দলের দ্বারা প্রভাবিত হয় না তখন তার আচরণের প্রকৃতি একরকম থাকে আর যখন সে দলের দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন তার আচরণ আর একরকম হয়। দলবদ্ধ অবস্থায় থাকার সময় ব্যক্তির মানসিক ও প্রাক্ষোভিক সংগঠনের মধ্যে বিরাট একটা পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। তার ফলে তার মনোভাব, চিন্তাধারা, বিচারবুদ্ধি, নৈতিক মান, প্রক্ষোভ প্রভৃতি গুরুতরভাবে বদলে যায় এবং তার স্বাভাবিক আচরণ-ধারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন আসে।

দলবদ্ধ মানুষের আচরণের প্রকৃতি সঙ্গীহীন মানুষের আচরণের প্রকৃতি থেকে এতই পৃথক যে একই মনোবৈজ্ঞানিক সূত্র দিয়ে এই দু'ধরনের আচরণের ব্যাখ্যা করা যায় না। স্বাভাবিক অবস্থায় যে সব নিয়মকানুন অনুযায়ী মানব আচরণ সম্পন্ন হয়, দলবদ্ধ অবস্থায় সে সব নিয়মকানুন প্রযোজ্য হয় না। তার ফলে দলবদ্ধ ব্যক্তির আচরণের ব্যাখ্যার জন্য নতুন এক মনোবিজ্ঞান সৃষ্ট হয়েছে। একেই যৌথ মনোবিজ্ঞান (Group Psychology) নাম দেওয়া হয়েছে।

মনোবিজ্ঞানমূলক দলের বৈশিষ্ট্য

কতকগুলি ব্যক্তি একস্থানে সমবেত হলেই মনোবিজ্ঞানের ভাষায় তাকে দল বলা যায় না। কোন কর্ম্মব্যস্ত দিনে বড় রাস্তার মোড়ে অফিস যাবার সময় বহুলোককে একসঙ্গে একই জায়গায় দেখা যায়। কিন্তু এই লোকের সমাবেশকে দল বলা যাবে না। কেননা এই সমাবেশের প্রতিটি ব্যক্তিই নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজন মত অপরের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। অপরের কাজ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু যখনই রাস্তায় কোন দুর্ঘটনার ফলে এই লোক-

গুলিই সেখানে সমবেত হবে তখন তারা একটি মনোবিজ্ঞানমূলক দলের সৃষ্টি করবে। কেননা তখন প্রতিটি ব্যক্তিরই চিন্তা, অনুভূতি, আচরণ ঐ দুর্ঘটনার বিষয়বস্তুটিকে কেন্দ্র করে ঐক্যলাভ করবে। যদিও তাদের এই একতা সাময়িক এবং অল্পক্ষণ স্থায়ী এবং অচিরেই তারা নিজের নিজের কাজে চলে যাবে তবুও তারা অল্পক্ষণের জন্য একটি মনোবিজ্ঞানমূলক দল তৈরী করেছে। এই ধরনের দলকে জনতা (crowd) বলা হয়। স্থায়িত্বের দিক দিয়ে দল বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। জনতার চেয়ে অধিকক্ষণ স্থায়ী দল হল কোন বক্তৃতা বা আলোচনার শ্রোতৃর দল বা সিনেমা থিয়েটারের দর্শকের দল ইত্যাদি। তার চেয়ে স্থায়ী দল হল ক্লাব, সাহিত্যমূলক বা কৃষ্টিমূলক সঙ্ঘ। তার চেয়ে স্থায়ী দল হল পরিবার, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র ইত্যাদি।

মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে দলের মৌলিক ধর্ম্ম হল দলের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া। যখন দুই বা তার বেশী ব্যক্তি পরস্পরের সম্পর্কে আসে তখন তারা পরস্পর পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। একেই মনোবিজ্ঞানমূলক প্রতিক্রিয়া বলে। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রতিটি ব্যক্তিই কিছু পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে একটি বিশেষ পারস্পরিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এইভাবেই প্রতিটি দল তৈরী হয়ে থাকে এবং এই পারস্পরিক সম্পর্কই হল প্রতিটি দলের মৌলিক ভিত্তি।

দলের শ্রেণীবিভাগ

এই পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে দলকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন :—

(১) প্রত্যক্ষ দল (Primary Group)

(২) পরোক্ষ দল (Secondary Group)

(৩) প্রান্তীয় দল (Marginal or Tertiary Group)

যে দলে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি সম্পন্ন হয় তার নাম প্রত্যক্ষ দল বা (Primary Group)। এই ধরনের দলে ব্যক্তিরা পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কথাবার্ত্তা বলে, মেলামেশা করে, পরস্পরের সুখ দুঃখে অংশ গ্রহণ করে এবং গভীর অনুভূতি ও অনুরাগের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পরিবার, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দল প্রভৃতি হল প্রত্যক্ষ দলের উদাহরণ। প্রত্যক্ষ দলের

ব্যক্তিদের মধ্যে একতার বন্ধন একান্ত আন্তরিক এবং সকল প্রকার দলের মধ্যে প্রত্যক্ষ দলের ভিত্তিই হল সবচেয়ে সুদৃঢ়।

যে দলের ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া পরোক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেই দলকে পরোক্ষ দল বলা হয়। যেমন বাঙালী সমাজ, বৈষ্ণব সমাজ, ক্যাথলিক সমাজ, রোটারিয়ানের দল, সমাজতন্ত্রী দল, ব্রাহ্ম সমাজ ইত্যাদি। এই ধরনের দলের সদস্যদের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে কোন সম্পর্ক থাকে না। এইসব দলে কোন বিশেষ মতবাদ বা আদর্শ বা উদ্দেশ্যের মাধ্যমে দলের সদস্যরা পরোক্ষভাবে পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান সম্পন্ন করে থাকে। যেমন, যদিও সমস্ত বাঙালী পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত নয় তবুও প্রতিটি বাঙালী নিজেকে বাঙালী সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে। এই ধরনের দলগুলি সাধারণত খুব বড় হয়ে থাকে এবং সদস্যদের মধ্যে সাক্ষাৎ প্রতিক্রিয়া না থাকার ফলে প্রত্যক্ষ দলের তুলনায় এই দলের ভিত্তি কম সুদৃঢ় হয়।

এছাড়া আরও এক ধরনের দল আছে যেগুলি স্বল্পক্ষণ স্থায়ী এবং যেগুলির সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া অসংবদ্ধ ও অনিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতিতে সবচেয়ে দুর্ব্বল এবং অস্থায়ী হওয়ার জন্য এ দলগুলিকে প্রান্তীয় দল বলা হয়। যেমন পথে হঠাৎ কোন ব্যাপারে যে জনতার সৃষ্টি হয় বা বাসে অফিস যাবার সময় যে দলের সৃষ্টি হয়, সেগুলিকে প্রান্তীয় দল বলা হয়ে থাকে।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে উপরের তিন ধরনের দলের মধ্যে প্রত্যক্ষ দল স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার দিক দিয়ে অন্যান্য সকল দলের চেয়ে অনেক উন্নত। তার পরে আসে পরোক্ষ দল এবং সব চেয়ে দুর্ব্বল ও অস্থায়ী দল হল প্রান্তীয় দল।

ব্যক্তিগত আচরণ ও দলগত আচরণের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। শুধু আচরণ নয় দলে থাকাকালীন চিন্তা ও অনুভূতির রাজ্যেও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন আসে। ব্যক্তির আচরণের বৈশিষ্ট্য হল তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (Individuality)। যখন ব্যক্তি আচরণ করে তখন তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা তার আচরণের প্রকৃতি নির্ণীত হয়। কিন্তু যখন সে কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দলগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অবদমিত হয়ে পড়ে এবং তার আচরণের নিজস্বতা সম্মিলিত আচরণের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যায়। এইজন্যই দলের মধ্যে ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায় না, সে তখন দলের একটি অংশমাত্র হয়ে দাঁড়ায়।

দল গঠনে বিভিন্ন শক্তি

দল গঠনের পেছনে কি ধরনের শক্তি কাজ করে থাকে এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা হয়েছে। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে এ সম্পর্কে অনেক মতান্তরও দেখা যায়।

প্রবৃত্তিবাদী মনোবিজ্ঞানীদের মতে দল গঠনের পেছনে আছে যৌথ প্রবৃত্তি (Gregarious Instinct)। ম্যাকডুগাল তাঁর প্রসিদ্ধ প্রবৃত্তির তালিকাতে যৌথ প্রবৃত্তিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং এর সহগামী প্রক্ষোভরূপে একাকিত্বের অনুভূতির (Feeling of loneliness) উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে প্রাণীমাত্রেই দল গঠন করে এই প্রবৃত্তিটির তাড়নায়। এই প্রবৃত্তিকে সক্রিয় করে তোলে মানুষের মধ্যে একা থাকার অনুভূতিটি অর্থাৎ মানুষ যখন একা থাকে তখন তার মধ্যে একটা নির্জনতা বা একাকিত্বের প্রক্ষোভ জেগে ওঠে এবং সে দল গঠন করতে সচেষ্ট হয়। ম্যাকডুগালের এই ব্যাখ্যাটি দল গঠনের প্রক্রিয়াটির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। মানুষের মধ্যে দল বাঁধার যে একটি জন্মগত প্রবণতা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু মানবীয় দল প্রকৃতি ও সংগঠনের দিক দিয়ে এত বিচিত্র ও বিবিধ হয়ে থাকে যে নিছক প্রবৃত্তির দ্বারা সেগুলির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে কোন দলের সংগঠন ও প্রক্রিয়াগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলি মনোবিজ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ার সন্ধান পাই। বস্তুত এই মনোবিজ্ঞানমূলক প্রক্রিয়াগুলি দলগঠনের পিছনে প্রধান শক্তিরূপে কাজ করে থাকে।

বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের দলবদ্ধ করার প্রধানতম শক্তিটি হল সমানুভূতি। যখন কোন বিষয়, বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে একই অনুভূতির সৃষ্টি হয় তখন সেই ব্যক্তিদের মধ্যে দলবদ্ধতা দেখা দেয়। অন্যান্য দিক দিয়ে এই ব্যক্তিদের মধ্যে নানারকম পার্থক্য থাকলেও এই সমানুভূতি তাদের একসূত্রে বেঁধে দেয়। রাস্তায় হঠাৎ জমা হওয়া একটা ভীড় থেকে সুরু করে ক্লাব, সংঘ, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র, জাতি, অতি ঘনিষ্ঠ আপনার জন প্রভৃতি সকল রকম দলের ভিত্তিই হল এই সমানুভূতি। রাস্তায় জনতার প্রত্যেকটি ব্যক্তিই হয় দুঃখ, নয় রাগ, নয় কৌতূহল আর সকলের সঙ্গে সমানভাবে অনুভব করছে বলেই ঐ জনতাটি তৈরী হতে পেরেছে। তেমনই সংঘ, রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার প্রভৃতি সংগঠনের প্রত্যেকেই পরস্পরের সঙ্গে সমানভাবে অনুভূতির অংশগ্রহণ করে থাকে। দল যত স্থায়ী ও সুসংবদ্ধ হয়, এই সমানুভূতিও সংখ্যা ও মাত্রার দিক দিয়ে তেমনই বেড়ে চলে।

জনতার মধ্যে এই অনুভূতি সংখ্যায় মাত্র একটি এবং স্থায়িত্বের দিক দিয়ে অত্যন্ত সাময়িক। একটি সুসংবদ্ধ পরিবারের সদস্যরা সমানভাবে এবং অত্যন্ত গভীরভাবে পরস্পরের প্রায় সমস্ত অনুভূতির অংশগ্রহণ করে থাকে।

বস্তুত ছোট হোক বড় হোক, স্থায়ী হোক অস্থায়ী হোক সমস্ত দলেরই মৌলিক ধর্ম্ম হল সমানুভূতি। যখনই একজন অপরের অনুভূতির অংশ গ্রহণ করে তখন সে অপরের সঙ্গ কামনা করে এবং এইভাবেই দলের উৎপত্তি হয়। কেবলমাত্র দলের সৃষ্টিতেই সমানুভূতির অবদান নেই, দলের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও স্থায়িত্ব সবই নির্ভর করে সমানুভূতির মাত্রার উপর।

দলের সৃষ্টি ও সংরক্ষণে আর একটি মনোবিজ্ঞানমূলক প্রক্রিয়া বিশেষভাবে কাজ করে থাকে। সেটি হল অনুকরণ। অপরের আচরণের অনুসরণে আচরণ করাকে অনুকরণ বলে। অনুকরণ প্রবণতা মানুষের সকল স্তরে দেখতে পাওয়া যায়। শৈশবে শিশু অতি প্রয়োজনীয় আচরণগুলি শেখে অনুকরণের মাধ্যমে। সামাজিক দল গঠনে অনুকরণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। দলের অন্তর্গত সদস্যেরা কখনও নিজেদের জ্ঞাতসারে কখনও বা অজ্ঞাতসারে অপরের আচরণ অনুকরণ করে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই এমন অনেক আচরণ আছে, যা সে অপরের দেখে সম্পন্ন করতে শিখেছে। এইজন্যই একটি দলের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তিদের আচরণের মধ্যে এত মিল দেখা যায়। বস্তুত দলের সদস্যদের এই অনুকরণপ্রবণতাই দলের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সমতার কারণ।

অনুকরণপ্রবণতাকে ম্যাকডুগাল প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে মানুষ মাত্রেরই এটি একটি সহজাত ধর্ম্ম এবং এটি সারাজীবন ধরে আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও অনুকরণ প্রবণতা যে আমাদের সামাজিক আচরণের স্বরূপ নির্ণয়ে একটি শক্তিশালী কারণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দলের সংহতি ও ঐক্য সৃষ্টি করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে আর একটি মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। সেটিকে আমরা অনুভাবন (Suggestion) বলে বর্ণনা করতে পারি। অনুভাবনও হল এক ধরনের অনুকরণ। যখন আমরা অপরের চিন্তা, ভাবধারা, আদর্শ প্রভৃতি নিজস্ব করে নিই, তখন তাকে অনুভাবন বলে বর্ণনা করা হয়। অনুভাবন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হল যে আমরা যে চিন্তা বা ধারণা অপরের কাছ থেকে গ্রহণ করি সেগুলি আমাদের অজ্ঞাতসারেই গ্রহণ করে

থাকি। অর্থাৎ আমরা যখন অপরের ভাব বা ধারণা নিয়ে থাকি তখন সেগুলি অপরের বলে আমরা জানতে পারি না বা অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা সেগুলি গ্রহণ করছি বলে মনে করি না। আমরা মনে করি যে ঐ ভাব বা ধারণা-গুলি আমাদের নিজেদের মধ্যে থেকেই জন্মেছে। এককথায় অনুভাবন প্রক্রিয়াটি একটি অচেতন প্রক্রিয়া। তবে যে অনুভাবিত হয় তার কাছেই সব সময়েই এটি অচেতন থাকে কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যকে অনুভাবিত করে তার কাছে অনুভাবন প্রক্রিয়াটি সচেতন হতেও পারে।

আমাদের জীবনে অনুভাবনের প্রভাব অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে দলগত জীবনযাত্রায়, পরস্পরের মধ্যে ভাবের সঞ্চালন, চিন্তাধারার একতা ও আদর্শগত সমতা সৃষ্টি করার ব্যাপারে অনুভাবনের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত যে কোন দলের জ্ঞানমূলক বা চিন্তামূলক দিকটি এই অনুভাবন প্রক্রিয়ার উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই দলের অন্তর্গত বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে চিন্তামূলক সংহতি দেখা দেয়। একই গোষ্ঠী বা পরিবারের অন্তর্গত, একই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে বৈষম্য ও পার্থক্য এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দূর হয়ে যায়।

অনুভাবন প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এর মূলে আছে একটা বশ্যতার অনুভূতি। যখন আমরা অপর কোন ব্যক্তিকে আমাদের চেয়ে কোন দিক দিয়ে বড় বলে মনে করি তখনই তার প্রতি আমাদের একটা বশ্যতার মনোভাব দেখা দেয়। এই বশ্যতার অনুভূতি থেকেই আমরা অপরের চিন্তা বা ভাবধারা আমাদের অজ্ঞাতসারেই নিজের করে নিই। যেখানে এই বশ্যতার অনুভূতি নেই সেখানেই অনুভাবন প্রক্রিয়া বিশেষ কার্য্যকরী হয় না। এইজন্য দল বা গোষ্ঠীতেই অনুভাবন প্রক্রিয়া বিশেষভাবে কার্য্যকরী হয় এবং এই অনুভাবন প্রক্রিয়ার উপরই আবার দল বা গোষ্ঠীর সংহতি এবং সমৃদ্ধি নির্ভর করে। সাধারণত দলের মধ্যে যারা প্রবীণ, জ্ঞানী, গুণী ও অভিজ্ঞ বলে পরিচিত হন তাঁদের মতামত, চিন্তা এবং ধারণা সহজেই দলের অপর সদস্যেরা গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া যার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি বা অনুরাগ থাকে তার চিন্তা, ধারণা বা বিশ্বাস গ্রহণ করে নিতে আমাদের দেরী হয় না। স্বাভাবিক অনুভাবন ছাড়াও অস্বাভাবিক অনুভাবনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সম্মোহনের সাহায্যে ব্যক্তিকে বিশেষ কোনও কাজে বা ব্যাপারে অনুভাবিত করা যেতে পারে। দেখা গেছে সম্মোহনের পর ব্যক্তি যখন জেগে ওঠে তখনও সে ঐ অনুভাবনের প্রভাব অনুযায়ী আচরণ করে থাকে। এই ধরনের অনুভাবন অবশ্য মানসিক রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দলের সংগঠনে

যে তিনটি প্রক্রিয়ার বর্ণনা করা হল সেই প্রক্রিয়া তিনটি মূলতঃ একই। সমানুভূতি বা অনুভাবন এ দুটিও এক ধরনের অনুকরণ প্রক্রিয়া। সমানুভূতির অর্থ হল অপরের অনুভূতির অনুকরণ করা এবং অনুভাবনের অর্থ হল অপরের চিন্তা বা ভাবের অনুকরণ করা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে অনুভূতির অনুকরণ, চিন্তার অনুকরণ এবং আচরণের অনুকরণ, এই তিন শ্রেণীর অনুকরণ প্রক্রিয়াই দল বা গোষ্ঠীর সংগঠনে প্রধানতম শক্তি। যদি ধরে নেওয়া যায় যে সঙ্গকামিতা বা দলবদ্ধতা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি, তাহলে এই অনুকরণ প্রক্রিয়া সেই প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করার একটি সহজাত উপকরণ বিশেষ।

এই ত্রিবিধ অনুকরণ প্রক্রিয়া দল গঠনের প্রধানতম শক্তি হলেও দলের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এমন আরও কয়েকটি শক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমত, প্রতি দলের সদস্যদের মধ্যেই একটি আত্মীয়তাবোধ বা সমগোষ্ঠিতার অনুভূতি থাকবে। অর্থাৎ সকল সদস্যই মনে করবেন যে তাঁরা সকলেই একটি বিশেষ গোষ্ঠীর অন্তর্গত। একেই আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে সমগোষ্ঠিতার অনুভূতি (we-feeling) বলা হয়। এই সমগোষ্ঠিতার অনুভূতির উপরই প্রতিটি গোষ্ঠী বা দলের সংহতি নির্ভর করে।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের সমতা থাকবেই। যখন বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে কোন বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে মিল দেখা যায় তখন তারা একত্রে সম্মিলিত হয়ে দল গঠন করে। আত্মরক্ষা ও জীবনধারণের উদ্দেশ্য সকল মানুষের মধ্যেই সমানভাবে বর্ত্তমান বলে সর্ব্বত্র মানবীয় দল বা সমাজ গড়ে ওঠা সম্ভব হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের একতা থেকেই বিশেষধর্ম্মী নানারকম প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

তৃতীয়ত, লক্ষ্যের সমতার সঙ্গে সঙ্গে আসে আচরণের সমতা। বিশেষ গোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তিদের মৌলিক আচরণগুলির মধ্যে প্রচুর সমতা দেখতে পাওয়া যায়। এর মূলে আছে অচেতন এবং সচেতন উভয়বিধ অনুকরণ প্রক্রিয়া।

চতুর্থত, আচরণের সমতা থেকেই পোষাক-পরিচ্ছদ, হাবভাব, জীবনধারণ-প্রণালী প্রভৃতির মধ্যেও সমতা ও মিল ধীরে ধীরে দেখা দেয়। কোন গোষ্ঠীকে সুসংবদ্ধ রাখতে হলে এই সমতাগুলি অপরিহার্য্য।

পঞ্চমত, গোষ্ঠীর সৃজনের মূলে যে শক্তিটি বিশেষভাবে কাজ করে থাকে সেটি হল আমাদের সঙ্গকামিতা বা দলবদ্ধতার স্পৃহা। অনেক মনোবিজ্ঞানী এটিকে যৌথ প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা করে থাকেন। তাঁদের মতে এই স্পৃহাটি প্রাণীর মধ্যে জন্ম

থেকেই সহজাত প্রবৃত্তি রূপে বর্ত্তমান থাকে এবং এই সহজাত প্রবৃত্তির বশেই মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী দলবদ্ধ হয়ে ওঠে। সঙ্গকামিতা বা দল বাঁধার স্পৃহাকে সহজাত প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা করায় যদিও অনেক মনোবিজ্ঞানীর আপত্তি আছে তবু এই স্পৃহাটি যে প্রাণীমাত্রের মধ্যে একটি প্রবল শক্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দেখা গেছে যে সাধারণভাবে মানুষ নির্জ্জনতা বা একাকিত্ব পছন্দ করে না এবং অপরের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করতে চায়। এই সঙ্গের আকাঙ্ক্ষাই সকল প্রকার দল বা সংগঠন তৈরী করার মূলে আছে।

আধুনিককালে দলবদ্ধতার আর একটি বড় কারণ হল পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। দলের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তিদের সুখ-সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি পরস্পরের সহযোগিতা ও সাহায্যের উপর প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে—এই উপলব্ধি বিভিন্ন দল গঠনে বিশেষ শক্তিরূপে যে কাজ করে থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

গণমন (Group Mind)

কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি যখন একত্রিত হয়ে একটি সংগঠনের সৃষ্টি করে তখন তাদের বিচ্ছিন্ন বহু সত্তার পরিবর্ত্তে একটি সমষ্টিগত একক সত্তা দেখা দেয়। এই একক সত্তাটির উদ্দেশ্য, চিন্তা, আচরণ সবই একটিমাত্র পথ ধরে অগ্রসর হয়। অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে যখন এই ধরনের একটি দলের সৃষ্টি হয় তখন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত মনগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি সমষ্টিগত একক মনের সৃষ্টি করে। এই মনটিকে তাঁরা সমষ্টিগতমন (Collective Mind) বা গণমন (Group Mind) নাম দিয়েছেন। এই মনোবিজ্ঞানীদের মতে যখন একটি সত্যকারের সুসংবদ্ধ দল তৈরী হয় তখন বিভিন্ন ব্যক্তিগত মনগুলির নিজস্ব কোন প্রভাব থাকে না। সমস্ত মনগুলিকে জুড়ে একটি একক মনের সৃষ্টি হয়ে যায়। এই গণমনের কাছে ব্যক্তিগত মনগুলি সত্তা বা স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে এবং গণমনটির সত্তা, লক্ষ্য, প্রয়োজন প্রভৃতির দ্বারাই দলের প্রত্যেকটি লোকের আচরণ ও কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত মনের নিজস্ব সত্তা বজায় না থাকার ফলে ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা, লক্ষ্য, ইচ্ছা, পছন্দ, অপছন্দ কিছুই কার্য্যকরী হয় না। ব্যক্তিমন তখন পরিপূর্ণভাবে গণমনের অধীনস্থ হয়ে পড়ে এবং গণমনের লক্ষ্যকে নিজের লক্ষ্য, তার চিন্তাকে নিজের চিন্তা, তার প্রক্ষোভ, পছন্দ, অপছন্দকে নিজের প্রক্ষোভ, পছন্দ, অপছন্দ করে তোলে। এইজন্যই দেখা যায় যে একটি সত্যকারের সুসংবদ্ধ দলের সদস্যদের মধ্যে চিন্তা, লক্ষ্য, ও আচরণ একই রকম।

দলের ব্যক্তিদের চিন্তা আচরণ প্রভৃতির মধ্যে একতা সম্বন্ধে কারও দ্বিমত না থাকলেও গণমন বা সমষ্টিগত মন নামে কোন একটি স্বতন্ত্র মনের অস্তিত্ব সকলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে দলের প্রভাবে দলের অন্তর্গত প্রতিটি সদস্যের মনে একটা সাময়িক পরিবর্তন দেখা দেয় এবং যতক্ষণ সে দলের মধ্যে থাকে ততক্ষণ সমষ্টিগত লক্ষ্য, চিন্তা ও চাহিদা তার সমস্ত কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে। অর্থাৎ সমষ্টিগত সচেতনতাই যৌথ আচরণের কারণ, কোনরূপ গণমন বা সমষ্টিগত মনের পরিকল্পনার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু যাঁরা গণমনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাঁরা বলেন যে দলের মধ্যে থাকার সময় ব্যক্তির চিন্তা আচরণ ও অনুভূতিতে এমন আমূল পরিবর্তন দেখা দেয় যে গণমনের পরিকল্পনা ছাড়া তার যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। সর্ব্বব্যাপী একনায়ক একটি মাত্র গণমনের প্রভাবেই বিভিন্ন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাওয়া সম্ভব।

দলের গঠনে গণমন বলে সত্যকারের একটা স্বতন্ত্র মন সৃষ্ট হয় কিনা, এবিষয়ে মতভেদ থাকলেও এ কথা অনস্বীকার্য্য যে দলের সংহতি ও ঐক্য নির্ভর করে এই ধরনের একটি সমষ্টিমূলক অনুভূতি বা সচেতনতার উপর। যেখানেই এই গণ-সচেতনতা যত সুদৃঢ় সেখানেই দলের ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সাফল্য তত বেশী। এই জন্য যখনই কোন দল গঠন করা হয় তখনই দেখতে হয় যে গণমন বা গণসচেতনতা সদস্যদের মধ্যে কতটা সৃষ্ট হয়েছে।

বিদ্যালয় ও গণমন

বিদ্যালয়ও প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীদের একটি দল এবং বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা, সংহতি ও সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের দলের ঐক্য ও সংহতির উপর। যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দলের মধ্যে সংহতি বেশী, সে বিদ্যালয়ের শিক্ষার কাজও সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পন্থায় সম্পন্ন হয়। আর যেখানে শিক্ষার্থীদের দলের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সংহতি কম সেখানে শিক্ষার কাজ আয়াসবহুল ও কষ্টকর হয়ে ওঠে। এই জন্য বিদ্যালয়ে গণমন বা গণসচেতনতা সৃষ্টি করাটা শিক্ষার উৎকর্ষের দিক দিয়ে প্রথমেই কাম্য।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই গণমন বা গণসচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন,

প্রথমত প্রত্যেক দলেরই সংহতির জন্য প্রয়োজন তার অস্তিত্বের মধ্যে একটা ছেদহীনতা। দলের অস্তিত্ব নিতান্ত সাময়িক বা অস্থায়ী হলে গণসচেতনতা সৃষ্টি

হতে পারে না। এই দলগত ছেদহীনতা দুশ্রেণীর হতে পারে—বস্তুগত এবং আকারগত। যখন একই ব্যক্তিরা দলের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে তখন তাকে বস্তুগত ছেদহীনতা বলে। যেমন, পরিবারের ছেদহীনতা বস্তুগত। কেননা পরিবারের অন্তর্গত যে সব ব্যক্তিরা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে, তারা বদলে যায় না। কিন্তু যখন দলটির আকার ঠিক একই রকম থাকে কিন্তু অন্তর্গত ব্যক্তিরা বদলে যায় তখন দলটির ছেদহীনতাকে আকারগত ছেদহীনতা বলে। যেমন ক্লাব, প্রতিষ্ঠান, সরকার প্রভৃতি সংগঠনগুলির ছেদহীনতা আকারগত। এগুলির সদস্যেরা বদলে গেলেও এগুলির সংগঠনমূলক রূপ বা আকৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে বলে দলের অস্তিত্ব বজায় থাকে।

বিদ্যালয়ে এ দুধরনের ছেদহীনতাই আছে। সেজন্য সেখানে গণসচেতনতা জাগানো সহজ। বিশেষ করে আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে এই ছেদহীনতা আরও স্থায়ী ও সুদৃঢ়। সেজন্য আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে সুসংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক জীবন গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

দ্বিতীয়ত, গণসচেতনতা সৃষ্টি করার আর একটি উপায় হল দলের ব্যক্তিদের মধ্যে দল সম্পর্কে ভাল জ্ঞান বা ধারণা সৃষ্টি করা। অর্থাৎ দলটির প্রকৃতি, সংগঠন, কাজ, শক্তি-সামর্থ্য, ও বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে দলের প্রত্যেকের যথোপযুক্ত জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। এই জ্ঞানই ব্যক্তির মধ্যে দল সম্পর্কে সচেতনতা এনে দেয় এবং তাদের মধ্যে দলগত সেন্টিমেন্ট সৃষ্টি করে। যে শিশু বিদ্যালয়ের স্বরূপ, কাজ ইত্যাদি সম্পর্কে উদাসীন সে শিশু কোনদিনই বিদ্যালয়-সমাজের সার্থক সদস্যরূপে গড়ে উঠতে পারে না।

তৃতীয়ত, প্রতিটি দলের সঙ্গে বাইরের সমপ্রকৃতির দলের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া থাকা অত্যাবশ্যক। বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আদর্শ ও লক্ষ্যগত বিভিন্নতা এবং ঐতিহ্য ও প্রথাগত বৈষম্য থেকে থাকে। তার ফলে বিভিন্ন দলের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হলে নিজের দল সম্পর্কে সচেতনতা আরও গভীর হয়ে ওঠে। এই দলসচেতনতা সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার রূপ নিয়ে প্রকাশ পায় এবং বিভিন্ন দলের পুষ্টি ও সমৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই জন্যই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যাতে অন্যান্য বিদ্যালয়, সমাজ ও দেশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায় তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। ভ্রমণ, গ্রাম-পরিদর্শন, সাংস্কৃতিক মেলামেশা, খেলাধুলা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের অন্যান্য শিক্ষার্থীদলের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ দিতে হয়।

চতুর্থত, প্রতিটি দলেরই নিজস্ব কতকগুলি আচার ব্যবহার, প্রথা ও অভ্যাস আছে এবং দলের সদস্যেরা সেগুলি সম্পর্কে অবহিত থাকে। এই আচার ব্যবহার, প্রথা ও অভ্যাসগুলি সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করে এবং এইগুলির সচেতনতাই দল সম্পর্কে ব্যক্তিদের সচেতন করে রাখে। প্রতিটি বিদ্যালয়েই এই রকম নিজস্ব প্রথা, ও নিয়মকানুন প্রভৃতি থাকে এবং এগুলিই শিক্ষার্থীদের মধ্যে একতাবোধকে সব সময় জাগিয়ে রাখে। বিদ্যালয়ের নানাবিধ অনুষ্ঠান, প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলন ইত্যাদি বিদ্যালয়ের সমাজকে পরিপুষ্ট করে তোলে।

পঞ্চমত, গণমন সৃষ্টিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে দলের মধ্যে সুপরিকল্পিত কার্য্যসূচীর প্রবর্ত্তন। প্রত্যেক দলেরই অস্তিত্ব নির্ভর করে গতিশীলতায়, সুনির্দ্ধারিত এবং সুসংগঠিত কর্মপন্থার অনুশীলনে। এই কাজগুলির নির্ব্বাচন এমন হবে যার মধ্যে দিয়ে সদস্যদের নিজস্ব প্রতিভা ও সম্ভাবনা অভিব্যক্তি লাভ করে। বিদ্যালয়েতেও সেইরকম সুচিন্তিত কর্ম্মসূচী প্রবর্ত্তন করতে হবে যার মধ্যে দিয়ে বিদ্যার্থীদের ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর হয়।

ষষ্ঠত, শিক্ষার্থীদের মধ্যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের একতা আনতে হবে। তারা সকলেই যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য বিদ্যালয়ে সমবেত হয়েছে এই বোধটি তাদের মধ্যে প্রথমেই জাগাতে হবে। যদি তাদের প্রত্যেকে একই লক্ষ্য এবং আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে সংহতি এবং ঐক্য জাগবে।

সপ্তমত, তাদের মধ্যে বাহ্যিক চিহ্নের দিক দিয়েও নানাভাবে সমতা আনা যেতে পারে। একই স্কুলের ছেলেমেয়েদের একই ইউনিফর্ম বা পোষাক, কোনও বিশেষ ধরনের স্কুল ব্যাজ বা প্রতীক, স্কুলের নিজস্ব সঙ্গীত, স্কুলের নিজস্ব পতাকা ইত্যাদির প্রবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে গণসচেতনতা বা গণমন তৈরী করা যেতে পারে। এই ধরনের পোষাক, ব্যাজ, প্রতীক প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েরা তাদের বিভিন্ন সত্তা ভুলে যায় এবং একই গোষ্ঠী বা দলের অন্তর্গত বলে প্রত্যেকে নিজেকে মনে করে।

অষ্টমত, যৌথ কর্ম্মসূচীই হল দলের সংহতি সৃষ্টি করার পক্ষে সব চেয়ে বড় শক্তি। সম্মিলিত ভাবে কোন কাজ করার মধ্যে দিয়েই ব্যক্তির মধ্যে দল সম্পর্কে সচেতনতা আসে এবং দলের প্রতি তার আসক্তি জন্মায়। তখনই তার মধ্যে সহযোগিতা, দায়িত্ব জ্ঞান, স্বার্থত্যাগ, দল-বিশ্বস্ততা প্রভৃতি মূল্যবান বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা দেয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য

প্রচুর পরিমাণে যৌথ অভিজ্ঞতা কর্ম্মসূচীতে প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন। খেলাধূলা ভ্রমণ থেকে স্বরু করে বিতর্ক, প্রদর্শনীর আয়োজন, সংস্কৃতিমূলক এবং সাহিত্যমূলক অধিবেশন, সামাজিক সম্মেলন, সমাজ উন্নয়নমূলক কাজকর্ম্ম ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য দূর করে তাহাদের মধ্যে একতা ও সংহতি সৃষ্টি করা যায়।

প্রশ্নাবলী

1. What do yon understand by Group Psychology ? Discuss its role and importance.

   Ans. পৃঃ ২৪৫

2. What is a Psychological Group ? How many types of group are there ? Discuss their characteristics.

   Ans. (পৃঃ ২৪৫—পৃঃ ২৪৭)

3. What are the forces that work behind the formation of a group ?

   Ans. (পৃঃ ২৪৮—পৃঃ ২৫১)

4. Describe the methods that you will adopt in transforming a crowd of children to an organised group.

   Ans. (পৃঃ ২৫৩—পৃঃ ২৫৬)

5. Write notes on :

   Group Mind, Primary and Secondnry Group. Tertiary Group.

উনিশ

কাজ ও ক্লান্তি (Work and Fatigue)

ব্যাপক অর্থে সকল আচরণই এক প্রকারের কাজ। কিন্তু সাধারণত আমরা 'কাজ' কথাটি একটা সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করে থাকি। সেই সব আচরণকে আমরা কাজ বলে থাকি যার মধ্যে কিছু পরিমাণ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক কাজের ক্ষেত্রেই এই দক্ষতার একটা নিম্নতম মান আছে এবং দক্ষতার সেই মান পর্যন্ত না পৌছলে ঐ আচরণটিকে কাজ বলা হবে না।

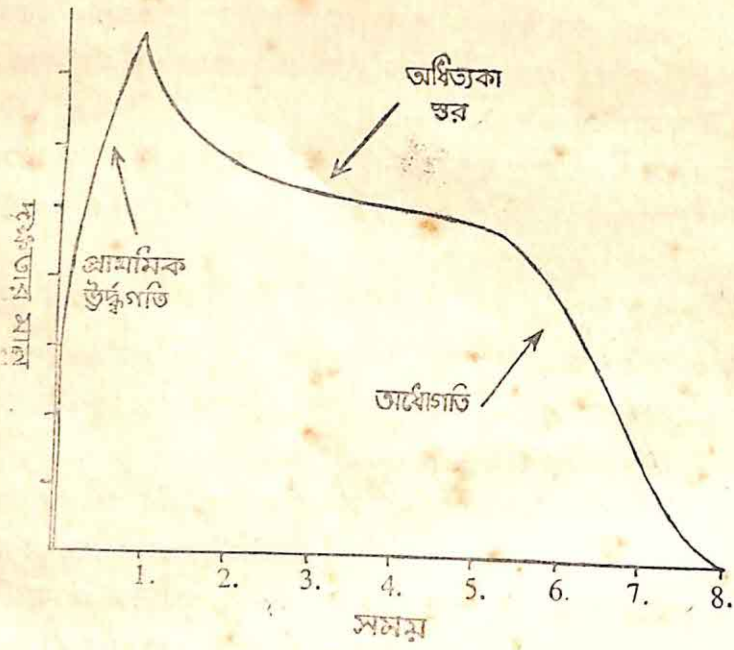
কাজের সঙ্গে অভ্যাসের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। প্রতি কাজের মধ্যেই অভ্যাসের প্রয়োগ অপরিহার্য্য। এ দিক দিয়ে বিভিন্ন মানসিক এবং শারীরিক অভ্যাসের বিভিন্ন মাত্রায় প্রয়োগকেই কাজ বলা চলতে পারে।

কাজ মাত্রেই শিখনের উপর নির্ভরশীল। কাজ সম্পন্ন করতে হলে প্রয়োজন শারীরিক ও মানসিক অভ্যাসের প্রয়োগ এবং সেই শারীরিক ও মানসিক অভ্যাস আহরণে আমাদের সক্ষম করে—শিখন। সেদিক দিয়ে শিখনের সংজ্ঞা হল—কাজের স্বীকৃত মান-সম্মত অভ্যাস তৈরী করার নাম হল শিখন।

কাজেতে শারীরিক এবং মানসিক, এই দু' ধরনের প্রচেষ্টারই প্রয়োজন হয়। সেজন্য অনেকে কাজকে শারীরিক ও মানসিক এই দু'শ্রেণীতে ভাগ করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এধরনের শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নয়, কেননা শারীরিক ও মানসিক দু'ধরনের কাজের পেছনেই আছে স্নায়বিক ও পেশীমূলক অঙ্গের ব্যবহার। তবে শারীরিক ও মানসিক কাজের মধ্যে একদিক দিয়ে পার্থক্য করা যেতে পারে। শারীরিক কাজে ব্যবহৃত প্রতিক্রিয়ক যন্ত্র ও পেশীসমূহ মানসিক কাজে ব্যবহৃত প্রতিক্রিয়ক যন্ত্র ও পেশীসমূহের তুলনায় আকৃতির দিক দিয়ে যেমন বড় সংখ্যাতেও তেমনই বেশী। অতএব দেখা যাচ্ছে যে কাজ বলতে বোঝায় দক্ষতামূলক আচরণ এবং সেই দক্ষতা আমরা লাভ করে থাকি শিখনের মাধ্যমে। কিন্তু প্রকৃত কাজের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে দক্ষতা আহরণ করলেই সেই দক্ষতার মান সব সময় বজায় রাখা যায় না। নানা কারণে কাজের দক্ষতা বিভিন্ন সময়ে কমতে বাড়তে থাকে। কেবলমাত্র শিখনের মাত্রার দ্বারাই কাজের দক্ষতা নির্দ্ধারিত হয় না, অনেক বিভিন্ন শক্তির প্রভাবের দ্বারা কাজের দক্ষতা নিরূপিত হয়।

কাজের দক্ষতার এই পরিবর্ত্তনের একটি চিত্ররূপ দেওয়া যেতে পারে। একে সাধারণত কাজের রেখাচিত্র (Work curve) বলা হয়। এই রেখাচিত্রটিকে পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে এর সুনির্দ্দিষ্ট তিনটি পর্য্যায় আছে। প্রথম, প্রাথমিক ঊর্দ্ধগতি (Initial spurt), দ্বিতীয়, অধিত্যকা কাল (Plateau period) এবং তৃতীয়, অধোগতি (Fall)।

প্রথমেই যখন কাজ সুরু হয় তখন একটা প্রাথমিক ঊর্দ্ধগতি (Initial spurt) দেখা যায়। এই সময় কর্ম্মী কাজ সুরু করার আনন্দ ও উৎসাহে তার সর্বশক্তির



প্রয়োগ করে এবং তার কাজের দক্ষতা সর্ব্বোচ্চ বিন্দুতে গিয়ে ওঠে। তার পর তার দক্ষতা কমতে থাকে এবং শীঘ্র এমন একটা বিন্দুতে এসে পৌছয় যখন নিম্নগতি বন্ধ হয়ে যায় এবং একটা সাম্যাবস্থা ধারণ করে। বেশ কিছুটা কাল ধরে এই অপরিবর্ত্তিত অবস্থা বজায় থাকে। এই সময়টিকে অধিত্যকা কাল (Plateau period) বলা হয়ে থাকে। এই সময়ে কাজের দক্ষতার মান কমেও না, বাড়েও না।

অধিত্যকা কালের শেষে দেখা দেয় অধোগতি। ধীরে ধীরে কাজের দক্ষতার মান নামতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কাজটি শেষ হবার সময় আবার একটা ঊর্দ্ধগতি দেখা দেয়। এটি ঘটে তখনই যখন কর্ম্মীরা বোঝে যে কাজের সমাপ্তি

নিকটবর্ত্তী এবং তাদের আর কাজ করতে হবে না। এই ঘটনাটিকে আমরা প্রান্তীয় উর্দ্ধগতি (End-spurt) বলতে পারি। এই ঘটনাটি অবশ্য সর্ব্বজনীন ঘটনা নয় এবং যেখানে কর্ম্মীরা কাজের সমাপ্তি সম্পর্কে সচেতন নয় সেখানে এই প্রান্তীয় উর্দ্ধগতি দেখা যায় না। প্রেষণার পরিবর্ত্তনই হল কাজের শেষের দিকে এই দক্ষতার উন্নতির কারণ।

কাজের রেখাচিত্রের এ বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথম আবিষ্কার করেন ক্রেপেলিনের ছাত্র এ্যাক্সেল ওহর্ন (Axel Oehrn) ১৮৮৯ সালে। তিনি দশজন অধ্যাপক ও ছাত্রদের নানা রকম বিষয়বস্তু শেখার কাজ দেন এবং তাঁদের দক্ষতার পরিবর্ত্তন পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাঁর এই পরীক্ষণ থেকেই তিনি উপরের সিদ্ধান্তগুলি গঠন করেন।

প্রাথমিক উর্দ্ধগতির পর যে বিন্দুতে ক্লান্তির স্থরু হয় সে বিন্দুকে চরম দক্ষতার বিন্দু বলা হয়। ওহর্ন দেখেন যে বিভিন্ন কাজে চরম দক্ষতার বিন্দু বিভিন্ন, যেমন অর্থহীন শব্দশিক্ষার ক্ষেত্রে ২৪ মিনিট পরে, শ্রুতিলিখনের ক্ষেত্রে ২৬ মিনিট পরে, যোগ অঙ্কের ক্ষেত্রে ২৮ মিনিট পরে, পড়ার ক্ষেত্রে ৩৮ মিনিট পরে, একটি একটি করে অক্ষর গোনার ক্ষেত্রে ৩৯ মিনিট পরে, তিনটি তিনটি করে অক্ষর গোনার ক্ষেত্রে ৫৯ মিনিট পরে এবং সংখ্যা শেখার ক্ষেত্রে ৬০ মিনিট পরে এই চরম দক্ষতার বিন্দু দেখা দেয়।

ক্লান্তি ও প্রেষণা :

একবার কাজটি স্থরু হলে কাজে দক্ষতার মান এবং কাজের রেখাচিত্রের প্রকৃতি ছ'টি বস্তুর দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে। সে ছুটি হল ক্লান্তি এবং প্রেষণা। এছাড়াও কাজের পরিবেশ, কর্ম্মীদের মানসিক দৃঢ়তা প্রভৃতি বিষয়গুলিও কাজের দক্ষতাকে প্রভাবান্বিত করে থাকে। ২৫৮ পাতায় যে কাজের রেখাচিত্রটি দেওয়া হয়েছে তাতে প্রেষণার প্রভাব নানা মাত্রার এবং নানা প্রকৃতির হতে পারে এবং তা বিভিন্নভাবে কাজের দক্ষতাকে প্রভাবিত করতে পারে। ক্লান্তির প্রভাব সর্ব্বজনীন প্রকৃতির এবং এর প্রভাবের কাল, প্রকৃতি এবং পরিমাণ স্থনির্দ্দিষ্ট সূত্র মেনে চলে।

ক্লান্তি (Fatigue)

কাজ করার সময় সমগ্র ব্যক্তিটির মধ্যে মনোবিজ্ঞানমূলক এবং শরীরতত্ত্বমূলক অবস্থার যে পরিবর্ত্তন ঘটে, আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী তাকেই ক্লান্তি বলা

হয়। কোন কাজ করতে করতে ব্যক্তির মধ্যে মানসিক এবং দৈহিক নানারকম পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্ত্তনের ফলে তার দক্ষতার মানের অবনতি ঘটে। একেই আমরা ক্লান্তি বলি। বিভিন্ন পরীক্ষণের দ্বারা জানা গেছে যে ব্যক্তি এবং তার কাজের মধ্যে তিন শ্রেণীর ক্লান্তি দেখা যায়।

(১) কাজের অনুভূতি বা ব্যক্তিগত ক্লান্তি।

(২) দেহগত পরিবর্ত্তন বা শরীরতত্ত্বমূলক ক্লান্তি।

(৩) কাজের মানের অবনতি বা বস্তুমূলক ক্লান্তি।

কাজের অনুভূতি বা ব্যক্তিগত ক্লান্তি

কিছুক্ষণ কাজ করার পর কর্ম্মীর মনে কাজ সম্পর্কে অনুভূতিটি ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে। কাজের প্রথম দিকে তার মধ্যে যে আনন্দ বা উৎসাহের ভাবটি থাকে সেটা যত সময় যায় তত কমে আসে। একেই আমরা ব্যক্তিগত ক্লান্তি বা একঘেয়েমি বলে থাকি। দেখা গেছে যে কাজের সুরু থেকেই ব্যক্তিগত ক্লান্তি-বোধও সুরু হয়। তবে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ এবং মানসিক সংগঠনের উপর এই কাজের অনুভূতির মাত্রা নির্ভর করে।

একটি পরীক্ষণে একশজন লরীচালকের লরী চালানোর বিভিন্ন সময়ে ঐ কাজটি সম্পর্কে তাঁদের ব্যক্তিগত ক্লান্তি মাপা হয়। দেখা যায় যে কাজের সুরুতে শতকরা ৬৬ জনের ঐ কাজটির সম্পর্কে সন্তোষজনক মনোভাব ছিল। ১ ঘণ্টা থেকে ৯ ঘণ্টার মধ্যে শতকরা ৪৮ জন কাজটিকে ক্লান্তিকর মনে করেন এবং দশ ঘণ্টা পরে মাত্র শতকরা ১৫ জন কোন ক্লান্তি অনুভব করেন না কিন্তু বাকী শতকরা ৮৫ জনের কাছেই কাজটি অল্পবিস্তর ক্লান্তিকর মনে হয়। থর্নডাইকের আর একটি পরীক্ষণে ২৯ জন ব্যক্তিকে দু'ঘণ্টার জন্য ছাপান লেখা সাজানোর ভার দেওয়া হল। প্রতি ২০ মিনিট অন্তর কাজটি করার সময় তৃপ্তিকরতার গড়পড়তা স্কোর পাওয়া যায় এইরূপ : ৪·৪, ৪·০, ৩·৬, ৩·৪, ২·৮, ২·৬।

কাজের তৃপ্তিকরতার এই অবনতি কাজের প্রকৃতির উপর অনেকখানি নির্ভর করে। একে আমরা প্রেষণার প্রভাব বলে বর্ণনা করতে পারি। পফেনবার্জ্জার (Poffenberger) তাঁর একটি পরীক্ষণে চারটি বিভিন্ন কাজের সময় কাজের অনুভূতির পরিবর্ত্তন পরিমাপ করেন। কাজ চারটি হল বুদ্ধির অভীক্ষা, বাক্য-সম্পূর্ণকরণ, রচনাবিচার এবং যোগকরণ। দেখা গেছে এই চার প্রকারের কাজে

অনুভূতির অবনতি বুদ্ধির অভীক্ষার ক্ষেত্রে হয় মাত্র ১'৩, বাক্য-সম্পূর্ণকরণে হয় ২'৭, রচনাবিচারে হয় ২'৩ এবং যোগকরণে হয় ২'২।

দেহগত পরিবর্ত্তন

প্রাচীন শরীরতত্ত্ববিদেরা ক্লান্তিকে শরীরের মধ্যে দূষিত পদার্থের সঞ্চয় থেকে জাত এক ধরনের রাসায়নিক অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। দেখা গেছে কাজের সময় স্নায়ুতন্তু থেকে কার্ব্বনডায়ক্সাইড এবং উত্তাপ নির্গত হয় এবং পেশীগুলির মধ্যে কার্ব্বনডায়ক্সাইড এবং ল্যাক্‌টিক এসিডের পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু আধুনিক পরীক্ষণে প্রমাণিত হয়েছে যে এই কারণে শরীরের মধ্যে এমন কোন রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে না যার দ্বারা কাজের দক্ষতা কমে যেতে পারে। আধুনিক শরীরতত্ত্বমূলক পরীক্ষণগুলি থেকে ক্লান্তির কোনরূপ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। মানসিক কাজ এবং বিশ্রামের সময় শরীরে যে পরিবর্ত্তন ঘটে তার সঙ্গে তুলনা করলে কাজের সময় একমাত্র উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হল হৃদ্‌স্পন্দনের গতিবেগের বৃদ্ধি। হৃদ্‌স্পন্দনের এই দ্রুতগতির জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত ক্যালোরি। এইজন্য যারা বেশী কাজ করে তাদের ক্যালোরির অভাব পরিপূরণের জন্য অতিরিক্ত খাদ্য খাওয়ার প্রয়োজন হয়।

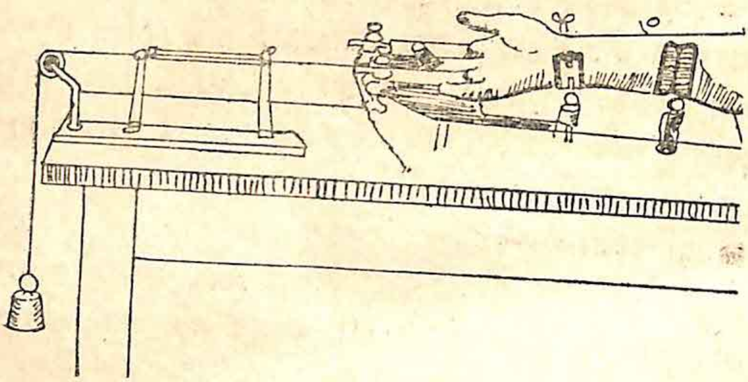
সাধারণ অবস্থায় কাজ করার সময় যে সব শারীরিক চাহিদা দেখা দেয় সেগুলি পূরণ করার মত ব্যবস্থা শরীরের মধ্যেই থাকে। যেমন, অতিরিক্ত অক্সিজেনের চাহিদা মেটাবার জন্য নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের হার, রক্তচাপ ও হৃদ্‌স্পন্দন বৃদ্ধি পায়। হৃদ্‌স্পন্দনের হার বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত শর্করার নিঃসরণ নিজে নিজেই হয়। শরীরের উত্তাপের নিয়ন্ত্রণও নিজে নিজেই শরীরের যন্ত্রপাতির দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ এক কথায় কাজের সময় শারীরিক সাম্যাবস্থা (homeostasis) অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা শরীরের মধ্যেই থাকে। তবে কাজটি যদি অতিরিক্ত শ্রমসাধ্য হয় বা ব্যক্তির সহনশীলতা যদি কম হয় বা বাইরের উত্তাপ বা শৈত্য খুব বেশী বা খুব কম হয় তবে ব্যক্তির এই সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যায় এবং তার মধ্যে ক্লান্তি দেখা দেয়। ক্লান্তির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় কাজের মানের অবনতি এবং শেষ পর্য্যন্ত কাজটি বন্ধ হয়েই যায়।

কাজের মানের অবনতি বা বস্তুমূলক ক্লান্তি

কোন কাজ বেশ কিছুক্ষণ ধরে করলে ধীরে ধীরে কাজের মানের অবনতি হয়। একেই বস্তুমূলক ক্লান্তি বলা হয়। কাজের রেখাচিত্রটি পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে

যে কাজ সুরু হওয়ার পরেই কাজের পরিমাণ হঠাৎ বেড়ে উঠে। এটিকে আমরা প্রাথমিক উর্দ্ধগতি বলে বর্ণনা করেছি। এসময় কর্ম্মীর মধ্যে উদ্যম ও উদ্দীপনা অক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকে এবং কাজে হাত দেবার পরে সে উৎসাহিত হয়ে উঠে (warming up)। এই উৎসাহ-বোধের স্তরেই কর্ম্মী কাজের সর্ব্বোচ্চ মানের বিন্দুতে গিয়ে পৌছয়। কিন্তু তার পরেই কাজের মানের পতন ঘটে এবং কিছুটা পতনের পর কাজের মান বেশ কিছুক্ষণ অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকে। একেই অধিত্যকার (Plateau) স্তর বলা হয়। এই অধিত্যকার স্তরের শেষে আবার পতন সুরু হয় এবং ক্লান্তির পরিমাণ যদি খুব বেশী হয় তাহলে কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

কাজের অবনতির হার ও পরিমাণ সম্পর্কে বহু পরীক্ষণ করা হয়েছে। আরগো-গ্রাফ (Ergograph) যন্ত্রের সাহায্যেও এই ক্লান্তির পরিমাপ করা

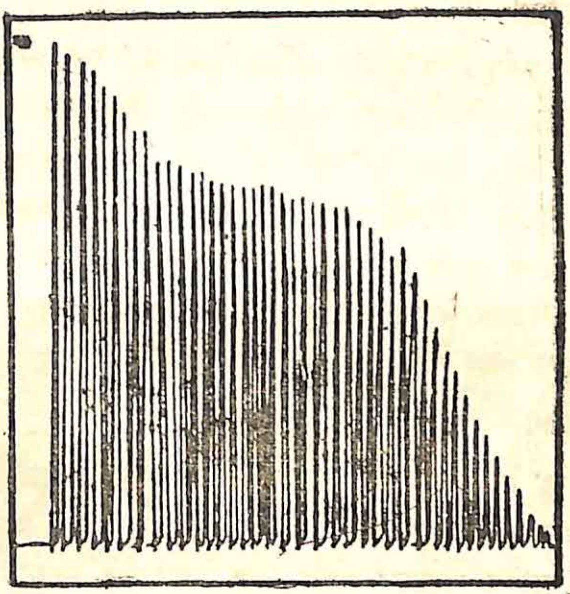


[আরগোগ্রাফ বা ক্লান্তি-পরিমাপক যন্ত্র]

যায়। আরগো-গ্রাফ যন্ত্রটি মসো (Mosso) ১৮৯০ সালে আবিষ্কার করেন। এতে টেবিলের উপর পরীক্ষার্থীর হাতটি এমনভাবে রাখা হয় যাতে সে মাঝের আঙ্গুলটি ছাড়া আর কিছু নাড়াতে পারে না। এই মাঝের আঙ্গুলের সঙ্গে দড়ি দিয়ে একটি ওজন বেঁধে দেওয়া হয় এবং ঐ আঙ্গুলটি দিয়ে ওজনটিকে টানতে বলা হয়। এবার কিমোগ্রাফ যন্ত্রের সঙ্গে একটি লেখার ষ্টাইলাস সংযুক্ত থাকে যার দ্বারা পরীক্ষার্থীর প্রতিটি টানের একটি চিত্ররূপ ঐ কিমোগ্রাফে আঁকা হয়ে যায়। এই চিত্রটিকে আরগো-গ্রাম (Ergogram) বলা হয়।

পরের পাতার আরগো-গ্রামটি থেকে দেখা যাবে যে পরীক্ষার্থীর প্রথম দিকে টান-গুলি বেশ লম্বা লম্বা ছিল কিন্তু যত সময় যাচ্ছে তত টানের দৈর্ঘ্য কমে আসছে

এবং অবশেষে টান একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝামাঝি অবস্থায় বেশ কিছু ক্ষণ টানের দৈর্ঘ্যটি প্রায় একই রয়েছে। আরগো-গ্রামও এক ধরনের কাজের



[আরগোগ্রাম বা ক্লান্তির রেখাচিত্র]

রেখাচিত্র। দেখা যাবে এতেও প্রাথমিক ঊর্দ্ধগতি, অধিত্যকার স্তর এবং ক্রম-পতন—এই তিনটি স্তর রয়েছে।

কাজের অবনতির হার ও পরিমাণ নানা কারণের উপর নির্ভর করে। ব্যক্তির নিজস্ব কর্ম্মক্ষমতা, প্রেষণা, মানসিক দৃঢ়তা, কাজের প্রকৃতি, কাজের সময় ও পরিবেশ প্রভৃতির দ্বারা বস্তুমূলক ক্লান্তি বা কাজের অবনতি নিয়ন্ত্রিত হয়।

ক্লান্তির কারণ

ক্লান্তির কারণকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

(১) পারিবেশিক কারণ (২) শারীরিক কারণ (৩) মানসিক কারণ।

পারিবেশিক কারণ

যে পরিবেশে কাজটি করা হয়, কাজটির সম্পাদনের মান ও প্রকৃতির উপর সেই পরিবেশের প্রচুর প্রভাব থাকে। বিভিন্ন পরিবেশে একই কাজের সম্পাদনের মান বিভিন্ন হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক কাজের উপর পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। অত্যন্ত গরমে কোন কাজ ভালভাবে করা যায়

না, ক্লান্তি সহজেই আসে। কিন্তু স্বাভাবিক আবহাওয়ায় ক্লান্তি সহজে আসে না। তাছাড়া আলো, হাওয়া, শব্দ ইত্যাদিরও কাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব আছে।

শারীরিক কারণ

স্বাভাবিক অবস্থায় অতিরিক্ত পরিশ্রম হলে শারীরিক ক্লান্তি দেখা যায়। আমাদের দেহের পরিশ্রম করার ক্ষমতার একটা সীমা আছে। কাজ করতে করতে যখন এই সীমায় পৌছান যায় তখনই দেহের কর্মক্ষমতা কমে যায় এবং ক্লান্তি দেখা দেয়। বিশ্রামের পর এই কর্মক্ষমতা আবার ফিরে আসে।

তবে শারীরিক ক্লান্তি শরীরের অবস্থার উপরও অনেকখানি নির্ভর করে। যে ব্যক্তির প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী তার ক্লান্তি দেরীতে দেখা দেয়। কিন্তু দুর্ব্বল, অসুস্থ বা পুষ্টিহীন শরীর অতি সহজেই ক্লান্ত হয়ে উঠে।

মানসিক কারণ

দেখা গেছে যে কোন কাজ করতে করতে কাজটি সম্পর্কে একঘেয়েমী বা বিরক্তির মনোভাব কর্ম্মীর মধ্যে দেখা দেয়। প্রথম প্রথম কাজটি সম্পর্কে ব্যক্তির মনে তৃপ্তির মনোভাব থাকে কিন্তু পরে এই মনোভাব পরিবর্ত্তিত হয়ে বিরূপ এবং বিরক্তিকর মনোভাবের রূপ নেয়। একেই ব্যক্তিগত ক্লান্তি বলা হয়েছে।

এই ক্লান্তি নানা কারণে দেখা দেয়। প্রথমত, কাজটি করার পেছনে যে প্রেষণা থাকে তার উপরেই এই মনোভাবটি নির্ভর করে। যদি কাজের প্রেষণাটি অত্যন্ত তীব্র হয় তাহলে একঘেয়েমী ভাব সহজে দেখা দেয় না। কিন্তু প্রেষণা যদি দুর্ব্বল বা কৃত্রিম হয় তাহলে কর্ম্মীর কাছে সেই প্রেষণার আবেদন স্থায়ী হয় না এবং কিছুক্ষণ পরেই ক্লান্তি দেখা দেয়। আবার, কাজটি যদি বহুক্ষণ চালিয়ে যাওয়া যায় তাহলেও যথেষ্ট প্রেষণা থাকা সত্ত্বেও এমন একটা সময় আসে যখন ক্লান্তি দেখা দেবেই।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক কাজের জন্যই প্রয়োজন প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা প্রকৃতিতে যেমন দৈহিক তেমনই মানসিকও। দৈহিক প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজন দৈহিক প্রতিক্রিয়ক যন্ত্রগুলির যথাযথ প্রয়োগ। কিন্তু মানসিক প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজন মানসিক প্রস্তুতি। এই মানসিক প্রস্তুতির স্বরূপ ও স্থায়িত্বের উপর ক্লান্তি নির্ভর করে। যদি মানসিক প্রস্তুতি দুর্ব্বল হয় তবে কাজের মধ্যে শীঘ্রই ক্লান্তি দেখা দেয় আর যদি মানসিক প্রস্তুতি দৃঢ় হয় তাহলে ক্লান্তিও বিলম্বিত হয়। মানসিক

প্রস্তুতি নির্ভর করে নানা বিষয়ের উপর। প্রথমত কাজটির দ্বারা কর্মীর ব্যক্তিগত চাহিদা কতটুকু তৃপ্ত হচ্ছে তার উপর। যদি কাজটি ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদাকে তৃপ্ত করতে পারে তাহলে কাজটির জন্য তার মানসিক প্রস্তুতিও স্বাভাবিক ও সবল হয়ে থাকে, আর যদি কাজটি ব্যক্তির চাহিদার বহির্ভূত হয় অর্থাৎ যদি অপরের দ্বারা আরোপিত হয় তাহলে ব্যক্তির মানসিক প্রস্তুতিও কৃত্রিম ও দুর্ব্বল হয়ে থাকে।

ব্যক্তির চাহিদা ছাড়াও আরও কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানসিক প্রস্তুতিকে প্রভাবিত করে। যেমন, কাজটি সম্পর্কে কর্মীর পছন্দ অপছন্দ, কাজের পরিবেশ সম্পর্কে কর্মীর মনোভাব ইত্যাদি।

ক্লান্তির মানসিক কারণের মধ্যে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেটিকে কাজের মোরেল (morale) বা মানসিক দৃঢ়তা বলা হয়ে থাকে। প্রতি কাজেতেই ব্যক্তিকে তার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে হয়। এই ইচ্ছাশক্তিই তার মনোযোগকে অটুট রাখে এবং তার উদ্যমকে ক্ষুণ্ণ হতে দেয় না। এই ইচ্ছাশক্তি বা মানসিক দৃঢ়তা কাজের সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য অপরিহার্য্য। যতক্ষণ এই মানসিক দৃঢ়তা অক্ষুণ্ণ থাকবে ততক্ষণ ক্লান্তি সহজে দেখা দেবে না। আর যদি কোন কারণে এই মানসিক দৃঢ়তার অভাব হয় তাহলে ক্লান্তি ও অবসাদে কাজের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যায়। বড় বড় কারখানায় কর্মীদের মধ্যে এই মানসিক দৃঢ়তা অক্ষুণ্ণ রাখার একটা বড় উপাদান হল কর্মীদের মধ্যে নিরাপত্তার বোধ সৃষ্টি করা। নিজের কাজ সম্পর্কে, নিজের বা আপনার জনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, নিজের স্বাস্থ্য বা শারীরিক মঙ্গল সম্পর্কে যদি কর্মীর মধ্যে নিরাপত্তাবোধের অভাব দেখা দেয় তাহলে এই মানসিক দৃঢ়তা কমে যায়।

ক্লান্তি অপনোদনের উপায়

শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্লান্তির সূত্রগুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে। শিখনও এক ধরনের কাজ এবং এতে যথেষ্ট পরিমাণে দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্তি দেখা দেয়।

এখন শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করতে হলে দুটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। প্রথম, শিখন প্রক্রিয়ার ক্লান্তিকে যতটা সম্ভব বিলম্বিত করা যায় সেদিকে যত্ন নেওয়া। দ্বিতীয়, ক্লান্তি দেখা দিলে তার অপনোদনের ব্যবস্থা করা।

ক্লান্তিকে বিলম্বিত করতে হলে নীচের পন্থাগুলি অবলম্বন করতে হবে।

প্রথমত, ক্লান্তির আবির্ভাব ও মাত্রা দুইই নির্ভর করে প্রেষণার উপর। শিখনের ক্ষেত্রে যদি প্রেষণা দুর্ব্বল হয় তাহলে সহজেই এবং খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্তি দেখা দেয়। আর যদি প্রেষণা সুদৃঢ় ও স্থায়ী হয় তাহলে ক্লান্তি সহজে দেখা দেয় না। অতএব শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি ক্লান্তিকে বিলম্বিত করতে হয় তাহলে যাতে সুদৃঢ় ও স্থায়ী প্রেষণা শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা দেয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। শিক্ষণীয় বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর প্রেষণা যত গভীর হবে ক্লান্তি ততই বিলম্বিত হবে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষণের পরিবেশটি শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে যাতে অনুকূল হয় তার চেষ্টা করা উচিত। অস্বস্তিকর বা অসুবিধাজনক পরিবেশে ক্লান্তি তাড়াতাড়ি দেখা দেয়।

তৃতীয়ত, শিক্ষার্থীর শারীরিক অবস্থা শিখনের উপযোগী হওয়া উচিত। শিখনটি সম্পন্ন করতে যতটা শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করা প্রয়োজন শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য ততটা পরিশ্রম করার উপযোগী হওয়া একান্ত :আবশ্যক। যদি শিখন কার্য্যটি শিক্ষার্থীর দৈহিক সামর্থ্যের বাইরে হয় তাহলে অতি শীঘ্রই ক্লান্তি দেখা দেবে। শারীরিক ক্লান্তি দেখা দিলেই মানসিক দক্ষতার মানও নেবে আসে।

চতুর্থত, শিখনের বিষয়বস্তুটি শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। শিক্ষণীয় বস্তুটি যদি শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি না করতে পারে তাহলে কিছুক্ষণ পরেই শিক্ষণ প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীর কাছে একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হয়ে ওঠে একেই ব্যক্তিগত ক্লান্তি নাম দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত ক্লান্তি দেখা দিলেই মানসিক ক্লান্তি শীঘ্রই দেখা দেয়।

পঞ্চমত, শিখন পদ্ধতিটি যদি বিজ্ঞানভিত্তিক না হয় তাহলেও ক্লান্তি দ্রুত দেখা দেয়। বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শেখার পদ্ধতিও বিভিন্ন। যদি অনুপযোগী শিখন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহলে শিখন কষ্টকর ও আয়াসবহুল হয়ে ওঠে। তার ফলে ক্লান্তিও তাড়াতাড়ি দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, যে বিষয়বস্তুটি অন্তর্দৃষ্টি-মূলক পন্থায় শেখা দরকার সেটি শেখার জন্য যদি প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহলে শিক্ষার্থী সহজেই ক্লান্ত হয়ে ওঠে।

অতএব উপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতির নির্ব্বাচন ক্লান্তিকে বিলম্বিত করার একটি প্রধান উপায়।

ষষ্ঠত, মানসিক তৃপ্তি ক্লান্তিকে বিলম্বিত করার আর একটি প্রধান উপকরণ। শিক্ষার্থী যদি শিখন কাজের মধ্যে মানসিক তৃপ্তি না পায় তবে ত রাক্লান্তি সহজে

দেখা দেয়। কিন্তু শিখনের মধ্যে দিয়ে সে যদি তৃপ্তি পায় তবে ক্লান্তি স্বাভাবিক-ভাবেই বিলম্বিত হয়। এইজন্য শিখন প্রক্রিয়াটিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সুবিভক্ত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী যেন শিখন কার্য্যটি সম্পন্ন করার মাঝে মাঝে সাফল্যের আনন্দ লাভ করে। যদি শিক্ষণ কার্য্যটি এমন সুদীর্ঘ ও প্রলম্বিত হয় যাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্পূর্ণ শিখন কার্য্যটি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোনরূপ সাফল্যের আস্বাদ পাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে অতি সত্বর কাজটি বিরক্তি-কর হয়ে ওঠে ও ক্লান্তি সহজেই দেখা দেয়। অবশ্য দেখতে হবে যে শিক্ষণ প্রক্রিয়াটিকে বিভক্ত করতে গিয়ে বিভাগগুলি যেন স্বাভাবিক হয়। কৃত্রিম বিভাগ হলে শিখনই কষ্টকর হয়ে ওঠে। ক্লান্তিকে বিলম্বিত করার পক্ষে সাফল্যের আনন্দ একটি শক্তিশালী উপকরণ।

সপ্তমত, কাজের গুরুত্ব ও শ্রমের মাত্রানুযায়ী সমগ্র শিখন প্রক্রিয়াটি সুপরিকল্পিত হওয়া চাই অর্থাৎ ক্লান্তির সূত্র অনুযায়ী লঘু ও গুরু কাজ বণ্টন করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, কাজ আরম্ভ হবার প্রথম দিকে শ্রমবহুল কাজগুলি দেওয়া উচিত। তারপর ক্রমশঃ ক্লান্তি সুরু হতে থাকলে লঘু কাজগুলি করতে দিতে হবে। এরপর ক্লান্তি অপনোদনের জন্য একটা সাময়িক বিরতি দেওয়া দরকার। বিরতির শেষে গুরু কাজ দেওয়া যায় কিন্তু আবার ক্লান্তি দেখা দিলে লঘু কাজগুলি আবার বণ্টন করতে হবে। দীর্ঘ সময় ধরে যেখানে শিখন চালান হয় সেখানেই কার্য্যবণ্টনে এই নীতি অনুসরণ করা উচিত। সাধারণত স্কুল কলেজে সময়-তালিকা রচনা করার সময় উপরের কার্য্যবণ্টন নীতি অনুসরণ করা হয়।

প্রশ্নাবলী

1. What is fatigue? How many types of fatigue are there? What are the causes of fatigue?

Ans. (পৃঃ ২৫৭—পৃঃ ২৬৫)

2. Discuss the relation between work and fatigue. What means will you adopt to remove the fatigue of the pupils in the class?

Ans. (পৃঃ ২৬৫—পৃঃ ২৬৭)

কুড়ি

শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা (Educational Backwardness)

শিক্ষার বহু সমস্যার মধ্যে অনগ্রসরতার সমস্যাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রায়ই দেখা গিয়েছে যে স্কুলে নিয়মিত যোগদান করা সত্ত্বেও শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতে সমর্থ হয় না। এই সব ছেলেমেয়েদের পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে তারা তাদের সহপাঠীদের চেয়ে লেখাপড়ায় বেশ পিছিয়ে আছে এবং যখন ক্লাসের অন্যান্য ছেলেমেয়েরা প্রোমোশন পেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন তারা একই ক্লাসে পড়ে থাকছে বা দু এক বছর চেষ্টা করার পর হতাশ হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

এই সব ছেলেমেয়েদের অনগ্রসরতার বিশেষ গুরুতর কারণ থাকতে পারে। তাদের সমস্যা ক্লাসের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সমস্যার সঙ্গে এক করে ফেলা উচিত নয়। বিশেষ সতর্কতা ও সহানুভূতি নিয়ে তাদের সমস্যা পর্য্যবেক্ষণ করতে হবে, কেননা সেগুলির যথোচিত ব্যবস্থা না করতে পারলে এই সব ছেলে মেয়েদের সমস্ত জীবনটিই ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা ও ক্ষীণবুদ্ধিতা

যে সব ছেলেমেয়ে ক্ষীণবুদ্ধি অর্থাৎ সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে কম বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় তারা লেখাপড়ায় যে অনগ্রসর হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ক্ষীণবুদ্ধি ছেলে তার বুদ্ধির স্বল্পতার জন্য লেখাপড়ায় প্রত্যাশিত ফল দেখাতে পারে না। তাদের অনগ্রসরতা কোন অস্বাভাবিক কারণ থেকে জন্মায় না। বিশেষ পন্থার সাহায্যে ক্ষীণবুদ্ধিদের লেখাপড়ার চেষ্টা করা হলেও তাদের অনগ্রসরতা পুরোপুরি কখনই দূর করা যায় না। ক্ষীণবুদ্ধি-জনিত অনগ্রসরতার সমস্যা এবং অস্বাভাবিক কারণ জনিত অনগ্রসরতার সমস্যা অভিন্ন নয়। অতএব যেসব ছেলেমেয়ে ক্ষীণবুদ্ধি তাদের অনগ্রসরতার সমস্যা এই আলোচনার বিষয়বস্তু নয়।

অনগ্রসরতার প্রকৃতি

শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা দু-শ্রেণীর হতে পারে প্রথম সর্ব্বাত্মক, দ্বিতীয় বিষয়মূলক। যখন শিক্ষার্থী সবকটি বিষয়েতেই অন্যান্য ছেলেদের তুলনায় পেছিয়ে থাকে তখন তাকে সর্ব্বাত্মক অনগ্রসরতা বলা যায়। আর শি.৯৭ যখন

একটি বা একাধিক বিষয়ে শিক্ষার্থী অনগ্রসর হয় তখন তাকে বিষয়মূলক অনগ্রসরতা বলা যায়। সর্ব্বাত্মক অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে সবকটি বিষয়েতেই শিক্ষার্থী কম নম্বর পায় কিন্তু বিষয়মূলক অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে একটি বা দুটি বিষয়েতে, যেমন—হয় ইংরাজীতে নয় অঙ্কে নয় অন্য কোন বিষয়ে অন্য সকলের চেয়ে শিক্ষার্থী পেছিয়ে থাকে।

অনগ্রসরতার কারণ

শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা নানা কারণে দেখা দিতে পারে। আমরা দেখেছি যে ক্ষীণবুদ্ধিতার জন্য শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা দেখা দেয়। সেজন্য যখনই কোন অনগ্রসরতার ক্ষেত্র দেখা যাবে তখনই প্রথমে দেখতে হবে তার মূলে ক্ষীণ-বুদ্ধিতা আছে কিনা। ক্ষীণবুদ্ধিতা থাকলে তার জন্য স্বতন্ত্র বিশেষধর্মী ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু ক্ষীণবুদ্ধিতা ছাড়া যদি অন্য কোন কারণে অনগ্রসরতা দেখা দেয় তবে তা দূর করার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। সর্ব্বাত্মক অনগ্রসরতা কতকগুলি সাধারণ ঘটনা বা কারণ থেকে জন্মায়। নীচে সর্ব্বাত্মক অনগ্রসরতার কয়েকটি কারণের উল্লেখ করা হল।

সর্ব্বাত্মক অনগ্রসরতার কারণ

(ক) দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের জন্য শিশু লেখাপড়ায় অনগ্রসর হতে পারে। স্বাস্থ্য দুর্ব্বল হলে শিশু প্রয়োজন মত পরিশ্রম করতে পারে না এবং এজন্য সে অনিচ্ছাকৃতভাবে পড়াশোনায় পেছিয়ে পড়তে পারে।

(খ) অনেক সময় চোখ বা কানের অসুখের জন্য শিশু ক্লাশে অনগ্রসর হয়ে পড়ে। চোখে কম দেখলে ভালো করে বোর্ড দেখতে পায় না এবং কানে কম শুনলে শিক্ষকের পড়া ভালো করে শুনতে পায় না। ফলে ক্লাশের অগ্রগতির সঙ্গে সে তাল রেখে চলতে পারে না। এই দোষগুলি যথাসময়ে দূর না করলে শিশুর লেখাপড়া বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

(গ) প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধ অনগ্রসরতার একটি বড় কারণ। কোন বিশেষ ঘটনা, আচরণ, ব্যক্তি বা পরিবেশের জন্য শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধ দেখা দিতে পারে। তার ফলে তার পড়াশোনা ঠিকমত এগোয় না।

(ঘ) অনেক সময়ে কোন স্থায়ী বা প্রলম্বিত রোগের জন্য অনগ্রসরতা দেখা দিতে পারে। বহুদিন কোন রোগে ভুগলে নানা কারণে লেখাপড়া ঠিকমত হয়ে ওঠেনা এবং শিশু আর সকলের চেয়ে পেছিয়েপড়ে।

(ঙ) কোন কারণে বিদ্যালয়ে বহুদিন অনুপস্থিত থাকলে শিশু ক্লাশের পড়ায় পেছিয়ে পড়ে। একবার বেশ খানিকটা পেছিয়ে পড়লে তার পক্ষে সেই অপঠিত অংশগুলি পূরণ করা সম্ভব হয় না। তার ফলে স্থায়ী অনগ্রসরতা দেখা দেয়।

(চ) অনুপযোগী পাঠক্রম অনগ্রসরতার আর একটি কারণ। পাঠক্রমটি যদি শিক্ষার্থীর সামর্থ্যাতীত হয় বা তার চাহিদা মেটাতে সক্ষম না হয় তাহলে শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষা প্রক্রিয়াটিই দুরূহ হয়ে ওঠে। ফলে অনগ্রসরতা দেখা দেয়।

(ছ) প্রতিকূল পরিবেশের জন্য অনেক সময় অনগ্রসরতা দেখা দেয়। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ আবহাওয়া যদি শিক্ষাগ্রহণের অনুকূল না হয় তাহলে শিক্ষা শিশুর কাছে বিরক্তিকর ও আয়াসবহুল হয়ে ওঠে। যে সব বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা অত্যন্ত নিপীড়নমূলক এবং শিক্ষাব্যবস্থা যান্ত্রিক সেখানে শিক্ষার্থীদের পক্ষে সাফল্যলাভ করা বেশ কষ্টকর হয়ে ওঠে।

(জ) অনুপযোগী শিক্ষণপদ্ধতি অনগ্রসরতার একটি বড় কারণ। বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিক্ষক যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করেন সেটি মনোবিজ্ঞানের বিচারে হয়তো খুবই ত্রুটিপূর্ণ এবং তার ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ঠিকমত হয় না। তাদের শিক্ষাগ্রহণ কার্যকরী হয় না এবং পরীক্ষাতেও তারা ভালো ফল দেখাতে পারে না।

(ঝ) প্রতিকূল গৃহপরিবেশকে অনগ্রসরতার একটা বড় কারণ বলে ধরতে হবে। শিশু যে গৃহে মানুষ হয় এবং যে স্থানীয় পরিবেশে সে বড় হয় এবং যে সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সে মেলামেশা করে, তাদের ঐ শিশুর ব্যক্তিসত্তার উপর অপরিসীম প্রভাব দেখা যায়। মা, বাবা, ভাই বোন, বাইরের সঙ্গীসঙ্গিনীরা, প্রতিবেশী এঁদের প্রভাব যদি শিক্ষার অনুকূল না হয় তাহলে শিশু অনগ্রসর হয়ে দাঁড়ায়।

বিষয়মূলক অনগ্রসরতার কারণ

কোন বিশেষ বিষয়ের প্রতি নানা কারণে শিক্ষার্থীর বিরাগ দেখা দিতে পারে। তার ফলে সে সেই বিষয়ে অনগ্রসর হয়ে পড়ে। সাধারণত বিষয়মূলক অনগ্রসরতা কতকগুলি বিশেষধর্মী কারণের জন্য দেখা দেয়। নীচে তার কয়েকটির উল্লেখ করা হল।

(ক) বিষয়টির উপর কোন বিশেষ কারণ বশত শিশুর প্রথম থেকেই বিরাগ থাকতে পারে বা বিষয়টি শিশুর পছন্দমত না হতে পারে। তার ফলে ঐ বিষয়ে তার অনগ্রসরতা সৃষ্টি হয়।

(খ) শিক্ষণ পদ্ধতির ত্রুটির জন্য বহুক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিশু অনগ্রসর হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে ইংরাজী ও অঙ্কে বহু ছেলেমেয়ের অনগ্রসর হবার কারণ হল এ বিষয় দুটির অবৈজ্ঞানিক শিক্ষণ পদ্ধতি।

(গ) অনেক সময় শিক্ষক বা পরিবেশ বা নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলা প্রভৃতির জন্য কোন বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার্থীর বিরাগ সৃষ্টি হতে পারে। তাই থেকে সে সেই বিষয়েতে অনগ্রসর 'হয়ে পড়ে।

(ঘ) বিশেষ কোন বিষয়ের ক্লাশে বহুদিন অনুপস্থিত থাকার জন্য ঐ বিষয়ে শিক্ষার্থী অনগ্রসর হয়ে উঠতে পারে।

অনগ্রসরতা দূর করার উপায়

অনগ্রসরতা দূর করতে হলে নীচের পন্থাগুলি অবলম্বন করা উচিত।

প্রথমত, দেখতে হবে যে শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতার প্রকৃত কারণটি কি, যেহেতু সেই কারণটি দূর করাই শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতা দূর করার প্রকৃষ্ট উপায়। যেমন যদি দেখা যায় যে শারীরিক অসুস্থতা বা ইন্দ্রিয়জনিত কোন দুর্ব্বলতা বা প্রলম্বিত ব্যাধির জন্য অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয়েছে তাহলে ঐ বিশেষ কারণটি দূর করলেই শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতাও দূর হয়ে যাবে। যদি কোন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে অনুপযোগী পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য অনগ্রসরতা দেখা দিয়ে থাকে তাহলে পদ্ধতির উন্নতি করলেই তার অনগ্রসরতাও দূর হয়ে যাবে। সেই রকম অনুপযোগী পাঠক্রম, প্রতিকূল পরিবেশ বা কোন ঘটনাজনিত বিরাগ প্রভৃতি কারণে যদি শিক্ষার্থীর মধ্যে অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে ঐ কারণটি দূর করাই অনগ্রসরতা নিরাকরণের উপায়।

যে সব ক্ষেত্রে প্রক্ষোভজনিত প্রতিরোধ থেকে অনগ্রসরতা সৃষ্টি হয় সেই সব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মন থেকে ঐ প্রতিরোধ দূর করতে হবে। পর্য্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধের কারণটি বার করতে হবে এবং সেই কারণটি দূর করলেই শিক্ষার্থীর মন থেকে প্রক্ষোভমূলক বিরূপতাও দূর হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন শিশুর বিদ্যালয় কিংবা শিক্ষকমণ্ডলী কিংবা লেখাপড়ার প্রতি মনে ঘৃণা বা ভয় বা বিরাগের সৃষ্টি হয় তাহলে তার

মন থেকে এই বিরূপ প্রক্ষোভটি দূর করতে না পারলে শিক্ষার প্রতি কখনই তার অনুকূল মনোভাব দেখা দেবে না।

প্রতিষেধমূলক পন্থা

সাধারণভাবে শিক্ষার্থীরা যাতে লেখাপড়ায় অনগ্রসর না হয়ে ওঠে তার জন্য নীচের সাবধানতামূলক পন্থাগুলি অবলম্বন করা উচিত।

(ক) গৃহ পরিবেশ সমুন্নত করা।

(খ) শিখনপদ্ধতি মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক করা।

(গ) পাঠক্রমকে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী করে তোলা।

(ঘ) বিদ্যালয়ের পরিবেশকে সমাজধর্মী করা এবং অন্তর্জাত শৃঙ্খলার প্রয়োগ করা।

(ঙ) শিক্ষার্থীর মধ্যে যাতে প্রক্ষোভমূলক সমতা বজায় থাকে তা দেখা।

(চ) শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষণের আয়োজন রাখা।

(ছ) কোন শারীরিক বা ইন্দ্রিয়জনিত ত্রুটি থাকলে অবিলম্বে তার চিকিৎসা করা বা তা দূর করার ব্যবস্থা করা।

(জ) দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য শিক্ষার্থী অনগ্রসর হয়ে পড়লে তার অপঠিত অংশ পূরণের জন্ত তাকে বিশেষ সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

(ঝ) কোন বিশেষ বিষয়ের প্রতি বিরাগ থাকলে সেই বিরাগের কারণ খুঁজে বার করা ও বিরাগ দূর করার ব্যবস্থা করা।

বিষয়মূলক অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে ত্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষার (Diagnostic Test) প্রয়োগ

বিষয়মূলক অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে কোন বিশেষ বিষয়ে কোন্ কোন্ অংশে বা পর্যায়ে শিক্ষার্থী প্রকৃতপক্ষে পশ্চাৎপদ সেটি প্রথমে খুঁজে বার করা দরকার। যেমন মনে করা যাক শিক্ষার্থী যদি ইংরাজীতে কাঁচা হয় তাহলে দেখতে হবে যে সে ইংরাজির কোন্ দিকটিতে কাঁচা। অর্থাৎ সে বানানে কাঁচা, না ব্যাকরণে কাঁচা, না বাক্য গঠনে কাঁচা, না বিশেষ প্রয়োগবিধিতে কাঁচা ইত্যাদি। হয়তো ইংরাজীর এই বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে কতকগুলিতে সে ভালই কিন্তু আর কতকগুলিতে সে দুর্ব্বল হওয়ায় সে ইংরাজীতে ভাল ফল দেখাতে পারে না। এই সব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রকৃত চিকিৎসা করার জন্য সে বিষয়টির ঠিক কোন্ দিকটিতে কাঁচা সেটি খুঁজে বার করে ঐ বিশেষ দিকটিরই চিকিৎসা করা উচিত। নইলে শ্রম ও সময়ের অযথা অপচয় হবে।

এই সব বিশেষধর্ম্মী ত্রুটি বা দুর্ব্বলতা ধরার জন্য আজকাল এক নতুন ধরনের অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে। তাকে ত্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষা (Diagnostic Test) বলে। এই অভীক্ষার সাহায্যে কোন বিশেষ বিষয়ের ঠিক কোন্ অংশে বা কোন্ দিকটিতে শিক্ষার্থী দুর্ব্বল তা ধরা যায় এবং সেই মত তার সংশোধনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। বলা বাহুল্য এই পন্থাতেই অনগ্রসরতা সুনিশ্চিত এবং কার্য্যকরীভাবে দূর করা সম্ভব। বিশেষ করে বিষয়মূলক অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে ত্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষার সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য্য। আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে অনগ্রসরতা দূর করার উপকরণরূপে ত্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষার বহুল প্রচলন হয়েছে

প্রশ্নাবলী

1. What is educational backwardness ? How is it caused ?
   Ans. (পৃঃ ২৬৮—পৃঃ—২৭১)
2. Discuss the causes and and remedies of educational backwardness.
   Ans. (পৃঃ ২৬৯—পৃঃ ২৭৩)

একুশ

অপরাধ-প্রবণতা (Delinquency)

শিক্ষার ক্ষেত্রে আর একটি বড় সমস্যা হল অপরাধপ্রবণতা। অনেক সময় দেখা যায় যে শিশু সহজ ও স্বাভাবিক পথে না গিয়ে অস্বাভাবিক ও অসামাজিক আচরণ করতে সুরু করেছে। প্রত্যেক সমাজেই আচরণের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মান আছে। এই মান অনুযায়ী আচরণ করতে শিশুকে শেখানই সমস্ত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য। আচরণের এই মান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাওয়াকে অপরাধ আখ্যা দেওয়া হয়। খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এই আচরণের মান থেকে ভ্রষ্ট হওয়াকে সমস্যামূলক আচরণ (Problem behaviour) বলা হয়। আর একটু বড় ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এই সামাজিক মান থেকে ভ্রষ্ট হওয়াকে অপরাধ প্রবণতা (Delinquency) নাম দেওয়া হয়। প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে সামাজিক আচরণের মান থেকে ভ্রষ্ট হওয়াকে দেশের আইনের মাধ্যমে বিচার করা হয় এবং সে আচরণ আইনবিরোধী হলেই তাকে আইনগত অপরাধ (Crime) নাম দেওয়া হয়। কিশোর অপরাধীদের (Delinquent) স্বতন্ত্রভাবে বিচার করার পন্থা সবদেশেই প্রচলিত আছে এবং তাদের জন্য স্বতন্ত্র কিশোর বিচারালয়ও (Juvenile Court) আছে। এর কারণ হল, মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে কিশোরদের অপরাধ করার মূলে এমন কতকগুলি শক্তি আছে যেগুলির জন্য কিশোরেরা নিজেরা দায়ী নয়। অতএব সাধারণ আইনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তাদের চিকিৎসা না করে তাদের মানসিক বিকৃতির প্রকৃত কারণ কি তা খুঁজে বার করে সেটি দূর করার চেষ্টা করাই উচিত।

অপরাধপ্রবণতার কারণ

বস্তুতঃ, অপরাধপ্রবণতাকে নিছক শিক্ষামূলক সমস্যা না বলে এটিকে সমাজমূলক সমস্যা বলাই উচিত। কেননা অপরাধপ্রবণতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও পারিবেশিক শক্তি কিশোরদের মনে অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি করে থাকে। এই সামাজিক ও পারিবেশিক শক্তিগুলি শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রতিকূল এবং এগুলির চাপেই শিশুর ব্যক্তিসত্তা

অস্বাভাবিক পথে বেড়ে ওঠে। যদি এই প্রতিকূল শক্তিগুলি কার্য্যকরী না হত তাহলে শিশুর ব্যক্তিসত্তা স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠত।

অপরাধপ্রবণতার কারণগুলিকে আমরা চার শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যথাঃ বংশধারামূলক (Hereditary), পারিবেশিক (Environmental), সামাজিক (Social) এবং মনোবৈজ্ঞানিক (Psychological)

বংশধারামূলক কারণ

বংশধারামূলক কারণ বলতে বোঝায় মাতাপিতা বা পূর্ব্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কোন বৈশিষ্ট্য। অপরাধপ্রবণতা অবশ্য উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় না। এটি অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ক্ষীণবুদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধ-প্রবণতার গভীর যোগাযোগ আছে। পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেছে যে অপরাধ-প্রবণ ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষীণবুদ্ধির সংখ্যা যথেষ্ট থেকে থাকে। অর্থাৎ যারা ক্ষীণবুদ্ধি হয় তাদেরই অপরাধ করার দিকে মন যায়। ক্ষীণবুদ্ধিতা একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য এবং এইজন্য আমরা ক্ষীণবুদ্ধিতাকে অপরাধপ্রবণতার বংশধারামূলক কারণ বলে বর্ণনা করতে পারি।

পারিবেশিক কারণ

অপরাধপ্রবণতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারিবেশিক কারণ থেকে সৃষ্ট হয়ে থাকে। এই ধরনের কারণগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

(১) গৃহের পরিবেশ শিশুর কাছে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। অপরাধ-প্রবণতার বহু কারণ এই পরিবেশের মধ্যে নিহিত থাকতে দেখা গেছে। যে গৃহ-পরিবেশে শিশু বড় হয় সে পরিবেশ স্বাস্থ্যপ্রদ না হলে শিশুর ব্যক্তিসত্তাও দুর্ব্বল ও বিপথগামী হয়ে ওঠে। অস্বাস্থ্যকর গৃহ পরিবেশ আবার নানাপ্রকারের হতে পারে। যেমন—

(ক) শিশু যদি অবহেলিত হয়। সাধারণত যে পরিবারে অনেকগুলি ভাই-বোন থাকে সে পরিবারে সব শিশু পূর্ণ যত্ন ও মনোযোগ পায় না।

(খ) শিশু যদি অতিরিক্ত নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলার মধ্যে মানুষ হয়।

(গ) শিশু যদি অতিরিক্ত আদর বা যত্নে মানুষ হয়। সাধারণত শিশু যদি পিতামাতার একটি মাত্র সন্তান হয় তাহলে সে প্রয়োজনাতিরিক্ত আদর-যত্ন লাভ করে এবং তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিসত্তার সংগঠন ব্যাহত হয়।

(ঘ) যদি বিপর্য্যস্ত গৃহে (Broken home) শিশু মানুষ হয়। দায়িত্বহীন

স্বার্থপ্রিয় মা কিংবা অসচ্চরিত্র মদ্যপ বাবা কিংবা ডিভোর্সে ভেঙে যাওয়া সংসার বা সর্ব্বদা মা-বাবার কলহে শান্তিহীন পরিবার প্রভৃতি কারণ শিশুর স্বাভাবিক স্বাস্থ্যময় গৃহপরিবেশকে নষ্ট করে দিতে পারে। এই ধরনের বিপর্য্যস্ত গৃহে যে সব শিশু বড় হয় তাদের সহজেই অস্বাভাবিক আচরণের দিকে প্রবণতা দেখা দেয়।

(ঙ) অতিরিক্ত দারিদ্র্য বা অভাবের জন্য সময় সময় অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয়। সাধারণ মাত্রার দারিদ্র্য বা অভাববোধ অপরাধপ্রবণতা আনে না। কিন্তু যদি দারিদ্র্য মাত্রাতীত হয় তাহলে তা শিশুর প্রক্ষোভমূলক সংগঠনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং এই মানসিক নিপীড়নের ফলে শিশুর মন অপরাধ করার দিকে ঝোঁকে।

(চ) অতিরিক্ত শৃঙ্খলা যেমন অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি করে তেমনই শৃঙ্খলার পূর্ণ অভাবও অপরাধপ্রবণতার কারণ হয়ে উঠতে পারে। স্বাধীনতা আর শৃঙ্খলার অভাব এক কথা নয়। স্বাধীনতা সুপরিচালিত ও উদ্দেশ্যমূলক হলে তা বিপথগামী হয় না, কিন্তু অপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যবিহীন স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা আনে এবং শিশুকে অপরাধ করার দিকে চালিত করে।

(ছ) শৃঙ্খলার অভাব যেমন ক্ষতিকর তেমনই ক্ষতিকর শিশুর প্রতি বৈষম্য-মূলক আচরণ। দেখা যায় এমন অনেক পিতা-মাতা আছেন যাঁরা কখনও শিশুকে খুব আদর-যত্ন করেন, উপহার পুরস্কারে প্লাবিত করেন, আবার পরমুহূর্ত্তেই হয়ত বকাবকি মারধর শাস্তি দেন। এই ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ শিশুর মনকে বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ করে এবং তাকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে।

(ঝ) যদি গৃহ-পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর ও শিশুর বৃদ্ধির সহজ গতিপথের প্রতিকূল হয়।

(২) গৃহ-পরিবেশের পর আসে শিশুর বাইরের পরিবেশ। শিশু যে অঞ্চলে মানুষ হয়, যে ধরনের সঙ্গী-সাথীর সঙ্গে মেলামেশা করে, যে ধরনের প্রতিবেশীদের সঙ্গে বাস করে, সে সবেরও প্রচুর প্রভাব থাকে শিশুর ব্যক্তিসত্তাগঠনের উপর। যদি তার বাসস্থানের পরিবেশ তার মানসিক স্বাস্থ্যগঠনের পরিপন্থী হয় তাহলে শিশু অপরাধপ্রবণ হয়ে বড় হয়ে ওঠে। অসদ্‌সঙ্গীর প্রভাবে শিশুর বিপথগামী হয়ে যাবার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। কিশোর বয়সে শিশুদের মধ্যে দল বিশ্বস্ততা গভীরভাবে দেখা দেয় এবং দলের প্রভাব তাদের আচরণকে প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত করে থাকে। যদি এই সময় সে ভাল দলের প্রভাবে না আসে তাহলে তার পক্ষে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠা খুবই সম্ভব।

(৩) শিশুর পরিবেশের মধ্যে বিদ্যালয়-পরিবেশ একটা বড় স্থান জুড়ে থাকে। দিনের একটা বেশ বড় অংশ শিশু বিদ্যালয়ে কাটায় এবং এই সময়ে সে বহু প্রভাবশালী শক্তির সংস্পর্শে আসে। শিক্ষকমণ্ডলী, সহপাঠী ও বন্ধুবান্ধবের দল, বিদ্যালয়ের নিজস্ব নিয়মকানুন, আচারব্যবহার ও প্রথাদি শিশুর মানসিক সংগঠনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। যে সব বিদ্যালয়ে পরিবেশকে সত্যকারের সমাজধর্ম্মী করে গড়ে তোলা যায় না, সে সব স্থানে শিশু একক বিচ্ছিন্ন মানুষরূপে বড় হয়ে ওঠে এবং তার উপর বিদ্যালয়ের সংহতিমূলক কোন প্রভাব থাকে না। এই সব শিশুরা স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও অসামাজিক হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধ দুর্ব্বল থাকার জন্য অপরাধপ্রবণতাও সহজে দেখা দেয়।

সামাজিক কারণ

আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ও সমাজতত্ত্ববিদেরা কিশোর অপরাধকে সামাজিক সমস্যা বলেই বর্ণনা করে থাকেন। বস্তুত সমাজের সংগঠন ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর অপরাধপ্রবণতার প্রকৃতি ও মাত্রা নির্ভর করে। সমাজের গঠনপ্রকৃতি, আচরণের অনুমোদিত মান, বিধিশৃঙ্খলার কাঠিন্য, নৈতিক আদর্শের স্বরূপ প্রভৃতির দ্বারাই ব্যক্তির আচরণ প্রচুর পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে সমাজের প্রচলিত নৈতিক মানের প্রতি প্রাপ্তবয়স্কদের কতটা আনুগত্য আছে তার উপর শিশুদেরও ভাল মন্দ, উচিত, অনুচিতেরধারণা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যে সমাজে নীতি-গত আদর্শ সম্পর্কে কোন সুনির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধ নেই সে সমাজের কিশোর ও তরুণ-দের মধ্যে অপরাধপ্রবণতার আধিক্য দেখা যায়। এইজন্যই অসংবদ্ধ ও অনিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থায় নানারকম দুর্নীতি ও অপরাধের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। যুদ্ধ, অন্তর্বিপ্লব, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় প্রভৃতির জন্য যখন সমাজব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে তখন কিশোর ও তরুণদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতাও প্রচুর পরিমাণে দেখা দেয়। এইসব কারণে স্বাভাবিকভাবেই এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে যখন কোন সমাজে কিশোরদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতার হার বেড়ে ওঠে তখন তার মূলে সামাজিক সংগঠনের কোন বিরাট ত্রুটি বা গলদ থাকবেই। সমাজ সংগঠনের যোগসূত্রগুলি যখন দুর্ব্বল হয়ে ওঠে তখন সেই দুর্ব্বলতা অসংযম ও আদর্শহীনতার রূপ নিয়ে ব্যক্তির মনে প্রতিফলিত হয়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সমস্ত দেশেই স্বাভাবিক সমাজ সংগঠনে অল্পবিস্তর বিপর্য্যয় দেখা দিয়েছিল। ভারতের মত সুদূর দেশেও ব্ল্যাক মার্কেটিং, অতিরিক্ত লাভ, অন্যায়ভাবে মাল মজুত রাখা, প্রতারণা, উৎকোচ গ্রহণ

প্রভৃতি নানা অন্যায় এবং অনুচিত অসামাজিক কাজ প্রচুর পরিমাণে সংঘটিত হয়েছিল। এর ফলে আমাদের সমাজ সংগঠনে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তা আমাদের দেশের কিশোর ও তরুণদের মধ্যে অপরাধপ্রণতার মাত্রা যে প্রচুর বাড়িয়ে দিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মনোবৈজ্ঞানিকমূলক কারণ

অপরাধপ্রবণতার একটা বড় কারণ হল মনোবৈজ্ঞানিক বিকলতা। প্রত্যেক শিশুরই কতকগুলি মৌলিক চাহিদা থাকে। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এই চাহিদাগুলি সংখ্যা ও জটিলতার দিক দিয়ে বেড়ে ওঠে। এই চাহিদাগুলি ঠিকমত তৃপ্ত না হলে তার মধ্যে অপসঙ্গতি (maladustment) দেখা দেয়। যখন এই অপসঙ্গতি তীব্র আকার ধারণ করে তখন তা অপরাধপ্রবণতার রূপ নেয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে চুরিকরা, মিথ্যা কথা বলা, ধ্বংসমূলক কাজকর্ম করা ইত্যাদির মূলে আছে কোন বিশেষ মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদার অতৃপ্তি। এই সব ছেলেমেয়েরা স্বাভাবিক পন্থায় চাহিদা মেটাতে না পেরে অপরাধমূলক আচরণের মধ্যে দিয়ে তাদের চাহিদা মেটাবার চেষ্টা করে।

অপরাধপ্রবণতার শ্রেণীবিভাগ

অপরাধপ্রবণতা বিভিন্ন রূপে দেখা দিতে পারে। তাদের মধ্যে যেগুলি ব্যাপকভাবে দেখা যায় সেগুলি হল এই—

(ক) মিথ্যাভাষণ
(খ) অপহরণ
(গ) ক্লাশপালানো
(ঘ) শৃঙ্খলাভঙ্গতা
(ঙ) আক্রমণধর্ম্মিতা
(চ) নেতিমনোভাব
(ছ) অবাধ্যতা
(জ) প্রতারণা
(ঝ) ধ্বংসমূলকতা
(ঞ) যৌন অপরাধ

এই সব অপরাধ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ ও মাত্রা নিয়ে দেখা দিতে পারে। উপরের তালিকার অধিকাংশ আচরণই ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে। কিন্তু সেগুলি মূলত পারিবেশিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে অসামর্থ্যের জন্যই দেখা দেয় এবং সযত্ন চিকিৎসা বা অনেক সময় শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি চলে যায়। কিন্তু কিশোরদের মধ্যে যখন অপরাধ প্রবণতা দেখা দেয় তখন সেগুলির চিকিৎসার জন্য সযত্ন প্রয়াস অপরিহার্য্য। কিশোর বয়সে অপরাধ প্রবণতাকে অবহেলা করলে বড় হলে তাদের মধ্যে থেকেই সমাজবিরোধী অপরাধী

বা ক্রিমিনাল (criminal) দেখা দেয়। এইজন্য সমাজের মঙ্গলের জন্যই অপরাধ-প্রবণতার চিকিৎসা করা একান্ত আবশ্যক।

অপরাধপ্রবণতা দূর করার উপায়

অপরাধপ্রবণতা দূর করতে হলে আমাদের দু'ধরনের উপায় অবলম্বন করতে হবে। (১) প্রতিরোধমূলক (preventive) এবং (২) নিরাময়মূলক (curative)। প্রতিরোধমূলক পন্থাগুলি আবার দুরকমের হতে পারে। —ব্যক্তিমূলক (individual) এবং সমষ্টিমূলক (collective)

প্রতিরোধমূলক পন্থা

প্রতিরোধমূলক পন্থাগুলি বলতে বোঝায়—শিশুর মনে যাতে অপরাধপ্রবণতা না জাগে তার ব্যবস্থা করা। যে সব কারণের জন্য অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয় সেগুলিকে দূর করাই এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

যখন এই প্রতিরোধমূলক পন্থাগুলি শিশুর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে প্রযুক্ত হয় তখন সেগুলিকে ব্যক্তিগত প্রতিরোধমূলক পন্থা বলা হয়। এই পর্য্যায়ে পড়ে নীচের পন্থাগুলি।

(ক) শিশুর গৃহ পরিবেশ উন্নত করা।

(খ) শিশু যাতে অবহেলিত বা প্রত্যাখ্যাত না হয় তা দেখা।

(গ) শিশুকে অতিরিক্ত আদর না দেওয়া।

(ঘ) বিপর্য্যস্ত পরিবারের ক্ষেত্রে শিশু যাতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ পায় তার ব্যবস্থা করা।

(ঙ) সাংসারিক অভাব অনটন, পারিবারিক সমস্যা প্রভৃতি শিশুর মনকে যাতে স্পর্শ না করে তা দেখা।

(চ) শিশুর বাসস্থান যাতে স্বাস্থ্যপ্রদ হয়, শিশু যাতে পুষ্টিকর খাদ্য পায়, ব্যায়াম ও শরীর সঞ্চালনের যথেষ্ট সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা।

(ছ) শিশুর নিত্যসঙ্গী ও খেলাধূলার সাথী, বন্ধুবান্ধব যাতে ভাল হয় সেদিকে যত্ন নেওয়া

(জ) গৃহের শৃঙ্খলা ব্যবস্থা যাতে সমাঞ্জস্যপূর্ণ ও সুনিয়ন্ত্রিত হয় সেদিকে দেখা। বৈষম্যমূলক আচরণ সযত্নে বর্জ্জন করা প্রয়োজন।

(ঝ) অপরাধপ্রবণতা দূর করতে হলে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য যাতে অক্ষুণ্ণ

থাকে সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি দেওয়া দরকার। মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হলে বিদ্যালয়ের পরিবেশকে সমাজধর্মী করে তুলতে হবে, সকলের চাহিদা মেটাতে পারে এমন পাঠক্রমের প্রবর্ত্তন করতে হবে, শিক্ষণপদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক করে তুলতে হবে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে হবে এবং বিদ্যালয়ের কার্য্যসূচীতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বহিঃপাঠক্রমিক কাজকর্ম্ম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সমষ্টিগত প্রতিরোধমূলক পন্থা বলতে সাধারণভাবে সামাজিক সংগঠনের উন্নয়নকেই বোঝায়। এ দিক দিয়ে বিচার করলে নীচের ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা যায়।

(ক) সামাজিক আচার-ব্যবহার, প্রথা-পদ্ধতিগুলি যেন প্রগতিশীল হয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সমতা রেখে সমাজ ব্যবস্থারও সংস্কার প্রয়োজন।

(খ) সমাজের সদস্যদের চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে আদর্শ বা মানের পরিবর্ত্তন করতে হবে। প্রাচীন গতানুগতিক মানের প্রতি অন্ধ আসক্তি পরিত্যাগ না করলে বর্দ্ধিষ্ণু কিশোর মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে সমাজে প্রচলিত মানের সংঘাত দেখা দেওয়ার ফলে কিশোর মনে চাঞ্চল্য ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয় এবং তা থেকে অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

(গ) রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে মানুষের জীবনে শঙ্কা ও নিরাপত্তাহীনতা যখন দেখা দেয় তখন প্রাপ্তবয়স্কদের মত কিশোর ও তরুণদের মনকেও সেই মনোভাব প্রভাবিত করে। এই সময় অনিশ্চয়তা উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা কিশোর মনের উপর এমন একটা মনোবৈজ্ঞানিক চাপের সৃষ্টি করে যার ফলে অপরাধপ্রবণতার দিকে তাদের মন চলে যায়।

এইজন্য রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা যাতে কিশোর মনকে স্পর্শ করতে না পারে তার জন্য তাদের সব সময় সংগঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত রাখতে হবে। সুপরিকল্পিত পন্থায় কিশোরদের শিক্ষাসূচীকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে এই ধরনের চিন্তা বা মনোভাব তাদের মনে গিয়ে না পৌছয়।

(ঘ) সমাজের বিধিনিষেধ, শৃঙ্খলা-নিয়মকানুন কঠোর হোক বা শিথিল হোক তাতে কিশোর মনের কিছু এসে যায় না। কিন্তু সব চেয়ে বেশী যা কিশোর মনকে প্রভাবিত করে সেটি হল সেই নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধের প্রতি সমাজের বয়স্কদের

আনুগত্যের মাত্রা। যে সমাজে প্রাং
প্রতি বিশ্বস্ত সে সমাজে কিশোরদের ম

(ঙ) যদি বিশেষ কোন অপ:
তাহলে উপযুক্ত মনশ্চিকিৎসকের সাহ
ব্যবস্থা করতে হবে।

নিরাময়মূলক পন্থা

নিরাময়মূলক পন্থাগুলির মধ্যে নী

(ক) যদি প্রতিকূল পরিবেশের
পরিবেশের পরিবর্ত্তন বা সংস্কারসাধ
শিশুকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অনুকূল

(খ) গৃহ পরিবেশ অনুপযোগী
রাখা যেতে পারে।

(গ) অপসঙ্গতির জন্য
মনোবৈজ্ঞানিক কারণটি খুঁজে বা
হয়। বিদ্যালয়ে শিশু যাতে যথ
এবং তার মৌলিক চাহিদাগুলি ে

(ঘ) সমাজধর্মী পরিবেশ স
কেন্দ্রিক পাঠসূচী অনুসরণ করা,
আয়োজন রাখা প্রভৃতি হল অপ:

1. What is delinqu
   Ans. (পৃঃ ২৭৪—
2. What are the va
   can they be faug
   Ans. (পৃঃ ২৭৫-
3. Delinquency i
   problem. Disc
   Ans. (পৃঃ ২৭৪-